আল্লামা কারী মুহাম্মদ তৈয়ব রহ. এর
বক্তৃতামালার অমর সংকলন

খুতুবাতে হাকীমুল ইসলাম



আল্লামা কারী মুহাম্মদ তৈয়ব রহ. এর
বক্তৃতামালার অমর সংকলন

খুতুবাতে হাকীমুল ইসলাম-৬

অনুবাদ
মাওলানা আবু সাকী মাহবুব
মুহাদ্দিস, সম্পাদক ও সাহিত্যিক, জামিয়াতুস সুন্নাহ শিবচর
ফাযেলে হাটহাজারী

বইঘর
[অভিজাত বইয়ের ঠিকানা]
৪৩ ইসলামী টাওয়ার, ১১/১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
দূরালাপনী : ০১৭১৭৫৫৪৭২৭, ০১৭১১৭১১৪০৯
e-mail: boighorbd@gmail.com; boighor2008@gmail.com
web: www.boighorbd.com

টেলিগ্রাম চ্যানেল লিংক

https://t.me/islaMic_fdf



খুতুবাতে হাকীমুল ইসলাম-৬
কারী মুহম্মদ তৈয়ব রহ.

প্রকাশক
ব ই ঘ র -এর পক্ষে
এস এম আমিনুল ইসলাম

© সংরক্ষিত

চতুর্থ মুদ্রণ
সেপ্টেম্বর ২০২০

তৃতীয় মুদ্রণ
সেপ্টেম্বর ২০১৮

দ্বিতীয় মুদ্রণ
জানুয়ারি ২০১৭

প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারি ২০১৬

প্রচ্ছদ
আরিফুর রহমান

কম্পোজ
ব ই ঘ র বর্ণসাজ
বাংলাবাজার, ঢাকা- ১১০০
০১৭১১৭১১৪০৯

মুদ্রণ : ঢাকা প্রিন্টার্স
৩৬ শ্রী-দাস লেন, ঢাকা-১১০০

মূল্য : ৪০০ টাকা মাত্র

ISBN : 984-70168-0057-3

KHOTOBAT-E-HAKIMUL ISLAM : Translet By Abu Saki Mahbub
Published by : S M Aminul Islam, BhoiGhor : 43 Islami Tower
11/1 Bangiabazar, Dhaka-1100 1st Edition : February 2016 4th Edition : September
2020 © by the publisher

Price : 400 Taka only

অ।র্প।ণ

হাজী আব্দুস সোবহান ও
মোসাম্মত রাহিমা বেগম
যাদের ভালবাসা ও স্নেহের ছায়ায়
আমার নিত্য বসবাস। নেক হায়াত
এবং উভয় জগতের সফলতা কামনায়–

–অনুবাদক

অনুবাদকের আরজ

হযরত হাকীমুল ইসলাম আল্লাম কারী মুহাম্মদ তৈয়ব রহ.কে আল্লাহ তায়ালা অশেষ ও অদ্বিতীয় দীনি খেদমতের সৌভাগ্যে সৌভাগ্যশালী করেছেন। লেখনি ও বয়ানের মাধ্যমে তিনি কুরআন ও সুন্নাহর সঠিক ও কার্যকর তালিম বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দিয়েছেন। এশিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপ ও আমেরিকার শতাধিক দেশের কোটি মানুষ দীনের সঠিক বুঝ গ্রহণ ও তাতে অটল থাকার ব্যাপারে তাঁর ইলম দ্বারা উপকৃত হয়েছেন।

তিনি সুদীর্ঘ ৫৯ বছর পর্যন্ত উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ দীনি প্রতিষ্ঠান দারুল উলুম দেওবন্দের মুহতামিম ছিলেন। এ সময়ে তিনি হাজী ওয়ালিউল্লাহ রহ. ও হযরত কাসেম নানুতুবী রহ.-এর ভাবনাকে দারুল উলুম দেওবন্দে পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। অসাধারণ গুণাবলি ও বিশ্বমানের ব্যক্তিত্ব দিয়ে তিনি এ দীনি প্রতিষ্ঠানটিকে 'কেন্দ্রীয় আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে' পরিণত করেছেন।

হাকীমুল ইসলাম রহ. যেমনিভাবে আকাবিরগণের রূহানী ফয়েযের ধারক ছিলেন, তেমনিভাবে আল্লাহ তাঁকে ইলমী ফয়েযও দান করেছিলেন। বিশেষ করে পিতামহ হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত মাওলানা কাসেম নানুতুবী রহ.-এর ইলমের সাথে পূর্ণ মুনাসাবাত দান করেছিলেন। এই বিশেষত্বের কারণেই তাঁর বয়ান ও খুতবাসমূহের ফয়েয জাতির কোনো বিশেষ স্তরের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, সবার জন্য ব্যাপক বিস্তৃত।

ইসলামী জীবন-যাপনের নানা বিষয়কে তিনি কুরআন-হাদীস, পূর্ববর্তী মনীষীদের ইলমের নির্যাস এবং স্বীয় জ্ঞান ও প্রজ্ঞার আলোকে সুচিন্তিত মতামতের সমন্বয়ে অপূর্ব দক্ষতার সাথে উপস্থাপন করেছেন। প্রতিটি বক্তৃতায় তিনি এক-একটি স্বতন্ত্র বিষয়কে তুলে এনেছেন। তাঁর উপস্থাপনার ধরন, জ্ঞানের গভীরতা, উদাহরণ-উপমা, বুঝানোর পদ্ধতি, বিষয়ের গভীর থেকে গভীরে সন্তরণ– যত দেখি ততই মুগ্ধ, বিস্মিত হই।

আলোচ্য গ্রন্থে হাকীমুল ইসলাম কারী মুহাম্মদ তৈয়ব রহ.-এর বয়ানসমূহ সংকলিত হয়েছে। প্রথম যুগে হযরতের বয়ানগুলো হাতে লিখে সংরক্ষণ করা হতো। এ কাজ আঞ্জাম দেয়ার জন্য আলেমদের একটি দল তৈরি হয়ে গিয়েছিল। হযরত বয়ান করার সময় তারা দ্রুততার সাথে প্রতিটি শব্দ লিখে নিতেন। টেপ রেকর্ডারের যুগ আসার পর তাঁর বয়ানগুলো পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ক্যাসেটে ধারণ হতে থাকে। সারা বিশ্বে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা সে বয়ানগুলো সংগ্রহ, সংকলন, সম্পাদনা ও গ্রন্থাকারে প্রকাশ করার দুরূহ কাজটি দেওবন্দের 'হাকীমুল ইসলাম একাডেমি' আঞ্জাম দিয়েছে। বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি দশ খণ্ডে সমাপ্ত সংকলনের ষষ্ঠ খণ্ডের অনুবাদ।

এই দুর্লভ বয়ানগুলো আমাদের পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়ার জন্য বিশেষভাবে শুকরিয়া আদায় করছি হাকীমুল ইসলাম একাডেমির পরিচালক এবং হযরতের সাহেবজাদা মাওলানা মুহাম্মদ সালেম কাসেমী সাহেবকে, যার সরাসরি তত্ত্বাবধান ও সম্পাদনায় বয়ানগুলো গ্রন্থাবদ্ধ হয়েছে। আরো শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি মাওলানা মুহাম্মদ ইদরিস হুশিয়ারপুরী সাহেবের, যিনি দিন-রাত পরিশ্রম করে ক্যাসেট থেকে শুনে বয়ানগুলো লিপিবদ্ধ করেছেন। বয়ানের শিরোনাম ও উপ-শিরোনামগুলো মাওলানা ইদরিস সাহেব ও অন্যান্যদের দেয়া। মহান আল্লাহ তায়ালা এঁদের সকলকে জাযায়ে খায়ের দান করুন।

এই খণ্ডে মোট নয়টি বয়ান সন্নিবেশিত হয়েছে। নবম বয়ানটি ২০১০ সালে 'ইসলাম ও বিজ্ঞান' শিরোনামে বইঘর থেকে স্বতন্ত্র গ্রন্থরূপে প্রকাশিত হয়। অনুবাদ করেছিলেন মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল আলীম সাহেব। বক্ষ্যমাণ গ্রন্থে উক্ত অনুবাদেরই সম্পাদিত রূপটি সন্নিবেশিত হলো। তাই মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল আলীম সাহেবকে বিশেষ কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি। অনুবাদ ও সম্পাদনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ব্যক্তিদের দ্বারা আমি নানাভাবে উপকৃত হয়েছি। আল্লাহ তায়ালা জগতে এমন কিছু দীনের দায়ী সৃষ্টি করেছেন, যারা নিজের নয় বরং দীনের প্রচার-প্রসারকে নিজ জীবনের ব্রতী হিসেবে গ্রহণ করেছেন। দীনের এমন দায়ীগণ আছেন বলেই আজও দীনের শিখা উন্নত মহিমায় দীপ্তি ছড়াচ্ছে।

মহান আল্লাহর কাছে এঁদের সর্বোচ্চ প্রতিদান প্রাপ্তির দরখাস্ত করছি।

অনুবাদের ক্ষেত্রে ভাষাকে যথাসম্ভব সহজ ও সাবলীল রাখতে চেষ্টা করেছি। বয়ানের আমেজ যেন বজায় থাকে সে দিকটিও বিবেচনায় ছিল। চেষ্টা করেছি যেন সম্মানিত পাঠকবর্গ মূল কিতাবের স্বাদ আস্বাদন করতে পারেন। সার্বিক সুন্দর ও নির্ভুল করার প্রাণান্তর চেষ্টা আমরা করেছি, তথাপি ভুল-ত্রুটি থাকা বিচিত্র নয়। এক্ষেত্রে আমরা সম্মানিত পাঠকদের ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টি কামনা করছি। আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকলকে তাঁর সন্তুষ্টি অনুযায়ী আমল করার তাওফিক দান করুন। আমীন।

তারিখ: মায়াস-সালাম

১ জানুয়ারি ২০১৬ আবু সাকী মাহবুব

টেলিগ্রাম চ্যানেল লিংক

https://t.me/islaMic_fdf

সূ চি প ত্র

বয়ান : ১

ইলমি মুজেযা / ১৯
মুজেযা নবুওয়াতের দলিল / ২২
রাসূল সা. -এর আমলি মুজেযাসমূহের শ্রেষ্ঠত্ব / ২৫
সবচেয়ে বড় মুজেযা / ২৬
মুজেযার হাকিকত বা নিগূঢ় তত্ত্ব / ২৮
ভাষাগত মুজেযার সামনে ভাষাবিদদের অক্ষমতা প্রকাশ / ২৮
মানবীয় গুণাবলির অক্ষমতার সীমারেখা / ৩০
কালামি মুজেযা / ৩২
বক্তার গুণাবলির পরিচয় / ৩৩
আসল মুতাকাল্লিম / ৩৫
কুরআনুল কারীম মুজেযার মুখপাত্র বা প্রতিনিধি / ৩৬
ছায়া শরীয়ত / ৩৭
ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বলের ঘটনা / ৩৭
মর্যাদার প্রতি নজর রাখা / ৩৯
আমল ও ইজতেহাদের শান / ৪১
ইলমে মারেফতের শর্ত / ৪২
তাওফিক উঠিয়ে নেওয়া, সৎ কাজের যোগ্যতা রহিত করা / ৪৩
সন্দেহযুক্ত চাঁদা হতে পরহেজ করা / ৪৫
একজন মুত্তাকির শান / ৪৭
পরিপূর্ণ বুদ্ধিমান / ৪৮
আমল বিল কুরআন দ্বারা বনি ইসরাঈলের নবীদের সাথে সদৃশ্য পয়দা হয় / ৪৯
ইলমি মুজেযার বৈশিষ্ট্য / ৪৯
কিতাবের স্থায়িত্ব নবুওয়াতের স্থায়িত্বকে আবশ্যক করে / ৫০
কুরআন বিরোধিতার শাস্তি / ৫১
উম্মতকে অনৈক্যের আজাব থেকে রক্ষা করার উপায় / ৫২
উলুমুল কুরআন বা কুরআনের ইলম / ৫৪
কিতাবুম মুবিনের বৈশিষ্ট্য / ৫৫
ইসলাহী নেসাব বা আত্মশুদ্ধির নেসাব / ৫৬
উলুমের মারকাজ / ৫৭
বরকত কামনা করা / ৫৭

বয়ান : ২

খেলাফতে তাজবিদ / ৫৯
জাওহারে দুনিয়া বা দুনিয়ার মূল উপাদান / ৬১
আল্লাহর বিশেষ দান / ৬২
মুসলিমদের বিশেষ শান / ৬২
বিশেষ শানদার কিতাব / ৬৩
খোদায়ী আওয়াজ / ৬৪
কালামের মর্যাদা / ৬৪
খেলাফতে তাজবিদ ও কেরআত / ৬৫
বিশেষ পন্থায় হেফাজত / ৬৭
হেফজের মাধ্যমে সংরক্ষণ / ৬৯
লেখার মাধ্যমে হেফাজত / ৭০
তাওয়াতুর বা অবিচ্ছিন্ন পদ্ধতিতে হেফাজত / ৭০
সংরক্ষিত কিতাব / ৭১
কুরআনের সনদের ব্যাপারে কুরআনের আলোচনা / ৭২
মর্যাদাবান শাহাদাত / ৭৫
সনদের মর্যাদা / ৭৬
মুতাওয়াতির তবকার মাধ্যমে চলমান / ৭৭
বিশ্বব্যাপী সার্বক্ষণিক হেফাজত / ৭৮
কুরআনকে সুমিষ্ট আওয়াজে পাঠ করা / ৮০
মোবারকবাদ ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন / ৮১

বয়ান : ৩

হেদায়াতের নক্ষত্র / ৮৩
সাহাবাদের মাকাম / ৮৪
সুনানে সাহাবা রা. / ৮৬
সাহাবাদের গালমন্দ করার পরিণতি / ৮৬
সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী জীবন / ৮৭
কামেল তথা পূর্ণ মনুষত্বের অধিকারীদের জামাত / ৮৮
নবুওয়াতের ছায়া / ৮৯
পরিপূর্ণ মিযান এবং পূর্ণ ওজনের পাল্লা / ৯০
সাহাবায়ে কেরাম রা. সত্যের মাপকাঠি হওয়া অকাট্য দলিল দ্বারা প্রমাণিত / ৯২
ইসলামী ফেরকাসমূহ হক ও বাতিল হওয়ার মাপকাঠি / ৯৩

সাহাবাদের আনুগত্য মূলত রাসূলেরই আনুগত্য / ৯৫
মাপকাঠি সমালোচনার যোগ্য হয় না / ৯৬
হক হস্তগত হয় সাহাবারায়ে কেরাম থেকে / ৯৭
সাহাব-সমালোচকদের দীন সঠিক হতে পারে না / ৯৮
আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত একমাত্র মুক্তিপ্রাপ্ত জামাত / ৯৯
মানসিক গোলামি ব্যতীত উপায় নেই / ৯৯
সাহাবা সমালোচনাকারীরা উম্মতের অনৈক্যের কারণ / ১০০
নিজেকে সত্যের মাপকাঠি দাবি করা / ১০১
সাহাবাদের ইজতিমায়ী বা সমষ্টিগত আনুগত্য / ১০২
কেয়ামত পর্যন্ত ব্যক্তিগত মাপকাঠি থাকবে / ১০৪
পরিশিষ্ট / ১০৭

বয়ান : ৪
আগাযে বুখারী / ১১০
সূচনা / ১১২
ইমামের জালালত বা শ্রেষ্ঠত্ব / ১১৩
হেফজশক্তির কারামাত / ১১৪
স্মৃতির পরীক্ষা / ১১৪
কিতাবের বড়ত্ব / ১১৫
আসমাউর রিজাল বা রাবীদের জীবনী / ১১৬
হাদীস মাপার পাল্লা / ১১৬
হাদীসসমূহ নির্বাচন / ১১৭
শানে কবুলিয়্যাত / ১১৭
কিতাবের আলোচ্যবিষয় / ১১৮
ইসমতে আম্বিয়া বা নবীদের নিষ্পাপতা / ১১৮
হেফাজতে আউলিয়া বা অলিদের পাপ হতে বেঁচে থাকা / ১১৯
কিতাবের উদ্দেশ্য / ১১৯
হাদীসের উছিলা বা হাদীসের মাধ্যম / ১২০
বয়ানুল কুরআন / ১২০
হাদীসের গুরুত্ব ও তাৎপর্য / ১২২
হাম্‌দ ও সালাত দ্বারা শুরু না করার কারণ / ১২২
প্রতিটি হাদীসের শুরুতে আজকারে আশারাহ বা দশ জিকির / ১২৪
কিতাব শুরু করতে ইত্তেবায়ে সুন্নাতের গুরুত্ব / ১২৫
তরজমাতুল বাব ও হাদীসের মধ্যে সম্পর্ক / ১২৫

ইমামের তাফাক্কুহ বা ফেকাহর জ্ঞান / ১২৭
ইমামের ইজতেহাদের মর্যাদা / ১২৮
হাদীসের বিশদ ব্যাখ্যা / ১২৮
মৌলিক পূর্ণাঙ্গ কথা / ১২৯
নিয়তের উপকারিতা / ১৩০
আমলের শুরু ও প্রকাশ / ১৩০
নিয়তের ফলাফল / ১৩১
এটি ছিল একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা / ১৩২
হাদীসের ব্যাপকতা / ১৩২
জরুরি সতর্কতা / ১৩৩

বয়ান : ৫
তালিম ও তাদরিস / ১৩৫
বাস্তব অবস্থা / ১৩৭
মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে শরীয়তের দাবি / ১৩৭
মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে আকলের দাবি / ১৩৮
দার্শনিকদের দৃষ্টিতে শ্রেষ্ঠত্বের কারণ / ১৩৯
দার্শনিকদের দৃষ্টিভঙ্গিতে ভুল / ১৩৯
শুধু ইলমও শ্রেষ্ঠত্বের কারণ নয় / ১৪০
মানুষ ব্যতীত অন্যান্য প্রাণীর ইলম ও জ্ঞান আছে / ১৪০
সকল সৃষ্টজীবের মধ্যে জ্ঞান ও বুদ্ধি রয়েছে / ১৫০
ইলম স্থানান্তর করা মানুষের বৈশিষ্ট্য / ১৫১
নববী শিক্ষার আযমত / ১৫৩
বাতেনী শিক্ষা প্রদান / ১৫৩
তালিমই হল নবুওয়াত / ১৫৫
তালিম ব্যতীত মানবতা থাকে না / ১৫৫
মাদরাসাগুলো মনুষ্যত্বের মাধ্যম / ১৫৬
প্রমাণপুষ্ট বিশুদ্ধ ইলম / ১৫৬
ইলমি উত্তরাধিকারের শর্ত / ১৫৭
ইসলামি ইলমের বৈশিষ্ট্য / ১৫৯
সনদের গুরুত্ব / ১৫৯
সিলসিলা তালিম দ্বারা-ই বাকি রাখা সম্ভব / ১৬০
বাতিলের প্রতিরোধ তালিমের উপর নির্ভরশীল / ১৬০
তালিম ও তায়াল্লুমের দৃষ্টিতে মনোনীত ব্যক্তিত্ব / ১৬১

মাদরাসার প্রয়োজনীয়তা / ১৬২
তারবিয়াতের দরজাসমূহ / ১৬২
রাব্বানী কাকে বলে / ১৬৩
তালিম ব্যতীত রাব্বানী তৈরি হয় না / ১৬৪
সনদের মর্যাদা / ১৬৫
ইলমি সম্পর্ক / ১৬৬
নেসবতের গ্রহণযোগ্যতা / ১৬৭
নেসবতের সম্মান / ১৬৮

বয়ান : ৬
আমলের প্রভাব / ১৭০
ভূমিকা / ১৭২
বাহ্যিক বস্তুর বৈশিষ্ট্য / ১৭২
কর্মের বৈশিষ্ট্য / ১৭২
রোযার বৈশিষ্ট্য / ১৭৩
যাকাতের বৈশিষ্ট্য / ১৭৪
বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পাওয়ার শর্ত / ১৭৪
বৈশিষ্ট্যবিদ্যায় পারদর্শীদের আনুগত্য / ১৭৪
নামাযের বৈশিষ্ট্য / ১৭৬
দিদারে ইলাহীর মর্যাদা / ১৭৬
ফজর ও আসরের বৈশিষ্ট্য / ১৭৭
ফজর ও আসরে ফেরেশতা অবতরণের হেকমত / ১৭৭
খেলাফতে আদম আ.-এর উপর সন্দেহের বিজ্ঞোচিত উত্তর / ১৭৯
ফেরেশতাদের উপর প্রমাণ পরিপূর্ণ করা / ১৮৪
মানুষের জিকিরের কারণে দুনিয়া টিকে আছে / ১৮৪
দুনিয়াতে রাব্বানীর তাজাল্লির প্রকাশ / ১৮৬
আখেরাতের তাজাল্লি / ১৮৭
আল্লাহর দরবার / ১৮৭
ওই দরবার কোথায় অনুষ্ঠিত হবে / ১৮৭
আল্লাহর দরবারে জান্নাতিদের অংশগ্রহণ / ১৮৮
আল্লাহর দরবারে শরাবে ত্বহুর পরিবেশন / ১৮৯
হযরত দাউদ আ.-এর মুনাজাত পাঠ / ১৮৯
জামালে খোদাওয়ান্দি দেখার আবেদন / ১৯০
নিয়ামতে মাযীদ / ১৯১

মাযীদ দিবস ও তার আদব / ১৯১
আল্লাহর দিদার সম্পর্কে মুতাযিলা সম্প্রদায়ের মতামত / ১৯৩
আহলে হকের অভিমত / ১৯৩
তর্কযুদ্ধে মুতাযিলাদের পরাজয় / ১৯৪
দিদারে খোদাওয়ান্দি ধাপে-ধাপে উন্নত হয় / ১৯৬
রুহের উর্ধ্বগমন এবং আরশের নিচে সিজদা / ১৯৭
জাগতিক জযবাগুলো আলমে বরযাখে প্রকাশ পাবে / ১৯৭
জাগতিক জযবা আখেরাতে প্রকাশ পাবে / ১৯৮
আরশের ছায়ায় নামায পড়ার আকাঙ্ক্ষা / ১৯৯
নামাযের স্বাদ / ১৯৯
সত্তাগত ইবাদত / ২০০
জযবা ইবাদতের সান্ত্বনা / ২০২
পূর্ণাঙ্গ শরীয়তের উপর আমলের প্রভাব / ২০২
ইলম ও আমলের বুনিয়াদ / ২০৩
সত্যিকারের অন্বেষণকারী / ২০৪
হাকিমসুলভ কথা / ২০৭

বয়ান : ৭

দোয়ার আদব / ২০৯
সাইয়্যেদুল আইয়্যাম বা দিবসসমূহের সরদার / ২১১
জুমুয়া সমন্বয়কারী ও পরিপূরক / ২১২
মানব অঙ্গসমূহের সমন্বয় / ২১২
শরীয়ত একত্রকরণ / ২১৩
কিয়ামত সংঘটিত হবে শুক্রবার / ২১৪
জুমুয়ার দিন নির্ধারণে বিভিন্ন জাতির পরীক্ষা / ২১৪
জুমুয়ার দিন দোয়া কবুল হওয়ার সময় / ২১৫
কলবি দোয়া কবুলযোগ্য / ২১৬
হারাম সম্পদ দোয়া কবুলের অন্তরায় / ২১৭
বাধ্য-বাধকতা ও শর্তযুক্ত দোয়া / ২১৮
রহমতবিরোধী শর্ত দ্বারাও দোয়া রদ হয় / ২১৮
প্রার্থনার পদ্ধতি / ২১৯
দ্রুততার সাথে কবুল হওয়া / ২২০
প্রার্থনার অধিক কবুল হওয়া / ২২০
কবুল দীর্ঘায়িত হওয়া / ২২০

দেরি করার কল্যাণ / ২২০
দেরিতে কবুল হওয়ায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ / ২২১
দোয়া আখেরাতের পুঁজি / ২২৩
দোয়া আল্লাহর যিম্মায় ছেড়ে দেওয়া / ২২৩
দোয়া একটি ইবাদত / ২২৪
ভিক্ষা করা নিষেধ / ২২৫
মহব্বতের চাওয়া / ২২৫
নিজ থেকে ফরমায়েশ দেওয়া / ২২৬
লৌকিকতা পরিহার করা / ২২৭
ইসলামী অন্তরঙ্গতাপূর্ণ সম্পর্ক / ২২৭
অবমাননাকর সাওয়াল নিষেধ / ২২৮
চাইলে আল্লাহ খুশি হন / ২২৯
দোয়ার শিক্ষা / ২৩০
দোয়া কবুল হওয়ার আলামত / ২৩১
মকবুল বান্দাদের সঙ্গে সাদৃশ্যের প্রভাব / ২৩১
ইসলামি ইউনিফর্ম / ২৩৩
মুহাম্মাদ নামের সঙ্গে সাদৃশ্যের পরিণাম / ২৩৩
সাদৃশ্যর সামাজিক উপকার / ২৩৪
সুন্নতের অনুসরণ মহব্বতের পূর্ণতার প্রকাশ / ২৩৫
আল্লাহর দানকৃত নেয়ামতের সম্মান / ২৩৬
রিজিকের সম্মান / ২৩৭
পোশাকের সম্মান / ২৩৮
সম্মান প্রদর্শনের পদ্ধতি / ২৩৮
শরয়ী বিধানে ইহকাল ও পরকালের ফায়দা / ২৩৯
পোশাকের প্রভাব-প্রতিক্রিয়া / ২৪০

বয়ান : ৮

ইলহামি ইদারা ও তার ছাত্রদের সংগঠন / ২৪২
দারুল উলুম দেওবন্দ প্রতিষ্ঠা : কারণ ও প্রেক্ষাপট / ২৪৩
প্রথম ইট / ২৪৫
রূহানী মারকাজ / ২৪৬
দারুল উলুম মুজাদ্দিদের ভূমিকায় / ২৪৬
একতার মারকাজ / ২৪৭
সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা / ২৪৮

তানজিমের উদ্দেশ্য / ২৪৮
খেদমতের তানজিম / ২৪৯
দারুল উলুমের বিস্তৃতি / ২৫০
মুহতামিম হওয়ার মাপকাঠি / ২৫১
ছাত্রদের মাপকাঠি / ২৫১
তানজিমের উপকারিতা / ২৫৩
শতবর্ষ জলসার আয়োজন / ২৫৫

বয়ান : ৯
বিজ্ঞান ও ইসলাম / ২৫৭
প্রারম্ভিক কথা / ২৬০
বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় / ২৬২
আনাসিরের শক্তির পারস্পরিক ব্যবধান ও তার মাপকাঠি / ২৬৪
মাটি / ২৬৫
আগুন / ২৬৯
পানি / ২৭০
বাতাস / ২৭১
সমস্ত উপাদানের আধার মানুষ ও তার শক্তি / ২৭২
আনাসিরে আরবায়ার উপর মনুষ্য হস্তক্ষেপ / ২৭৩
মূল উপাদানে মানুষের উদ্ভাবন / ২৭৬
মনুষ্য শক্তি ও বশক্ষমতা কোথায় সুপ্ত / ২৮০
মানব-রূহের সূক্ষ্মতা ও ইন্দ্রিয়ানুভূত দীপ্তিময়তা / ২৮১
মানব-রূহের অভ্যন্তরীণ শক্তি ও সূক্ষ্মতা / ২৮৩
রূহের বৈশিষ্ট্যাবলি থেকে প্রভুত্ববাদের প্রমাণ / ২৮৫
রূহানী শক্তির অপব্যবহার / ২৮৯
রূহানী শক্তির অপব্যবহারের ফলাফল / ২৯৩
রূহানী শক্তির বিস্ময়কর কৃতিত্ব / ২৯৫
বস্তুগত রূপান্তর প্রকৃত কোন পরাকাষ্ঠা নয় / ২৯৭
মানুষের মুখাপেক্ষিতার মূল কারণ / ২৯৯
মৌলিক উপাদান চতুষ্টয়ের চরিত্র / ২৯৯
মাটি ও তার চরিত্র / ২৯৯
আগুন ও তার চরিত্র / ৩০১
বাতাসের স্বভাব / ৩০৩
পানির চরিত্র / ৩০৪

আত্মিক হীনতার মূলনীতি চারটি / ৩০৫
আত্মিক সৌন্দর্যের মূলনীতি চারটি / ৩০৫
আমল বিনে আখলাকের প্রকাশ অসম্ভব / ৩০৫
বস্তুচরিত্র প্রকাশক কাজ / ৩০৬
রূহানী চরিত্র প্রকাশক কাজ / ৩০৬
সদকা ও নির্ভীকতা / ৩০৬
বস্তুজগৎ থেকে নির্ভীকতা তায়াল্লুক মায়াল্লাহর ভিত্তি / ৩০৯
'তায়াল্লুক মায়াল্লাহ'র শক্তিই সব রূহানী বিস্ময়তার ভিত্তি / ৩১০
শুধু বিজ্ঞান কখনও এই নির্ভীকতা সৃষ্টি করতে পারে না / ৩১২
সাইন্স ও ইসলামের মধ্যে 'লক্ষ্য' ও 'উপলক্ষ্য'র সম্পর্ক / ৩১৩
সাইন্স ও ইসলামের প্রকৃতিসমূহ কী চায় / ৩১৫
নিরেট বস্তুবাদিতার ক্ষতিসমূহ / ৩১৭
ইউনিভার্সিটির ছাত্রদের জন্য উপদেশ / ৩১৮
বস্তুজগতের অনিষ্ট দূর করার উপায় / ৩১৮
তাওহীদ সুদৃঢ় করুন / ৩১৯
ইয়াদে হক ও তার প্রাথমিক সহজ নিয়ম / ৩২০
সৎ লোকদের সোহবত এবং আহলুল্লাহর সম্পর্ক / ৩২২
আলোচনার সার-সংক্ষেপ / ৩২৩
শিরোনামের হাদীসের সাথে আলোচনার সম্পর্ক / ৩২৪
হাদীসের আলোচনার সূক্ষ্ম ফলাফল / ৩২৬
রূহের সূক্ষ্মতা দীনদার হওয়ার মধ্যে নিহিত / ৩২৭
ইসলামের ভিত্তিমূল / ৩২৮
বিজ্ঞানের মূল বুনিয়াদ কী / ৩২৮
একটি ভুল ধারণার নিরসন / ৩৩২
ইউনিভার্সিটির ছাত্রদের শিক্ষা নেওয়ার ক্ষেত্র / ৩৩৩
উপসংহার ও উপদেশের সার-সংক্ষেপ / ৩৩৪

বয়ান : ১

ইলমি মুজেযা

সকল নবী-রাসূলকে আমলি মুজেযা দেওয়া হয়েছিল আর আমাদের হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমলি মুজেযার পাশাপাশি ইলমি মুজেযাও দেওয়া হয়েছিল। আমলের বৈশিষ্ট্য হল, আমলকারী যখন দুনিয়া হতে বিদায় নেন, তখন আমল নিঃশেষ হয়ে যায়। আর ইলমের বৈশিষ্ট্য হল, আলেম দুনিয়া হতে বিদায় নেন; কিন্তু ইলম বাকি থাকে। সুতরাং নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আমলি মুজেযাগুলো তাঁর সত্তার সাথে খতম হয়ে গেছে; কিন্তু ইলমি মুজেযা কুরআনুল কারীম আজও পর্যন্ত বিদ্যমান রয়েছে। অতএব নবুওয়াতের দলিল আজও বিদ্যমান আছে। সুতরাং যে বস্তুর দাবির দলিল মওজুদ, সেই বস্তুর দাবিও মওজুদ।

এ কারণেই হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নবুওয়াতকে বর্তমানেও প্রমাণ হিসেবে পেশ করা যায়। তাই কোন প্রমাণ তালাশ করা হলে তাঁর মুজেযাকে উপস্থাপন করা হয়। আর তা হল কুরআনী মুজেযা।

– হযরত হাকীমুল ইসলাম রহ.



ইলমি মুজেযা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَ نَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ، وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ، وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُهٗ، اَرْسَلَهُ اللّٰهُ اِلٰى كَآفَّةٍ لِلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّ نَذِيْرًا وَدَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَ سِرَاجًا مُّنِيْرًا•

اَمَّا بَعْدُ: فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ•

لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنٰتِ وَ اَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتٰبَ وَ الْمِيْزَانَ لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ۚ وَ اَنْزَلْنَا الْحَدِيْدَ فِيْهِ بَاْسٌ شَدِيْدٌ وَّ مَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ مَنْ يَّنْصُرُهٗ وَرُسُلَهٗ بِالْغَيْبِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ قَوِيٌّ عَزِيْزٌ ۝ ২৫

আমি আমার রাসূলগণকে সুস্পষ্ট নিদর্শনসহ প্রেরণ করেছি এবং তাঁদের সাথে নাযিল করেছি কিতাব ও ন্যায়নীতি, যাতে মানুষ ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করে। আর আমি নাযিল করেছি লৌহ, যাতে আছে প্রচণ্ড রণশক্তি এবং মানুষের বহুবিধ উপকার। এটা এজন্য যে, আল্লাহ তায়ালা জেনে নিবেন, কে না দেখে তাঁকে ও তাঁর রাসূলগণকে সাহায্য করে। আল্লাহ শক্তিধর, পরাক্রমশালী। *[সূরা হাদীদ : ২৫]*

মুজেযা নবুওয়াতের দলিল

বুযুর্গানে মুহতারাম!

আল্লাহ তাবারাকা তায়ালা নবী-রসূলগণকে অনেক মুজেযা দিয়েছিলেন। মুজেযা হল নবুওয়াতের দলিল। তাই সেগুলো নবীদের থেকে প্রকাশ হত; অন্যদের হতে প্রকাশ হত না।

মুজেযা হল নিরেট আল্লাহ তায়ালার কর্ম। সুতরাং কোন মাখলুক তা পেশ করতে অক্ষম। হযরত ঈসা আ.কে আল্লাহ তায়ালা মৃতকে জীবিত করার মুজেযা দান করেছিলেন। তিনি আল্লাহ তায়ালার হুকুমে মুর্দাকে জিন্দা করতে পারতেন। তেমনিভাবে জন্মান্ধের চোখে হাত বুলালে তা তৎক্ষণাৎ ভাল হয়ে যেত। কুষ্ঠরোগী-শ্বেত রোগীর গায়ে হাত বুলিয়ে দিলে তাদের শরীর সুস্থ হয়ে যেত। ওই যুগের ডাক্তার-কবিরাজগণ অপারগ হয়ে বলেছিল ওই সকল রোগের চিকিৎসা নেই।

যখন হযরত ঈসা আ. উক্ত মুজেযাসমূহ প্রকাশ করলেন, তখন দুনিয়াবাসী বুঝে নিল, এগুলো দুনিয়াবী আসবাব পর্যায়ের কোন বস্তু নয় বরং তা 'মুসাব্বিবুল আসবাব' তথা আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হতে কোন বিশেষ কারিশমা ও মুজেযা। উক্ত মুজেযাগুলো ছিল হযরত ঈসা আ.-এর নবুওয়াতের দলিল।

হযরত মুসা আ.কে দিয়েছিলেন লাঠি, যার বৈশিষ্ট্য ছিল, যখন তাকে জমিনে নিক্ষেপ করা হতো, তখন অজগর হয়ে যেত আর হাতে নেওয়ার পর কাঠের লাঠি হয়ে যেত। তেমনিভাবে তাকে ইয়াদে বায়যা বা উজ্জ্বল হাত দান করা হয়েছিল। তার বৈশিষ্ট্য ছিল, যখন তা জামার পকেটে প্রবেশ করাতেন, তখন তা সূর্যের মত চমকাত, তার আলো চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ত। এগুলোর দ্বারা দুনিয়াবাসী বুঝে নিল, এগুলো দুনিয়ার অন্য কেউ প্রদর্শন করতে পারবে না। এগুলো অবশ্যই হযরত মুসা আ.-এর নবুওয়াতের দলিল। তিনি আল্লাহ তায়ালার প্রতিনিধি, তাঁর প্রতিনিধিত্ব নিয়ে এসেছেন।

আল্লাহ তায়ালা হযরত ইবরাহীম আ.কে 'নারে খলীল' প্রদান করলেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁর মাধ্যমে অলৌকিক বস্তু প্রকাশ করলেন। তাঁকে বিশাল অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হলে আগুন তার জন্য শীতল ও শান্তিদায়ক হয়ে গেল। দুনিয়াবাসী দেখতে পেল, এ কাজ হযরত ইবরাহীম আ. ব্যতীত অন্য কেউ দেখাতে পারবে

না। তাঁর মাধ্যমে এমন আশ্চর্য মুজেযা প্রকাশ পেল, যা তার রিসালাতের উপর দলিল হিসেবে প্রমাণিত হল।

তেমনিভাবে অন্যান্য নবীদেরও নানা মুজেযা দান করেছিলেন। হযরত শুয়াইব আ.কে 'যুল্লায়ে শুয়াইব' (আকাশের ছায়া) দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু যখন তাঁর জাতি তাকে মেনে নেয়নি, তখন মেঘমালা এল এবং তা থেকে আগুন বর্ষিত হল। ফলে তার জাতি আজাবে লিপ্ত হল।

হযরত হুদ আ.কে বাতাসের মুজেযা দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু যখন তার কওম তার দাওয়াতকে মেনে নেয়নি, তখন প্রবল ধূলিঝড় হল এবং তা সাত দিন স্থায়ী হল। এটা সাধারণ ঝড় ছিল না; বরং বিরাট ঘূর্ণিঝড় ছিল, যা বড়-বড় বস্তুকে উঠিয়ে বহু দূরে নিক্ষেপ করল।

হাদীস শরীফে এসেছে, আদ জাতির জানোয়ারগুলোর আওয়াজ আকাশে শোনা গিয়েছিল। বিশাল-বিশাল বাড়িঘর উপরে উড়ল আবার নিচে ভেঙে পড়ল। এগুলো ছিল নবীদের মুজেযা, যা দ্বারা জগদ্বাসী অনুধাবন করতে পেরেছিল, নিশ্চয়ই তারা হলেন আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হতে প্রেরিত মানব।

হযরত সালেহ আ.কে 'নাকায়ে সালেহ' দান করা হয়েছিল। তাঁর জাতি তাকে বলল, এমন দলিল ও সনদ পেশ কর, যা দ্বারা আমরা তোমাকে নবী হিসেবে মেনে নিতে পারি। তিনি তাদের বললেন, তোমরাই বল কী প্রমাণ পেশ করব? তারা বলল, পাথর হতে উটনী বের কর। তিনি আল্লাহ তায়ালার হুকুমে উটনী বের করলেন। প্রকাশ থাকে যে, কোনো মানুষের সাধ্য নেই পাথর থেকে উটনী বের করার। তা তো ওই সত্তার কাজ, যাঁর শান হল, জিন্দা হতে মুর্দা পয়দা করা এবং মুর্দা থেকে জিন্দা পয়দা করা।

অতএব, প্রাণহীন বস্তু পাথর হতে জীবন্ত বস্তু বের করা নিঃসন্দেহে মুজেযা ছিল। কিন্তু যেহেতু উক্ত মুজেযা তারা রাত-দিন সর্বদা দেখছিল, তাই সেটি আশ্চর্যজনক থাকেনি। তবে মানুষ সৃষ্টি করা কি মুজেযা নয়? এক অনুভূতিহীন নাপাকি, এক হাকিকতবিহীন ফোঁটার মাঝে নকশা অঙ্কন করা, চিত্র তৈরি করা এবং একটা নাপাক কাতরা (ফোঁটা) হতে একটা পূত-পবিত্র মানব তৈরি করা, বোধহীন বস্তু হতে জ্ঞানসম্পন্ন মানবসৃষ্টি করা, প্রাণহীন বস্তু হতে প্রাণবান বস্তু বের করা– পাথর হতে উটনী বের করারই মত। কিন্তু যেহেতু এগুলো সর্বদা আমাদের সামনে দৃশ্যমান, সে জন্য এগুলো দুর্লভ ও আশ্চর্যজনক মনে হয় না। অন্যথায় রাত-দিন সর্বদাই মুজেযা প্রকাশ পেত, আল্লাহ তায়ালার কুদরত জাহির হতে থাকত।

হযরত ইউসুফ আ.-কে 'কামিসে ইউসুফ' দেওয়া হয়েছিল। উক্ত জামাটি হযরত ইয়াকুব আ.-এর চেহারা মোবারকে লাগানোর পর বারো বছর পূর্বে নষ্ট হওয়া দৃষ্টিশক্তি পাঁচ মিনিটের মধ্যে ফিরে এল। চোখ আলোকিত হল। এটি ছিল হযরত ইউসুফ আ.-এর মুজেযা। হযরত দাউদ আ.-কে 'ইলানাতে হাদীদ' নামক মুজেযা দেওয়া হয়েছিল। তিনি হাত মোবারকে লোহা ধারণ করতেন আর সাথে-সাথে সেগুলো মোমের ন্যায় নরম হয়ে যেত। তিনি তা দ্বারা ইচ্ছেমতো আসবাব ও বস্তু বানাতে পারতেন।

হযরত সুলাইমান আ.-কে 'তাসখিরে রিয়াহ' নামক মুজেযা দান করেছিলেন। বাতাস তাঁর ফরমাবর্দার ছিল, তাঁর কথা মানত, তাঁর হুকুমে বাতাস তার সিংহাসনকে উড়িয়ে নিয়ে যেত। আরোহী নিয়ে যেত। বাতাস দ্বারা তিনি ওই কাজ সম্পাদন করতেন, যে কাজ জমিনের বাহন দ্বারা সম্পাদিত হত।

হযরত সুলাইমান আ.-এর তাসখিরে রিয়াহ'র বর্ণনা কুরআনে এভাবে বর্ণিত হয়েছে–

فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ ﴿٣٦﴾

তখন আমি বাতাসকে তার অনুগত করে দিলাম, যা তার হুকুমে অবাধে প্রবাহিত হত যেখানে সে পৌঁছতে চাইত। *[সূরা সোয়াদ : ৩৬]*

অতএব 'তাসখিরে রিয়াহ' তথা বাতাসকে অনুগত করা হযরত সুলাইমান আ.-এর জন্য মুজেযা ছিল। তেমনিভাবে তাকে 'মানতিকুত তুয়ুর' তথা পাখির কথা বোঝার মুজেযা দান করেছিলেন। পাখিদের কথা অনুধাবন করা, তাদের কথা বুঝা এবং তাদের উপর হুকুম প্রয়োগ করা ছিল হযরত সুলাইমান আ.-এর মুজেযা।

হযরত দাউদ আ.-কে 'ইলানাতে হাদীদ' তথা লোহা নরম করার মুজেযা প্রদান করা, হযরত সুলাইমান আ.-কে 'তাসখিরে রিয়াহ', হযরত মুসা আ.-কে 'লাঠি' ও 'ইয়াদে বায়যা' প্রদান করা আর ঈসা আ.-কে 'ইহইয়ায়ে মাউতা' তথা মৃতকে জীবিত করার মুজেযা প্রদান করা– এগুলো মূলত তাদের নবুওয়াতের দলিল ছিল, যাতে জগদ্বাসী বুঝতে পারে, তাঁরা হলেন আল্লাহ তায়ালার প্রেরিত মানব, তাঁরা আল্লাহর পক্ষ হতে এসেছেন এবং তাঁর বাণী পৌঁছেছেন।

রাসূল সা. -এর আমলি মুজেযাসমূহের শ্রেষ্ঠত্ব

হযরত ঈসা আ.-কে মৃতকে জীবিত করার মুজেযা দেওয়া হয়েছিল, তাঁর হুকুমে মুর্দা জিন্দা হয়ে যেত। জনাব রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ ধরনের হাজারো মুজেযা দেওয়া হয়েছিল। তাঁর হাতে 'উস্তুয়ানায়ে হান্নানাহ' জিন্দা করেছিলেন। ঘটনাটি আপনারা শুনে থাকবেন। হাদীস শরীফে সুস্পষ্টরূপে বর্ণিত হয়েছে যে, মসজিদে নববীতে মিম্বর তৈরি হওয়ার পূর্বে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি শুকনা খেজুর গাছের কাষ্ঠে হেলান দিয়ে খুতবা প্রদান করতেন। তিনি অনেক দিন তাতে হেলান দিয়ে খুতবা পাঠ করেছিলেন। যখন মিম্বর তৈরি হল, তখন তার উপর খুতবা পাঠ করার জন্য তাশরিফ নিলেন, তখন উক্ত খেজুর গাছের কাঠ হতে কান্নার আওয়াজ বের হতে লাগল। সেটি এমনভাবে ব্যাকুল হয়ে ক্রন্দন করতে লাগল, যেমনভাবে বিদায়-বিরহে মানুষ কাঁদে। যখন সেটি চিৎকার করে কাঁদতে লাগল, তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বর হতে অবতরণ করে তার উপর হাত মোবারক রাখলেন এবং এমনভাবে সান্ত্বনা দিলেন, যেভাবে ক্রন্দনরত শিশুকে সান্ত্বনা দেওয়া হয়। তারপর সেটি চুপ হল এবং ক্রন্দন বন্ধ করল।

হযরত ঈসা আ.-এর হাতে মৃত ব্যক্তি জীবিত হত আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মোবারক হাতে শুকনো কাষ্ঠ জীবিত হল। এ মুজেযা হযরত ঈসা আ.-এর মুজেযা হতে অনেক উচ্চ স্তরের। কারণ, মানুষের লাশে এক সময় প্রাণ বিদ্যমান ছিল। যদি দ্বিতীয়বার ফিরে আসে, তাহলে তো ওই আত্মা-ই ফিরে এল, যে আত্মার সেই শরীরের সাথে সম্পর্ক ছিল। আত্মা বের হতে সক্ষম হলে প্রবেশ হতেও সক্ষম। সে নিজের স্থানে প্রবেশ করেছে, সে নিজের ডাইসে এসে স্থান করে নিয়েছে।

কিন্তু খেজুর গাছের একটি টুকরো জীবিত হল এবং জীবিত হয়ে এমন প্রতিক্রিয়া দেখাল, যা সাধারণত একটি প্রাণবিশিষ্ট বস্তু দেখাতে পারে। যদি তাতে এতটুকু জিন্দেগী হত যে, তাতে নতুন পাতা জন্মেছে, তাহলে বলা যেত, তার মধ্যে বৃক্ষের আত্মা এসে গেছে। বৃক্ষের আত্মা ফিরে আসায় তার শুষ্কতা চলে গেছে। সে দ্বিতীয়বার ফিরে এসেছে তার নিজ স্থানে। যেমনভাবে মুর্দার লাশে প্রাণ আসে। কিন্তু খেজুর কাষ্ঠে এমন প্রাণ এল, যা সাধারণত প্রাণীদের হয়ে থাকে। অর্থাৎ প্রাণীদের আত্মা প্রবেশ করল। আর শুধু প্রাণীর আত্মা নয় বরং মানবাত্মা প্রবেশ করল। আর মানবাত্মার মধ্যে সাধারণ আত্মা প্রবেশ করেনি বরং আল্লাহপ্রেমিকদের আত্মা প্রবেশ করেছে। সেটি আল্লাহপ্রেমিকদের ন্যায় নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিরহে ক্রন্দন করেছিল এবং চিৎকার

করছিল, যা একজন আল্লাহপ্রেমিকের কাজ। অতএব একটি শুকনো খেজুর বৃক্ষের টুকরোতে প্রাণ সঞ্চার হওয়া আবার তা মানুষের প্রাণ এবং কামেল মানুষের প্রাণ; তা তো অবশ্যই ওই মুজেযা হতে বড় মুজেযা যে, একজন মানুষের লাশে মানুষের প্রাণ ফিরে এসেছে। আর বৃক্ষের লাশে কামেল মানুষের প্রাণ সঞ্চার হওয়া মৃত মানুষকে জীবিত করার তুলনায় অনেক উচ্চমাপের বিষয়। সুতরাং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকেও মৃতকে জীবিত করার মুজেযা দেওয়া হয়েছিল। হযরত মুসা আ.-কে আসা এবং ইয়াদে বায়যা দেওয়া হয়েছিল। আর আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এক সাহাবী- যার নাম সম্ভবত হযরত হানিফা রা., তিনি এক জঙ্গল দিয়ে যাচ্ছিলেন। কঠিন অন্ধকারের কারণে রাস্তা হারিয়ে ফেললেন। তিনি আল্লাহ তায়ালার নিকট দোয়া করলেন, হে আল্লাহ! আমাকে রাস্তার সন্ধান দাও। হাদীস শরীফে এসেছে, তার লাঠি এমন আলোকিত হয়েছিল যে, সমগ্র জঙ্গল আলোকিত হয়ে গেল। ফলে তিনি রাস্তা দেখতে পেলেন।

সুতরাং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুহবতের ফয়েজ ও বরকতে সাহাবাদের মধ্যে এমন কারামত প্রকাশ পেত, যা মূলত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুজেযার প্রভাবে হয়েছিল। এটি আসলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুজেযা, যা তার খাদেমের হাতে প্রকাশ পেয়েছিল। অতএব, যত পরিমাণ বা যত ধরনের মুজেযা নবী-রসূলদের দেওয়া হয়েছিল, তা সবই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেওয়া হয়েছিল। এমনকি তাঁদের সকলের চেয়েও বেশি মুজেযা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দান করা হয়েছিল।

সবচেয়ে বড় মুজেযা

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সবচেয়ে বড় মুজেযা, যা অন্যান্য নবীদের দেওয়া হয়নি, তাহল তাঁর ইলমি মুজেযা, যাকে কুরআনুল হাকিম বলে। যে কিতাব এমন শরীয়ত পেশ করেছে, যা জামেউল হেদায়াত, যার মধ্যে সকল জাতি-গোষ্ঠীর হেদায়াত রয়েছে। পদ্ধতিগতভাবেও কুরআন শরীফ মুজেযাতুল্য। কারণ, তাতে এমন ফাসাহাত ও বালাগাত রয়েছে যে, জগদ্বাসী তার মুকাবেলা করতে অক্ষম। কুরআন মায়ানী ও মজমুন তথা মর্ম ও আলোচ্য বিষয়ের দিক থেকেও সর্বোচ্চ জামে বা পূর্ণাঙ্গ। কুরআন এমন পূর্ণাঙ্গ যে, দুনিয়াবাসী তার

নজির পেশ করতে অপারগ। আরববাসীরা ফাসাহাত ও বালাগাত তথা ভাষার অলংকার ও বাগ্মিতার ক্ষেত্রে তুলনাহীন ছিল।

তাদের দাবি ছিল, আমরা আরব অর্থাৎ শিক্ষিত আর বাকি সবাই আজম অর্থাৎ অশিক্ষিত বোবা। তারা নিজেদের মুকাবেলায় সমগ্র দুনিয়াকে বোবা ভাবত যে, দুনিয়াবাসী কোন কথা বলতে পারে না, তারা আনন্দ, খুশি বা দুঃখ-কষ্ট প্রকাশ করতে পারে না। বর্ণনাধারা তাদের হাতে নেই, তা আরবদের হাতে। তারা কাসিদা ও কবিতা রচনা করে চ্যালেঞ্জ করত যে, কেউ কি আছে যে তার মুকাবিলা করবে? এমন কাসিদা পেশ করতে পারবে? তারা কাসিদা লিখে বাইতুল্লাহর দেওয়ালে ঝুলিয়ে দিয়ে চ্যালেঞ্জ করে বলত, কেউ আছ কি এমন কাসিদা লিখবে? এমনটি আরবদের মাঝে সাধারণ নিয়ম ছিল। আরবদের মাঝে ফাসাহাত ও বালাগাত এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, তাদের ৫/৬ বছরের শিশুরা নব্বই-নিরানব্বই পঙ্‌ক্তিবিশিষ্ট দুর্লভ কাসিদা অনায়াসে তাৎক্ষণিক পড়ে ফেলত।

সাবয়া-মুয়াল্লাকাত নামক গ্রন্থ যা দরসে নিযামীতে পড়ানো হয় তা সেই সাত কাসিদা, যা বাইতুল্লায় ঝুলানো হয়েছিল এবং চ্যালেঞ্জ করা হয়েছিল, কেউ কি আছে এর নজির পেশ করার মতো?

মোটকথা, ওই যুগে আরবদের মাঝে ফাসাহাত ও বালাগাতের শক্তি বিদ্যমান ছিল। তখনকার সময়ের মুজেযা যা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পেশ করেছিলেন, তা ছিল ফাসাহাত ও বালাগাতের মুজেযা, যাকে কুরআনুল কারীম বলা হয়। তারা যখন কাসিদা রচনা করে চ্যালেঞ্জ করতো, তখন আল্লাহ তায়ালা কুরআন নাযিল করে চ্যালেঞ্জ করেন–

قُلْ لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَ الْجِنُّ عَلٰٓى اَنْ يَّاْتُوْا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لَا يَاْتُوْنَ بِمِثْلِهٖ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيْرًا ۝

বলুন, যদি মানব ও জিন এই কুরআনের অণুরূপ রচনা করার জন্য জড়ো হয় এবং তারা পরস্পরের সাহায্যকারী হয় তবুও তারা কখনও এর অণুরূপ রচনা করে আনতে পারবে না। কারণ, তা মানুষের কালাম নয় বরং আল্লাহ তায়ালার কালাম। *[সূরা বনী ইসরাঈল : ৮৮]*

মুজেযার হাকিকত বা নিগূঢ় তত্ত্ব

যে বস্তু দ্বারা সকল জিন-ইনসান অক্ষম হয়ে যায়, সেই বস্তু এ কথার দলিল হয় যে, এটি মানুষের শক্তি ও সাধ্যের কাজ নয়। বরং তা মানুষের শক্তির উর্ধ্বের বস্তু। আজ আপনারা জানেন এবং বলেন যে, সূর্য-চন্দ্র এগুলো আল্লাহর তৈরি বস্তু। কেননা, সারা মানব-দানব মিলেও সূর্যের একটি রশ্মি বানাতে পারবে না।

আপনারা বলে থাকেন, এ জমিন আল্লাহর বানানো বস্তু। তার দলিল এভাবে দেন যে, সকল মানুষ জড়ো হয়ে সামান্য পরিমাণ ভূমি সৃষ্টি করতে পারবে না। ভূমি ভেঙে চাষাবাদ করা তো ভিন্ন বস্তু; কিন্তু এমন সামান্য ভূমি তৈরির, যার মধ্যে ভূমির উর্বরতা ইত্যাদির যোগ্যতা রয়েছে, তা সারা জগতের মানুষ ও বিজ্ঞানীরা মিলেও বানাতে পারবে না।

চাঁদ-সুরুজ তো উর্ধ্বজগতের বস্তু। নিম্নজগতের বস্তু হল জমিন। এই জমিনের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশও মানুষ তৈরি করতে সক্ষম নয়। পাতার মধ্যে আল্লাহ যে বিশেষ বৈশিষ্ট্য রেখেছেন সেই বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন একটি পাতাও তারা বানাতে সক্ষম নয়। জমিনের ভিতর সংযোজন এবং বিশ্লেষণ করে তা থেকে নতুন কিছু উদ্ভাবন করা আলাদা বিষয়। কিন্তু নতুন বস্তু সৃষ্টি করতে গিয়ে আপনাকে জমিন ও তার মূল ধাতুর সাহায্য নিতে হয়েছে। স্বয়ং মাদ্দাকে নিজ হাতে তৈরি করা এবং অনস্তিত্বকে অস্তিত্বে আনয়ন করা মানুষের শক্তি ও সামর্থ্যে নেই। সকল মানুষ মিলেও বানাতে পারবে না। অতএব, যে বস্তুর প্রতি সকল মানুষ অপারগ বা তার নজির পেশ করতে পারে না, তাকেই মুজেযা বলে।

ভাষাগত মুজেযার সামনে ভাষাবিদদের অক্ষমতা প্রকাশ

তেমনিভাবে ভাষা হিসেবেও সমগ্র দুনিয়ার ভাষাবিদরা অপারগতা প্রকাশ করেছেন। এমনকি ওই আরবরাও অপারগতা প্রকাশ করেছেন, যারা সারা পৃথিবীকে চ্যালেঞ্জ করতো তাদের মত ফাসাহাত ও বালাগাত পেশ করতে।

তারাও কুরআনুল কারীমের সামনে হার মেনেছেন এবং বলেছেন,

ان فيه لحلاوة وان فيه لطراوة

নিশ্চয়ই এ কালামের মধ্যে বিশেষ ধরনের মিষ্টতা এবং স্বাদ রয়েছে।

আমরা তার এক-দশমাংশও রচনা করতে পারব না।

মোটকথা, ওই যুগের ভাষাবিদরা এ কথা মেনে নিয়েছিলেন যে, আমরা কুরআনের কালামের ন্যায় কালাম রচনা করতে অক্ষম। অন্যথায় আপনারা অনুমান করুন যে, যখন চ্যালেঞ্জ করা হয়েছিল, তখন যারা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেশান্তর করেছে, সর্বোচ্চ কষ্ট দিয়েছে, যুদ্ধ করেছে, মুকাবিলা করেছে- এ সবকিছুই তারা করেছে; কিন্তু তারা কোনো আয়াতের নজির পেশ করতে পারেনি।

কুরআন শরীক সর্বপ্রথম এ চ্যালেঞ্জ করেছে-

عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ

এ কুরআনের ন্যায় কোন কুরআন রচনা কর।

তারপর আরো নিচে নেমে ঘোষণা করেছে-

قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ

তোমরা বলে থাক এটি বানানো কালাম, তো তোমরা এ বানানো কালামের ন্যায় দশটি সূরা নিজেরা রচনা করে ফেল।

তারপর আরো নিচে নেমে ঘোষণা করেছে-

فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ

এ-কালামের একটি সূরার ন্যায় সূরা রচনা করে দেখাও।

এখানে এ কথার শর্ত আরোপ করা হয়নি যে, সূরায়ে বাকারার ন্যায় আড়াই পারাবিশিষ্ট সূরা বানাও বা সূরা আলে ইমরানের ন্যায় বিশাল সূরা রচনা কর। বরং সূরা কাউসারের ন্যায় ছোট্ট সূরা রচনা কর।

তারপর তার চেয়ে নিচে নেমে বলেছে-

فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ

যদি তোমরা তোমাদের দাবিতে সত্যবাদী হও, তাহলে এ কালামের ন্যায় একটা কালাম বানাও, তথা একটা কথা বানাও।

এতে আন্দাজ করে নিতে পারেন যে, যারা চ্যালেঞ্জ দেওয়ায় অভ্যস্ত ছিল, তাদের এত বড় চ্যালেঞ্জ দেওয়া হল। তারা মুসলমানদের অন্যান্য কর্মকাণ্ডের মোকাবেলা করেছে এবং নির্যাতন ও জুলুম করেছে; কিন্তু কালামুল্লার নজির পেশ করতে অপারগতা প্রকাশ করেছে। এতে প্রমাণিত হয়, তারা বুঝে নিয়েছিল, এ

কালামের নজির পেশ করা মানুষের সাধ্যের অতীত। এতে এত পরিমাণ ফাসাহাত ও বালাগাত ভরপুর যে, এটি শুধু আল্লাহ তায়ালারই মুজেযা। তিনিই পারেন এমন কালাম রচনা করতে।

মানবীয় গুণাবলির অক্ষমতার সীমারেখা

মানুষের যত গুণ রয়েছে এবং যত কর্মকাণ্ড রয়েছে, সেগুলোর মধ্যে এমন একটি সীমা রয়েছে, যেখানে পৌঁছে সেগুলো অপারগ হয়ে পড়ে এবং আর অগ্রসর হতে পারে না। নির্দিষ্ট একটা সীমা পর্যন্ত পৌঁছতে পারে; তার চেয়ে সামনে আগাতে পারে না। সেখানে পৌঁছে বুঝতে পারে, এখান থেকে আল্লাহর সীমারেখা শুরু হয়েছে, এখান থেকে আল্লাহর শক্তি শুরু হয়েছে।

উদাহরণস্বরূপ আপনি দেখুন, আপনার মধ্যে দেখার শক্তি বিদ্যমান। আপনি এক ফার্লং বা দুই ফার্লং অথবা মাইলকে মাইলের বস্তু দেখতে পারেন, আকাশের তারকারাজি দেখতে পারেন। কিন্তু আকাশের পরে? তারপর আপনার দৃষ্টিশক্তি অপারগ। অতএব, এমন একটি সীমারেখা বের করুন, যেখানে আপনার দৃষ্টিশক্তি পৌঁছতে অক্ষম। আপনি মাটির নিচে দেখতে পারেন না। শুধু উপরের অংশটুকু দেখতে পারেন। আপনি কোন বস্তুর ভিতরগত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আপন চোখে দেখতে পারেন না। এখানে আপনার চোখ দৃষ্টিশক্তি পৌঁছতে অক্ষম। সুতরাং আপনার দৃষ্টিশক্তি রয়েছে, আপনার দেখার শক্তি আছে; কিন্তু তার একটা সীমারেখা এমন বের হবে, যেখানে পৌঁছে আপনার দৃষ্টি বলবে, আমি দেখতে সক্ষম নই। তারপর থেকে আল্লাহর শক্তি শুরু হবে। যেগুলো শুধু আল্লাহর সত্তাই দেখেন। একমাত্র তিনিই তা দেখতে পারেন।

তেমনিভাবে আপনি এক মাইল, দুই মাইল অথবা পঞ্চাশ মাইল দূরত্বের কথা শোনেন। আপনি যন্ত্রের মাধ্যমে পৃথিবীর পূর্ব-পশ্চিমের খবর শ্রবণ করতে পারেন। কিন্তু আসমানের ভিতরের খবর এবং আওয়াজ শুনবেন? আপনার শ্রবণশক্তি এখানে পৌঁছে অক্ষম হয়ে যায়। এতে প্রতীয়মান হয় যে, আপনার শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি ও বাকশক্তির সীমারেখা রয়েছে। প্রতিটি বস্তুর সীমারেখা রয়েছে। প্রতিটি বস্তু একটা সীমানার উপর প্রতিষ্ঠিত। ওখানে পৌঁছে আপনি আপনার অক্ষমতা স্বীকার করে নেন। ওখানে থেকে খোদায়ী শক্তি শুরু হয়।

তেমনিভাবে কালামের বেলায়ও একই অবস্থা। আপনি কথা বলাতে ফসীহ ও বালীগ, আপনি সুন্দর কথা বলতে পারেন, রচনা করতে পারেন। আপনি অনেক-অনেক বড় মাপের কবি হতে পারেন, আপনার চেয়ে বড় আরেকজন

কবি তৈরি হবে, তিনি আপনার চেয়ে আরো উন্নত কালাম করবে। তারপর তার চেয়ে আরো বড় মাপের কবি সৃষ্টি হবেন। তিনি আরো ভাল ও সাহিত্যপূর্ণ কালাম করবেন। কিন্তু এত কিছুর পরও বান্দা এমন একটা পর্যায়ে পৌঁছে নিজের অক্ষমতা স্বীকার করবে যে, আমি আর অগ্রসর হতে পারব না। এমন সূক্ষ্ম মর্মকে চার শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করতে আমি সক্ষম নই।

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হলেন 'আফসাহুল আরব ওয়াল আজম'। তিনি হাদীস শরীফে সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্ম বিষয়কে অতি সহজভাবে ব্যাখ্যা করে দিয়েছেন। জান্নাত ও জাহান্নামের অবস্থা, হাশর ও কবরের হালত ইত্যাদি যেগুলো বিশেষ কাইফিয়াতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বস্তু, সেগুলোকে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অতি সহজ ও বোধগম্য শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করেছেন। অনেক কঠিন ও রহস্যময় বিষয়কে তিনি অতি সহজভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, যা একজন সাধারণ মানুষ আপন যোগ্যতা দ্বারা বুঝতে পারে। এ কালামকে যখন একজন হাকিম পড়বেন, তখন তা হতে অনেক হিকমতপূর্ণ কথা বের করবেন। একজন আরেফ বিল্লাহ পাঠ করলে তা হতে মারেফতের কথা বের করবেন। কালাম তো ছোট; কিন্তু তা বিষয়বস্তুতে ভরপুর। হাদীসসমূহের খাযানা আপনাদের নিকট মজুদ আছে। এগুলোর ব্যাখ্যা করে হাজারো কিতাব লিপিবদ্ধ হয়েছে। তাদের সংখ্যা অগণিত। একই হাদীস; কিন্তু প্রত্যেক আলেম তার নতুন-নতুন ব্যাখ্যা করেন। এতে প্রমাণিত হয়, হাদীসের অর্থের কোন সীমা-পরিসীমা নেই। একেকজন আলেম হাদীসের একেক দিক গ্রহণ করে তা থেকে অগণিত ইলমি কথা বের করেন। অন্য আলেম অন্যদিকে গ্রহণ করে তা হতে সীমাহীন উলুম বের করেন। এক হাদীসের ভিতর হতে হাজারো সূক্ষ্ম কথা এবং মর্ম বের করেন।

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন আরব ও আজমের মধ্যে সবচেয়ে বড় সাহিত্যিক ও ভাষাবিদ। তিনি নিজে বলতেন, কুরআনুল কারীমের ব্যাপারে আমিও অক্ষম যে, এমন কালাম পেশ করতে পারি না। এ কালাম আল্লাহ তায়ালারই কালাম। এতে একথা সুস্পষ্ট হয়ে গেল যে, একমাত্র খালেকই তাঁর পূর্ণ ব্যাখ্যা করতে সক্ষম। মাখলুককে এই ক্ষমতা দেওয়া হয়নি। অতএব সকল ইনসানি গুণাবলিতে– শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি, ক্ষমতা ও হায়াত ইত্যাদির মধ্যে যেমনভাবে অক্ষমতার সীমারেখা রয়েছে, তেমনিভাবে কালাম-সিফাতের মধ্যেও অক্ষমতার পরিধি রয়েছে। আর এই অক্ষমতার সীমাকেই মুজেযা বলে। সেই কালামি মুজেযা তথা আল-কুরআন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেওয়া হয়েছে।

কালামি মুজেযা

কুরআনুল কারীম একটি বিশেষ মুজেযা। এ ব্যাপারে পৃথকভাবে অনেক কিতাব রচিত হয়েছে। সেগুলোর মধ্যে বড়-বড় দলিল-প্রমাণ পেশ করা হয়েছে। তার মধ্যে সকলের বোধগম্য একটা মোটা কথা হলো এই যে, প্রত্যেক মানুষের মাঝে বিভিন্ন অবস্থা আসে। তন্মধ্যে যে অবস্থা প্রবল থাকে, প্রাধান্য লাভ করে, সেই হালতে কালাম করলে সেই কাইফিয়াত জাহির হয়। যদি সে ইচ্ছা করে, এখন আমি অন্য কাইফিয়াতে কথা বলব, তখন সে অন্য কাইফিয়াতে কথা বলতে সক্ষম হয় না।

উদাহরণস্বরূপ কোন আত্মীয় মারা যাওয়ার কারণে কোন ব্যক্তি চিন্তিত অবস্থায় বসে আছে। তার কলব চিন্তার সাগরে ডুবে আছে। সেই সময় সে যে কোন কথা বলবে, তাতে চিন্তার প্রভাব ফুটে উঠবে। তখন যদি সে চায়, আমি আনন্দের কথা বলব, তাহলে সে তা বলতে সক্ষম হবে না। যদি সে লৌকিকতা করে বলে, আমি এখন ভরপুর খুশির কথা বলব; তারপরও সম্ভব নয়। কারণ, এ সময় তার উপর চিন্তার কাইফিয়াত প্রবল। সুতরাং যে বস্তু প্রবল হবে, তা-ই তার কালামের মধ্যে ফুটে উঠবে।

যদি কোন ব্যক্তি বিয়ের আনন্দে ডুবে থাকে, তখন তার প্রতিটি কথা থেকে অনিচ্ছাকৃতভাবে আনন্দ ও খুশির ভাব প্রকাশ পাবে। যদি সে মনে করে, এখন আমি অত্যন্ত চিন্তাযুক্ত কথা বলব, তাহলে সে তা বলতে পারবে না। কারণ, সে এখন আনন্দের সাগরে ডুবে আছে। অতএব মানুষের উপর যখন যে অবস্থা প্রবল থাকবে, তখন কালাম করলে সেই অবস্থা তার কালামে প্রকাশ পাবে। তার মাঝে এক কাইফিয়াত প্রবল হলে অন্য কাইফিয়াত দূর হয়ে যাবে। এক অবস্থার বিজয় হলে অন্য অবস্থান পরাজয় হবে।

কিন্তু কুরআনুল কারীম হল ভিন্নধর্মী। একই সময় এক আয়াত নাযিল হয়েছে, যার শুরু অংশে আল্লাহ তায়ালার জালালি সিফাত জাহির হয়েছে এবং পরবর্তী বাক্যে বা শেষাংশে তাঁর জামালি সিফাত জাহির হয়েছে। অর্থাৎ শুরুতে আজাব ও শাস্তির কথা বর্ণিত হয়েছে আর শেষাংশে সুসংবাদ ও শান্তির কথা বর্ণিত হয়েছে। যদি শুরুতে জাহান্নামের আলোচনা হয়ে থাকে, তাহলে শেষে জান্নাতের আলোচনা করা হয়েছে। আর যখন আমরা তেলাওয়াত করি, তখন সেই অবস্থা আমাদের অন্তরে পরিলক্ষিত হয়, যা দ্বারা বুঝা যায়, দুটি ভিন্ন কাইফিয়াত সমানভাবে চলছে। কারণ, মানুষ হল অবস্থার তাবেদার, প্রতিটি হাল তার উপর

প্রভাব বিস্তার করতে পারে। সে যে হালতে থাকবে সেই হালতে কথা বলবে। কিন্তু আল্লাহর উপর কোন কাইফিয়াত প্রবল হয় না। বরং আল্লাহ হলেন সবকিছুর উপর গালেব। তাঁর উপর না খুশি প্রবল হতে পারে, না চিন্তা। খুশি ও চিন্তা তাঁরই সৃষ্টি করা বস্তু। এ জন্য তিনি যখন কালাম করেন, তখন তিনি ইচ্ছা করলে কালামকে খুশি দ্বারা ভরে দিতে পারেন আবার চাইলে চিন্তা দ্বারাও ভরে দিতে পারেন। কেননা, তিনি সর্বাবস্থায় সবকিছুর উপর ক্ষমতা রাখেন।

তাই কুরআনুল কারীমের লম্বা ও দীর্ঘ আয়াতগুলোতে কয়েকটি ভিন্নধর্মী কাইফিয়াত পরিপূর্ণ সক্ষমতার সাথে সমপরিমাণে দেখা যায়, যা দ্বারা প্রতীয়মান হয় এই কালাম কোন মানবরচিত কালাম নয়, বরং তা ওই সত্তার কালাম, যিনি প্রতিটি বস্তুর উপর গালেব হতে পারেন। তার সিফাত ও শান তাতে ভরপুর। তাই যখন মানুষ তা পাঠ করে এবং বুঝে-শুনে পাঠ করে, তখন কিছুটা কাইফিয়াত তার অন্তরেও জাহির হয়।

বক্তার গুণাবলির পরিচয়

প্রতিটি কালামের ভিতর মুতাকাল্লিমের (বক্তার) গুণাবলি লুকায়িত থাকে। কথা পড়ে বুঝে নিতে পারবেন, এটি আলেমের কথা না কোন জাহেলের কথা? কোন কবির কথা না গাইরে কবির কথা? কথার ঢং এবং বিষয়বস্তু পড়ে ও দেখে বুঝে নিতে পারবেন, এটি অমুক ব্যক্তির কথা অথবা এটি এমন ব্যক্তির কালাম, যার মধ্যে অমুক গুণ প্রবল। মোদ্দাকথা, কালামের মধ্যে মুতাকাল্লিমের প্রভাব প্রবল থাকে। এমনকি কালামের ভিতর মুতাকাল্লিম লুকিয়ে থাকে। যদি মুতাকাল্লিমকে দেখতে হয়, তাহলে তার কথা পাঠ করে নাও, তাহলে তার কাইফিয়াত আয়ত্বে এসে যাবে।

বাদশাহ আওরঙ্গজেবের মেয়ে জীবুন্নেছা অনেক বড় কবি ছিলেন। তার কবিতা ও কালাম অনেক সুন্দর হত। কাব্যচর্চার আসর হলে তার কথা পাঠ হত। আকেল খান বাদশাহ আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে অনেক বড় দায়িত্বশীল ও বড় কবি ছিলেন। তিনি একদিন বললেন, যদি আমি এ কবিতার কবিকে দেখতে পারতাম, যার কবিতা এত উঁচু মানের, যার কালাম এত বালাগাতপূর্ণ। একথাগুলো জীবুন্নেছার নিকট পৌছার পর তিনি তার উত্তর একটি কবিতার দ্বারা প্রদান করেন যে, আমাকে দেখতে চাইলে দেখতে পাবেন। আমি তারও পথ বাতলে দিচ্ছি।

তিনি নিম্নের কবিতাটি লিখে পাঠালেন–

در سخن مخفی منم چوں بوئے گل در برگ گل

আমি আমার কথা ও কবিতায় এমনভাবে লুকায়িত রয়েছি, যেমনভাবে গোলাপ পাপড়িতে খুশবু লুকায়িত থাকে।

ہر کہ دیدن میل دارد در سخن بیند مرا

যে আমাকে দেখতে চায় সে যেন আমাকে আমার কালামের ভিতর দেখে নেয়। তাহলে আমি তার সামনে উদ্ভাসিত হয়ে যাব।

মোটকথা, প্রত্যেক কালামের ভিতর মুতাকাল্লিমের সিফাত লুকায়িত থাকে। কবির কবিতার ফাসাহাত ও বালাগাতকে এভাবে আপনারা ওজন করেন যে, যদি কোন উঁচু মানের কবিতা হয়, তাহলে বলেন, বহুত বড় কবির কবিতা, আর সাধারণ হলে বলেন, হ্যাঁ শুধু ছন্দ মিলানো হয়েছে।

আমার একটি কথা স্মরণ হয়েছে যে, আমাদের উর্দু ভাষায় একটা প্রবাদ বাক্য রয়েছে। এই বাক্যটি এমন ক্ষেত্রে ব্যবহার হয় যখন মহব্বত ইশারা-ইঙ্গিতে প্রকাশ করতে হয়। উক্ত প্রবাদ বাক্যটি এক উস্তাদ কবিতাকারে ব্যক্ত করেছেন-

آنکھ سے آنکھ ہے لڑتی مجھے ڈر ہے دل کا

کہیں یہ جائے نہ اس جنگ وجدل میں مارا

চোখে-চোখে যুদ্ধ করে ভয় অন্তরে, একথা যেন বলা না হয় এ যুদ্ধে সে মরেছে।

অন্য এক হিন্দু কবি একই বিষয়কে কবিতাকারে বর্ণনা করেছেন এবং সে বিষয়টি অনেক উন্নতভাবে উপস্থাপন করেছেন। তিনি লিখেছেন–

دل کی نہیں تقصیر کمنڈ آنکھیں ہیں ظالم

یہ جا کہ نہ لڑتیں وہ گرفتار نہ ہوتا

অন্তরকে অপরাধী ভেব না, চোখ হল জালেম। চোখ লড়াই করে না আর অন্তর গ্রেফতার হয় না।

একই কথাকে দুটি পঙ্‌ক্তিতে দুভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে। তবে জ্ঞানী ব্যক্তিরা বুঝবেন, এ বিষয়টিকে দ্বিতীয় কবিতাংশে যে অলংকার দ্বারা সাজানো হয়েছে প্রথমাংশকে সেই অলংকার দ্বারা সাজানো হয়নি। দ্বিতীয় কবিতাংশটি প্রথমটা হতে উঁচু মাপের।

সুতরাং কালাম ও বাক্যের মধ্যে ফাসাহাত ও বালাগাত হিসেবে পার্থক্য ও মর্যাদা বালীগ ও ফসীহ ব্যক্তিরা বুঝতে পারেন। তারাই বুঝতে পারেন, এটি উত্তম কালাম। তার চেয়ে উত্তম কালাম অন্যটি হতে পারে না। যখন মানুষের কালামে এমন স্তর বের হয় যে, কখনও-কখনও মানুষ বলে ওঠে, এটি উত্তম কালাম, তার চেয়ে উত্তম কালাম হতে পারে না। তাহলে আল্লাহ তায়ালার কালামের মধ্যে উক্ত মর্যাদাগত বিষয়টি অবশ্যই পাওয়া যাবে।

আসল মুতাকাল্লিম

আল্লাহ হলেন আসল মুতাকাল্লিম। যখন তিনি কালাম করবেন, তখন তাঁর কথা এমন সাহিত্যপূর্ণ হবে যে, তার চেয়ে উত্তম কালাম সম্ভব হবে না। মানুষের কথা যতই সাহিত্যপূর্ণ হোক না কেন, তার চেয়ে উত্তম ও নতুন কালাম হওয়া সম্ভব। কারণ, তার চেয়ে উত্তম ফসীহ ও বালীগ তথা সাহিত্যিক জন্মাতে পারে। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা যে কাজ করবেন অথবা কালাম করবেন, তার চেয়ে উত্তম হওয়া সম্ভব নয়। কারণ, আল্লাহ তায়ালার যাতেরও কোন নজির নেই, তাঁর কালামেরও কোন নজির নেই। না তাঁর কোন তুলনা হয়, না তাঁর কালামের কোন তুলনা হয়। এ কারণেই ইরশাদ হয়েছে–

لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهٖ

তার কালামের মিছাল কেউ পেশ করতে পারবে না।

কেননা, তার যাত ও সিফাতের কোন নমুনা বিদ্যমান নেই।

لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ

তার সত্তার কোন নজির এবং তুলনা নেই, তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা। *[আশ-শুরা ৪২:১১]*

সুতরাং যখন তাঁর যাত বেনজির, তুলনাহীন এবং তাঁর সিফাতেরও কোন নজির নেই, তাহলে তার আফয়ালের (কর্মের) নজির কিভাবে হবে?

তাঁর সিফাতসমূহের মধ্যে কালাম একটি সিফাত। কালাম করার অধিকার একমাত্র তাঁরই রয়েছে। আমি ও আপনি তো মুতাকাল্লিম হয়েছি শুধু তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে, তাঁর সংসর্গের প্রভাবে। যদি কালামের প্রতিবিম্ব না হত, তাহলে আমাদের তা নসীব হত না। শ্রবণ করা ও দেখা তাঁরই সিফাত। এগুলোর প্রতিচ্ছবি হয়েছে বিধায় আমরাও শুনতে পারি ও দেখতে পারি। আসল

বিদ্যমান হলেন তিনি। তাঁর প্রতিচ্ছবি হয়েছি বিধায় আমরাও অস্তিত্বে এসেছি। অন্যথায় আমাদের মধ্যে কোন সত্তাগত এবং প্রকৃত অস্তিত্ব নেই। সুতরাং যখন আমাদের প্রত্যেকটি বস্তু আল্লাহ তায়ালার প্রতিচ্ছবির কারণে, তখন মূল সিফাত তাঁর আর ছায়া সিফাত আমাদের, প্রকৃত অস্তিত্ব তাঁর আর ছায়া অস্তিত্ব আমাদের, প্রকৃত কালাম তাঁর আর ছায়া কালাম আমাদের, আসল ফাসাহাত ও বালাগাত তাঁর আর ছায়া বালাগাত ও ফাসাহাত আমাদের।

মোটকথা, যখন আসল ফাসাহাত ও বালাগাত আমাদের মধ্যে নেই, তখন একথা তো স্পষ্ট যে, একজনের ছায়া অন্যজনের ছায়ার সাদৃশ্য হতে পারে। আর আসলের সাদৃশ্য হতে পারে তখন, যখন দ্বিতীয় কোন আসল পয়দা হয়। আর আসল হল এক সত্তা। তাই আসল কালাম একটাই থাকবে।

আল্লাহ তায়ালা যেমনভাবে তাঁর আফয়ালের মুজেযা প্রকাশ করেছেন– জমিন একটা মুজেযা, আসমান একটা মুজেযা, চন্দ্র-সূর্য একটা মুজেযা, যাদের নজির পেশ করার ক্ষমতা কারো নেই, তেমনিভাবে তার কালামের মুজেযাও প্রকাশ করেছেন। আর তা হল কুরআনুল কারীম, যার নজির অসম্ভব। তার নজির আজ পর্যন্ত কেউ পেশ করতে পারেনি, ভবিষ্যতেও পারবে না।

দুনিয়ার বিভিন্ন জাতি দিন-রাত মুকাবেলা করেছে; কিন্তু কালামুল্লাহর ন্যায় অর্থপূর্ণ বিভিন্ন বিষয়বস্তু-ভরপুর এবং ফাসাহাত ও বালাগাতসম্বলিত কোন কিতাব রচনা করতে পারেনি। এতে প্রমাণিত হয়, কুরআন হল মুজেযা অর্থাৎ আল্লাহর কালাম, কোন মানুষের কালাম নয়।

কুরআনুল কারীম মুজেযার মুখপাত্র বা প্রতিনিধি

কুরআন শরীফ শুধু মুজেযা নয় বরং তা মুজেযার উপাদান। অর্থাৎ কুরআনুল কারীম মুজেযা তৈরি করে। আর তা এভাবে যে, কুরআনুল কারীমের উপর আমল করে বড়-বড় আকাবির ও আউলিয়া পয়দা হয়েছেন, তাঁদের হাতে অনেক কারামত প্রকাশ পেয়েছে। অতএব কুরআন নিজে শুধু মুজেযা নয় বরং তা মানুষের হাতে মুজেযা প্রদর্শন করে। পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, নবীদের হাতে যে সমস্ত অলৌকিকতা প্রকাশ পেয়েছে, তাকে মুজেযা বলে আর অলিদের হাতে যা জাহির হয়েছে, তাকে কারামাত বলে।

হযরত আবু হানিফা রহ. ও সুফিয়ান সাওরী রহ.-এর মত অনেক বড়-বড় মুজতাহিদ অতিবাহিত হয়েছেন। তারা নবী-রাসূল ছিলেন না; কিন্তু নবীদের ন্যায় একেকজন কোটি-কোটি মানুষকে ইসলামের রঙে রঙিন করেছেন।

ঈমানের রঙে রঙিন করেছেন এবং একেক এলাকাকে ঈমান ও ইসলামের রঙে রঙিন করেছেন।

সুফিয়ায়ে কেরামদের প্রতি নজর দিলে দেখা যায়, তাদের এক-একজন পূর্ব যুগের নবীদের মত দায়িত্ব পালন করেছেন। হযরত শায়েখ মঈনুদ্দীন আজমিরি রহ. সম্পর্কে এক খ্রিস্টান লেখক লিখেছেন, যার নাম মি. আরনাল্ড। তিনি তার গ্রন্থ 'প্রিচিং অব ইসলাম'-এ লিখেছেন, একা হযরত মঈনুদ্দীন আজমিরির হাতে নিরানব্বই লক্ষ অমুসলিম মুসলমান হয়েছেন। তাঁর একার হাতে নিরানব্বই লক্ষ মানুষ ইসলামে দীক্ষিত হয়েছেন। তাঁর মুরিদদের হাতে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছেন, তাদের সংখ্যা ভিন্ন। অতএব একজন শায়েখ মঈনুদ্দীন রহ. সেই কাজ করেছেন, যা বনী ইসরাইলের নবীগণ করতেন। তারা একক অঞ্চলে বসে যেতেন এবং লক্ষ-কোটি মানুষকে ঈমানদার বানাতেন এবং ঈমানের আলো জ্বালাতেন।

অতএব হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উক্ত মুজেযা এবং তার উপর আমল করার দ্বারা মানুষ এমন পর্যায়ে পৌঁছে, বেলায়েতের এমন মাকামে পৌঁছে, যাদের হাতে কারামাত ও অলৌকিক বস্তু প্রকাশ পায় এবং ইলহাম আসতে থাকে।

ছায়া শরীয়ত

নবীদের উপর আসল শরীয়ত আর আইম্মায়ে মুজতাহিদদের উপর ছায়া শরীয়ত জাহির হয়েছে। অর্থাৎ তাঁরা নবীদের শরীয়তের মধ্যে ইস্তেম্বাত করে বিভিন্ন আহকাম বের করেছেন। তাঁরা শরীয়তে ইজতেহাদ করে আহকাম বের করেছেন এবং বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁদের আহকাম কিতাব ও সুন্নাত থেকে ভিন্ন কোন বস্তু নয়। কিতাব ও সুন্নাতের সমষ্টিতে যে সমস্ত বস্তু লুকায়িত ছিল মুজতাহিদের আকল ও বোধশক্তি সেগুলোকে বের করে প্রকাশ করেছে। এগুলো তাঁদের ইলহামী বস্তু ছিল, যা আল্লাহ তায়ালা তাঁদের অন্তরে ঢেলে দিয়েছিলেন। তাঁরা সেগুলোকে প্রকাশ করেছেন।

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বলের ঘটনা

হযরত ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ.– যিনি ইমাম শাফিয়ী রহ.-এর শাগরেদ ছিলেন– তাঁর একটি কাহিনী মনে পড়ল। তাঁরা উভয়ে পৃথক-পৃথক মাযহাবের

ইমাম ও ফকীহ। ইমাম শাফিয়ী রহ.-এর ফিকহ হিজাযে বিস্তার লাভ করেছে। কারণ, তিনি প্রথমে হিজাযে বসবাস করতেন। আর শেষ বয়সে তিনি মিসরে বসবাস করতেন। মিসরবাসীর অনেকে শাফিয়ী মাযহাবের অনুসারী। ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. পশ্চিম দিকের এলাকায় বসবাস করতেন। তাই নজদ ও ইয়ামানে হাম্বলি মাযহাব বিস্তার লাভ করে। ওখানকার লক্ষ লক্ষ মানুষ হাম্বলি মাযহাবের অনুসারী।

হযরত ইমাম শাফিয়ী রহ. মিসরে বসবাস করতেন আর ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. অন্যত্র বসবাস করতেন। তাই দুজনের মাঝে মুলাকাত অনেক দীর্ঘ হয়ে যায়। ইমাম শাফিয়ী রহ. ইমাম হাম্বলের নিকট পত্র লিখলেন–

'অনেক দীর্ঘ কাল যাবত তোমার সাথে আমার সাক্ষাৎ হয় না; মন চাচ্ছে তোমার সাথে সাক্ষাত করার। যদি মিসর আসার সুযোগ মিলে, তাহলে চেষ্টা করে মিসর চলে এস। আমার মন চাচ্ছে শেষবারের মত তোমাকে আরেকবার দেখব।'

ইমাম আহমাদ রহ. উত্তরে লিখলেন, আমি অচিরেই হাজির হচ্ছি। আপনি দিন-তারিখ নির্ধারণ করে দিন যে, আমি অমুক তারিখে উপস্থিত হব। সুতরাং নির্ধারিত তারিখে মিসর পৌছার জন্য তিনি রওনা করলেন এবং ওয়াদাকৃত তারিখে মিসর পৌছলেন। ইস্তেকবালের জন্য ইমাম শাফিয়ী রহ. শহরের বাইরে তাশরীফ নিলেন।

যখন ইমাম শাফিয়ী রহ. বের হলেন, তখন তাঁর সাথে মিসরের সকল উলামা বের হলেন। যখন তিনি চলতে লাগলেন, তখন সকল হাকেম ও রাষ্ট্রের বড়-বড় কর্মকর্তাগণ তাঁর সাথী হলেন। তখনকার সময়ের বাদশাহও ইস্তেকবালের জন্য বের হলেন। ইস্তেকবালের জন্য বিশাল একটি জামাত রওনা হল। মোটকথা, মিসরের সকল আকাবির ও নেতৃস্থানীয় লোক ইস্তেকবালের জন্য বের হলেন। সবার ভিতর আনন্দের ঢেউ বয়ে যাচ্ছে যে, আজ বর্তমান সময়ের ইমাম আমাদের মাঝে আগমন করছেন, আমাদের মেহমান হচ্ছেন।

ইমাম শাফিয়ী রহ.-এর সন্তানদের হালত এমন ছিল যে, ছোট-ছোট বাচ্চারা আনন্দে লাফাচ্ছিল, এদিক-ওদিক ছোটাছুটি করছিল যে, আমাদের বাড়িতে বর্তমান সময়ের ইমাম মেহমান হবেন। আল্লাহ তায়ালা ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ.কে মিসর পৌছালেন এবং তিনি ইমাম শাফিয়ী রহ.-এর বাড়িতে মেহমান হলেন।

হযরত শাফিয়ী রহ. খানা পরিবেশন করলেন। ইমাম শাফিয়ী রহ. মেহমানদারীতে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁর মেহমানদারী সম্পর্কে আশ্চর্য ইতিহাস

রয়েছে। মোটকথা, তিনি পরম আন্তরিকতার সাথে মেহমানদারী করলেন এবং খানা এনে হাজির করলেন।

ইমাম সাহেব খানা খেতে আরম্ভ করলেন। তিনি খানা এমনভাবে খেতে লাগলেন, যেমনভাবে সাত ওয়াক্তের ক্ষুধার্ত ব্যক্তি আহার করে থাকে। তিনি অনেক সময় ধরে যথেষ্ট পরিমাণ খাবার আহার করলেন। তিনি পেটভরে খেলেন। তাঁর আহার দেখে মনে হচ্ছিল, না জানি তিনি কত দীর্ঘ সময় পর্যন্ত না খেয়ে আছেন।

সেটি ছিল তাকওয়া ও পবিত্রতার যুগ। তাই ইমাম শাফিয়ী রহ.-এর সন্তানরা তাঁর নিকট প্রশ্ন করল, আপনি বলেছিলেন তিনি বর্তমান সময়ের ইমাম; তিনি কেমন ইমাম, যিনি পেট ভরে আহার করেন? পেট ভরে খানা খাওয়া তো সর্বসাধারণের কাজ। মুত্তাকিদের কাজ তো পেট ভরে আহার করা নয়। তারা তো সুন্নাতের অনুসারী হন। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সাহাবায়ে কেরাম রা. ও তাবেঈদের সুন্নাত হল প্রয়োজন পরিমাণ আহার করা। কিন্তু খাবারে এমনভাবে লিপ্ত হওয়া যে, মনে হয় অনেক দিন যাবত তিনি না খেয়ে আছেন এ তো মুত্তাকিদের শান নয়। তাহলে তিনি কেমন ইমাম?

ইমাম শাফিয়ী রহ. উত্তর দিতে পারলেন না। তিনি বললেন, আমি নিজেও তো তাঁর অবস্থা দেখে হয়রান। কিন্তু আমি তো বলতে পারি না। কারণ, আমি তার মেজবান। আমার জবান থেকে যদি এমন কথা বের হয় যে, ভাই কম খাও, তাহলে সেটি অপবাদ হবে যে, মনে হয় আমি রুটি বাঁচাতে চাচ্ছি। এজন্য আমি বলার সুযোগ পাইনি। অন্যথায় আমি নিজেও হতভম্ব যে, আহমাদ ইবনে হাম্বলের মধ্যে এমন পরিবর্তন কখন থেকে হল? তিনি খাবারের প্রতি এত মনোযোগী কিভাবে হলেন?

মর্যাদার প্রতি নজর রাখা

মুত্তাকি-পরহেজগারদের আহারের অবস্থা ছিল এমন যে, সাহাবায়ে কেরামদের সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে, যখন তাঁরা জিহাদে যেতেন, তখন তাঁদের সাথে রসদ হিসেবে ডিম, কেক এবং তাজা রুটি থাকত না। কিছু শুকনো রুটি পুটুলিতে পড়ে থাকত। অনেক ক্ষুধা পেলে সামান্য আহার করে নিতেন। কারো নিকট তাও থাকত না। সামান্য কিছু খেজুর থাকত। কতকের নিকট তাও থাকত না। শুধু কিছু খেজুরের গুটি থাকত, ক্ষুধার সময় সেগুলো মুখে দিয়ে নিজের মনকে বোঝাতেন, আমিও কিছু খাচ্ছি। মনও বুঝে নিত, আমি কিছু একটা আহার

করছি। তাঁদের খাদ্য ছিল এমন। কিন্তু তাঁরা চব্বিশ ঘণ্টা জিহাদে ও ইবাদতে ব্যয় করতেন। তাঁদের নিকট রূহানী ও গায়েবী শক্তি ছিল।

হযরত কুতুবুল আলম শায়েখ আবদুল কুদ্দুস গাংগুহী রহ. আপন মালফুযাতে লিখেছেন, আমি এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে অবগত আছি, যিনি দীর্ঘ চল্লিশ বছর যাবত দৈনিক শুধু একটি বাদাম দ্বারা ইফতার করতেন। আপনারা আন্দাজ করুন একটা বাদাম কি খাবার হিসেবে গণ্য হতে পারে! উক্ত মালফুযাতের ব্যাখ্যাকারীগণ লিখেছেন, উল্লিখিত ব্যক্তিটি তিনি নিজেই। তিনি নিজেকে গোপন ও আড়াল করতে গিয়ে এভাবে লিখেছেন যে, আমি এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে অবগত আছি, যিনি প্রতিদিন শুধু একটি বাদাম দ্বারা ইফতার করতেন।

হযরতের হালত এমন ছিল যে, তার জীবনীতে এসেছে, তিনি যখন রাতের বেলা জিকির করতেন, তখন এত উঁচু আওয়াজে করতেন যে, তিনি নিজ ঘরে জিকির করতেন; কিন্তু দুই ফার্লংব্যাপী শহরের প্রতিটি বাড়িতে জিকিরের আওয়াজ এমনভাবে পৌছত যে, সবাই মনে করত আমাদের দরজার সামনে বসে তিনি জিকির করছেন। এই ছিল তাঁর শারীরিক শক্তির হালত। এটি ছিল তাঁর রূহানী ও গায়েবী শক্তি।

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে হাদীস শরীফে এসেছে, দুই-দুই মাস এমনভাবে অতিবাহিত হয়েছে যে, তাঁর ঘরে আগুনের ধোঁয়া ওড়েনি। শুধু দুটি কালো বস্তু আহার করে দিনাতিপাত করতেন। একটি খেজুর খেয়ে এক পেয়ালা পানি পান করে নিতেন। এ ছিল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পরিবারের খাবার। আর যখন তিনি সাওমে বেসাল রাখতেন, তখন তাও পরিহার করতেন।

সুতরাং নবীদের শান ছিল, তাঁরা খানাপিনা অত্যন্ত কম করতেন। সাহাবা, আউলিয়া ও মুত্তাকিদের শানও ছিল খানাপিনা কম খাওয়া।

মুত্তাকিদের হালত তাদের সামনে ছিল। তাই ইমাম শাফিয়ী রহ.-এর সন্তানরা প্রশ্ন তুলল, আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. কেমন মুত্তাকি মানুষ? তিনি কেমন ইমাম, যিনি পেট ভরে আহার করেন? ইমাম শাফিয়ী রহ.-এর নিকট সেই প্রশ্নের কোন উত্তর ছিল না। তিনি বললেন, আমি নিজেও তো অবাক! কিন্তু মেজবান হওয়ার কারণে কিছুই বলতে পারছি না।

প্রথম ঘটনার সমাধান হওয়ার পূর্বে আরেকটি কাণ্ড ঘটে গেল। আর তা এই যে, এশার সময় হলে ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. নামায আদায়ের জন্য মসজিদে গমন করলেন। তখন ইমাম শাফিয়ী রহ.-এর সন্তানরা ইমাম সাহেবের

জন্য রাতে শয়নের জন্য বিছানা প্রস্তুত করল। এক লোটা পানি ভরে রাখল, যাতে তাহাজ্জুদের সময় অজু করতে কষ্ট না হয়। এগুলো প্রস্তুত করে তারা চলে গেল। ইমাম সাহেব রহ. ফিরে এসে শুয়ে পড়লেন। ফযরের নামাযের জন্য যখন মসজিদে গেলেন, তখন শাফিয়ী রহ.-এর সন্তানরা বিছানা ভাঁজ করতে গিয়ে দেখতে পেল, লোটার পানি স্ব-অবস্থায় রয়েছে।

এ হালত দেখে তাদের রাগ আরো বেড়ে গেল। তারা অত্যন্ত চটে গেল। তারা ইমাম শাফিয়ী রহ.-এর জামার পার্শ্ব ধরে বলল, তিনি আপনার শাগরেদ, যার সম্পর্কে আপনি বলতেন, তিনি বর্তমান যুগের ইমাম এবং উম্মতের মধ্যে বড় মুত্তাকি ও পরহেজগার ব্যক্তিত্ব। তিনি কেমন মুত্তাকি, যিনি পেট ভরে আহার করেন আর রাতের বেলা নফল পড়ার তাঁর তাওফিক হয় না? যিনি তাহাজ্জুদ পড়েননি, তিনি কেমন ইমাম?

এসব শ্রবণ করে ইমাম শাফিয়ী রহ. নিজেকে আর ধরে রাখতে পারলেন না, ধৈর্য ধারণ করতে পারলেন না। তিনি তাঁর ছাত্র ছিলেন। তাই ধরে বসলেন এবং বলতে লাগলেন, হে আহমাদ ইবনে হাম্বল! এমন পরিবর্তন তোমার মধ্যে কখন থেকে হল? তোমাকে গতকাল থেকে লক্ষ্য করে আসছি আর ধৈর্য ধরে আছি। তুমি পেটভরে আহার করলে। আমি এ জন্য কিছু বলিনি যে, আমি হলাম তোমার মেজবান। বললে আমার উপর অপবাদ আসবে। তাই সবর করেছি। কিন্তু যখন দেখলাম, রাতের বেলা তোমার তাহাজ্জুদ পড়ার তাওফিক হয়নি, তাই আমি নিজেকে আর ধরে রাখতে পারছি না। এখন তুমি বল তোমার এ পরিবর্তন কখন থেকে? এ তো আফসোসের কথা!

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. হাসলেন এবং আরজ করলেন, হযরত! আপনি যা ভেবেছেন প্রকৃত ঘটনা তা নয়।

আমল ও ইজতেহাদের শান

তিনি বললেন, প্রকৃত ঘটনা কী?

আহমাদ রহ. উত্তর দিলেন, আপনি আমার অধিক আহার দেখে প্রশ্ন করলেন। আসলেই আমি অনেক আহার করেছি। আমি যথেষ্ট পরিমাণে খেয়েছি। সারা জীবন কখনও এত পরিমাণ আহার করিনি, যত পরিমাণ আপনার বাড়িতে খেলাম। তা এই কারণে যে, যখন খাবারের দস্তরখানা বিছানো হল এবং তাতে এমন হালাল ও পবিত্র খানা রাখা হল যে, তার উপর আসমান হতে আনওয়ার এবং বরকতের বৃষ্টি নাযিল হচ্ছিল। আমি সারা পৃথিবীতে এমন পবিত্র ও হালাল

খাবার দেখিনি। তাই আমি ইচ্ছা করলাম, যত পারি খেয়ে নেব, হতে পারে এমন পবিত্র খাবার আমার জীবনে দ্বিতীয়বার জুটবে না। এ কারণে আমি বেশি খেয়েছি। তাতে পরবর্তী সাত দিন আমাকে রোযা রাখতে হলে রাখব। কিন্তু এত নূরানী, বরকতময় ও হালাল লুকমা আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে দেখিনি।

তারপর তিনি বললেন, উক্ত খানার দুটি বরকত আমার মাঝে প্রকাশ পেয়েছে। একটি ইলমি অপরটি আমলি। আমলি বরকত তো এই হয়েছে যে, আজ রাত আমি ঈশার অজু দ্বারা তাহাজ্জুদ পড়েছি, এমনকি ফজরের নামাযও পড়েছি। এ কারণে লোটার পানি ব্যবহার হয়নি। তা পরিপূর্ণ ভরাই রয়েছে। আমি সারারাত ইবাদতে কাটিয়েছি।

আর ইলমি বরকত এমনটি পয়দা হয়েছে যে, কুরআনুল কারীমের একটি আয়াত দ্বারা একশত মাসআলা বের করেছি। আর ইলমসমূহের দরজা আমার জন্য খুলে গেছে। এগুলো ছিল হালাল খাদ্যের বরকতের ফল।

ইলমে মারেফতের শর্ত

হাকিকত ও বাস্তবতা হল, নূরে মারেফত হালাল খাদ্য থেকে সৃষ্টি হয়। তার প্রথম শর্ত হল খাবার হালাল হওয়া। ঈমানী ও রূহানী শক্তি হালাল খাদ্যের অনুগামী।

মানুষের পেট হল শরীরের হাউজ। হাউজ যা দ্বারা ভরা থাকবে বিভিন্ন নালা ও পাইপে তা-ই প্রবাহিত হবে। যদি পেটে হালাল খাবার থাকে, তাহলে অন্তরে তার পবিত্র প্রতিক্রিয়া আসবে এবং দেমাগেও আসবে। তার থেকে পবিত্র কথা বের হবে, তার দ্বারা ভাল কাজ আঞ্জাম হবে। আর যদি খাবার হালাল না হয়, তাহলে অন্ধকার ও ময়লাযুক্ত কথা-কাজ বের হবে এবং আচরণও তেমন হবে।

এজন্য আল্লাহওয়ালাগণ সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেন হালাল খাবারের প্রতি। তাঁরা মনে করেন, উপার্জন হালাল হলে কলবে মারেফতের নূর পয়দা হবে। অন্যথায় নির্দয়তা ও কঠোরতা পয়দা হবে।

আমাদের দেওবন্দ এলাকার এক বুযুর্গ ছিলেন। তার নাম ছিল শাহজী আবদুল্লাহ সাহেব। তিনি নিরেট উম্মি ছিলেন। কিন্তু তিনি সাহেবে নেসবত বুযুর্গ ছিলেন। তিনি তাঁর জীবন-যাপনের পেশা হিসেবে ঘাস কাটাকে নির্বাচন করে নিয়েছিলেন। তিনি ঘাস কেটে আটি বানিয়ে বিক্রি করতেন। প্রতি আটির মূল্য নির্ধারণ করেছিলেন ছয় পয়সা। তার চেয়ে কমও নিতেন না আবার বেশিও
তন না।

দেওবন্দে যত মানুষ নিজেদের পশুর জন্য ঘাস খরিদ করতেন, তারা যখন হাটে যেতেন, তখন হাজারও ঘাসের আটি পড়ে থাকত; কিন্তু সবাই অপেক্ষায় থাকত, আমি হযরত শাহজীর ঘাস খরিদ করব। সবাই তাঁর ঘাস খরিদ করার জন্য চেষ্টা করত। তারা মনে করত আমাদের পশুগুলো শাহজীর ঘাস ভক্ষণ করলে ঘরে বরকত হবে। যখন শাহজী রহ. তাদের নজরে পড়ত তখন সবাই তাঁর দিকে দৌড়াতে থাকত। যে ব্যক্তি সর্বপ্রথম তাঁর ঘাসে হাত লাগাত, তিনি তার ঘাস সেখানেই রেখে দিতেন এবং ছয় পয়সায় নিয়ে নিতেন।

তিনি ছয় পয়সা কিভাবে বণ্টন করতেন? দুই পয়সা তৎক্ষণাৎ সদকা করে দিতেন। দুই পয়সা দ্বারা সে যুগে কিছু আধুলি এবং পাই মিলত। তিনি ভাংতি নিয়ে দুই-দুই বা এক-এক পাই করে শিশুদের, এতিমদের, বিধবা ও গরিবদের সেই স্থানে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে ভাগ করে দিতেন। আর দুই পয়সা প্রতিদিনের খাদ্য সংগ্রহে ব্যয় করতেন। কিছু তেল কিনতেন, কিছু লবণ ও লাকড়ি কিনতেন। তখন সস্তা সদায়ের যুগ ছিল। তাই দুই পয়সার সদায় দ্বারা ঘরের খরচ চলে যেত। আর অবশিষ্ট দুই পয়সা জমা করতেন। সারা বছরে যখন ছয়-সাত রুপি হত, তখন আমাদের আকাবির হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ সাহেব, হযরত রশীদ আহমাদ সাহেব, হযরত কাসেম নানুতুবী সাহেব ও হযরত ইয়াকুব সাহেব রহ.কে দাওয়াত করতেন।

মাওলানা ইয়াকুব সাহেব রহ.– যিনি দারুল উলুম দেওবন্দের সর্বপ্রথম প্রধান শিক্ষক ছিলেন– তিনি শুধু আলেম ছিলেন না, আরেফ বিল্লাহ ছিলেন। এমনকি কাশ্‌ফ ও কারামাতদার বুযুর্গদের মধ্য হতে একজন ছিলেন। তাঁর কথা আমি বড়দের থেকে শুনেছি যে, আমরা সারা বছর হযরত শাহজী রহ.-এর দাওয়াতের অপেক্ষায় থাকতাম। কখন সেই কাঙ্ক্ষিত দিনটি আসবে যে, আমরা শাহজীর ঘরে খানা খাব। তিনি বলেছেন, আমরা যেদিন তার ঘরে খানা খেতাম, সেদিন হতে চল্লিশ দিন পর্যন্ত অন্তরে নূর থাকত এবং কলবে জযবা পয়দা হত যে, মন চাইত এই ইবাদত করি, নফল নামায পড়ে নেই, তেলাওয়াত করে নেই, সর্বদা মন চাইত ইবাদত করতে। ওই হালাল খাবারের বরকত অন্তরে প্রকাশ পেত।

তাওফিক উঠিয়ে নেওয়া, সৎ কাজের যোগ্যতা রহিত করা

হালাল খাদ্য বাস্তবে এমন বস্তু যে, তা দ্বারা ভাল কর্মের তাওফিক পয়দা হয়। বর্তমান সময়ের আমলহীনতা, ইলমহীনতার কারণে নয়। ইলম তো এখন আরও ব্যাপকতা লাভ করেছে। প্রত্যেক ব্যক্তি জানে ও বোঝে। তারপরও বদ-

আমল কেন? তাওফিক উঠিয়ে নেওয়ার কারণে। হারাম ও সন্দেহযুক্ত খাদ্যের কারণে তাওফিক রহিত হয়ে যায়। সম্পূর্ণ হালাল খাবার যোগাড় হয় না।

কবি গালিব বলেন–

جانتا ہوں ثواب طاعت وزہد پر طبیعت ادھر نہیں آتی

জানি সাওয়াব রয়েছে ইবাদত ও যুহদে; কিন্তু তবিয়ত তো সেদিকে ধাবিত হয় না।

কারণ, সন্দেহযুক্ত আহার তবিয়তকে বেঁধে রেখেছে। যার ফলে তাওফিক রহিত হয়ে গেছে। মোটকথা, বর্তমানকালে গুনাহের কারণ অজ্ঞতা ও ইলমহীনতা নয়; বরং তার কারণ হল তবিয়তের নির্দয়তা ও কঠোরতা অথবা অন্ধকার বা তাওফিক না হওয়া ইত্যাদি। কারণ, খাবার হালাল নয়।

আমি দেখেছি, আপনাদের এলাকায় নয়; বরং আমাদের এলাকার সব স্থানে আজ সুগারমিল গড়ে উঠেছে। দেওবন্দ হতে দিল্লি পর্যন্ত প্রতিটি স্টেশনে একটি করে সুগারমিল নির্মিত হয়েছে। এ কারণে আখের চাষাবাদ বেড়ে গেছে। আখগুলো রেলগাড়ি বা গরুর গাড়ির মাধ্যমে বহন করা হয়। কিছু-কিছু মিল মালিক নিজস্ব গাড়ি খরিদ করেছে, যেগুলো বিভিন্ন স্থানে ঘুরে-ঘুরে আখ সংগ্রহ করে। ফলে মালগাড়ির বগি সর্বদা আখ দ্বারা পূর্ণ থাকে।

আমি দেখেছি, পথচারীরা বা গাড়ির যাত্রীরা যখন দেখে স্টেশনে ইক্ষুভরা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে, তখন প্রত্যেক যাত্রী গাড়ি থেকে আখ টেনে-টেনে বের করে নেয়। কেউ বিশটি, কেউ চল্লিশটি, কেউ আবার পঞ্চাশটি নিয়ে নেয় এবং খেতে থাকে। আমি হতভম্ব হয়ে দেখেছি এবং ভেবেছি, এরা সেগুলো খাচ্ছে এই ভেবে যে, এগুলো তাদের বাপ-দাদার সম্পত্তি। তাদের কারো এই অনুভূতি নেই যে, এগুলো অন্যের মাল, আমাদের জন্য এগুলো খাওয়া হালাল নয়। তাদের মধ্যে কোন অনুভূতি অবশিষ্ট নেই। উদাহরণস্বরূপ গরু, যে ক্ষেতে প্রবেশ করে মুখ লাগাতে থাকে, সে একথা ভাবে না যে এটি কি আমার মালিকের ক্ষেত না অপর কারও। মানবজাতিরও একই অবস্থা হয়েছে। তাদের সামনে খাবার এলে ঝাঁপিয়ে পড়ে। একথা চিন্তা করে না যে, এই খাবার আমার জন্য হালাল, না হারাম। তখন আমি চিন্তা করছিলাম, হে আল্লাহ! তাদের অন্তরের কী কাইফিয়াত হবে? এমন মাল ও সম্পদ দ্বারা নির্দয়তা ও কঠোরতা এবং অন্ধকার ব্যতীত অন্যকিছু পয়দা হতে পারে না। হারাম খাদ্য দ্বারা কখনও নেক কাজের জযবা ও উৎসাহ সৃষ্টি হয় না। নেক কর্মের জযবা সর্বদা হালাল খাবার দ্বারা সৃষ্টি হয়।

পূর্ব যুগে আল্লাহওয়ালাগণ কাউকে মুরিদ করার পূর্বে শর্ত দিতেন, হালাল আহারের ব্যবস্থা আছে কি? তোমার খাদ্য যদি সন্দেহযুক্ত হয়, তাহলে সারাদিন আল্লাহর জিকিরে মশগুল থাকলেও কলবের উপর কোন ধরনের প্রতিক্রিয়া পড়বে না।

সারকথা, সে যুগে হালাল খাবারের অনেক গুরুত্বদ দেওয়া হত। উক্ত আলোচনা পেশ করার দ্বারা আমার উদ্দেশ্য একথা বুঝানো যে, পবিত্র ও হালাল উপার্জন দ্বারা মারেফাতের নূর পয়দা হয়। পবিত্র উপার্জনের জযবা কিভাবে পয়দা হবে? তা একমাত্র নবী-রাসূলদের অনুসরণ দ্বারা হতে পারে।

হালাল উপার্জনের ব্যাপারে আল্লাহ কুরআনুল কারীমের বিভিন্ন স্থানে তাকিদ ও উৎসাহ প্রদান করেছেন–

لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

তোমরা পরস্পর একে অন্যের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভোগ করো না, বরং ন্যায়ভাবে ভক্ষণ কর, জায়েয পদ্ধতিতে খাও। নাজায়েয পদ্ধতি ও পথে আহার করো না। *[সূরা নিসা ৪ : ২৯]*

চুরি, ডাকাতি, সুদ, ঘুষ ইত্যাদি অবৈধ পন্থা এই জন্য নিষেধ করা হয়েছে যে, এগুলো নাজায়েয পথ। এ পন্থায় উপার্জন করলে অন্তরে তার বদ আসর পড়বে। সন্দেহযুক্ত উপার্জন দ্বারা খারাপ আসর পড়ে।

শায়েখ আবদুল কাদের জিলানী রহ. বলেন, আমি মালের ব্যয়ের খাতগুলোকে দেখে বুঝে নিতে পারি, এগুলো উপার্জন হয় কিভাবে। অর্থাৎ সম্পদ যে স্থানে ব্যয় হয়, সেই স্থানগুলো দেখে চিনে নিতে পারি, এই সম্পদগুলো কেমন স্থান হতে উপার্জন হয়েছে। যদি পবিত্র ও হালাল স্থানে ব্যয় হয়, তাহলে বুঝতে পারি, এগুলো পবিত্রভাবে উপার্জন হয়েছে। আর যদি নাপাক ও অবৈধ স্থানে ব্যয় হতে দেখি, তাহলে বুঝতে পারি, এগুলো অবশ্যই অবৈধ পথে উপার্জন করা হয়েছে। পবিত্র মাল কখনও অপবিত্র স্থানে ব্যয় হতে পারে না। যেমনভাবে নাপাক মাল পাক স্থানে ব্যয় হতে পারে না।

সন্দেহযুক্ত চাঁদা হতে পরহেজ করা

বোম্বের এক শেঠ দারুল উলুম দেওবন্দের এল। তিনি লাখপতি ধনীদের মধ্যে গণ্য হতেন। তিনি দারুল উলুম পরিদর্শন করে অনেক আনন্দিত হলেন এবং পছন্দ করলেন। লোকটি ঘোষণা করলেন, আমি দেওবন্দের জন্য ২৫ হাজার

রুপি পাঠাব। তখন আমাদের বুযুর্গরা তার উপর বেশি খুশি প্রকাশ করেননি। উদাহরণস্বরূপ সে যখন ঘোষণা করেছিল, তখন তার শুকরিয়া জ্ঞাপন করা যেত বা দোয়ার শব্দাবলি বলা যেত, যাতে তার মন-দিল ভরে উঠত। কিন্তু তারা কিছুই করলেন না। লোকটি চুপ হয়ে বসে পড়ল। তখন আমি অত্যন্ত পেরেশান হলাম এই ভেবে যে, বেচারা কত বড় মনের পরিচয় দিলেন যে, মাদরাসায় ২৫ হাজার রুপি দান করবেন। আর আমরা তাকে কোন শুকরিয়া জানালাম না। এটি আজ হতে ৪৫ বছর পূর্বের ঘটনা। ৪৫ বছর পূর্বের ২৫ হাজার বর্তমান সময়ের ৪৫ লাখেরও বেশি মূল্য রাখে। আবার দ্বীনি প্রতিষ্ঠানে ২৫ হাজার রুপি এলে তা কত উপকারী হত। এজন্য ব্যয়ের খাত হিসেবে সেগুলো অনেক বেশি। এ কারণে তার জন্য কোন শুকরিয়া বাক্য বা দোয়ার বাক্য হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু সবাই চুপ রইলেন।

তখন আমি অবস্থা দৃষ্টে অনেক হয়রান হলাম। শেঠ সাহেব ঘোষণা দিয়ে চলে গেলেন। তারপর ১ মাস অতিবাহিত হল, ২ মাস অতিবাহিত হল। তারপর আমি মাওলানা হাবিবুল্লাহ সাহেব রহ.-কে বললাম, আপনি লোকটিকে স্মরণ করলেন না। মাদরাসা যদি এই মুহূর্তে ২৫ হাজার রুপি পেত, তাহলে মাদরাসার অনেক উপকার হত। এক ব্যক্তি ঘোষণা করেছিল এবং ওয়াদাও করেছিল, আপনি অন্তত স্মরণ করিয়ে দিন।

আমার কথা শুনে তিনি চুপ রইলেন। তারপর আমি আরও অবাক হলাম এই ভেবে যে, লোকটিকে কোন প্রকার শুকরিয়া জানানো হল না। দোয়া করা হল না। এখন আবার তাকে স্মরণ করানোর কথা বললাম; কিন্তু তিনি চুপ রইলেন। তার কিছু দিন পর আমি পুনরায় স্মরণ করালাম যে, লোকটিকে তো চিঠি লিখে এতটুকু বলা যায় যে, ভাই রুপিগুলো পাঠিয়ে দিন।

তখন তিনি কিছুটা রাগতস্বরে বললেন, এই রুপি দারুল উলুমে আসতে পারবে না।

আমি বললাম, কেন? তিনি বললেন, লোকটির সব কর্মকাণ্ড সুদি ব্যবস্থা দ্বারা চলে। মদের কারখানায় সে চাকরি করে। তার সকল উপার্জন অবৈধ পন্থায়। সুতরাং এমন উপার্জনের টাকা দেওবন্দে আসবে না এবং সেখানে চলবেও না। আর এখানে পাঠানোর তার তাওফিকও হবে না। আমি তাকে কেন স্মরণ করাব? তখন আমার মস্তিষ্কে এল যে, আমাদের আকাবিরগণ সর্বদা এমন চাঁদা গ্রহণ করতে অস্বীকার করতেন। তারা সন্দেহযুক্ত মনে করলে গ্রহণ করা হতে বিরত থাকতেন। আর তা এই কারণে যে, যদি এমন চাঁদা মাদরাসায় ব্যবহার

করা হয়, তাহলে তার প্রতিক্রিয়া মাদ্রাসার ছাত্রদের উপর পড়বে। তাদের ইলমে বরকত থাকবে না, তাদের মারেফাত নিঃশেষ হয়ে যাবে।

সুতরাং আল্লাহওয়ালাদের নিকট উক্ত বিষয়টি অত্যন্ত লক্ষণীয় বস্তু ছিল। তারা সর্বদা উপার্জন সন্দেহমুক্ত হওয়া জরুরি মনে করতেন। কেননা, তার উপর তাওফিক ও আমল নির্ভর করে। এমনটি ছিল আমাদের বড়দের শান। আমাদের তো এতটুকু থাকতে হবে যে, উপার্জন হালাল ও সন্দেহমুক্ত হতে হবে।

একজন মুত্তাকির শান

আমি বলছিলাম, বর্তমান কালের আমলহীনতা ইলমহীনতার কারণে নয় বরং অন্য কোন কারণে। আর তাহল আমাদের মধ্যে পরহেজগারী নেই। তাকওয়া-পবিত্রতা তো দূরের বস্তু, ফতওয়াও নেই যে সে মোতাবেক আমাদের উপার্জন সহীহ হবে। তবে সবাই এমন নয়। মাশাআল্লাহ, আজও এমন কিছু মানুষ রয়েছেন, যারা সর্বদা ইহতিয়াত করে চলেন, নির্ভেজাল উপার্জন করেন। এমন কিছু লোক কেয়ামত পর্যন্ত থাকবে। এমন মানুষ হতে এই উম্মত খালি হবে না।

হাদীস শরীফে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

مَثَلُ أُمَّتِي كَمَثَلِ الْمَطَرِ لَا يُدْرَى أَوَّلُهُ خَيْرٌ أَمْ آخِرُهُ

আমার উম্মতের দৃষ্টান্ত হল বৃষ্টির ন্যায়, কেউ বলতে পারে না জমিনের জন্য বৃষ্টির প্রথম ফোঁটাটি বেশি উপকারী, না মাঝের ফোঁটাটি বেশি উত্তম, না শেষেরটি বেশি উত্তম।

অর্থাৎ– আমার উম্মতের মধ্যে খাইরিয়াত ও উত্তমতা সংমিশ্রিত। কম ও বেশির পার্থক্য থাকবে, কিন্তু খায়ের হতে এই উম্মত কখনও খালি হবে না। এজন্যই এই উম্মত মুত্তাকিদের হতে কখনও খালি হবে না।

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়াদা দিয়ে ইরশাদ করেছেন–

لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي مَنْصُورِينَ عَلَى الْحَقِّ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ وَلَا مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللهِ

আমার উম্মতের ভিতর সর্বদা এমন একটা জামাত থাকবে, যারা আল্লাহর পক্ষ হতে সাহায্য পাবে, শক্তি পাবে, তারা হক

বলবে ও শুনবে। তারা হকের উপর আমল করবে। তাদের বিরোধীরা তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

এখানে عِصَابَة শব্দটি এসেছে, যার অর্থ ছোট জামাত। অর্থাৎ এমন হতে পারে যে, তারা সংখ্যায় কম হবে কিন্তু সর্বদা বিদ্যমান থাকবে। তবে এমন হতে পারে না যে, মুত্তাকি মানুষ উম্মতের মধ্যে অবশিষ্ট থাকবে না।

তেমনিভাবে অন্যস্থানে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

لَا تَجْتَمِعُ أُمَّتِي عَلَى الضَّلَالَةِ

আমার সকল উম্মত কখনো গোমরাহীতে ঐক্যবদ্ধ হবে না।

আহলে হক অবশ্যই বাকি থাকবে। এই উম্মত হতে হক কখনও নিঃশেষ হবে না। এজন্যই ঢালাওভাবে বলা যাবে না, সকল মানুষ হারাম ও সন্দেহযুক্ত উপার্জনে লিপ্ত। তবে একথা বলা যাবে যে, অধিকাংশ মানুষ হারাম উপার্জনে লিপ্ত। কিছু মানুষ আছে, যারা সাবধানতা অবলম্বন করে চলে। তাকওয়াকে অগ্রাধিকার দেয়। এ মুহূর্তে স্মরণ হল, হালাল দ্বারাই মানুষের মধ্যে সৎকাজের তাওফিক হয়। শুধু আমল নয় বরং তা দ্বারা ইলম এবং মারেফাতও সৃষ্টি হয়।

পরিপূর্ণ বুদ্ধিমান

উত্তর শুনে ইমাম শাফেয়ী রহ. অত্যন্ত আনন্দিত হলেন এবং সন্তানদের বললেন, দেখেছ আমাদের বাড়িতে বর্তমান সময়ের ইমাম মেহমান? এমনটি ইমামের শান যে, তিনি কম আহার করলেও তা থেকে দীন পয়দা করেন, আবার বেশি আহার করলেও তা থেকে দীন পয়দা করেন। সুতরাং প্রকৃত অর্থে দীনদার হলেন তিনি, যিনি যেভাবেই দুনিয়া প্রাপ্ত হন, তা থেকে তিনি দীন পয়দা করে নেন। এটা নির্বুদ্ধিতা যে, মানুষ দীনকেও দুনিয়া বানিয়ে ফেলে। আর বুদ্ধিমত্তা হল, দুনিয়া থেকেও নিজের জন্য দীন ও কল্যাণ লাভ করা।

মোটকথা, উত্তর শ্রবণে তিনি খুব খুশি হলেন এবং বললেন, দেখ বর্তমান সময়ের ইমাম আমাদের মেহমান। আবারও স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, হালাল খাদ্যে এবং কম আহারের মধ্যে অবশ্যই নূর রয়েছে, ইলমে মারেফাত রয়েছে। আর এর ফলে মানুষ পথ চলতে পারে।

আমল বিল কুরআন দ্বারা বনি ইসরাঈলের নবীদের সাথে সদৃশ্য পয়দা হয়

কুরআনুল কারীম একটি স্বভাবজাত মুজেযা। কুরআন মোতাবেক চলে মানুষ আল্লাহর অলি হয়, কামেল হয়। তার উপর আমল করে উম্মতের মধ্যে অনেক অলি তৈরি হয়েছেন। এমন বড়-বড় অলি তৈরি হয়েছেন, যাঁরা বনি ইসরাঈলের নবীদের মত ছিলেন। তাঁরা নবী ছিলেন না; কিন্তু তাঁরা এমন এমন কর্ম করেছেন, যা নবীগণ করে থাকেন। নবীদের নিকট ওহী আসত আর তাঁদের নিকট ইলহাম আসে। নবীদের হাতে মুজেযা প্রকাশ পেতো আর তাঁদের হাতে কারামাত প্রকাশ পায়। নবীদের আসল শরীয়ত দেওয়া হয়েছে আর তাঁদের ইজতিহাদী শরীয়ত দেওয়া হয়েছে। এভাবে তাঁদের নবীদের সাথে সদৃশ্যতা সৃষ্টি হয়েছে। এজন্যই রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

كَأَنْبِيَاءِ بَنِيْ إِسْرَائِيْل

অত্র হাদীসটি যদিও সনদের দিক দিয়ে দুর্বল; কিন্তু এ অর্থে আরো অনেক হাদীস রয়েছে। তবে সেই হাদীসগুলো বিভিন্ন বিষয়বস্তু দ্বারা সংমিশ্রিত যে, এই উম্মতের আউলিয়াগণ, মুত্তাকিগণ এবং উলামাগণ কারনামা ও কারগুজারী হিসেবে বনি ইসরাঈলের নবীদের মত। আর এগুলো তাদের পক্ষে সম্ভব হয়েছে কুরআনের উপর আমল করার দ্বারা।

যাই হোক, আমরা আলোচনা করছিলাম যে, কুরআনুল কারীম শুধু নিজে মুজেযা নয় বরং মুজেযা তৈরিও করে। অর্থাৎ মুজেযার সদৃশ্য বস্তু কারামাত আউলিয়াদের হাতে প্রকাশ করে যখন তাঁরা কুরআনে উপর আমল করে। সুতরাং কুরআনুল কারীম মুজেযা এবং নবুওয়াতের দলিল।

ইলমি মুজেযার বৈশিষ্ট্য

উক্ত বয়ানের দ্বারা আরো একটি বিষয় পরিষ্কার হল যে, সকল নবীকে আমলি মুজেযা দেওয়া হয়েছিল আর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমলি মুজেযার পাশাপাশি ইলমি মুজেযাও দেওয়া হয়েছে। আমলের বৈশিষ্ট্য হল, আমেল তথা আমলকারী দুনিয়া হতে চলে যাওয়ার সাথে সাথে আমলও নিঃশেষ হয়ে যায়। কিন্তু ইলমের বিশেষত্ব হল, আলেম দুনিয়া হতে চলে গেলেও তা বাকি থাকে। সুতরাং নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আমলি

মুজেযা তাঁর জাতের সাথে খতম ও নিঃশেষ হয়ে গেছে। কিন্তু তাঁর ইলমি মুজেযা কুরআনুল কারীম আজও বিদ্যমান। এতে প্রতীয়মান হয় যে, নবুওয়াতের দলিল দুনিয়াতে আজও বিদ্যমান। অতএব যে দাবির দলিল আজও বিদ্যমান, সেই দাবি আজও প্রমাণিত। এ কারণে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নবুওয়াতকে আজও পেশ করা যায়। কেউ দলিল-প্রমাণ তালাশ করলে আমরা তার মুজেযা উপস্থাপন করব। আর তা হল কুরআনুল কারীম।

কিতাবের স্থায়িত্ব নবুওয়াতের স্থায়িত্বকে আবশ্যক করে

যদি হযরত মুসা আ. সম্পর্কে বলা হয় যে, বর্তমান সময়ে তাঁর উপর ঈমান আনয়ন কর, তখন যদি তাঁর স্বপক্ষে দলিল তালাশ করা হয়, তাহলে তাঁর মুজেযা আসায়ে মুসা ও ইয়াদে বায়যা পাওয়া যাবে না। অর্থাৎ কোন দলিল-প্রমাণ পেশ করতে পারবে না। হযরত ঈসা আ.-এর মুজেযা মৃতকে জিন্দা করা, জন্মান্ধ ও শ্বেতরোগীকে ভাল করা এগুলোও এখন বিদ্যমান নেই, যেগুলো কুরআন বর্ণনা করেছে। হযরত শুয়াইব আ. সম্পর্কে বললেও তাঁর নবুওয়াতের কোন দলিল বিদ্যমান নেই। কিন্তু আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নবুওয়াতকে পেশ করা হলে এবং তার স্বপক্ষে দলিল তালাশ করা হলে দলিল বিদ্যমান রয়েছে। কুরআন হল কালামি ও ইলমি মুজেযা, যার আলেম দুনিয়া থেকে বিদায় নিলেও খতম হবে না; বরং বিদ্যমান থাকবে।

এ কারণে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শরীয়ত হল আবাদী, যা কিয়ামত পর্যন্ত চালু থাকবে। কেননা, তার দলিল দায়েম ও কায়েম রয়েছে।

মোটকথা, সকল নবীর নবুওয়াত হক এবং আপন-আপন যুগে সচল ও সত্য। কিন্তু আজ তা অচল। কারণ, ইলমি দলিল বিদ্যমান নেই। কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নবুওয়াতের দলিল আজও বিদ্যমান রয়েছে। রাসূলের নবুওয়াত দায়েম এবং তার সম্পর্কে চ্যালেঞ্জ করা যায়। এ কারণে বলা হয়, কুরআনুল কারীমের কারণে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নবুওয়াত দায়েমী ও আবাদী। তাঁর পর আর কোন নবী আসবেন না। সেহেতু খাতামুন নাবিয়্যিনের নবুওয়াত বাকি থাকতে নবুওয়াতের দলিল হিসেবে এমন একটি বস্তু দাঁড় করানো হয়েছে, যা খতম হওয়ার নয়। অর্থাৎ কুরআন মাজিদ। আর কুরআন হল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইলমি মুজেযা।

কুরআন বিরোধিতার শাস্তি

মুজেযার বিশেষ শান হল, যখন কোন জাতি তার বিরোধিতা করবে, তখনই তারা ধ্বংস হয়ে যাবে। কওমে সালেহ্ হযরত সালেহ্ আ.-এর নিকট নবুওয়াতের দলিল হিসেবে মুজেযা চাইল যে, পাথর থেকে উটনি বের করে দাও। তিনি আল্লাহর এজাযতে উটনি বের করলেন। তারপর তাঁর জাতি উটনির সাথে মোকাবেলা করল এবং তাকে মেরে ফেলল। তখন তাদের উপর আজাব এল, তাদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দিল।

মোটকথা, যখনই কোন জাতি মুজেযার মোকাবেলা করেছে, তখনই তারা ধ্বংস হয়েছে।

কুরআনুল কারীম হল একটি মুজেযা। আমরা অলসতা করে তার উপর আমল করি না তা ভিন্ন কথা। কিন্তু আল্লাহ্ না করুন যদি কোন জাতি-গোষ্ঠী তার মোকাবেলা করে, তার বিরোধিতা করে, তাহলে নিঃসন্দেহে তারা ধ্বংসের ভিতর পড়ে যাবে। নিঃসন্দেহে তারা কোন না কোন আজাবে লিপ্ত হবে। চাই সে আজাব যে কোন প্রকারের হোক। এই উম্মতের উপর পূর্ব যামানার উম্মতের মত সমূলে ধ্বংসকারী আজাব আসবে না। হাদীস শরীফে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

لَيْسَ عَذَابُ أُمَّتِيْ اَلْخَسْفُ وَالْمَسْخُ وَالرَّجْفُ إِنَّ عَذَابَهَا الْقَتْلُ وَالْفِتَنُ وَالزَّلَازِلُ

আমার উম্মতের উপর এমন আজাব আসবে না যে, চেহারার আকৃতি বিকৃত করে দিবে, যেমনটি পূর্ব উম্মতকে করা হয়েছে। অথবা সমগ্র উম্মতকে ভূমিতে ধসিয়ে দিবে এমনটি হবে না বা পাথর বর্ষণ করে খতম করে দিবে এমনও হবে না। এমন আজাবকে খতম করে দেওয়া হয়েছে।

আমার উম্মতের আজাব কেমন হবে? ফেতনা ছড়িয়ে পড়বে, একজন অন্যজনকে মজা দেখাবে, একজন আরেকজনের সাথে যুদ্ধ করবে।

ইরশাদ হয়েছে–

قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَّبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَّيُذِيْقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ ۝٦٥

> আপনি বলে দিন, আল্লাহ তায়ালা সক্ষম এই উম্মতের উপর কোন শাস্তি প্রদান করতে উপর থেকে অথবা নিচে থেকে অথবা তাদের মাঝে পরস্পর বিভক্তির আজাব ছড়িয়ে দিতে। তাদের একজন অন্যজনকে স্বাদ আস্বাদন করাবে। *[সূরা আন'আম : ৬৫]*

ফলে তারা শান্তিতে বসবাস করতে পারবে না। উক্ত আজাব বর্তমান বিশ্বে সর্বত্র বিরাজমান। আর তা কখন এসেছে? যখন মানুষ কুরআন– যা একটি জীবন্ত মুজেযা– তাকে মুকাবেলা করতে শুরু করেছে। আজ যদি কুরআনকে মেনে নেওয়া হয়, তাহলে মতানৈক্য নিঃশেষ হয়ে যাবে, শান্তি বিরাজ করবে। আর বিরোধিতা করলে ঝগড়া ও অনৈক্য সৃষ্টি হবে আর ঝগড়ার মন্দ প্রতিক্রিয়া উম্মতের মধ্যে ছড়িয়ে পড়বে।

উম্মতকে অনৈক্যের আজাব থেকে রক্ষা করার উপায়

যদি কুরআনকে ইমাম বা নেতা মেনে সকল জাতি-গোষ্ঠীর মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়ে যায়, তদ্রূপ কুরআনের ব্যাখ্যা হাদীসের উপর ঐক্যবদ্ধ হয়, অভিজ্ঞ উলামা যে সকল মাসায়েল কুরআন ও হাদীস থেকে বের করেছেন, তার উপর ঐক্যবদ্ধ হয়, তাহলে উম্মতকে কেউ গোমরাহ করতে পারবে না, মিটাতে পারবে না, বিভক্ত করতে পারবে না। এ শক্তি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তৈরি করে গেছেন। তিনি বলেছেন–

تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ

> আমি তোমাদের মাঝে দুটি বস্তু রেখে গেলাম। যদি তোমরা সেই দুটি বস্তুকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধর, তাহলে কখনও পথভ্রষ্ট হবে না, কখনও পরাজিত হবে না। বস্তুদুটি হলো আল্লাহর কিতাব ও আমার সুন্নাত।

অর্থাৎ কুরআনী আদর্শ আর আমার কর্মপদ্ধতি। যখন সেগুলোকে আঁকড়ে ধরবে, তখন গোমরাহ হবে না। এ হাদীস শরীফে এ দুটিকে সাকলাইন বলা হয়েছে, যার অর্থ এগুলো এমন ভারী ও ওজনদার বস্তু, যা কেউ সরাতে পারবে না এবং কেউ মিটাতেও পারবে না।

যখন তুফান ও ঘূর্ণিঝড় শুরু হয়, তখন মানুষ যদি খড়কুটা আঁকড়ে ধরে, তাহলে খড়ও ভেসে যাবে, মানুষও ভেসে যাবে। যদি কোন বিশাল বৃক্ষ ভেসে আসতে

দেখে আর সেটাকে আঁকড়ে ধরে তাহলে বৃক্ষ যেভাবে ভেসে যাচ্ছে, লোকটিও সেভাবে ভেসে যাবে। কিন্তু যদি সে বিশাল পাথরখণ্ডকে আঁকড়ে ধরে তার আশ্রয় গ্রহণ করে, তাহলে তুফান পাথরকে নাড়াতে পারবে না এবং আশ্রিত ব্যক্তিকেও নাড়াতে পারবে না। কারণ, পাথর হল ভারী বস্তু। এ কারণে কিতাব ও সুন্নাহকে ভারী বস্তু বলা হয়েছে। অর্থাৎ এ দুটি এমন ভারী ও ওজনদার বস্তু যে, সে নিজ স্থান হতে টলবে না এবং সরবে না। তাকে অন্য কেউ সরাতে পারবে না। যদি আমরা এ দুটি বস্তুকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরি, তাহলে এ দুটি এমন ভারী জিনিস যে, আমাদেরকে তুফান ভাসিয়ে নিতে পারবে না। নিঃসন্দেহে আমরা স্বস্থানে অটল ও অবিচল থাকতে পারব, একটি মজবুত ও শক্ত দলিল আমাদের হস্তগত হবে। আর যদি আমরা আকলি ও বুদ্ধিগত দলিল পেশ করি, তাহলে যে কেউ বলবে, আমি তোমাদের চেয়ে বেশি বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী; আমিও একটি আকলি দলিল পেশ করতে সক্ষম। আর যদি স্বভাব ও তবিয়তগত কথা পেশ করি, তাহলে যে কেউ বলবে, আমারও একটা তবিয়ত আছে। আর যদি মেজাজ ও মর্জি মোতাবেক কথা বলি, তাহলে প্রত্যেকে বলবে, আমার ভিতরও একটা মেজাজ রয়েছে। আমার কথা আপনি মানবেন না কেন? কিন্তু যখন আপনি এমন দলিল পেশ করবেন, যা সকল মেজাজ হতে উন্নত এবং সকল তবিয়ত হতে উঁচু আর তাহল কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাতে রাসূল; এ দুটি বস্তু এমন ভারী ও অটল যে, তার সামনে সকলকে মাথা নত করতেই হবে।

অতএব একটি শক্তিশালী দলিল আল্লাহ তায়ালা আমাদের হাতে প্রদান করেছেন আর তা হল কুরআন ও সুন্নাহ নামক অটল ও মজবুত দলিল, যা নিজ স্থান হতে টলে না, নড়ে না। সুতরাং কুরআনুল কারীম নিজে মুজেযা এবং মুজেযা প্রদর্শনকারীও। কুরআনের উপর চলে মানুষ নিজে নিজে মুজেযা বনাম কারামাত দেখাতে পারেন। এই কুরআন ও সুন্নাহর উপর আমল করে হাজারো আউলিয়া তৈরি হয়েছেন, হাজারো কামেল লোক তৈরি হয়েছেন।

কুরআন হল পৃথক হুজ্জত। ইলম হিসেবে দেখলে দেখা যাবে কুরআনের মধ্যে সর্বোচ্চ পর্যায়ের ইলম রয়েছে। আমল হিসেবে নজর করলে দেখা যাবে, তাতে উন্নতমানের আমল রয়েছে; সেটি একটি উত্তম আমলের কিতাব। হেকমত হিসেবে সেটি উন্নততর হেকমতের কিতাব। তার ইলম ও হেকমত দ্বারা অগণিত কুতুবখানা ভরপুর।

উলুমুল কুরআন বা কুরআনের ইলম

ইমাম আওজায়ী রহ. লিখেছেন, অধিক পরিমাণে রচনা ও লেখালেখি এই উম্মতের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। জগতের অন্য কোন জাতি রচনাবলির এত বড় ভাণ্ডার জমা করতে পারেনি, যা এই উম্মত জমা করেছে। এই উম্মত রচনার নানাবিধ রাস্তা আবিষ্কার করেছে। তাতারীদের বাগদাদ আক্রমণকালে সেখানে কতগুলো কুতুবখানা ছিল, তা আপনারা ইতিহাসে পড়েছেন, দেখেছেন। তার সংখ্যা আপনাদের জানা থাকবে।

শুধু একটি কুতুবখানার ঐতিহাসিক হালত শোনাচ্ছি। ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, বাগদাদের উপকণ্ঠে দজলা নদীর উপর একটা ব্রিজ ছিল। বাগদাদবাসীরা সেটি ভেঙে ফেলেছিল, যাতে দুশমন বাগদাদে প্রবেশ না করতে পারে। ব্রিজ ভাঙা থাকার কারণে তাতারীরা চলাচল করতে পারছিল না। আর দরিয়াও ছিল গভীর। তখন তাতারীরা মুসলমানদের একটি কুতুবখানার কিতাব দ্বারা দরিয়া ভরতে শুরু করল। অতঃপর কিতাবের স্তূপ দিয়েই সেখানে এমন বিশাল সড়ক নির্মাণ করা হলো, যার উপর দিয়ে চার-পাঁচটি গাড়ি একসাথে চলাচল করতে পারত। এ ছিল শুধু একটি কুতুবখানার অবস্থা।

ঐতিহাসিকগণ আরো লিখেছেন, উক্ত কিতাব ভিজে ভিজে যে কালি প্রবাহিত হয়েছে, তা দীর্ঘ এক মাস পর্যন্ত আলেমদের জন্য কালির প্রয়োজন মেটাতে পারত। নদীর পানি এত কালো হয়ে গিয়েছিল যে, অনায়াসে তা দ্বারা লেখা যেত। এখন অনুমান করতে পারেন যে, শহরের একটি কুতুবখানার অবস্থা এমন, তাহলে ঐ শহরের অন্যান্য কুতুবখানার অবস্থা কেমন ছিল এবং সেই শহরে বা দেশে কত সংখ্যক কুতুবখানা ছিল!

উনদুলুস (স্পেন)-এর ইসলামি শাসনব্যবস্থা যখন ধ্বংস হল। একজন খ্রিস্টান মহিলা লেখক তার গ্রন্থে– যার নাম حاضر الاندلس وغاربها এ লিখেছেন, খ্রিস্টান সরকার ধর্মীয় সংস্কারের নামে মুসলমানদের লিটারেচার তথা সাহিত্য ধ্বংস করতে চাইল। তারা ভাবল, যদি এই কিতাবগুলো বাকি থাকে, তাহলে পুনরায় তারা উন্নতি লাভ করতে পারে, তাদের উত্থান পুনরায় হতে পারে। এ জন্য তারা নতুন ও পৃথক মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করল, যাতে কুতুবখানাগুলোকে নিঃশেষ করা যায়। উক্ত উদ্দেশ্যে সদস্য সংগ্রহ করে এবং তার জন্য একটা বিশেষ আদালত গঠন করল যে, কুতুবখানাগুলোকে পুড়িয়ে দেওয়া হবে, না সাগরে ভাসিয়ে দেওয়া হবে, না নষ্ট করে ফেলা হবে? তার জন্য একজন ভিন্ন ইনচার্জ অফিসার নির্বাচন করা হয়।

তিনি লিখেছেন– তারা কুতুবখানা হতে কিতাব সংগ্রহ করত এবং জ্বালিয়ে দিত। এভাবে দীর্ঘ পঞ্চাশ বছরে সারা দেশের কুতুবখানার কিতাবগুলো পুড়িয়ে শেষ করে।

আপনারা আন্দাজ করুন স্পেনে কতগুলো কুতুবখানা ছিল। হিন্দুস্তান ও পাকিস্তানের কুতুবখানাগুলো অনেক পুরাতন। বর্তমান সময়ে কিতাব পোকা-মাকড়ে কাটছে। পাঠক তো কেউ নেই। হাজার-হাজার কুতুবখানা আজও বিদ্যমান। কিন্তু কিতাবগুলো আজ পোকা-মাকড়ের জন্য উপহার হয়ে আছে। হেজাযের কুতুবখানারও একই অবস্থা। মিসর সরকার তাদের কুতুবখানার কিতাবগুলো মুদ্রণের উদ্যোগ নিয়েছিল। তার সেগুলো ছাপাতে-ছাপাতে হয়রান হয়ে যাচ্ছে তবুও সালফে সালেহীনদের রচনাবলির একশত ভাগের এক ভাগও ছাপাতে পারেনি। হাজারো, লাখো সংখ্যা এখনও অমুদ্রিত রয়ে গেছে। এগুলো তারা ইচ্ছা করলে ছাপাতে পারে। এত বিশাল রচনার ভাণ্ডার এই কুরআন ও হাদীসের বদৌলতে। উলামায়ে কেরাম যা রচনা করেছেন এবং করছেন সবগুলো কুরআন ও হাদীসেরই ব্যাখ্যা।

কিতাবুম মুবিনের বৈশিষ্ট্য

উপরের বর্ণনা থেকে অনুমান করা যেতে পারে, কুরআন ও হাদীসের বক্তব্য কতটুকু অর্থবহ যে, তাদের ব্যাখ্যা হতে হতে হাজারো কুতুবখানা ভরে গেছে। এত হওয়ার পরও একশ ভাগের এক ভাগ হয়েছে। হাজার-হাজার, লাখ-লাখ কিতাব ছাপানো বাকি রয়ে গেছে। এতে কুরআনের ইলমের আন্দায হয় যে, এই ইলম মুজেযার ইলম। কোন মানুষের ইলমের ব্যাখ্যায় এত রচনার ভাণ্ডার হতে পারে না যে, শতাব্দি অতিবাহিত হয়ে যাবে; কিন্তু তবুও তার ব্যাখ্যা শেষ হবে না। সুতরাং এমন হওয়া একমাত্র কিতাবুম মুবিনেরই বৈশিষ্ট্য। একমাত্র আল্লাহপ্রদত্ত কিতাবের এমন হালত হতে পারে যে, সকল আলেম, হাকিম, সূফীগণসহ সবাই যদি তার ব্যাখ্যা করতে শুরু করে, তাহলে ব্যাখ্যা হতে থাকবে।

হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে–

لَا تَنْقَضِيْ عَجَائِبُهٗ

কেয়ামত এসে যাবে; কিন্তু কুরআনুল কারীমের ব্যাখ্যা শেষ হবে না। ব্যাখ্যার কাজ চলতে থাকবে আর বাড়তে থাকবে।

> আজও হাজার-হাজার উলামা তাসনিফাতের কাজ করে চলছেন, যার দলিল আয়াত ও হাদীস দ্বারাই গ্রহণ করে থাকেন।

এতে প্রতীয়মান হয় যে, এর একেকটি আয়াত পৃথক-পৃথক সমুদ্র। মুসলিম লেখকগণ শুধু তাসনিফ তথা লেখালেখিই করেননি বরং তারা আলাদা-আলাদা বিভিন্ন শাস্ত্র উদ্ভাবন করেছেন, হাজারো ফন ও উলুম আবিষ্কার করেছেন। প্রত্যেক ফনের ভিতর আবার হাজারো কিতাব রচিত হয়েছে। সুতরাং কুরআন মুজেযা হবে না তো কী হবে? একটি ছোট্ট কিতাব, তবে ভিতর থেকে এত পরিমাণ ইলম বের হচ্ছে যে, লাখ-লাখ কুতুবখানা ভরে গেছে, লাখ-লাখ গ্রন্থ রচিত হয়েছে এবং আজও হচ্ছে। আর যে সকল নতুন ও আধুনিক সমস্যা ও মাসআলা সামনে আসছে, সেগুলোর সমাধান তা থেকে হচ্ছে। অতএব এমনটি মুজেযার শক্তি ব্যতীত আর কোন শক্তি হতে পারে?

ইসলাহী নেসাব বা আত্মশুদ্ধির নেসাব

কুরআনুল কারীম হল একটি জীবন্ত মুজেযা। মুসলমানরা সৌভাগ্যবান যে, আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে এই মুজেযা দান করেছেন। কুরআন হল আল্লাহ তায়ালার তাবাররুক, যা তাঁর ভিতর হতে বের হয়ে এসেছে। এ বরকত তাঁর ভিতরে বিদ্যমান ছিল। আজও যদি কেউ কুরআনমুখী হয়, তাহলে তার ইলম আমল ও তাকওয়া উঁচু স্তর পর্যন্ত পৌঁছতে পারে। আর তার প্রভাব-প্রতিক্রিয়া এমনভাবে প্রকাশ পেতে পারে যেমনভাবে পূর্ব যুগে প্রকাশ পেয়েছিল। ইমাম মালেক রহ. বলেন–

لَا يَصْلُحُ اٰخِرُ هٰذِهِ الْاُمَّةِ اِلَّا بِمَا صَلُحَ بِهٖ اَوَّلُهَا

> এই উম্মতের শেষ যুগের মানুষের ইসলাহ কেবল ওই জিনিস দ্বারা-ই হতে পারে, যা দ্বারা উম্মতের প্রথম যুগের মানুষদের ইসলাহ হয়েছিল।

এই উম্মতের প্রথম ত্ববকা হল সাহাবায়ে কেরাম। তাদের ইসলাহের জিম্মাদার ছিল এই কুরআন। তাদের কুতুবখানাগুলোতে কুরআন ছাড়া অন্য কোন কিতাব ছিল না। তাদের নিকট কিতাব ছিল অথবা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী হাদীস ছিল, যা তাদের সিনাতে মাহফুজ ছিল। এগুলোই তাদের ইসলাহ বা সংশোধন করেছে। জাহেলী যুগকে পরিবর্তন করেছে।

তাদের মাঝে ইনকিলাব পয়দা করেছে আর ইনকিলাবের পিছনে শুধু এই কুরআনুল কারীমই ছিল। যে জাতিকে দুনিয়ার সকল জাতির মধ্যে অপদস্থ জ্ঞান করা হত, আরবদের তুচ্ছ নজরে দেখা হত, তারা মাত্র পঞ্চাশ বছরের মধ্যে এমন উন্নত জাতি হিসেবে আবির্ভূত হল যে, তারা কিসরা ও কায়সারের হুকুমাতকে উল্টে দিল। তারা হুকুমাতসমূহে ইনকিলাব সৃষ্টি করে ফেলল। দুনিয়াকে মূর্খতার পরিবর্তে ইলম ও জ্ঞান দ্বারা ভরে দিল। তাদের মধ্যে এমন ইনকিলাব তথা পরিবর্তন এই কিতাবুম মুবিনই পয়দা করেছিল। তাদের নিকট এ কিতাব ব্যতীত অন্য কোন কিতাব ছিল না। তাদের নিকট এ কিতারের ইলম ও আমল ছিল, যা তাদের এত উন্নত করেছিল। যে কিতাব তাদের ইসলাহের মাধ্যম হয়েছিল, ওই কিতাব আজও আমাদের ইসলাহের মাধ্যম হবে।

উলুমের মারকাজ

আমার বয়ানের উদ্দেশ্য এই নয় যে, আপনি অন্যান্য ইলম এবং ফন-এর শিক্ষা পরিহার করবেন। আপনি তামাম উলুম ও ফুনুন অর্জন করুন, আপনি বিজ্ঞান, দর্শন, প্রকৌশলবিদ্যা, গণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞান ইত্যাদি অর্জন করুন। কিন্তু প্রত্যেকটি ইলমের কোন একটা মারকাজ ও মাপকাঠি থাকা প্রয়োজন, যার আশপাশে ওই ইলমগুলো আবর্তিত হবে। সমগ্র ইলমের মারকাজ যদি আপনি দীনকে বানান, তাহলে ওই সকল ইলম আপনার জন্য দীন হিসেবে গণ্য হবে। শুধু দুনিয়াবী স্বার্থই অর্জন হবে না, তার পাশাপাশি আখেরাতের সাওয়াব ও আজর সংযোজন হতে থাকবে। যদি দীন ও কিতাব-সুন্নাহকে মারকাজ বানানো হয় এবং তামাম উলুম ও ফুনুনকে তার সাথে সংযুক্ত করা হয়, যার দ্বারা উদ্দেশ্য হয় দ্বীনি ইলমকে উন্নত করা এবং মানুষদের ইসলাহ করা, তাহলে প্রত্যেক ইলম ও ফন কাজে আসবে এবং প্রতিটি বিষয় আখেরাতের আজর, ইসলাহ ও তাকওয়ার মাধ্যম হবে।

বরকত কামনা করা

আজ আমি কুরআনুল কারীম সম্পর্কে কয়েকটি কথা এজন্য বললাম যে, দারুল কুরআন নামক প্রতিষ্ঠানে আজকের জলসা হচ্ছে। ওই সমস্ত মানুষ মোবারক, যারা দারুল কুরআন প্রতিষ্ঠা করে কুরআনুল কারীমের প্রচারের রাস্তা খুলেছেন। তারা কুরআনের শব্দাবলি ও তার মূল উপকরণ ও তরজ-তরিকা প্রচার করছেন। আর যারা কুরআনী ইলম প্রসার-প্রসারের মাধ্যম হন, তারা নিঃসন্দেহে

মোবারকবাদ পাওয়ার যোগ্য, যারা কুরআনের তাবলীগ ও প্রচলনের জন্য প্রতিষ্ঠান কায়েম করেন। এতেই আমাদের কল্যাণ ও সংশোধন রয়েছে।

এসময় কয়েকটি বাক্য যেহেনে এসেছিল, সেগুলো পেশ করলাম। আল্লাহ্ তায়ালা আমাকে ও আপনাদেরকে কুরআনুল কারীমের উপর চলার এবং তার উপর আমল করার তাওফিক দান করুক। আমীন।

اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ اَللّٰهُمَّ اَعِذْنَا مِنَ الْفِتَنِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ اَللّٰهُمَّ اجْعَلِ الْقُرْاٰنَ اِمَامًا لَّنَا وَاجْعَلْهُ حُجَّةً لَّنَا وَارْزُقْنَا عَمَلَهُ بِفَضْلِكَ الْعَظِيْمِ يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ اَللّٰهُمَّ تَوَفَّنَا مُسْلِمِيْنَ وَ اَلْحِقْنَا بِالصَّالِحِيْنَ غَيْرَ خَزَايَا وَلَا مَفْتُوْنِيْنَ وَصَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهٖ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ اَجْمَعِيْنَ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

(২রা রবিউল আউয়াল-১৪০৯ হিজরী)

বয়ান : ২

খেলাফতে তাজবিদ

এই যে দারুল কুরআন প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, এটিও একটি খেলাফতে খোদাওন্দী। এটি শব্দাবলি, উচ্চারণ ও বাচনভঙ্গির খেলাফত, যা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগ থেকে চলে আসছে। কারী ও মুজাব্বিদগণ ওই উচ্চারণ ও বাচনভঙ্গিকে হেফাজত করার চেষ্টা করে চলছেন। মূল প্রকরণ ও বৈশিষ্ট্য একই থাকে, যদিও ব্যক্তিসত্তার কারণে কিছুটা পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় কিন্তু লয় সেটাই বলবৎ থাকে যা পূর্ব হতে চলে আসছে।

– হযরত হাকীমুল ইসলাম রহ.





খেলাফতে তাজবিদ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَ نَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ، وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ، وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُهٗ، اَرْسَلَهُ اللّٰهُ اِلٰى كَآفَّةٍ لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّ نَذِيْرًا وَدَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَ سِرَاجًا مُّنِيْرًا•

اَمَّا بَعْدُ: فقد قال النبى صلى الله عليه وسلم تَبَرَّكُ بِالْقُرْاٰنِ فَاِنَّهٗ كَلَامُ اللّٰهِ وَخَرَجَ مِنْهُ او كما قال النبى صلى الله عليه وسلم

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, কুরআন দ্বারা বরকত লাভ কর। কেননা, তা আল্লাহ তায়ালার কালাম এবং তাঁর সত্তা থেকে নির্গত হয়েছে।

জাওহারে দুনিয়া বা দুনিয়ার মূল উপাদান

বুযুর্গানে মুহতারাম!

এ পৃথিবী দুটি জিনিস দ্বারা আবাদ হয়েছে। সেই দুটি বস্তু পৃথিবীর জাওহার ও রূহ। তন্মধ্যে একটি হল আল্লাহর কর্ম অপরটি তাঁর কালাম। একদিকে আপনাদের সামনে এ দুনিয়া দাঁড়িয়ে আছে। নিচে জমিন নামক বিছানা বিছানো রয়েছে, উপরে আসমান নামের তাঁবু টানানো রয়েছে। আকাশে চন্দ্র ও সূর্য নামের দুটি প্রদীপ রয়েছে, যাদের দ্বারা পৃথিবী আলোকিত ও উজ্জ্বল হচ্ছে। বিভিন্ন রঙের প্রাণবিশিষ্ট ও প্রাণহীন মাখলুক তাতে বসবাস করছে। এ সবই আল্লাহর কর্ম। এগুলো তাঁর সৃষ্টি ও নিপুণ কারিগরি, যা আপনার সামনে

উদ্ভাসিত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মূলত এগুলো মহান আল্লাহর নেয়ামত ও বরকতময় বস্তু। চাঁদ ও সূর্য আল্লাহ তায়ালার দান ও তাবাররুক। কিন্তু এগুলোর মধ্য হতে কোনটাই আল্লাহ তায়ালার সত্তা হতে বের হয়ে আসেনি। এগুলো সবই আল্লাহর মাখলুক। তিনি প্রতিটি বস্তুকে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে এনেছেন, সৃষ্টি করেছেন এবং প্রকাশ করেছেন। অতএব তাঁর উদ্ভাবনের দ্বারাই এ সমস্ত জিনিস আপনার সামনে বিদ্যমান।

আল্লাহর বিশেষ দান

কিন্তু ওই তাবাররুক ও দান যা আল্লাহ তায়ালার জাতের ভিতর থেকে বের হয়ে এসেছে, তাঁর বাতেন হতে জাহির হয়েছে এবং আপনার সামনে প্রকাশ হয়েছে, তাহল আল্লাহ তায়ালার কালাম। সকল বস্তু হল মাখলুক কিন্তু কালাম মাখলুক হতে পারে না।

যখন আপনি কোন জিনিস বানান, তখন বলেন, আমি এ জিনিসটি বানিয়েছি, আমি ইমারত নির্মাণ করেছি, কাঠ বানিয়েছি, পাত্র বানিয়েছি ইত্যাদি। কিন্তু যখন কালাম করেন বা কথা বলেন, তখন একথা বলেন না যে আমি আমার কালাম বানিয়েছি অথবা আমি আমার কথাকে সৃষ্টি করেছি। সুতরাং কালাম মুতাকাল্লিমের ভিতর হতে বের হয়, প্রকাশ পায়– বানানো হয় না। বানানো হয় বাইরের জিনিস। বাইরের জিনিসকে অস্তিত্ব দেওয়া হয়। তাই এ জামিন ও আসমান আল্লাহর জাতের ভিতর হতে বের হয়ে আসেনি, এগুলোকে সৃষ্টি করার দ্বারা অস্তিত্বমান হয়েছে, প্রকাশ্যে এসেছে। কিন্তু আল্লাহর কালাম স্বয়ং তাঁর জাত হতে নির্গত হয়ে আমাদের সম্মুখে জাহির হয়েছে। সুতরাং সবচেয়ে বড় তাবাররুক আজ মুসলমানদের হাতে, যা সরাসরি আল্লাহর জাতের মধ্য হতে বের হয়েছে।

মুসলিমদের বিশেষ শান

মুসলিম মিল্লাতের একটি বিশেষ মর্যাদাগত শান ও সৌভাগ্য যে, আল্লাহ তায়ালার সরাসরি দান ও তাঁর তাবাররুক তাদের হাতে বিদ্যমান, যা আল্লাহর সত্তা হতে বের হয়ে মুসলিমদের সত্তার মধ্যে প্রবেশ করেছে।

এ জন্যই হাদীস শরীফে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

تَبَرَّكْ بِالْقُرْاٰنِ فَاِنَّهٗ كَلَامُ اللّٰهِ وَخَرَجَ مِنْهُ

কুরআন থেকে বরকত হাসিল কর। কেননা, তা আল্লাহর কালাম এবং তাঁর সত্তা বের হয়ে এসেছে।

তাওরাত ইঞ্জিল ও যাবুরও আল্লাহ তায়ালার কালাম। কিন্তু হাকিকী অর্থে কালাম বলা হয়, যা সরাসরি কালাম হয় এবং মুখ দ্বারা বলা হয়। তাওরাত তো আল্লাহ তায়ালার জবান দ্বারা বলেননি বরং কাষ্ঠফলকে লিখে হযরত মুসা আ.-এর নিকট পাঠিয়ে দিয়েছেন। তেমনিভাবে ইঞ্জিলও আল্লাহর কালাম। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা নিজে তাকাল্লুম করেননি বরং হযরত ঈসা আ.-এর মোবারক কলবে ইলহাম করেছেন। শব্দাবলি আল্লাহর পক্ষ হতে আসেনি, শুধু বিষয়বস্তু আল্লাহর। হযরত ঈসা আ. নিজের মোবারক যবানে নিজ ভাষায় তা পড়ে শুনিয়েছেন। তেমনিভাবে যাবুর কিতাবেও আল্লাহর তাকাল্লুম হয়নি।

বিশেষ শানদার কিতাব

কুরআনুল কারীমের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল, স্বয়ং আল্লাহ পাক তার তাকাল্লুম করেছেন এবং তিনি নিজে পাঠ করে শুনিয়েছেন। এ কারণে কুরআনুল কারীমের কেরাতের নেসবত তিনি নিজের দিকে করেছেন এবং তাকাল্লুমের নেসবতও নিজের দিকে করেছেন।

فَاِذَا قَرَاْنٰهُ فَاتَّبِعْ قُرْاٰنَهٗ ۝١٨

যখন আমি কুরআনে কারীম পাঠ করি হে রাসূল! তখন আপনি শুনতে থাকুন এবং তার ইত্তেবা করুন। *[সূরা কিয়ামা : ১৮]*

কোথাও বলেছেন–

نَتْلُوْا عَلَيْكَ مِنْ نَّبَاِ مُوْسٰى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ

হে পয়গম্বর! আমি আপনার উপর তেলাওয়াত করি মুসার ঘটনা ও ফেরাউনের কাহিনী। *[সূরা কাসাস : ৩]*

সুতরাং আল্লাহ তায়ালা নিজেকে তেলাওয়াতকারী বা ক্বারী বলেছেন এবং নিজেকে হাফেজও বলেছেন–

اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ ۝٩

এবং আমি এই কালাম নাযিল করেছি এবং আমি-ই তার হাফেজ ও রক্ষণাবেক্ষণকারী। *[সূরা হিজর : ৯]*

অতএব তিনি নিজে হাফেজও, তেলাওয়াতকারীও এবং ক্বারীও। এই বৈশিষ্ট্য ও মর্যাদা শুধু কুরআনে কারীমের, যার তেলাওয়াত আল্লাহর পক্ষ হতে, তাকাল্লুম আল্লাহর পক্ষ হতে, তার কেরাতও তাঁরই পক্ষ হতে।

খোদায়ী আওয়াজ

কালামের জন্য ধ্বনি বা আওয়াজের প্রয়োজন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যখন জিজ্ঞেস করা হল–

كَيْفَ يَأْتِيكَ الْوَحْيُ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟

হে আল্লাহর রাসূল! আপনার ওপর ওহী কিভাবে আসে? ওহীর কাইফিয়্যাত বা অবস্থা কেমন হয়?

তখন তিনি ইরশাদ করলেন–

يَأْتِينِي مِثْلَ صَلْصَلَةِ الْجَرَسِ

অর্থাৎ আমার উপর ওহী এমনভাবে আসে, যেমন ঘণ্টা বাজানোর পর যখন ছেড়ে দেওয়া হয়, তখন তার মধ্যে এক ধরনের গুঞ্জন চলতে থাকে, যা কয়েক মিনিট পর্যন্ত স্থায়ী হয়ে থাকে। আমি ওই প্রকারের একটা গুঞ্জন ও আওয়াজ শুনতে পাই।

কখনও তিনি এমন বলেছেন, পরিষ্কার পাথরের উপর যদি লোহার শিকল রেখে টানা হয়, তাহলে লাগাতার গুঞ্জনের যে আওয়াজ ভেসে আসে, আমি তেমন আওয়াজ শুনতে পাই। এ দ্বারা পরিষ্কার বুঝে এল যে, কুরআনুল কারীম তেলাওয়াতের সময় এক ধরনের আওয়াজ ভেসে আসত। যদিও সেই আওয়াজের ধরন আমাদের পক্ষে বয়ান করা সম্ভব নয়। তবে তাকাল্লুমের জন্য আওয়াজ হতো। অতএব খোদায়ী আওয়াজের সাথে কুরআনুল কারীম শুনানো হতো।

কালামের মর্যাদা

হযরত জিবরাঈল আ. সর্বপ্রথম কালাম শোনেন। হাদীস শরীফে এসেছে, যখন আল্লাহ ওহী নাযিল করেন, তখন তাঁর ভয় ও আযমতে সকল ফেরেশতার উপর

এক প্রকার বিশেষ পর্দা পড়ে বেহুশ হয়ে যান। স্বয়ং জিবরাঈল আ.ও বেহুশ হয়ে যান। সর্বপ্রথম যিনি হুশ ফিরে পান, তিনি হলেন জিবরাঈল আ.। তাঁর পরে অন্যান্যরা হুঁশ ফিরে পান। তখন ফেরেশতাগণ জিজ্ঞেস করেন–

مَاذَا قَالَ رَبُّنَا

আমাদের পরোয়ারদেগার কী বলেছেন?

قَالَ الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ

তিনি বলেন, সত্য বলেছেন। আর তিনিই উচ্চমর্যাদাশীল ও সবচেয়ে বড়।

খেলাফতে তাজবিদ ও কেরআত

এতে সুস্পষ্ট হল যে, কোন কোন কালাম হযরত জিবরাঈল আ. শ্রবণ করেন আর তা শ্রবণের ভয়ে বেহুশ হয়ে যান। অতএব যখন তাকাল্লুম হয় এবং আওয়াজ উঁচু এবং ভীতিকর হয়, তখন তার প্রভাবে অবশ্যই বেহুশ হবে। যদি বজ্রজোরে হয়, তাহলে নিঃসন্দেহে অন্তর কেঁপে ওঠে এবং কতক সময় মানুষ বেহুশ হয়ে যায়। মানুষ পরের কথা, বিকট আওয়াজ দ্বারা পাহাড়ও ফেটে যায়, বাড়ি-ঘর ভেঙে পড়ে। সুতরাং কুরআনের আওয়াজ যখন শুনানো হয়, তখন ফেরেশতার ন্যায় শক্তিশালী মাখলুকও ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেলে।

কুরআনুল কারীমের কয়েকটি দিক রয়েছে। একটি হল আলফায বা শব্দাবলি। আরেকটি মায়ানী বা অর্থাবলি। আলফাযের হেফাজত হুফফাজগণ করে থাকেন। কুরআনের হুবহু প্রতিটি শব্দ প্রতিটি ইরাব তথা যের, যবর পেশ এবং প্রতিটি নুকতা সংরক্ষিত। আর এগুলোর লেখা ও পড়া বিদ্যমান। এমন কিছু কুরআন শরীফ ছাপানো হয়েছে, যেগুলোর মধ্যে রুকুর সংখ্যা, সূরার সংখ্যা, হরফের সংখ্যা, আলফাজের সংখ্যা এমনকি যের-যবরের সংখ্যাও উল্লেখ রয়েছে। এসব হেফাজত করে যাচ্ছেন হাফেজে কুরআনগণ।

কুরআনের অর্থ উলামা ও ফুকাহাগণ সংরক্ষণ করছেন। তাতে যত কানুন ও বিধান রয়েছে সেগুলো উলামাগণ বুঝেছেন।

কুরআনের উচ্চারণ, বাচনভঙ্গি ও পাঠরীতি কারী ও মুজাব্বিদগণ হেফাজত করেছেন। জনাব রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন থেকে শ্রবণ করেছেন, হযরত জিবরাঈল আ. হতে শুনেছেন বিশেষ এক উচ্চারণভঙ্গির সাথে। সেই উচ্চারণভঙ্গির সাথে তিনি পরবর্তী কালে

তেলাওয়াত করেছেন এবং আপন সাহাবাদের শিক্ষা দিয়েছেন। সাহাবাদের মধ্যে অনেক কারী ও মুজাব্বিদ ছিলেন। তারা নিজেরা শুনে অন্যদের শুনিয়েছেন এবং শিখিয়েছেন। সুতরাং কুরআনুল কারীমের বাচনভঙ্গি কারী ও মুজাব্বিদগণ সংরক্ষণ করেছেন। কুরআনুল কারীমের শব্দাবলিতে হুফফাজগণ হলেন আল্লাহর খলিফা, অর্থাবলিতে হলেন উলামাগণ আর আওয়াজ ও উচ্চারণভঙ্গিতে রবের খলিফা হলেন কারী ও মুজাব্বিদগণ, যারা তেলাওয়াত ভঙ্গিকে সংরক্ষণ করেছেন।

কুরআনের লেখার নিয়মাবলিকেও হেফাজত করা হয়েছে। প্রথম যুগে যেভাবে লেখা হত আজও একই নিয়মে লেখা হয়। উদাহরণস্বরূপ আপনি اَلرَّحْمٰنُ শব্দটি লিখবেন। তাহলে আপনার মিমের সঙ্গে আলিফ মিলিয়ে اَلرَّحْمَانُ লেখা মাকরূহ ও নিষেধ। আপনাকে মিমের সাথে নুনকে মিলিয়ে লিখতে হবে এবং মিমের উপর খাড়া যবর দিতে হবে। আর এটিই আসল ও আদি লেখনপদ্ধতি। এভাবে পুরা কুরআনের লেখার নিয়মাবলিকেও হেফাজত করেছেন উলামায়ে রাসমুলখতগণ। তাঁরা এর কায়দা-কানুন অবিষ্কার করে তাকে একটি শাস্ত্র হিসেবে রূপ দান করেছেন।

কুরআনের হিকমাতসমূহের হেফাজত হুকামায়ে ইসলাম করেছেন। তার মধ্যে যে সমস্ত ঐতিহাসিক বাক্য রয়েছে, সেগুলোর ব্যাখ্যা ইতিহাসবিদরা করেছেন। তার মধ্যে যত হাকায়েক তথা প্রকৃত তত্ত্ব রয়েছে সেগুলোকে সুফী-সাধকগণ আয়ত্ব করে হেফাজত করেছেন। মোটকথা হল কুরআনের একেক দিককে হেফাজত করার পৃথক-পৃথক জামাত তৈরি হয়েছে, যারা কুরআনকে সর্বদিক থেকে হেফাজত করেছেন। আলফাযের জন্য হুফফাজরা, অর্থের জন্য উলামাগণ, রাসমুলখতের জন্য উলামায়ে রাসমুলখতগণ, আওয়াজ ও উচ্চারণভঙ্গির জন্য কারী ও মুজাব্বিদরা, হিকমত ও মাসলেহাতের জন্য হাকিমগণ, হাকায়েকের জন্য সুফীগণ এবং ইল্লত, হুজ্জত ও আসরার তথা রহস্য ভেদের জন্য ফকীহগণ। অর্থাৎ প্রত্যেক বিষয়ের জন্য পৃথক-পৃথক জামাত তৈরি হয়েছেন এবং এভাবে আল্লাহ তায়ালা কুরআনকে হেফাজত করেছেন।

اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ ۝

আমি কুরআন নাযিল করেছি, আমি-ই তার হেফাজতের যিম্মাদার।

বিশেষ পন্থায় হেফাজত

কুরআনুল কারীমের আসল হেফাজতকারী হলেন আল্লাহ। আল্লাহ তায়ালার যত সিফাত ও কামাল রয়েছে, সেগুলো দুনিয়াতে আসবাবের মাধ্যমে প্রকাশ পেয়ে থাকে। যেমন মানবসৃষ্টির ক্ষেত্রে খালিক নিঃসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা; কিন্তু তার তাখলিক তথা সৃষ্টি বাস্তবায়িত হয় পুরুষ-মহিলার সংমিশ্রণে। অতএব পুরুষ-মহিলা হল তাখলিকের মাধ্যম আর আল্লাহ তায়ালা হলেন খালিক। মা-বাবাকে খালিক বলা হবে না; বরং সৃষ্টির কারণ বলা হবে। তেমনিভাবে রাজ্জাক নিঃসন্দেহে মহান আল্লাহ; কিন্তু রিজিক পৌঁছানোর মাধ্যমে বানিয়েছেন জমিনকে। তা থেকে শস্য উৎপন্ন হয়। কৃষকরা তাতে মেহনত করে, তারা মেহনত করে জমিনের উপরের অংশে। আসল চাষাবাদ আল্লাহ তায়ালা করেন। যেমনটি কুরআনুল কারীমে ইরশাদ করেছেন–

ءَاَنْتُمْ تَزْرَعُوْنَهٗٓ اَمْ نَحْنُ الزّٰرِعُوْنَ ۝٦٤

তোমরা চাষাবাদ কর, না আমি চাষাবাদ করি? *[সূরা ওয়াকিয়া : ৬৪]*

তোমরা তো শুধু বীজ বপন করেছ। সেই বীজকে মাটির নিচে হেফাজত করা, তা থেকে পল্লব বের করা। পল্লব এর মধ্যে শস্যদানা সৃষ্টি করা এগুলো কী কৃষকের কাজ, না আমার কাজ? অতএব শুধু বীজ ফেলে দেওয়া আসল চাষাবাদ নয় বরং তা থেকে চারা বের করা এবং তাকে বড় গাছে রূপ দেওয়া, তাতে ফল দেওয়া হলো আসল চাষাবাদ। এজন্যই তিনি বলেছেন, তোমরা চাষাবাদকারী, না আমি চাষাবাদকারী? তোমরা শস্য উৎপন্ন কর, না আমি উৎপন্ন করি?

তিনি আরো বলেন–

ءَاَنْتُمْ تَخْلُقُوْنَهٗٓ اَمْ نَحْنُ الْخٰلِقُوْنَ ۝٥٩

তোমরা খালিক, না আমি খালিক? *[সূরা ওয়াকিয়া : ৫৯]*

তোমাদের কাজ এতটুকু যে নর-নারীকে মিলানো। মায়ের পেটে কি হচ্ছে? কিভাবে মাখলুক বানানো হচ্ছে? কী পদ্ধতিতে তাকে মুকুলিত করা হয়? এসব সম্পাদনকারী-ই কেবল জানেন, তিনিই করেন। ওই মায়ের সামান্য খবর নেই, যার পেটের ভিতর এ সকল মেশিনারি চলছে এবং কারখানা চলছে। সুতরাং অন্ধকার কুটিরে পানির উপর নকশা করা ঐ নিপুণ হাকিমের কর্ম, যার শক্তি অসীম।

তেমনিভাবে কালাম তাকালুম করা। এ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন, প্রকশ্যে তোমরা তাকালুম করছ; কিন্তু হাকিকতে কালাম আমার। জাহিরীভাবে তোমরা

হেফাজত করছ; কিন্তু সত্যিকারের হেফাজতকারী আমি। জাহিরীভাবে তোমরা কারী ও পাঠক; কিন্তু হাকিকতে কারী আমি– আমি কেরাত পড়ছি। সুতরাং আল্লাহর হেফাজত আসবাবের মাধ্যমে প্রকাশ পাচ্ছে।

বর্তমানকালে যখন মানুষের কুরআনের দিকে তাওয়াজ্জুহ নেই অর্থাৎ শতকরা এক-দুজন হয়তো আছে। যেমন তাওয়াজ্জুহ হওয়া প্রয়োজন ছিল সমষ্টিগতভাবে তা নেই। কুরআনুল কারীম পড়ার পিছনে জাগতিক কোন ওয়াদা-অঙ্গীকারও নেই যে, যদি কুরআন পড়েন তাহলে বড় কোন চাকরি পাবেন, কয়েক লাখ টাকা পেয়ে যাবেন অথবা কোন সরকারি জায়গীর পেয়ে যাবেন। এমন কোন ওয়াদা নেই। এরপরও এ দারুল উলুম কিভাবে কায়েম হল? হেফজখানাগুলো কিভাবে জারি আছে? হাজার-হাজার ছাত্র কিভাবে পড়তে চলে আসছে? এগুলো শুধু কুরআনের মুজেযা যে, কোন প্রকার ওয়াদা ছাড়াই তার দ্বারা অন্তরে প্রভাব পড়ছে যে, আল কুরআন পড় এবং পড়াও। সুস্পষ্টত তাতে জাগতিক কোন ওয়াদা নেই, দুনিয়ার কোন ফায়দা নেই। তারপরও আসতে বাধ্য। এ ব্যবস্থা আল্লাহ তায়ালার ওই হেফাজতে খোদাওন্দী, যা অন্তরে ঢালা হচ্ছে। ফলে আসছে, পড়ছে ও পড়াচ্ছে। এভাবে কুরআনের হেফাজত হচ্ছে।

আল্লাহ তায়ালা কুরআনের হেফাজত ছোট্ট-ছোট্ট শিশু দ্বারা করাচ্ছেন। সাধারণত কুরআনপড়ুয়ারা ছোট শিশু হয়ে থাকে। যদি বড় মানুষ কুরআন পড়তেন, তাহলে কুরআন সম্পর্কে এমন অপবাদ আসত যে, তারা কুরআন হেফাজতের জন্য পড়ছে। আর কুরআন হেফাজতের নেসবত তাদের দিকে করা হত যে, যদি এই বড় মানুষগুলো না পড়তেন, তাহলে কুরআন মাহফুজ হত না। অথবা এমন বলত যে, বড় মানুষগুলো বুঝে-শুনে হেফাজত করছেন। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা কুরআনকে শিশুদের দ্বারা হেফাজত করাচ্ছেন, যাদের এতটুকু খবর নেই যে, কুরআন পড়লে কী ফায়দা হবে। তিনি এভাবে হেফাজত করে চলছেন, যাতে হেফাজতের নেসবত নিরেট আল্লাহর দিকে হয় যে, তিনিই হেফাজত করছেন– শিশুরা হেফাজতকারী নয়।

অতএব, বড়রা যদি হেফাজত করতেন, তাহলে হেফাজতের নেসবত (সম্পর্ক) তাদের দিকে হত, ফলে আল্লাহর উপর অপবাদ আসত। এজন্যই আল্লাহ তায়ালার আদত এমন যে, ছোট-ছোট শিশু, যাদের বয়স ৫/৬ বা ৭ বছর তাদের সীনাতে কুরআন কারীম মাহফুজ করেন, যাতে হেফাজতের সম্পর্ক নিরেট আল্লাহর দিকে হয়। এ কারণেই তিনি ইরশাদ করেছেন–

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحٰفِظُونَ ۝٩

আমি এ কিতাব নাযিল করেছি আমি-ই তার হেফাজতের যিম্মাদার।

অতএব সত্যিকারের হেফাজত আল্লাহ তায়ালা করেন।

হেফজের মাধ্যমে সংরক্ষণ

কুরআনুল কারীমের একেক দিককে হেফাজত করার জন্য একেক জামাত দাঁড়িয়ে গেছেন, যারা কুরআনের বিভিন্ন দিককে হেফাজত করেছেন। ক্বারী ও মুজাব্বিদগণ কেরাতের ভিতর আল্লাহ তায়ালার হাকিকী খলিফা। তাদের সনদ আল্লাহ তায়ালা পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছে। ইসলামের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল, তার প্রতিটি বিষয় সনদবিশিষ্ট। চাই কুরআন হোক, হাদীস হোক, ফিকাহ হোক, উসূলে ফিকাহ হোক, সকল বিষয়ে সনদ রয়েছে। হাদীস শরীফের প্রতিটি শব্দ, প্রতিটি টুকরোর সনদ আমাদের থেকে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত নির্ভুলভাবে পৌঁছে। একটা সামান্য টুকরো আপনি বর্ণনা করবেন তারও সনদ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছবে। মুহাদ্দিসগণ হাদীস বর্ণনাকারীদের মধ্য হতে চার লক্ষ বর্ণনাকারীর জীবনী রচনা করেছেন। তাঁদের পেশা, কাজকর্ম, তাঁদের স্মৃতিশক্তি, তাঁদের স্মরণশক্তি, তাদের আদালত ও ইনসাফ, তাদের নাম ও বংশ পর্যন্ত রচনা করেছেন যে, তারা হলেন হাদীসের বর্ণনাকারী।

তেমনিভাবে কুরআনে কারীমের হেফাজত সনদের সাথে করেছেন। যত কারী ও মুজাব্বিদ রয়েছেন, তাদের সনদ দেওয়া হয়। উদাহরণস্বরূপ আমি মাওলানা কারী আবদুল ওয়াজেদ সাহেব রহ.-এর নিকট কুরআন পড়েছি, তাজবিদের সাথে পড়েছি, তার সনদ আমার নিকট বিদ্যমান। আমাকে কারী আব্দুল ওয়াহেদ সাহেব পড়িয়েছেন, তাঁকে কারী আবদুর রহমান সাহেব ইলাহাবাদী রহ. পড়িয়েছেন, তাঁকে কারী আবদুল্লাহ সাহেব মক্কী রহ. পড়িয়েছেন, তাঁকে কারী ইব্রাহীম রশীদ মিসরী রহ. পড়িয়েছেন। এমনিভাবে প্রত্যেকের উস্তাদ রয়েছেন এবং হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছেছে। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আমি হযরত জিবরাঈল আ.-এর মাধ্যমে হক তায়ালা থেকে হাসিল করেছি। আর জিবরাঈল আ. বলেন, আমি সরাসরি হক তায়ালা হতে শ্রবণ করি। অতএব একজন কারীর সনদ আল্লাহ তায়ালা পর্যন্ত পৌঁছে। সুতরাং যেমনভাবে কুরআনুল কারীমের আলফাযের সনদ সংরক্ষিত, তেমনিভাবে তার উচ্চারণ ও বাচনভঙ্গির সনদও

সংরক্ষিত। তার অর্থ এবং ইলমসমূহের সনদও সংরক্ষিত। এক কথায় আল্লাহর কালামের যত দিক রয়েছে, সবগুলো সনদের সাথে সংরক্ষিত। তার প্রতিটি নুকতা পর্যন্ত হেফাজতকৃত। এজন্য তিনি ইরশাদ করেন–

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحٰفِظُونَ ۝٩

আমি তার নাযিলকারী, আমি-ই তার সংরক্ষক।

অতএব হেফাজতের পদ্ধতি হল যবানে পাঠ করা এবং কলম দ্বারা লিপিবদ্ধ করা। আর আল্লাহ তায়ালা উভয়ভাবে হেফাজত করেছেন। তিনি কালামও করেছেন এবং লিখিয়েছেনও।

লেখার মাধ্যমে হেফাজত

হাদীস শরীফে এসেছে, কুরআনুল কারীমকে সর্বপ্রথম লাওহে মাহফুজে লেখা হয়েছে। যেমন লেখক তেমন তার লেখা, তেমন তার হরফগুলো। কিছু সিরাত গ্রন্থে রয়েছে যে, প্রথমে কুরআনকে লাওহে মাহফুজে লেখা হয়েছে, যার প্রতিটি হরফ ছিল কোহেকাফ (একটি বিখ্যাত পাহাড়)-এর মত বড়-বড়। অতএব যেমন তার লেখক, তেমন তার হরফ। হযরত জিবরাঈল আ. লাওহে মাহফুজে কুরআনকে দেখে হেফজ করে ফেললেন। তারপর এই কুরআনকে হযরত ইসরাফিল আ.-এর কপালে লেখা হয়। এ ছিল তার জন্য পুরস্কার। অতএব কুরআনকে ইসরাফিল আ.-এর কপালে এবং লাওহে মাহফুজে লেখা হয় আর হযরত জিবরাঈল আ.-এর কলবে লেখা হয়। তারপর এ কুরআনকে বাইতুল ইজ্জতে নাযিল করা হয়। এটি প্রথম আকাশ তথা পৃথিবীর আকাশের উপরের একটি স্থানের নাম। সেখানে পূর্ণ কুরআন নাযিল হয়। অতঃপর এখান থেকে দীর্ঘ তেইশ বছরে আস্তে-আস্তে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর নাযিল হয়। কখনও এক আয়াত, কখনও দুই আয়াত, কখনও একটি সূরা অর্থাৎ প্রয়োজন মোতাবেক নাযিল হয়। প্রথমে লাওহে মাহফুজ পর্যন্ত হল, তারপর জিবরাঈল পর্যন্ত, তারপর বাইতুল ইজ্জত, তারপর নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত এসে পৌঁছল।

তাওয়াতুর বা অবিচ্ছিন্ন পদ্ধতিতে হেফাজত

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবাদের পড়িয়েছেন। তাঁরা তাবেঈদের পড়িয়েছেন। অতএব কুরআনের মধ্যে তাওয়াতুর তবকা বা

জামাতের সংখ্যার নয়। হাদীসে মুতাওয়াতির বলা হয় যার মধ্যে সর্বনিম্ন তিন রাবী বর্ণনাকারী সর্বদা মওজুদ থাকে এবং শেষ পর্যন্ত এই সংখ্যা বহাল থাকে। তিনজন হোক বা তার চেয়ে বেশি হোক, এমন তাওয়াতুরকে উত্তম তাওয়াতুর মনে করা হয়। কিন্তু কুরআনুল কারীমের মধ্যে তিন-তিন এর সংখ্যা নেই বরং হাজার-হাজার এর সংখ্যা। প্রত্যেক যুগেই হাজার-হাজার, লাখ-লাখ হাফেজ ছিল, আছে। প্রত্যেক যুগেই বিশাল এক জামাত বিশাল এক জামাত থেকে পাঠ করেছেন। একজন অপরজনের নিকট হতে শুনেছেন। এভাবে তার সনদ চলে এসেছে।

সংরক্ষিত কিতাব

যার নিকট হতে রেওয়ায়েত করা হয়েছে তিনি হলেন স্বয়ং আল্লাহ পাক। প্রথম রাবী হলেন হযরত জিবরাঈল আ.। তারপর হেফাজতের সাথে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মোবারক কলবে তাকে নাযিল করা হয়। এ সম্পর্কে এক স্থানে এসেছে–

وَ اِنَّهٗ لَتَنْزِيْلُ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ ۱۹۲ نَزَلَ بِهِ الرُّوْحُ الْاَمِيْنُ ۝ ۱۹۳ عَلٰى قَلْبِكَ
لِتَكُوْنَ مِنَ الْمُنْذِرِيْنَ ۝ ۱۹۴

এটি আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে নাযিলকৃত কিতাব। তাকে রুহুল আমীন নিয়ে এসে নাযিল করেছে এবং মুহাম্মদ-এর পবিত্র কলবে নাযিল করেছে। *[সূরা আশ-শুয়ারা : ১৯২-১৯৪]*

আল্লাহ তায়ালার সিফাতী নামসমূহের একটি হল আমীন। অর্থাৎ তিনি আমানতদার। হযরত জিবরাঈল আ.-এর সিফাত রুহুল আমীন– তিনি নিজেও আমানতদার। আর নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সিফাতও মুহাম্মদ আমীন অর্থাৎ আমানতদার। আর এই আমানত শব্দটি নিজে নিজে তিনি সংযোজন করেননি বরং অন্য লোকেরা তা স্বীকার করেছেন। নবুওয়াত পাওয়ার পূর্বে মক্কার তামাম কাফের তাকে আমীন উপাধির সাথে স্মরণ করত। যখন তিনি আসতেন, তখন তারা বলল, আমানতওয়ালা এসে গেছে।

সুতরাং কালামুল্লাহ এক আমীন-এর সত্তা থেকে বের হয়েছে এবং আরেক আমীন নিয়ে এসেছে আর অপর আমীনের কলবে নাযিল করেছে। অতএব উপর থেকে পূর্ণ আমানতের সাথে নিচ পর্যন্ত পৌঁছেছে। কোন বস্তুর সনদে এসব

জিনিস লক্ষ করা হয় যে, যার থেকে বর্ণনা করা হয়েছে এবং যিনি বর্ণনা করেছেন উভয়ে পুরোপুরি আদেল কিনা। পূর্ণ আমানতদার, পূর্ণ নিয়ন্ত্রিত কিনা। সুতরাং আল্লাহর চেয়ে বড় আমানতদার কে হতে পারে? জিবরাঈলের চেয়ে বড় আমীন কে হতে পারে? মানুষের মধ্যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চেয়ে বড় আমানতওয়ালা কে হতে পারে? তাই তিন আমীনের নিকট এই কালাম ছিল, তারপর সনদের সিলসিলা শুরু হয়।

কুরআনের সনদের ব্যাপারে কুরআনের আলোচনা

এই কারণে কুরআনুল কারীমের এক জায়গায় তার সনদ বর্ণনা করেছে। যেমনিভাবে মুহাদ্দিসগণ কোন হাদীস বর্ণনা করার সময় তার বর্ণনাকারী সম্পর্কে নিরীক্ষণ করেন যে, তার বর্ণনাকারী কেমন। যে স্তরের বর্ণনাকারী হবে সেই স্তরের বর্ণনা হবে। সুতরাং এক সুরতে পৃথকভাবে কুরআনের সনদ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে–

إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُوْلٍ كَرِيْمٍ ۝١٩ ذِىْ قُوَّةٍ عِنْدَ ذِى الْعَرْشِ مَكِيْنٍ ۝٢٠ مُّطَاعٍ ثَمَّ اَمِيْنٍ ۝٢١

কুরআনুল কারীমের প্রথম বর্ণনাকারী হযরত জিবরাঈর আ.। এজন্য তাঁর গুণাবলি বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথমে বলা হয়েছে–

إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُوْلٍ كَرِيْمٍ ۝١٩

নিশ্চয়ই কুরআন একজন সম্মানিত ও কারীম রাসূলের আনীত বাণী।

এখানে 'রাসূল' শব্দ দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। একথা তো সুস্পষ্ট যে, রাসূল কার হবে? রাসূল আল্লাহ তায়ালার।

পরে আল্লাহ তায়ালাই ব্যাখ্যা প্রদান করছেন যে, প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের রাসূল ও দূত নির্বাচন করেন এমন ব্যক্তিত্বকে যার উপর পূর্ণ আস্থা ও এতমিনান থাকে। যদি সামান্যতম আস্থা না থাকে, তাহলে তাকে দূত বানানো হয় না। যার উপর পূর্ণ আস্থা থাকে, তাকে দূত বানানো হয়। সেই দূত সত্যবাদী ও আমানতদার হয়। সুতরাং সর্বপ্রথম রাসূল শব্দ বলে জিবরাঈর আ.-এর প্রশংসা করা হয়েছে যে, তিনি আমাদের রাসূল। রিসালাতের দায়িত্ব তো নিজেই একটা মর্যাদাসম্পন্ন বস্তু। তারপর বলা হয়েছে, কেমন রাসূল? তিনি কারীম, সম্মানিত। যার চরিত্রে

করম রয়েছে, যার আদত-অভ্যাসে করম রয়েছে। অতএব তিনি রাসূলও, কারীমও। কারীমুন নফস তার জাওহার। তার শানে দুটি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। একটি কারীম, অপরটি রাসূল। যার দ্বারা জিবরাঈল আ.-এর শান সুস্পষ্ট হয়ে গেছে।

কিন্তু রাসূল এমন হতে পারে যে, একজন লোক রাসূলও কারীমও এবং নেককারও। তার নিয়তও ভাল। তবে এত দুর্বল যে যদি কালাম নিয়ে আসে তাহলে কারো ধমকের কারণে সম্ভাবনা রয়েছে, কালাম বদলিয়ে দিবে, ভয়ের প্রভাবে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে যাবে। অতএব নিয়ত ভাল, আমানতদারও তবে অন্তর এত দুর্বল যে, সত্য কথা বলছিল; কিন্তু যখন কেউ তলোয়ার উত্তোলন করল যে কী বলছ? তখন সে ভয় ও প্রভাবে অন্য কিছু বলে ফেলল। তাই এমন হতে পারে, একজন মানুষ নেককার, নিয়ত ভাল, কারীমও কিন্তু অত্যন্ত দুর্বল মনের মানুষ। তাহলে আশংকা থাকে যে, ভয়ের মুহূর্তে কথার মধ্যে পরিবর্তন করে ফেলবে। এ জন্য আরো একটি বাক্য বৃদ্ধি করলেন ذِيْ قُوَّةٍ (তিনি শক্তিশালী) তিনি রাসূলও, কারীমও এবং শক্তিশালীও। দুর্বল নন যে, কারো ভয়ে প্রভাবিত হয়ে অন্য কিছু বলে ফেলবেন। অতএব জিবরাঈল আ.-এর তিনটি গুণ হল– তাঁর মধ্যে রিসালত আছে, কারামত ও কুওয়াত (শক্তি)ও রয়েছে। তিনি কারো ভয়ে প্রভাবিত হয়ে অন্য কিছু বলে ফেলবেন না বরং বুদ্ধিমত্তা ও আমানতের সাথে বলবেন। তিনি যে পয়গাম প্রাপ্ত হয়েছেন তা-ই বলবেন।

তবে তারপরও একটা সম্ভাবনা ও সন্দেহ থেকে যায় যে, একজন মানুষ নেককার, তার নিয়ত ভাল এবং কারীম ও শক্তিশালীও কিন্তু সে দূর থেকে কথা শ্রবণ করেছে, তাই অন্য কিছু শুনে থাকবে। যখন সে বর্ণনা করবে, তখন পূর্ণরূপে এই কালাম বর্ণনা করতে পারবে না, যা মুতাকাল্লিমের হুবহু কথা ছিল, সে মাইল দুই মাইল বা ফার্লং দুই ফার্লং দূর থেকে শুধু আওয়াজ শুনেছে। দূরের আওয়াজ তো আওয়াজই হয়ে থাকে। তাই হয়তো বুঝতে ভুল হয়ে যাবে, পূর্ণরূপে আওয়াজ কানে পৌঁছবে না। ফলে সে একেবারে হুবহু কালাম পৌঁছাতে পারবে না। এ কারণে আল্লাহ তায়ালা আরো একটি বাক্য বাড়িয়ে দিলেন–

عِنْدَ ذِى الْعَرْشِ مَكِيْنٍ

তিনি আরশওয়ালা তথা আল্লাহর কাছে থাকেন।

দূরে কোথাও থাকেন না। এমনটি সম্ভব নয় যে, দূরে বসে কিছু একটা শুনে নিবেন। তো তিনি অতি নিকটে থাকেন, আরশওয়ালার নিকটে। যেমনটি হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে, হযরত জিবরাঈল আ.-এর মাকাম সিদরাতুল মুনতাহা।

আর তা সপ্তম আকাশে অবস্থিত। তারপর থেকে জান্নাতের এলাকা শুরু হয়েছে। তারপর তার উপর সমুদ্র রয়েছে, যার উপর আরশে আযীম অবস্থিত।

জগৎসমূহের এরিয়া যাকে মুকাল্লাফ বলা হয় তা আসমানসমূহের নিচে-নিচে বিদ্যমান। আর আসমানসমূহের উপর হল হযরত জিবরাঈল আ.-এর মাকাম। এখন যদি আকাশে বিচরণ করতে হয় তাহলে উপরে উঠতে হবে, কখনও নিচে যেতে হবে, কখনও উপরে উঠতে হবে।

এজন্যই বলা হয়েছে–

عِنْدَ ذِى الْعَرْشِ مَكِيْنٍ

তিনি আরশওয়ালার নিকট অবস্থান করেন।

তাই দূরে বা নিকটের কোন প্রশ্ন নেই। সুতরাং প্রথম বর্ণনাকারীর শান হল তার মধ্যে রিসালতও রয়েছে, কারামাতও আছে, শক্তিমত্তা আছে এবং আল্লাহর নৈকট্যও আছে। অতএব দূরে অবস্থান করার কোন সম্ভাবনা নেই।

হ্যাঁ তারপরও একটা জিনিসের সম্ভাবনা থেকে যায় যে, একজন মানুষ রাসূল, কারীম, শক্তিশালী, আল্লাহর নৈকট্যশীল; কিন্তু তার কোন পদমর্যাদা নেই। পদমর্যাদাবান লোক যখন কোন কিছু বলেন, তখন তার প্রতি মনোনিবেশ করা হয়। যদি কেউ অনেক বড় ধনী মানুষ হয়, যার শক্তি আছে কিন্তু তার কোন পদমর্যাদা নেই, কোন বড় শাসনক্ষমতা নেই; তাহলে তার কথা মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করবে না। যদি আমি একটি বাক্য বলি, তাহলে তার কোন গ্রহণযোগ্যতা হবে না। কিন্তু দেশের প্রধান যদি একই বাক্য বলে, তাহলে রাজনীতির মোড় ঘুরে যাবে, তার কথা অর্থবহ হবে, দেশে ইনকিলাব হয়ে যেতে পারে। কেননা, একজন পদমর্যাদাবান ব্যক্তি কথা বলেছেন। অতএব একজন ব্যক্তি নেককার ও বুযুর্গ, আল্লাহর নৈকট্যশালীও, হকপন্থীও, কিন্তু কোন যিম্মাদার ব্যক্তি নন, তার কোন পদমর্যাদা নেই, তাহলে তার কালাম অধিক মনোযোগযোগ্য হবে না। এজন্য জিবরাঈল আ. সম্পর্কে কেউ বলতে পারে, তিনি বড় দরবেশ, বড় উচ্চ পর্যায়ের নৈকট্যশালী ব্যক্তিত্ব, আরশের নিকট থাকেন, নেককারও বুযুর্গও, পূর্ণ আমানতদারও, কিন্তু তার কোন প্রকার পদমর্যাদা ও শাসনক্ষমতা তো নেই; এ জন্য তার যিম্মাদারগত শান ও মান নেই যে, তার কালাম মনোযোগ সহকারে শুনবে। এ কারণে আল্লাহ তায়ালা আরেকটি বাক্য বাড়িয়ে দিলেন–

مُّطَاعٍ (সবার মান্যবর) সকল ফেরেশতার সর্দার, তার আনুগত্য করাও ওয়াজিব, সকল ফেরেশতা তাঁর সামনে মাথা নত করে, তাঁর কথা মেনে নেয়, আসমানে

তাঁর হুকুমাত রয়েছে, তিনি ফেরেশতাদের সর্দার। এতে একথা সুস্পষ্ট হয় যে, যখন মুতাকাল্লিম, কাসেদ ও ভাষ্যকার জাতিগতভাবে বুযুর্গ হয়, আমানতদার হয় আর বাহির হতে সে রিসালত পায় এবং উপর হতে এমন বড় মর্যাদাপূর্ণ পদ মিলে যে, সাত আসমানে তাঁর হুকুমত চলে, তার যিম্মাদারী ও দায়িত্বও থাকে, তাহলে এমন বড় ব্যক্তিত্ব যখন পয়গাম পৌছাবেন, তখন তার মধ্যে কোন প্রকার ত্রুটি ও অস্পটতার আশংকা থাকতে পারে না। কোন প্রকার সন্দেহ হতে পারে না।

তারপরও বলেছেন–

ثَمَّ اَمِيْنٍ

ওখানে তিনি বিশ্বাসভাজন।

উপরে বর্ণিত সকল গুণের উপর তিনি বিশ্বাসভাজন ও আমানতদার। একথার সাক্ষ্য কে দিচ্ছেন? স্বয়ং আল্লাহতায়ালা সাক্ষ্য দিচ্ছেন। জিবরাঈর আ.কে কে বলেছেন তিনি বুযুর্গ ও মান্যবর? সাহেবে কুরআন তথা আল্লাহতায়ালা বলেছেন। সুতরাং স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা তার গুণাবলি বর্ণনা করছেন।

মর্যাদাবান শাহাদাত

যদি কোন ছোট ও অপরিচিত ব্যক্তি কোন বড় ও মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিত্বের প্রশংসা করে বা বড়ত্ব বয়ান করে, তাহলে তা বড়ত্ব বর্ণনা করা মনে করা হয় না। মনে করা হয়, আসলে সে নিজের প্রশংসা করতে চায়। কবি বলেন–

مادح خورشید مداح خوداست

সূর্যের প্রশংসাকারী আসলে নিজের প্রশংসা করে।

অর্থাৎ কেউ যদি সূর্যের প্রশংসা করে, তাহলে বলা হবে, সে নিজের প্রশংসা করছে– সূর্যের পরিচয়ের প্রয়োজন নেই। অতএব কোন বড় ব্যক্তির পরিচয় বা প্রশংসা যদি কোন ছোট ব্যক্তি করে, তাহলে বুঝতে হবে আসলে সে নিজের পরিচয় তুলে ধরছে এবং প্রশংসা করছে। বড় তো নিজেই পরিচিত ও প্রশংসিত। কিন্তু বড় যদি ছোটর প্রশংসা করে, তাহলে তা বাস্তবে বড় সাক্ষ্য। উদাহরণস্বরূপ হযরত জিবরাঈল আ.-এর পরিচয় যদি আমি তুলে ধরি, তাহলে বলা হবে, আমি আমার পরিচয় ও ইজ্জত তালাশ করছি, একজন বড় ব্যক্তিত্বের নাম নিচ্ছি, তাহলে বড় মানুষের নাম উচ্চারণ করছি।

হযরত জিবরাঈল আ.-এর প্রশংসা ওই সত্তা করেছেন, যিনি তার সৃষ্টিকর্তা, যিনি তার মাবুদ। তিনি নিজেই বলছেন, জিবরাইল রাসূল, কারীম, শক্তিশালী, আমানতদার, আল্লাহর নৈকট্যশীল এবং পদমর্যাদাবান। অর্থাৎ ফেরেশতাকূলের সর্দার। আমি তাকে দূত ও পয়গম্বর বানিয়ে পাঠিয়েছি। সুতরাং প্রেরণকারী হলেন হক তায়ালা, যার ইলমের কোন সীমা-পরিসীমা নেই। আর যাকে পাঠানো হয়েছে, তিনি আমানতদার এবং যার নিকট পাঠানো হয়েছে তিনি হলেন নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, যাকে নবুওয়াতের মর্যাদা দান করা হয়েছে যে মানবজগতে তার চেয়ে কামেল পুরুষ নেই।

সনদের মর্যাদা

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধু নবী নন বরং খাতামুল আম্বিয়া তথা সর্বশেষ নবী। খাতাম শব্দের অর্থ হল যিনি নবুওয়াতের মর্তবাকে সমাপ্ত করেছেন, ইতি টেনেছেন অর্থাৎ নবুওয়াতের সকল স্তর তার উপর খতম হয়েছে। নবুওয়াতের এমন কোন দরজা অবশিষ্ট রয়নি যে, তার জন্য আরো ব্যক্তিত্বের প্রয়োজন হবে যে, তিনি ওই মর্যাদা নিয়ে আগমন করবেন। অতএব খাতামুল আম্বিয়া দ্বারা উদ্দেশ্য হল নবুওয়াতের কামালতের পরিপূর্ণতার যত স্তর হতে পারে, সকল কিছু তার মধ্যে রয়েছে এবং তার পবিত্র জাতে এসে খতম ও নিঃশেষ হয়েছে।

নবুওয়াতের বুনিয়াদ দুটি বস্তুর উপর। একটি ইলমি কামালাত বা পরিপূর্ণ জ্ঞান, অপরটি আখলাকি কামালাত বা সর্বোচ্চ আখলাক, যার দ্বারা আমলের সিলসিলা চালু থাকে। ইলম সম্পর্কে বলা হয়েছে,

أُوتِيتَ عِلْمَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ.

পূর্ববর্তী ও পরবর্তীর সমস্ত ইলম আপনাকে দেওয়া হয়েছে।

আর আখলাক সম্পর্কে বলা হয়েছে–

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ

আপনি অবশ্যই মহান চরিত্রের অধিকারী। *[সূরা কলাম ৬৮:৪]*

সুতরাং তাঁর চরিত্রও মহান এবং তাঁর ইলম এত ব্যাপক যে, পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সমস্ত ইলম তাঁকে দেওয়া হয়েছে।

এতে প্রতীয়মান হয় যে, যে বরকতময় সত্তা ইলমের দিক থেকে সকল মাখলুক হতে পরিপূর্ণ, চরিত্র ও আখলাকের হিসাবে সর্বোন্নত, তাহলে তার নবুওয়াতও সকল নবীদের থেকে সবচেয়ে মুকাম্মাল হবে। এ জন্যই তিনি স্রেফ নবী নন বরং খাতামুল আম্বিয়া অর্থাৎ তাঁর বরকতপূর্ণ জাতের উপর নবুওয়াতের স্তরকে সমাপ্ত করা হয়েছে। অতএব এমন জাত ও সত্তার উপর কুরআন নাযিল হয়েছে, যিনি মানবীয় গুণাবলিতে সবচেয়ে উত্তম গুণের অধিকারী। আর যে সত্তা কুরআন নিয়ে এসেছেন, তার প্রশংসা স্বয়ং আল্লাহ পাক করেছেন যে, একজন রাবীর যতগুলো গুণ হতে পারে, তার সবকটি পূর্ণরূপে তাঁর মধ্যে বিদ্যমান। আর কুরআনুল কারীমকে যে সত্তা পাঠিয়েছেন তিনি হলেন স্বয়ং আল্লাহ, যিনি সকল কালামের উৎপত্তিস্থল। অতএব উপর থেকে শুরু করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত কুরআনুল কারীমের সনদ এত মুকাম্মাল ও পরিপূর্ণ যে, তাতে ত্রুটি বা সন্দেহের কোনোই অবকাশ নেই।

মুতাওয়াতির তবকার মাধ্যমে চলমান

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবাদের কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন। তাঁরা দলে-দলে কুরআন হিফজ করেছেন। একজন দুজন করে নয় বরং জামাত-জামাত ও দল-দলগতভাবে কুরআন হিফজ করেছেন। তারা পরবর্তী তবকাকে হাফেজ বানিয়েছেন। এভাবে জামাতবদ্ধভাবে হাফেজ হয়েছেন। এমনকি বর্তমান সময় পর্যন্ত চালু আছে। প্রতি যুগে একজন একজন দুজন-দুজন, বিশজন-বিশজন, চল্লিশজন-চল্লিশজন নয়; পঞ্চাশজন-পঞ্চাশজন, শতশত নয় বরং হাজার-হাজার হাফেজে কুরআন বিদ্যমান রয়েছে। তারা উপরের যুগের লোকদের থেকে গ্রহণ করতেন আর নিচের যুগের মানুষদের দিতেন।

অতএব যে আল্লাহর কালাম এমন হেফাজতের সাথে এসেছে এবং কেয়ামত পর্যন্ত চলবে, তাতে কোন প্রকার ত্রুটি ও দোষ অথবা পরিবর্তনের সুযোগ নেই। যদি কোন পরিবর্তনকারী পরিবর্তন করে, তাহলে যেহেতু হেফাজত সামগ্রী অগণিত সেহেতু ধরা পড়ে যাবে। সুতরাং অনেক রদবদলকারীর সৃষ্টি হয়েছে, যারা কুরআনকে অর্থগতভাবে পরিবর্তন করতে চেয়েছে; কিন্তু দুধ থেকে দুধ এবং পানি থেকে পানি পৃথক করে দেওয়া হয়েছে।

বিশ্বব্যাপী সার্বক্ষণিক হেফাজত

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদীস শরীফে ইরশাদ করেছেন, প্রত্যেক শতাব্দিতে মুজাদ্দিদের ওয়াদা করা হয়েছে–

إِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا

নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা এই উম্মতের জন্য প্রত্যেক শতাব্দিতে এমন মানুষ পাঠাবেন, যারা উম্মতের দীনকে সংস্কার করবেন।

প্রত্যেক শতাব্দিতে মুজাদ্দিদ বা সংস্কারক পাঠাবেন। মুজাদ্দিদ একজন হওয়া জরুরি নয়। এক যুগে একাধিক মুজাদ্দিদ হতে পারেন। একটা জামাতও মুজাদ্দিদ হতে পারেন। দীনের নানা বিষয়ে মানুষ যখন পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও মিশ্রণ ঘটায় এবং অসম্পূর্ণ করে ফেলে। তারা এসে সেগুলোকে খুলে দেন, পরিষ্কার করেন তথা সংস্কার করেন। অতএব প্রত্যেক শতাব্দিতে মুজাদ্দিদ আসার ওয়াদা করা হয়েছে। স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

كَيْفَ تَهْلِكُ أُمَّةٌ أَنَا أَوَّلُهَا، وَالْمَسِيحُ آخِرُهَا، وَالْمَهْدِيُّ وَسَطُهَا.

ওই উম্মত কিভাবে ধ্বংস হবে, যাদের শুরু অংশে আমি রয়েছি, শেষে রয়েছেন ঈসা আর মধ্যস্থলে আছেন মাহদী।

এই হাদীস শরীফে শুরু ও শেষের হেফাজতের কথা বলা হয়েছে, প্রত্যেক শতাব্দির হেফাজতের কথা বলা হয়েছে।

তারপর প্রত্যেক শতাব্দির ভিতর অংশের হেফাজতের ওয়াদা দেওয়া হয়েছে–

يَحْمِلُ هٰذَا الْعِلْمَ مِنْ كُلِّ خَلَفٍ عُدُوْلُهُ يَنْفُوْنَ عَنْهُ تَحْرِيْفَ الْغَالِيْنَ، وَانْتِحَالَ الْمُبْطِلِيْنَ، وَتَأْوِيْلَ الْجَاهِلِيْنَ.

প্রত্যেক অগ্রগামীর পর অনুগামী সৃষ্টি হতে থাকবে, যারা হবেন এ ইলমের ধারক-বাহক। এঁরা এঁদের এই জ্ঞান দ্বারা বিভ্রান্তি ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের মনগড়া মিথ্যার পর্দা উন্মোচন করতেই থাকবেন। ইলমের ফায়েজের মাধ্যমে বাতিলের অসারতা প্রমাণ করতেই থাকবেন এবং জাহেলদের বিভ্রান্তিকর ঠুনকো তাবিলের পর্দা উন্মুক্ত করতেই থাকবেন।

ইলম তার উজ্জ্বল দ্যুতি নিয়ে সামনে আসতেই থাকবে এবং হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য হতেই থাকবে।

মোটকথা, এই উম্মত সম্পর্কে ওয়াদা দেওয়া হয়েছে যে, কেয়ামত পর্যন্ত প্রত্যেক যুগে একটি হকপন্থী জামাত অবশ্যই থাকবে, যারা হুবহু কুরআনের শব্দ ও বয়ান এবং তার ব্যাখ্যা ও তাফসীর শিখাতে থাকবে। এভাবে পূর্বসূরী হতে উত্তরসূরীগণ দীন শিক্ষা লাভ করবে।

যেখানে একথা বলা হয়েছে যে, এই উম্মতের মধ্যে বিভিন্ন ফেরকা জন্মাবে, মতানৈক্য ও ইখতেলাফ প্রকাশ পাবে, ওখানে একথার ওয়াদা করা হয়েছে যে, কেয়ামত পর্যন্ত একটি জামাত অবশ্যই হকের উপর থাকবে। মানুষ নিজের রুচি, জ্ঞান, মেধা ও দলিল-প্রমাণ দ্বারা বুঝতে পারবে, এই দল বা জামাতটি হকপন্থী। তাদের কর্ম, তাদের আলামত বলে দেবে, এরা হকপন্থী মানুষ। মানুষ দ্বীনি কথা ও কাজ তাদের প্রতি রুজু করবে। মোটকথা, একটা জামাত সর্বদা অবশিষ্ট থাকবে, যারা সঠিক ও শুদ্ধ মেজাজের উপর দীনকে চালু রাখবে এবং সঠিক রুচির সাথে দীনকে কায়েম রাখবে।

لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ وَلَا مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَهُمْ أَمْرُ اللَّهِ

কেয়ামত পর্যন্ত তাদেরকে অপমানকারীরা অপমান করতে পারবে না এবং অপদস্থকারীরা অপদস্থ করতে পারবে না।

তারা হবে–

مَا أَنَا عَلَيْهِ الْيَوْمَ وَأَصْحَابِي

আজকের দিনে আমি (রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এবং আমার সাহাবীগণ যার উপর রয়েছি। সেই মোতাবেক শব্দ, অর্থ এবং হাকায়েক ও কাইফিয়্যাতকে দুনিয়ার সামনে পেশ করবে। সুতরাং যেখানে ইখতিলাফের কথা বলা হয়েছে, সেখানে সাথে-সাথে হকপন্থী জামাতের কথাও বলা হয়েছে। এতে প্রমাণিত হয়, এই দীন খাতামুন নাবিয়্যীনের দীন, যা কেয়ামত পর্যন্ত থাকবে। কারণ, নবুওয়াতের স্তর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বরকতময় জাতে খতম করে দেওয়া হয়েছে। এখন আর কোন স্তর অবশিষ্ট নেই যে, অন্য কোন ব্যক্তিত্বকে পাঠিয়ে তা পূরণ করতে হবে।

অতএব কুরআনুল কারীমের খোদায়ী হেফাজতের ধারাবাহিকতায় মুজাব্বিদদের ওয়াদা ভিন্ন, আইম্মায়ে হেদায়াতের ওয়াদা ভিন্ন, খোলাফাদের ওয়াদা ভিন্ন, ইনসাফগার উত্তরসূরীর ওয়াদা ভিন্ন, সালেহীনদের ওয়াদা ভিন্ন। এগুলো একের

পর এক পাঠাতে থাকবেন, ফলে দীনের হক্কানিয়াত ও সত্যতা বহাল থাকবে। তাই إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ إِنَّا لَهُ لَحٰفِظُوْنَ উক্ত আয়াত সম্পর্কে আমি বলেছি, যেখানে কুরআনের শব্দাবলিকে হেফাজত করা হয়েছে, তার লিখনপদ্ধতিকে হেফাজত করা হয়েছে, তার ইলম ও অর্থকে সংরক্ষণ করা হয়েছে, ওখানে তার বিধিবিধানকেও হেফাজত করা হয়েছে। তাই শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত, জাহির হতে বাতিন পর্যন্ত কুরআনের প্রতিটি বিষয় সংরক্ষিত। এভাবে কেয়ামত পর্যন্ত মাহফুজ থাকবে।

এ বিষয়টি এখানে পেশ করার কারণ হল, এই যে দারুল কুরআন প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, এটিও একটি খেলাফতে খোদাওন্দী। এটি শব্দাবলি, উচ্চারণ ও বাচনভঙ্গির খেলাফত, যা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগ থেকে চলে আসছে। কারী ও মুজাব্বিদগণ ওই উচ্চারণ ও বাচনভঙ্গিকে হেফাজত করার চেষ্টা করে চলছেন। মূল প্রকরণ ও বৈশিষ্ট্য একই থাকে, যদিও ব্যক্তিসত্তার কারণে কিছুটা পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় কিন্তু লয় সেটাই বলবৎ থাকে যা পূর্ব হতে চলে আসছে।

কুরআনকে সুমিষ্ট আওয়াজে পাঠ করা

এই কারণে কুরআনুল কারীম সম্পর্কে বলা হয়েছে–

مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْاٰنِ فَلَيْسَ مِنَّا

যে ব্যক্তি কুরআনুল কারীমকে সুমিষ্ট আওয়াজে পড়ে না, সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। *[ইবনে মাজাহ]*

এখানে تغنى অর্থ সঙ্গীত নয়। গান-বাজনার ভঙ্গিতে পড়ার ব্যাপারে কড়া ধমকি দেওয়া হয়েছে। অতএব কুরআনের সুর ভিন্ন এবং গান-বাজনার সুর ভিন্ন। কুরআনের ব্যাপারে যে تغنى শব্দ এসেছে, তার ব্যাখ্যা করা হয়েছে এভাবে যে, এমন দরদমিশ্রিত উচ্চারণে পাঠ কর যে, কুরআনের কাইফিয়াত এক অন্তর হতে অন্য অন্তরে পৌছে যায়। এমন বিশেষ দরদ এবং বিশেষ উচ্চারণ ও বাচনভঙ্গিকে কারী ও মুজাব্বিদগণ গ্রহণ করে থাকেন। সুতরাং যখন কুরআন তেলাওয়াত করা হয়, তখন ঘটনা এমন হয় যে, পৃথিবীতে হাজার-হাজার মিউজিক ও সঙ্গীত রয়েছে, প্রত্যেক দেশের সঙ্গীত ভিন্ন-ভিন্ন। কিন্তু কুরআনের সুর এমন, যা কোন সঙ্গীত ব্যক্ত করতে পারে না। আর কোন সঙ্গীতের মধ্যে

এমন প্রভাব নেই, যা কুরআনের মধ্যে রয়েছে। সত্যিকার অর্থে কোন তেলাওয়াতকারী তেলাওয়াত করলে মন আকর্ষণ করে। তাই তো বলা হয়েছে–

مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ فَلَيْسَ مِنَّا

কোথাও বলা হয়েছে–

زَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ، فَإِنَّ الصَّوْتَ الْحَسَنَ يَزِيدُ الْقُرْآنَ حُسْنًا

কুরআনুল কারীমকে সুন্দর আওয়াজে পাঠ কর, তা দ্বারা কুরআনের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়। সুতরাং সুন্দর আওয়াজ সম্পর্কে পূর্ববর্তীদের অনুসরণ করতে হবে যে, কেমন ধরনের সুন্দর আওয়াজ সাহাবাদের থেকে চলে আসছে, তাবেঈদের থেকে চলে আসছে এবং ধারাবাহিকভাবে আমাদের নিকট পৌছেছে। তাদের তরিকায় تغنى করা এবং সুন্দর ও সুমিষ্ট আওয়াজ ইখতিয়ার করা। অতএব কুরআনের আওয়াজ, উচ্চারণ ও বাচনভঙ্গি পর্যন্ত মাহফুজ করা হয়েছে।

মোবারকবাদ ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন

ওই সকল কারী ও মুজাব্বিদগণ মোবারকবাদ পাওয়ার উপযুক্ত, যারা আল্লাহর খেলাফতকে আঞ্জাম দিচ্ছেন। খেলাফতে খোদাওন্দি বিভিন্ন ধরনের রয়েছে। খেলাফতে ইলমি, খেলাফতে আমলি, খেলাফতে আখলাকী। আর কারীদের খেলাফত হলো খেলাফতে সাউতি বা আওয়াজের খেলাফত। কুরআনের উচ্চারণভঙ্গির ব্যাপারের দুনিয়াতে আল্লাহ তায়ালার খলিফা রয়েছেন, যারা তার কালামকে তার ভঙ্গিতে পাঠ করতে চেষ্টা করে। এ জন্য তারাও মোবারকবাদ পাওয়ার হকদার। আর দারুল কুরআনও মোবারকবাদ পাওয়ার উপযুক্ত। যে প্রতিষ্ঠান কারী ও মুজাব্বিদ তৈরি করার রাস্তা সৃষ্টি করেছে এবং এই মর্যাদাপূর্ণ ফলকে প্রচার প্রসারের ইচ্ছা করেছে, তার বরকতসমূহ হতে এটিও একটি বরকত যে, আপনারা এখানে একত্রিত হয়েছেন কুরআন শ্রবণ করার জন্য, এখানে কারী ও মুজাব্বিদদের মাহফিল কায়েম হয়েছে। আল্লাহর কালাম পড়া হচ্ছে। অতএব বাস্তবে এই মাহফিল কালামুল্লাহর মাহফিল। যেমনভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বদর যুদ্ধে যখন কাফেরদের উপর ছোট পাথর নিক্ষেপ করেন, তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে বলা হয়েছে–

وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللهَ رَمٰى

হে নবী! যখন আপনি কংকর নিক্ষেপ করছিলেন তা আপনি নিক্ষেপ করছিলেন না।

অর্থাৎ অঙ্গ আপনার ছিল; কিন্তু কামালাত আমার প্রকাশ পাচ্ছিল। প্রকাশ্য নজরে আপনি ছিলেন আর বাহ্যিকভাবে ছিলাম আমি। অতএব যবান আমাদের আর কালাম আল্লাহর। ইনসান শুধু তার প্রকাশকারী। এই কারণে এই প্রতিষ্ঠানও মোবারকবাদ পাওয়ার যোগ্য, যে প্রতিষ্ঠান আজ কারী ও মুজাব্বিদদের একত্র করেছে এবং ভবিষ্যতে সৃষ্টিও করবে। আল্লাহ তায়ালা কামিয়াব করুন, যাতে এই প্রতিষ্ঠান হতে অনেক ক্বারী তৈরি হতে পারে এবং কুরআন ও তার তাজবিদের প্রচার-প্রসার হয়। আর মানুষের অন্তরে স্থান করে নেয়। তারপর লোকেরা তার প্রতি মনোযোগী হয় এবং তার ইলম ও আমলের প্রতি মনোনিবেশ করে।

اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ اَللّٰهُمَّ اَعِذْنَا مِنَ الْفِتَنِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ اَللّٰهُمَّ اجْعَلِ الْقُرْاٰنَ اِمَامًا لَّنَا وَاجْعَلْهُ حُجَّةً لَّنَا وَارْزُقْنَا عَمَلَهٗ بِفَضْلِكَ الْعَظِيْمِ يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ اَللّٰهُمَّ تَوَفَّنَا مُسْلِمِيْنَ وَ اَلْحِقْنَا بِالصَّالِحِيْنَ غَيْرَ خَزَايَا وَلَا مَفْتُوْنِيْنَ وَصَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهٖ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ اَجْمَعِيْنَ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

(২৪ রবিউল আউয়াল ১৪০৯ হিজরী)

বয়ান : ৩

হেদায়াতের নক্ষত্র

সাহাবায়ে কেরামগণ রা. হলেন হাকিকতে নবুওয়াতের পরিপূর্ণ প্রতিচ্ছবি, যাঁদের দ্বারা নবুওয়াত ও কামালাতে নবুওয়াতের পরিচয় মেলে। এ জন্যই কোন জামাতকে যদি জামাত হিসেবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নিকট পছন্দনীয় হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়, তাহলে তাঁরা হবেন সাহাবাদের জামাত, যার সাক্ষ্য কুরআন ও হাদীস দিয়েছে।

– হযরত হাকীমুল ইসলাম রহ.





হেদায়াতের নক্ষত্র

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَ نَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ، وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ، وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُهٗ، اَرْسَلَهُ اللّٰهُ اِلٰى كَآفَّةٍ لِلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّ نَذِيْرًا وَدَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا۔

اَمَّا بَعْدُ: فَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَصْحَابِيْ كَالنُّجُوْمِ بِاَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمُ اهْتَدَيْتُمْ اَوْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, 'আমার সাহাবীগণ নক্ষত্রতুল্য, তাদের মধ্য হতে যাকেই অনুসরণ করবে, তোমরা হেদায়াত পেয়ে যাবে।'

সাহাবাদের মাকাম

নবুওয়াত নামক সূর্যের তাসির ও তারবিয়াত এবং তালিম ও তামরিন (চর্চা) থেকে উম্মত ফায়দা লাভ করে এবং আলোকিত হওয়ার দ্বারা উপকারী স্তর উন্মুক্ত হয়। যার দৃষ্টান্ত হলো সূর্যের নিকটবর্তী ও দূরবর্তী হওয়ার অনুরূপ। অর্থাৎ যে তার যত নিকটবর্তী হবে সে তত নূরানী ও প্রভাবিত হবে। আর যত দূরে হবে তা হতে তত কম ফয়েয লাভ করবে।

উদাহরণস্বরূপ, সূর্য উদিত হওয়ার পর যে জিনিসটি সবচেয়ে বেশি এবং সর্বপ্রথম সূর্যের প্রভাব দ্বারা প্রভাবিত হয়, তাহলো মহাশূন্য। মহাশূন্য যেহেতু সৃষ্টিগতভাবে সুউচ্চ ও পরিষ্কার, আবার সূর্যের সামনে কোন প্রকার পর্দার

আড়াল ব্যতীত উপস্থিত, এ কারণে সর্বপ্রথম ও সবচেয়ে অধিক আলো ও গরম তাপের প্রভাব গ্রহণ করে। মহাশূন্য এমন পর্যায়ের আলোকিত হয় যে, তার নিজস্ব চমক ও উজ্জ্বলতা থাকা সত্ত্বেও তার চমক নজরে আসে না বরং সূর্যের আলো এবং তার কিরণ নজরে আসে। মহাশূন্যের যে অংশটুকু নজরে আসে, তাতে শুধু সূর্যের আলোই দেখা যায়। স্বয়ং মহাশূন্যের আসল অস্তিত্ব নজরে পড়ে না, দেখা যায় না।

কেমন যেন মহাশূন্য সূর্যের আলোতে এতটুকু ডুবে যায় এবং বিলীন হয়ে যায় যে, তার নিজস্ব আলো কারো নজরে আসে না বরং সূর্য এমনভাবে দেখা যায় যেমন কোন মাধ্যম ও আড়াল ছাড়া দেখা যায়। অথচ মহাশূন্যের সীমাহীন প্রশস্ততার দরুন মধ্যস্থলে আড়াল রয়েছে।

ঠিক একই অবস্থা হয় রূহানী সূর্য হতে ফায়দা হাসিল করার। অর্থাৎ তার বিশ্বব্যাপী আসর দ্বারা তো সকলেই প্রভাবিত হয়। কিন্তু সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত হন ওই জামাত, যারা মাধ্যম ছাড়া সরাসরি নিকটবর্তী হয়ে আলো গ্রহণ করেছেন। আর সেই তবকা হল সাহাবায়ে কেরাম রা.-দের তবকা, যারা শূন্যের ন্যায় জমিন থেকে উপরে এবং নবুওয়াতের আসমান হতে নিকটে। তারা শূন্যের ন্যায় সৃষ্টিগতভাবে পরিষ্কার-স্বচ্ছ, যা শুধু তার নিজেকে দেখানোর জন্য নয় বরং স্বয়ং সূর্যকে দেখানোর পরিপূর্ণ যোগ্যতা রাখে। যেমনটি হাদীসসমূহে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন– সকল নবীর সাহাবাদের মধ্য হতে আমার সাহাবাদের নির্বাচন করা হয়েছে।

অথবা যেমনটি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেছেন যে, সাহাবাদের অন্তর পরিষ্কার ও স্বচ্ছ ছিল, তাঁদের ইলম গভীর ছিল, তাদের লৌকিকতা ছিল না। ইকামাতে দীনের জন্য সারা উম্মত হতে তাদেরকে নির্বাচন করা হয়েছিল, তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ ওয়াজিব করা হয়েছে ইত্যাদি। যা দ্বারা হযরত সাহাবায়ে কেরামের পূর্ণ গ্রহণযোগ্যতা জাহির হয়, যা নূরে নবুওয়াতকে আকর্ষণ করার কারণে তাদের অর্জিত হয়েছিল। সুতরাং জন্মগত স্বচ্ছতা এবং পরিপূর্ণ নৈকট্যের নজরে তারা শূন্যের ন্যায় যা পরিষ্কার ও স্বচ্ছ এবং সমগ্র দুনিয়া হতে সূর্যের অতি নিকটে অবস্থিত যে, কোন মাধ্যম ছাড়া সরাসরি সূর্য হতে আলো গ্রহণ করছে। আর সাহাবায়ে কেরাম স্বচ্ছ বক্ষদেশ সিনা দ্বারা এমন পর্যায়ের নবুওয়াতের সূর্য হতে নূর ও আসর গ্রহণ করেছেন যে, তাঁরা শূন্যের ন্যায় আপাদমস্তক নূরানী বনে গেছেন। যেমন মহাশূন্য সূর্যের নিকটবর্তী ও কাছাকাছি হয়ে এমন পর্যায়ের আলোকিত হয়েছে যে, সে নিজেই নজরে আসে না।

অর্থাৎ সে নিজেকে দেখাতে পারে না, বরং স্রেফ সূর্য ও তার কিরণের দ্যুতি প্রদর্শন করে। তেমনিভাবে সাহাবায়ে কেরাম নিজেদের জন্মগত যোগ্যতার ভিত্তিতে এমন পর্যায়ের পবিত্র অন্তর, গভীর ইলম, অলৌকিকতা এবং হিংসা ও কপটতাহীন হয়ে গিয়েছিল যে, যদি তাঁদের মধ্যে ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য না হত, তাহলে তাঁরা নবীর সুন্নাতের প্রতিকৃতিতে পরিণত হতেন।

সুনানে সাহাবা রা.

এ জন্যই রাসূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদের আকিদা ও আমলকে নিজের আকিদা ও আমলের সাথে সমাপ্ত করে মোহর মেরে তাদেরকে সত্যের মাপকাঠি সাব্যস্ত করে ঘোষণা করলেন, সুনানে নবুওয়াত ও সুনানে সাহাবা একই জিনিস। এতে প্রমাণিত হয়, সাহাবাদের দ্বীনি বৈশিষ্ট্য নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বৈশিষ্ট্যের অনুরূপ ছিল। সুতরাং যখন উম্মতের উত্তম ফেরকা বা জামাত সম্পর্কে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)কে প্রশ্ন করা হয়েছিল– উত্তম ফেরকাসমূহের মধ্য হতে মুক্তিপ্রাপ্ত ফেরকা কোন্‌টি? তখন ইরশাদ হয়েছিল–

مَا اَنَا عَلَيْهِ الْيَوْمَ وَاَصْحَابِيْ

আজকের দিনে আমি এবং আমার সাহাবীরা যার উপর রয়েছি।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের আকিদা ও আমলের সঙ্গে সাহাবাদের আকিদা ও আমলকে এমনভাবে মিলিয়ে বললেন যে, সাহাবাদের আকিদা ও আমল এবং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আকিদ ও আমলের প্রকার ও ধরন একই সাব্যস্ত হল। আর নিজের বরকতপূর্ণ সত্তা ও সাহাবাদেরকে হক ও বাতিলের মানদণ্ড নির্ধারণ করলেন।

সাহাবাদের গালমন্দ করার পরিণতি

যেমনভাবে শূন্যে কোন ময়লা বা দুর্গন্ধযুক্ত বস্ত পৌঁছে না। আর যদি নিক্ষেপ করা হয়ও, তাহলে তা ফিরে এসে নিক্ষেপকারীর উপর পতিত হয়। আর শূন্য তার কারণে দুর্গন্ধযুক্ত হয় না, তেমনিভাবে সাহাবাদের জামাত রূহানী মহাশূন্যের ন্যায়। তাঁরা উম্মতের সমালোচনার উর্ধ্বে। যদি তাদের শানে কোন দল বা গোষ্ঠী গালমন্দ বা বেয়াদবি করে কিংবা দুঃসাহস দেখায় বা তাদের উপর

নিজেদের ঘৃণ্য সমালোচনার তীর ছুড়ে মারে, তাহলে তাদের এ নাপাকি নিজেদের দিকেই ফিরে আসবে।

সাহাবাদের স্বচ্ছ ও পরিষ্কার মহাশূন্যে এর কোন প্রভাব পড়বে না। অতএব সাহাবা রা.গণ হলেন নিকটবর্তী মহাশূন্যের মত যে, তার স্বচ্ছতার মধ্যেও সূর্যের সম্পর্ক রয়েছে। সাহাবাগণ হলেন নবুওয়াত নামক সূর্যের নিকটবর্তী মানুষ, কোন প্রকার পর্দা ও অন্তরাল ছাড়া সংযুক্ত রয়েছেন। তাঁরা জমিনের দুর্গন্ধ হতে পবিত্র ও উর্ধ্বে এবং তাঁরা নবুওয়াতের সূর্যের আলোতে বিলীনও। তাঁরা শুধু নূরের প্রদর্শনস্থল হিসেবে রয়ে গেছেন। ফলে নিজেদের বৈশিষ্ট্য শুধু প্রতিক্রিয়া এবং হক গ্রহণের জন্য রয়ে গেছে।

সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী জীবন

সাহাবায়ে কেরাম ছিলেন উন্নত জীবনের নমুনা এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যিন্দেগীর সাথে অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাঁরা নবুওয়াতের যিন্দেগীর সঙ্গে মিশে থেকে তার কিরণ হতে নূর গ্রহণ করছেন। এজন্যই তাঁদের জীবন শুধু ইচ্ছামূলক জীবন ছিল না। আবার এমনও ছিল না যে, শুধু পুরস্কারের আড়ালে আমল করা ব্যতীত উত্তম অংশগুলো তাঁরা নিয়ে নিবে আর যারা আত্মার আরাম তালাশ করে, তাদেরকে বিদায় দিয়ে বা ভাল হোক বলে আমলি মোজাহাদা ও কষ্টের জীবন বানিয়ে নিবে। বরং তাঁদের জীবন সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী, যার মধ্যে ছিল পূর্ণ মধ্যমপন্থা যে, একদিকে রিপু দমনের সাধনা, পাশাপাশি শরীয়তের আদব এবং সুন্নানে নববীর সর্বোচ্চ ইত্তেবা। আবার স্বভাবগত জযবাও রয়েছে। অপরদিকে আকলি চাহিদা এবং সম্পদের লোভও প্রবল।

এমন পূর্ণ মধ্যমপন্থী সমষ্টিগত জীবন সাহাবায়ে কেরাম ব্যতীত জামাতবদ্ধভাবে এই উম্মতের কারো ভাগ্যে জোটেনি। একমাত্র সাহাবা জামাতের দ্বারাই তা সম্ভব হয়েছিল। একজন দুজনকে এমন মধ্যম পন্থার জীবন যাপন করতে দেখা যায়, যার মধ্যে সাহাবী হওয়ার মর্যাদা ছাড়া সব পাওয়া যায়। কিন্তু জামাতের সবাই একই রঙে রঙিন হওয়া এবং সর্বদা ইখলাস ও মারেফতের চূড়ান্ত মাকামে উপনীত হওয়া সাহাবা জামাত ছাড়া অন্য কেউ হতে পারেনি। যারা ঘরবাড়ি পরিত্যাগ করে জৈবিক চাহিদা হতে মুখ ফিরিয়ে স্রেফ রেজায়ে হককে নিজেদের জীবন বানিয়েছিলেন, তাঁরা আপন পছন্দকে শরয়ী পছন্দের উপর কুরবান করে দিয়েছিলেন। তারা তবিয়ত বা অভ্যাসের ওয়াতন (জন্মভূমি)কে পরিত্যাগ করে

শরীয়তের ওয়াতনকে যথেষ্ট করে নিয়েছিলেন এবং শরয়ী উদ্দেশ্যসমূহের খাতিরে নফসের বাহানা ও আরামকে পরিহার করে দৃঢ় সংকল্পের সঙ্গে সর্বদা আল্লাহ তায়ালার রেজামন্দী ও সুনানে নববীর অনুসরণে ডুবে গিয়েছিলেন এবং তাকেই নিজেদের জীবন হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন।

এই সমষ্টিগত এবং ভিন্ন রকম জিন্দেগীর সবচেয়ে বেশি লক্ষণীয় এবং আশ্চর্যজনক দিক হল, তাঁরা সম্পূর্ণরূপে দুনিয়াত্যাগী ছিলেন; কিন্তু বৈরাগ্য গ্রহণ করেননি। দুনিয়া ও দুনিয়ার জৌলুস, পদমর্যাদা, ধন-দৌলত, হুকুমাত ও সিয়াসাত, রাজত্ব ও রাজনীতি, ঘরবাড়ি, জমাজমি ও আসবাবপত্রের ভিড় লেগে থাকত। তার পরও তারা হক আদায়ের ব্যাপারে পরিষ্কার ও পবিত্র থাকতেন।

নারী, সোনা, জমিন ইত্যাদি তাঁরা ব্যবহার করতেন, আদান-প্রদান করতেন; কিন্তু আন্তরিকভাবে এসব থেকে সম্পর্কহীন এবং দূরত্ব বজায় রাখতেন। কামেল দরবেশও ছিলেন আবার শাহী আলখেল্লাও গায়ে শোভা পেত। শাসনকর্তাও ছিলেন আবার ফকিরের বেশভুষাও ধারণ করতেন। রাজ্য জয় করে চলছেন আবার ফকিরের চালচলনও যথারীতি কায়েম রয়েছে।

কামেল তথা পূর্ণ মনুষত্বের অধিকারীদের জামাত

নবী রাসূলদের যিন্দেগী হল এমন যে, তারা মানুষও এবং ফেরেশতাও। তারা অভ্যাসকে পরিহার করেন না এবং আকল ও ফিরাসাত তথা বুদ্ধিমতা ও বিচক্ষণতার তাকাজা হতে এক ইঞ্চিও এদিক-ওদিক হন না। খালেস অভ্যাসগত জযবার অনুসরণ করা জানোয়ারের কাজ। আর তবিয়ত থেকে একেবারে দূরে থেকে শুধু আকলের পায়রবি করা ফেরেশতাদের কাজ। কিন্তু অভ্যাসকে বহাল রেখে তাকে আকলি অনুভূতি দ্বারা আকলের অধীনে আঞ্জাম দেওয়া এবং শরয়ী সীমাকে অতিক্রম না করা মানুষের কাজ। কিন্তু কামেল ইনসান বলে ওই পবিত্রতা ও পূর্ণতা দেখানো হয়েছে। এ জন্য যে জামাতের কর্ম, আকাঈদ, অবস্থা ও কথাবার্তাসহ সকল বিষয়ে এই পরিপূর্ণ মধ্যমপন্থা পছন্দ হয়, ওই জামাতকে পূর্ণ কামেল ইনসানের জামাত বলা হবে। সুতরাং জামাতবদ্ধ হিসেবে এমন জাতিগত কামাল নবীদের মধ্যে হয়ে থাকে।

মোটকথা, জামাত হিসেবে পূর্ণতা নবীদের পরে সাহাবাদের পর্যন্ত এসে খতম হয়ে গেছে। শুধু ব্যক্তিগত কামাল অবশিষ্ট রয়েছে। তবে তাঁদের মাকাম এতটুকু পর্যন্ত পৌঁছছে না, যতটুকু তাঁরা কৃতকার্য হয়েছিলেন।

নবুওয়াতের ছায়া

সাহাবায়ে কেরাম হাকিকতে নবুওয়াতের পরিপূর্ণ ছায়া বা প্রতিচ্ছবি ছিলেন, যে জামাত দ্বারা নবুওয়াত ও কামালাতে নবুওয়াতের পরিচয় জানা যেত। এ কারণে যদি কোন জামাত ও তবকাকে জামাতবদ্ধ হিসেবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পছন্দনীয় ও মর্জি মোতাবেক স্বীকৃতি দেওয়া হয়, তাহলে তা হবে শুধু সাহাবায়ে কেরামের জামাত, যার সাক্ষ্য কুরআন ও হাদীস দিয়েছে–

رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ

আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট আর তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। *[তাওবাহ ৯:১০০]*

সন্তুষ্টির সনদপত্র তাঁদের জন্য আসমানি কিতাবে কিয়ামত পর্যন্তের জন্য দিয়ে দিয়েছেন।

أُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ امْتَحَنَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ لِلتَّقْوٰى ؕ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّ اَجْرٌ عَظِيْمٌ ۝٣

আল্লাহ তায়ালা তাঁদের অন্তরকে তাকওয়ার জন্য খালেস ও শোধিত করেছেন। তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার। *[সূরা হুজুরাত ৪৯ : ৩]*

উক্ত আয়াত দ্বারা সাহাবায়ে কেরাম রা.দের অন্তরের পবিত্রতার সাক্ষ্য দেওয়া হয়েছে।

আবার কোথাও ইরশাদ হয়েছে–

أُولٰٓئِكَ هُمُ الرّٰشِدُوْنَ ۝ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَنِعْمَةً

তারাই সৎপথ অবলম্বনকারী। এটি আল্লাহর কৃপা ও নেয়ামত। *[সূরা হুজুরাত ৪৯ : ৭-৮]*

আবার কোথাও ইরশাদ হয়েছে–

رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ تَرٰىهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا

তারা পরস্পর সহানুভূতিশীল। আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় আপনি তাদের দেখবেন রুকু ও সিজাদারত অবস্থায়। *[সূরা ফাতাহ ৪৮ : ২৯]*

এ আয়াতে তাঁদের উন্নত চরিত্রের সাক্ষ্য প্রদান করা হল।

হাদীস শরীফে ঘোষণা হয়েছে–

اَصْحَابِيْ كَالنُّجُوْمِ بِاَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمُ اهْتَدَيْتُمْ

উক্ত হাদীসে প্রত্যেক সাহাবাকে পুরো উম্মতের জন্য অনুসরণীয় বানিয়ে দিলেন, যাদের অনুসরণ-অনুকরণে হেদায়াত পাওয়ার ব্যাপারে সামান্য পরিমাণও সন্দেহ নেই।

পরিপূর্ণ মিযান এবং পূর্ণ ওজনের পাল্লা

কয়েক বছর পূর্বের ঘটনা। দারুল উলুমের সঙ্গে সম্পর্ক রাখেন এমন কিছু মানুষের একটি চিঠি দফতরে আমার নামে এসে পৌঁছল, যাতে মওদুদী গবেষণা কেন্দ্র এবং নিজে মওদুদী মতবাদের হওয়ার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানতে চাওয়া হয়েছে। এমন সংশোধনপ্রিয় বৈশিষ্ট্য লক্ষ করে হযরত শায়েখ মাওলানা মাদানী রহ. ইসলাহের দৃষ্টিকোণ থেকে তাদের জন্য একটি অনুগ্রহনামা লিপিবদ্ধ করেন, যাতে মওদুদী চিন্তাধারার কিছু বুনিয়াদী দফা সম্পর্কে আলোচনা করে তাদের ইসলাহ করার চেষ্টা করেছেন। হযরত মাদানী রহ.-এর উক্ত ইরশাদনামাটি আকিদা ও চিন্তাধারার জন্য একটি পরিপূর্ণ মাপকাঠি এবং ভারসাম্যপূর্ণ পাল্লায় মর্যাদা রাখে, যাতে সাধারণত বর্তমান কালের সীমা অতিক্রমকারী চিন্তা ও চেতনাকে এবং বিশেষ করে মওদুদী চিন্তাধারার ধারণাপ্রসূত বিষয় ও আকিদাগত বিষয়সমূহকে পরিমাপ করে হক ও বাতিলের ফয়সালা অতি সহজে করা যেতে পারে।

কেননা, মাদানী রহ.-এর বিখ্যাত চিঠির বিষয়বস্তু মওদুদী সাহিত্যের বা চিন্তাধারার কোন শাখা-প্রশাখাগত বিষয় সম্পর্কে নয়, যাকে মওদুদী সাহেবের ব্যক্তিগত মতামত অথবা তার ইজতিহাদ ও কিয়াসের ফলাফল বলে জামায়াতে ইসলামীর উপর থেকে বোঝাকে হালকা করে ফেলবে। যেমনটি অনেক সময় তারা করে থাকে। বরং এটি একটি বুনিয়াদী ও উসুলি মাসয়ালা। আর এটি জামায়াতে ইসলামীর বুনিয়াদী উসূল, যা দল ও আমীর সকলের জন্য একই ধরনের মাপকাঠির মর্যাদা রাখে। সুতরাং যদি জামায়াতে ইসলামীগণ এই পুস্তককে যা 'দস্তুরে ইসলামী' নামে প্রচারিত, মেনে নেয় (তারা অবশ্যই মেনে নেয় যেহেতু জামায়াতের ভিত্তি এবং তার গঠন ওই দস্তুর দ্বারা হয়) তাহলে নিঃসন্দেহে দস্তুরের এই দফা–

رسول خدا کے سوا کسی انسان کو معیار حق نہ بنائے کسی کو تنقید سے بالاتر نہ سمجھے کسی کی ذہنی غلامی میں مبتلا نہ ہو

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যতীত কোন মানুষকে সত্যের মাপকাঠি বানাবে না। কাউকে সমালোচনার ঊর্ধ্বে মনে করবে না, কারো মানসিক গোলামিতে লিপ্ত হবে না।

সকল জামায়াতীদের জন্য একটি স্বীকৃত আকিদা এবং বুনিয়াদী উসুল হিসেবে প্রমাণিত হল। এ কারণে হযরতের সম্মানিত লিখনীতে ওই বুনিয়াদী আকিদা বিশ্লেষণ করে যে সমস্ত শরয়ী প্রতিবাদ করেছেন, সেগুলো নিঃসন্দেহে জামায়াতের প্রত্যেক কর্মী ও সদস্যদের জন্য দলিল। এ কারণে সমষ্টিগতভাবে জামায়াতের উপর অতি জরুরি হল, পক্ষপাতিত্বের ঊর্ধ্বে উঠে ঠাণ্ডা মাথায় ও অন্তরে চিন্তা করা। কেননা, আকিদার মুয়ামালা জাগতিক নয় বরং পরকালীন, যা অধিক মনোনিবেশযোগ্য।

উল্লেখিত ৬ষ্ঠ দফার উপর মাদানী রহ. কুরআন-সুন্নাহর আলোকে যা আলোকপাত করেছেন, চাচ্ছি সেগুলো সামনে আসার পূর্বে মীমাংসা করে দেব, যাতে উল্লিখিত চিঠিতে যে সমস্ত নিগূঢ় তত্ত্ব রয়েছে, তা বুঝতে সহজ হয়।

এই ৬ষ্ঠ দফাতে মওদুদী সাহেব রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ব্যতীত অন্য কাউকে মাপকাঠি বানাতে এবং সমালোনার ঊর্ধ্বে মনে করতে বারণ করেছেন। কিন্তু এই নিষেধাজ্ঞা তখনই সঠিক হত, যখন সরাসরি শরীয়ত কোন গাইরে রাসূলকে সত্য-মিথ্যার মাপকাঠি বানাত এবং সমালোচনার ঊর্ধ্বে না মনে করত। অতএব শরয়ীভাবে যদি কেউ মাপকাঠি নির্ধারণ হয় এবং সমালোচনার ঊর্ধ্বে মনে করা হয়, তাহলে সত্যের মাপকাঠি মনে করা এবং সমালোচনার ঊর্ধ্বে জ্ঞান করা কোন অন্যায়ের কাজ হতে পারে না।

কেউ যদি সমালোচনার ঊর্ধ্বে না হয়, তারপরও যদি কোন ব্যক্তি নিজে নিজে তাকে সত্যের মাপকাঠি এবং সমালোচনার ঊর্ধ্বে মনে করে, তাহলে অবশ্যই সে শরয়ীভাবে অপরাধী এবং গোনাহগার।

এজন্য আমাদের কথা হল, মওদুদী সাহেবের ওই চিন্তাধারার উপর যে, গাইরে রাসূল সত্যের মাপকাঠি হতে পারে না এবং সমালোচনার ঊর্ধ্বে হতে পারে না। যদি উক্ত ৬ষ্ঠ দফাকে তার সকল শব্দাবলিসহ অল্প সময়ের জন্য মেনে নেওয়া হয় যে, 'রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যতীত কেউ সত্যের মাপকাঠি নয়, কেউ সমালোচনার ঊর্ধ্বে নয় এবং কেউ মানসিক গোলামি করার অধিকারী

নয়', তাহলে প্রশ্ন দাঁড়ায়, স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি কাউকে সত্যের মাপকাঠি বানিয়ে দেন অথবা সত্যের মাপকাঠি হওয়ার সাক্ষ্য দেন অথবা হকের মিয়ার হওয়ার নিয়ম-কানুন বলে দেন যে এই দৃষ্টিকোণ থেকে তোমরা কাউকে সত্যের মাপকাঠি নির্ধারণ করতে পার, তাহলে তার পরও কি তারা সত্যের মাপকাঠি হতে পারবে না?

যদি হতে পারে, তাহলে আপনার উসূল ভুল ও মনগড়া যে 'রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাড়া অন্য কেউ সত্যের মাপকাঠি হতে পারবে না।' (নাউযুবিল্লাহ)! রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বলা সত্ত্বেও কেউ যদি সত্যের মাপকাঠি না হয়, তাহলে স্বয়ং রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)ও সত্যের মাপকাঠি হতে পারেন না। যেহেতু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কথা হকের বিপরীত প্রমাণিত হল। সুতরাং উভয় সুরতে জামায়াতের ৬ষ্ঠ দফা বাতিল ও মনগড়া হিসেবে প্রমাণিত হল।

এই সুরতে তো তার নেতিবাচক দিক বাতিল প্রমাণিত হয় যে, রাসূলে খোদা ব্যতীত কেউ সত্যের মাপকাঠি নেই। আর দ্বিতীয় সুরতে তার ইতিবাচক দিক বাতিল প্রমাণিত হয় যে, শুধু রাসূলে খোদা-ই সত্যের মাপকাঠি। অতএব জামায়াতে ইসলামীর জন্য উক্ত ভ্রান্ত ও মনগড়া দফা হতে মুক্তি পাওয়ার সহজ উপায় হল একথা মেনে নেওয়া যে, আমরা রাসূলে খোদা ব্যতীত অন্য কাউকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইরশাদ মোতাবেক সত্যের মাপকাঠি এবং সমালোচনার ঊর্ধ্বে মেনে নিব। কেননা, আল্লাহর রাসূল হলেন সত্তাগতভাবে সত্যের মাপকাঠি আর গাইরে রাসূল তথা সাহাবায়ে কেরাম হলেন ইরশাদে রাসূল দ্বারা সত্যের মাপকাঠি এবং সমালোচনার ঊর্ধ্বে।

সাহাবায়ে কেরাম রা. সত্যের মাপকাঠি হওয়া অকাট্য দলিল দ্বারা প্রমাণিত

আরো প্রশ্ন জাগে যে, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাউকে সত্যের মাপকাঠি বানিয়েছেন কিনা এবং কাউকে সমালোচনার ঊর্ধ্বে ও মানসিক গোলামি করার অধিকারী স্বীকৃতি দিয়েছেন কিনা? উক্ত প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত উত্তর হল, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাদের নাম নিয়ে সত্য-মিথ্যা ও হক-বাতিলের মাপকাঠি বলে স্বীকৃতি প্রদান করেছেন, তাদেরকে ঘায়েল ও সমালোচনা করতে নিষেধ করেছেন এবং যেহেনগুলোকে তাদের গোলামি করার জন্য প্রস্তুত করেছেন, তারা হলেন সাহাবায়ে কেরামের পবিত্র জামাত।

তাদেরকে সত্যের মাপকাঠি স্বীকৃতি প্রদান করার জন্য অত্যন্ত পরিষ্কার ও স্বচ্ছ এবং সন্দেহমুক্ত হিদায়েত জারি করেছেন। অর্থাৎ সাহাবাগণ সত্যের মাপকাঠি হওয়া কিয়াসী বা ধারণাগত অথবা ইস্তিম্বাতি নয় বরং মানসুসী বা প্রমাণসিদ্ধ, যার জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পৃথক একটি হাদীস ইরশাদ করেছেন–

إِنَّ أُمَّتِي سَتَفْتَرِقُ عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً، كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً قِيلَ وَمَا هِيَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ مَا أَنَا عَلَيْهِ الْيَوْمَ وَأَصْحَابِي

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রা. হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আমার উম্মত তেহাত্তর মিল্লাতে ভাগ হয়ে যাবে। তন্মধ্যে একটি জামাত ব্যতীত সকলকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। সাহাবাগণ প্রশ্ন করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! মুক্তিপ্রাপ্ত জামাত কোন্‌টি? তিনি বললেন, যারা আমার এবং আমার সাহাবাদের তরিকার উপর থাকবে। *[মিশকাত, সংক্ষেপিত]*

ইসলামী ফেরকাসমূহ হক ও বাতিল হওয়ার মাপকাঠি

উক্ত হাদীস শরীফে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসলামি ফেরকাসমূহের মুক্তি ও ধ্বংস, অন্য কথায় হক ও বাতিল হওয়ার মাপকাঠি বলে দিয়েছেন যে, তা হলো আমার এবং আমার সাহাবাদের পথ। কিন্তু তিনি এই তরিকাকে নির্ধারিত কোন ব্যক্তির সাথে সম্পর্ক করেননি। বরং নিজের মোবারক জাত এবং নিজের সাহাবীদের পবিত্র জাতের দিকে নেসবত করে মাপকাঠি বলে দিলেন যে, ওই ব্যক্তিদের মধ্যে সত্য পাওয়া যাবে। অন্যথায় মাপকাঠি বলার জন্য এই নেসবত এবং নামকরণ করার প্রয়োজন ছিল না। বরং তারা কারা এর উত্তরে ما أنا عليه বাক্যের সহজ সরল ব্যাখ্যা এই ছিল যে, আমি যা নিয়ে এসেছি বলে দিলেই চলত। অর্থাৎ সত্যের মাপকাঠি হল, আমি যা নিয়ে এসেছি অর্থাৎ শরীয়ত। কিন্তু শরীয়তকে ব্যক্তিদের থেকে পৃথক করা ব্যতীত তাদের দিকে নেসবত করে উল্লেখ করার উদ্দেশ্য এছাড়া আর কি হতে পারে যে, শুধু কাগজের কালো কালো নকশা মাপকাঠি নয় বরং জাত ও সত্তা হল সত্যের মাপকাঠি, যে জাতের মধ্যে উক্ত নকশা ও শব্দাবলি আমল ও অবস্থা সৃষ্টি হয়ে

প্রবেশ করেছে এবং এমনভাবে মিশে গেছে যে, এখন কেউ তাদের জাতকে দীন থেকে পৃথক করতে পারবে না এবং দীনকে তাদের হাত থেকে পৃথক করে দেখাতে পারবে না।

যার নির্যাস এই বের হল যে, শুধু লিটারেচার সত্যের মাপকাঠি নয় বরং ওই জাত সত্যের মাপকাঠি, যা এই লিটারেচারের হাকিকি পাত্রে পরিণত হয়েছে।

بَلْ هُوَ اٰيٰتٌۢ بَيِّنٰتٌ فِيْ صُدُوْرِ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ ۭ وَمَا يَجْحَدُ بِاٰيٰتِنَآ اِلَّا الظّٰلِمُوْنَ ۝۴۹

বরং যাদের জ্ঞান দেওয়া হয়েছে, তাদের অন্তরে এটি (কুরআন) তো স্পষ্ট আয়াত। কেবল বেইনসাফরাই আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করে। *[সূরা আনকাবুত : ৪৯]*

তারপর ওই তরিকাকে ব্যক্তিত্বের দিকে সম্বোধন করার ধারাবাহিকতায় সুস্পষ্টত ে শব্দের পরে ো শব্দ বলাই যথেষ্ট ছিল এবং এতটুকু বলে দেওয়া যথেষ্ট হত যে, নাজাত ও হালাক চেনার তরিকা হল আমার জাত, যাতে সত্যের মাপকাঠি শুধু রাসূলে খোদার জাত হত। কিন্তু তিনি নিজের সাথে নিজের সাহাবাদের শামিল করলেন। ফলে একথা সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয়ে গেল যে, ফেরকাসমূহ এবং বিভিন্ন চিন্তাধারা যুক্ত জামাতকে হক ও বাতিল যাচাই করার জন্য মাপকাঠি যেমনভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জাত, তেমনিভাবে রাসূলের সাহাবাদের জাতও মাপকাঠি। এ জন্যই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবদ্দশায় বা ইন্তিকালের পর কোন ফেরকা এবং কোন বিশেষ চিন্তাধারাযুক্ত প্রতিষ্ঠানে সদস্যদের যাচাই করার জন্য এতটুকু দেখে নেওয়া যথেষ্ট যে, তারা কী সাহাবাদের পথ ও তরিকা মোতাবেক চলে, না তাদের বিরোধিতা করে। তাদের অনুসরণ করে, না তাদের দূরত্ব বজায় রেখে চলে। তাদের সাথে সুধারণার ব্যবহার করে, না খারাপ ধারণা করে এবং ইত্তেবা করে না। কারো মাপকাঠি হওয়ার জন্য উক্ত শান থাকা জরুরি। ফলে একথা সুস্পষ্ট হয়ে গেল যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে-সাথে তাঁর সাহাবারাও মাপকাঠি। আর উক্ত হাদীসটি এ সম্পর্কে দলিল হিসেবে প্রমাণিত হল।

সাহাবাদের আনুগত্য মূলত রাসূলেরই আনুগত্য

এই বিষয়টি উপরের হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত হাদীসের মধ্যে নিজের তরিকাকে হুবহু নিজের সাহাবাদের তরিকা বলে ঘোষণা করেছেন। যার খোলাসা হল এই যে, তাদের পথে চলা মানে আমার চলা এবং তাদের ইত্তেবা মানে আমার ইত্তেবা। এ বিষয়টি এমন হল যে, যেমন আল্লাহ তায়ালা আপন রাসূল সম্পর্কে বলেছেন–

مَنْ اَطَاعَ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللهَ

যে রাসূলের আনুগত্য করল, সে আল্লাহর আনুগত্য করল।

এ আয়াতে একজনের আনুগত্যকে হুবহু আরেকজনের আনুগত্য বোঝানো উদ্দেশ্য। তার সুস্পষ্ট অর্থ হল, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের তরিকা পৃথক নয়। যেটি আল্লাহর রাস্তা, সেটিই রাসূলের রাস্তা। সুতরাং আল্লাহর আনুগত্য-পরিচয়ের মাপকাঠি হল এই যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আনুগত্যকে দেখতে হবে। যদি রাসূলের আনুগত্য হয়, তাহলে নিঃসন্দেহে আল্লাহর আনুগত্য হবে– অন্যথায় নয়। একই অবস্থা এই বিষয়েও যে, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরাম রা.-এর অনুসরণ ও আনুগত্যকে সরাসরি নিজের আনুগত্য বলে স্বীকৃতি প্রদান করছেন। যার মর্মার্থ হল, যদি রাসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আনুগত্য দেখতে হয়, তাহলে সাহাবাদের আনুগত্যকে দেখে নাও। যদি দেখা যায়, সাহাবায়ে কেরামগণের আনুগত্য ও অনুসরণ করা হচ্ছে, তাহলে বুঝতে হবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আনুগত্য আছে– অন্যথায় নয়।

উক্ত কথার সার কথা হল, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর তরিকা ও তার সাহাবাদের তরিকা ভিন্ন নয় এবং যা রাসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর তরিকা, অবিকল তা-ই তাঁর সাহাবাদের তরিকা। এ কারণে যেমনভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হক ও বাতিল পরখ করার মাপকাঠি, তেমনিভাবে সাহাবায়ে কেরামও হক ও বাতিলের মাপকাঠি। তাদেরকে সামনে রেখে সকল মানবজাতির হক ও বাতিলকে অতি সহজে পরখ করা যেতে পারে।

মোটকথা, উক্ত হাদীস দ্বারা হযরত সাহাবায়ে কেরামগণের শুধু প্রশংসা এবং মর্যাদা-ই প্রমাণিত হয়নি এবং তাঁদের মাপকাঠি ও গ্রহণযোগ্যতা-ই প্রমাণিত হয়নি; বরং উম্মতের হক ও বাতিলের জন্য তাঁদের মাপকাঠির শান ও মান

প্রমাণিত হয়েছে যে, তাঁরা স্রেফ নিজেরাই হকের উপর নন বরং তাঁরা উম্মতের হক ও বাতিরের কষ্টিপাথর, যা দ্বারা অন্যদের হক ও বাতিল যাচাই করা যায়।

উক্ত হাদীস দ্বারা এ বিষয়টিও প্রমাণিত হয়েছে যে, সাহাবায়ে কেরাম রা.-এর মাপকাঠি হওয়ার স্থান-মান তাদের অসাধারণ ফযিলত ও শুধু রায় ও কিয়াস দ্বারা প্রমাণিত হয়নি বরং আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জাত তাঁদের সত্যের মাপকাঠি হওয়ার সাক্ষ্য প্রদান করেছেন। এ কারণে তাঁদের সত্যের মাপকাঠি হওয়া কিয়াসী নয়; বরং দলিল দ্বারা প্রমাণিত।

মাপকাঠি সমালোচনার যোগ্য হয় না

সাহাবায়ে কেরাম যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে উম্মতের হক-বাতিল পরখ করার মাপকাঠি প্রমাণিত হল, তখন উম্মতের কী অধিকার থাকতে পারে যে, তাঁদের সমালোচনা করে তাঁদের ভুল ধরবে? অথবা স্বয়ং তাঁদের এমন অধিকার হবে যে, উম্মতের গুনাহ ও সাওয়াবের ফয়সালা করবে? একথা কে না জানে যে, সমালোচনার অধিকার মাপকাঠি বা কষ্টিপাথরের থাকে, যে পরখকারী। এটি কেমন কথা যে, নিজের গুনাহ ও সাওয়াবকে কোন মাপকাঠি দ্বারা যাচাই করতে এবং নিজের ফয়সালা করতে চলছে আর চলতে-চলতে পথিমধ্যে যে নিজেই মাপকাঠি বনে যায় এবং মাপকাঠির উপর হুকুম আরোপ করার জন্য দাঁড়িয়ে যায়? এতে প্রমাণিত হল যে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেমনিভাবে সত্যের মাপকাঠি হওয়ার জন্য সালোচনার ঊর্ধ্বে, তেমনিভাবে তাঁর সাহাবাগণও। যেহেতু তিনি তাঁদেরকে নিজের সাথে মিলিয়ে সত্য-মিথ্যার মাপকাঠির স্বীকৃতি দিয়েছেন তাই তারাও সমালোচনার ঊর্ধ্বে। অন্যথায় কাউকে হকের মাপকাঠি মেনে তার দোষ-ত্রুটি তালাশ করা অর্থাৎ হকের খেলাফ হওয়ায় তার ওপর সন্দেহ করা অথবা নিজের হকের খেলাফ হওয়ার দোষারোপ করা, তাহলে তাকে মাপকাঠি না মানার মতো হবে, যা স্পষ্টত দুটি বিপরীতমুখী বস্তু একত্র করার শামিল।

এজন্য হযরত সাহাবায়ে কেরাম রা. যদি উম্মতের ফেরকাসমূহের হক ও বাতিলের ফয়সালার মাপকাঠি হয় আর তা অবশ্যই হবে, তাহলে নিঃসন্দেহে তাঁরা ওই সমস্ত ফেরকার সমালোচনা থেকে ঊর্ধ্বে ছিলেন। অন্যথায় তাঁদের মাপকাঠি হওয়ার শান বাকি থাকবে না। অথচ তা বাকি থাকা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত ও আবশ্যক।

হক হস্তগত হয় সাহাবারায়ে কেরাম থেকে

সাহাবায়ে কেরাম সত্যের মাপকাঠি এবং সমালোচনার উর্ধ্বে এ দুটি বিষয় প্রমাণিত হওয়ার পর এই সূক্ষ্ম বিষয়টির প্রতি তীক্ষ্ণ নজর রাখা উচিত যে, সাহাবায়ে কেরাম সত্যের কষ্টিপাথর হওয়ার অর্থ এমন হতে পারে না যে, তাঁদেরকে কষ্টিপাথর বানানো হয়েছে ভেজাল ও নির্ভেজাল যাচাইয়ের জন্য; কিন্তু তাঁরা নিজেরা ভেজাল-নির্ভেজাল কোনটাই নন। তেমনি সাহাবাগণ এমন যে (নাউযুবিল্লাহ) তাঁদেরকে তো হক ও বাতিলের মাপকাঠি বানানো হয়েছে; কিন্তু তাঁদের মধ্যে হক ও বাতিল কোনটাই নেই। এমনটি হতে পারে না। কেননা, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদেরকে নিজের সঙ্গে মিলিয়ে উম্মতের মাপমাঠি বলেছেন। আর একথা তো সুস্পষ্ট যে, স্বয়ং নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সত্যের মাপকাঠি হওয়ার অর্থ হল, তিনি হক ও সততার মূর্তপ্রতীক এবং আপাদমস্তক সত্য ও আমানতদার, যার মধ্যে বাতিলের সংমিশ্রণের সন্দেহ সম্ভব নয়। এজন্য সাহাবাদের সত্যের মাপকাঠি হওয়ার অর্থ হবে, তারা নিরেট নির্ভেজাল হকের ছবি এবং হক ও সততার মূর্তপ্রতীক, যার মধ্যে বাতিলের অণুপ্রবেশ নেই।

এখন একথা দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরাম এর সত্যের মাপকাঠি হওয়ার শান এই হল যে, তাঁদেরকে সামনে রাখলে হক ও বাতিলের মধ্যে পরিপূর্ণ পার্থক্য সৃষ্টি হবে এবং হক হস্তগতও হবে। কারণ, যেহেতু তাঁরা হকের পূর্ণ নমুনা এবং তাঁরা এই উম্মতের হকের প্রথম নমুনা; অতএব হক-নাহক চেনা যাবে তাঁদেরই দ্বারা। আর হক হস্তগত হবে তাঁদেরই থেকে। তবে শর্ত হল তাঁদের আনুগত্য করতে হবে।

এখান থেকে আরেকটি বিষয় ফুটে উঠল যে, সাহাবায়ে কেরাম রা. সত্যের মাপকাঠি হওয়া এবং উম্মতের বিভিন্ন চিন্তাধারার ফেরকাসমূহের কষ্টিপাথর হওয়ার অর্থ হল, যে ফেরকা তাঁদের আনুগত্যকে অপরিহার্য করে নিবে, তারাই হকের উপর থাকবে আর যারা বিদ্রোহী হয়ে উল্টো পথে চলবে, তারা বাতিল ও নাহক।

প্রকাশ থাকে যে, আবশ্যক আনুগত্যের সর্বনিম্ন স্তর হল, তাঁদের দোষ ও সমালোচনা করার পরিবর্তে তাঁদের সত্যায়ন করা, অনুমোদন করা। তাদের ভুল-ভ্রান্তি ও ত্রুটি ধরার স্থলে তাঁদের গুণাবলি বর্ণন করা। তাঁদের প্রতি বদগুমান করার পরিবর্তে সুধারণা রাখা এবং তাঁদের উপর খারাপ কর্ম যথা

মিথ্যা ইত্যাদির অপবাদ দেওয়ার পরিবর্তে তাঁদের সত্যবাদী ও আমানতদার জ্ঞান করা। যদি তাঁদের পরবর্তী জামাত তাঁদের আনুগত্য ও অনুসরণ না করে এবং তাদের সামনে সাহাবাদের নমুনা না থাকে, তাহলে নিঃসন্দেহে তারা হক অর্জন করতে পারবে না এবং তাদের অন্তরে হক ও বাতিলের পরখ করার যোগ্যতা পয়দা হবে না।

সাহাব-সমালোচকদের দীন সঠিক হতে পারে না

কারণ, সাহাবায়ে কেরাম হলেন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পর এই উম্মতের প্রথম মুমিন এবং উম্মতের প্রথম মুবাল্লিগ। দীনের কোন অংশ অন্য কারো দ্বারা পৌঁছেনি। কুরআনুল কারীম কোন আয়াতও অন্যদের থেকে পৌঁছেনি। কুরআন একত্রকারীরা সাহাবাদের থেকেই একত্র করেছেন। অতএব একজন সাহাবীর আনুগত্য হতে বিদ্রোহ করা অথবা একজন সাহাবীকে ঘায়েল করা ও দোষ-ত্রুটি বের করা বাস্তবে তা দীনের ওই টুকরোর বিদ্রোহ হবে, অস্বীকার করা হবে, যা তাঁর মাধ্যমে উম্মতের নিকট পৌঁছেছে। বর্ণনাকারী যদি দোষযুক্ত ও অনুপযুক্ত হন, তাহলে তাঁর বর্ণনাকৃত দীনের অংশটুকুও দোষযুক্ত-অনুপযুক্ত হিসেবে গণ্য হবে। নাউযুবিল্লাহ! যদি দোষ-ত্রুটি তালাশ করা ও আনুগত্য না করা সাহাবাদের ব্যাপারে জায়েয থাকে এবং সকলের মধ্যে চালু ও অবশিষ্ট থাকে, যা আমাদের নিকট জানতে চাওয়া হয়েছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যতীত অন্য কাউকে সমালোচনার ঊর্ধ্বে মনে করব না এবং মানসিক গোলামিতে লিপ্ত হব না, তাহলে দীনের কোন অংশই দোষহীন ও গ্রহণযোগ্য থাকতে পারে না এবং উম্মতের কোন একজন ব্যক্তিও দীনদার অথবা দীনের দাবিদার হতে পারে না। তাই সাহাবাদের সমালোচনা বৈধতা প্রদানকারীগণ এবং সমালোচনা করাকে নিজেদের দীনের আলোচ্য বিষয় নির্ধারণকারীগণ, প্রথমে নিজেদের দীনের খবর নাও। তা কী অবশিষ্ট আছে, না খতম হয়ে গেছে?

মোটকথা, আবশ্যক আনুগত্য ও মানসিক গোলামির সর্বনিম্ন স্কোর হল, সাহাবাদের সাথে আন্তরিক সুধারণা পোষণ করা এবং তাঁদের ঘায়েল করা ও সমালোচনা করা থেকে বিরত থাকা। তাঁদেরকে গুনাহগার মনে করে আনুগত্যের আলামত দেখানো সম্ভব নয়। কেননা, গুনাহকে গুনাহ ভেবে তার আনুগত্য করা হয় না।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত একমাত্র মুক্তিপ্রাপ্ত জামাত

হাদীসের আলোকে উম্মতের মধ্যে একটিমাত্র ফেরকা হকের উপর রয়েছে, যারা সর্বাধিক পর্যায়ে সাহাবায়ে কেরামদের রা. স্বীকৃতি ও সত্যায়ন এবং অনুমোদন ও নিষ্কলুষতার জযবা নিজেদের অন্তরে লালন করে। আর এতে কোন সন্দেহ নেই যে, ওই আনুগত্যশীল জামাত বা মানসিক গোলমীর দ্বারা সজ্জিত জামাত একমাত্র আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত, যাদের মাযহাবই এমন যে, সাহাবায়ে কেরাম সকলেই সাধারণভাবে ইনসাফগার ও পূত-পবিত্র।

তাঁদের প্রতিটি কর্মের উদ্দেশ্য পবিত্র, নিয়ত সঠিক এবং ইচ্ছাও সঠিক। তাঁরা ঝগড়া করতেন; কিন্তু তাঁদের ঝগড়ায় খারাবি ছিল না। তাঁদের মতানৈক্যও আমাদের ঐক্য থেকে অধিক আনন্দদায়ক ছিল। তাঁদের কারও নফসই নফসে আম্মারাহ ছিল না বরং মুতমাইন্নাহ ছিল। তাঁদের অন্তর তাকওয়া ও পবিত্রতার মেরুদণ্ড ছিল। যাঁদের পরীক্ষা আল্লাহ তাল্লাহ তায়ালা নিয়েছিলেন। তাঁদের আধা পোয়া বস্তু সাদকা আমাদের পাহাড় পরিমাণ সাদকা হতে উত্তম। তাঁরা লৌকিকতা ও কৃত্রিমতা হতে পবিত্র ছিলেন। তাঁদের ইলম গভীর এবং পরিষ্কার ছিল। তাঁদের তাওহীদ ও ইখলাসের মাকাম পুরো উম্মতের তাওহীদ ও ইখলাসের সাথে কোন সম্পর্ক নেই।

হযরত হাসান বসরী রহ.-এর কথা অনুযায়ী হযরত আমীরে মুয়াবিয়া রা. এর ঘোড়ার নাকের ধূলি উমর ইবনে আবদুল আজিজ হতে হাজারো স্তরে উত্তম। কেননা, আমিরে মুয়াবিয়া রা. সাহাবী আর হযরত উমর ইবনে আবদুল আজিজ তাবেঈ। *[তাফসিরে রুহুল মায়ানী]*

মানসিক গোলামি ব্যতীত উপায় নেই

একথা তো স্পষ্ট যে, উপরের জযবাগুলো আকিদা হিসেবে মাথায় রাখার পর সাহাবাদের উপর দোষারোপ ও সমালোচনার কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। অবশ্য মানসিক গোলামির প্রশ্ন উত্থাপন হতে পারে। সুতরাং দীন বর্ণনার প্রথম জামাতের উপর সকল মানুষ সর্বদিক থেকে মুহজাত হবে। বর্ণনাগত বিষয়ে, যুক্তি-বুদ্ধিগত বিষয়েও, শিক্ষা-দীক্ষাতেও এবং তাফসীরেও। পরিণতিতে তাঁদের মানসিক গোলামি (মেধাগত অনুসরণ) করবে না তো কার করবে? আর যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদেরকে উম্মতের বিভিন্ন ফেরকার হক ও বাতিলের মাপকাঠির স্বীকৃতি প্রদান করেছেন। আর মাপকাঠি হওয়ার শান হল, তাঁদের দ্বারা হক ও বাতিলের পার্থক্য হয় এবং তাঁদের থেকে হক পাওয়া

যায়। তখন এই অবস্থায় মানসিক গোলামি করা ব্যতীত উপায় থাকে না। অন্যথায় হক হওয়ার স্থলে মানুষ বাতিল মনে করবে।

রাফেজী তথা শিয়া, খারেজী মুতাযিলা ইত্যাদি একই চিন্তাধারার ফেরকাগুলো বাতিল বলে স্বীকৃতি পেয়েছে সাহাবাদের সমালোচনার ঊর্ধ্বে না মনে করার কারণে, তাঁদের মানসিক গোলামির উপর রাজি না হওয়ার কারণে এবং তাঁদের প্রতি দোষারোপ ও দোষ তালাশ হতে বিরত না থাকার কারণে, যা পরিষ্কার শব্দ দ্বারা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছিলেন যে, আমার সাহাবাদের গাল-মন্দ করো না, আমার সাহাবাদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর। সেই নিষেধাজ্ঞার ভিতর দোষারোপ-সমালোচনা এবং ব্যক্তিগতভাবে ঘায়েল করা সবই অন্তর্ভুক্ত। তাঁরা হেদায়াতের তারকা, তাঁদের থেকে সঠিক রাস্তা পাওয়া যাবে, তাঁদেরকে রাস্তা দেখানো যাবে না। তাঁদের অনুসরণ করতে হবে। তাঁদের ভুল ধরে তাঁদের অনুসরণ হবে না।

এতে প্রকাশ হয়ে গেল যে, যারা নিজেদের সমালোচনার সীমানা ওই নেককার পিতাদের পর্যন্ত বিস্তৃত করতে চায় এবং তাঁদের উপর দোষারোপ ও সমালোচনা জায়েয মনে করে, তাহলে এই একটি বস্তুই তাদের মাযহাব বাতিল হওয়ার জন্য এবং তাদের আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের বিরোধী হওয়ার জন্য এবং তাদের থেকে পৃথক হওয়ার দলিল হিসেবে যথেষ্ট। চাই তারা নতুন কোন ফেরকা গঠন করে বা পুরাতন কোন বাতিল ফেরকার মানসিক গোলামিতে লিপ্ত হয়, তাদের অনুসারী হয়। সর্বাবস্থায় তারা আহলে হক তথা হকপন্থী হবে না।

সাহাবা সমালোচনাকারীরা উম্মতের অনৈক্যের কারণ

উপরের হাদীসে এ বিষয়টিও ফুটে উঠেছে যে, সাহাবায়ে কেরাম যেহেতু হক ও বাতিলের মাপকাঠি, তাহলে তাঁদের বিরোধিতার কারণেই নতুন ফেরকার আবিষ্কার হবে। তাঁদের আনুকূল্য দ্বারা নতুন ফেরকা সৃষ্টি হতে পারে না। বরং ওই পুরাতন মুক্তিপ্রাপ্ত ফেরকা-ই অবশিষ্ট থাকবে, যারা সাহাবায়ে কেরামের মাধ্যমে নিজেদের রূহানি সিলসিলাকে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে মিলিয়েছেন। কেননা, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে একটিমাত্র জামাত ছিল, যারা মুক্তিপ্রাপ্ত জামাত ছিল। তাঁরা হলেন সাহাবাদের জামাত, যাঁরা হকের উপর ছিলেন এবং হকের মাপকাঠি ছিলেন। পরবর্তীতে যত ফেরকা আবিষ্কার হয়েছে, সেগুলো তাঁদের উল্টো পথে

চলার কারণেই হয়েছে। আর এ কারণে তারা বাতিল হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে যে, তারা সত্যের মাপকাঠি হতে আলাদা হয়ে গেছে।

সুতরাং যারা কোন প্রকার প্রভেদ করা ব্যতীত সকল সাহাবাকে মর্যাদা ও বিশ্বাসের সাথে অনুসরণ করে এবং তাদের সমালোচনা ও দোষারোপের যবান খোলা জায়েয মনে করে না, নিঃসন্দেহে তারা ফেরকা নয় বরং আসল জামাত। যাদের আকিদা ও আমল নির্ভরযোগ্য সূত্রে প্রথম যুগের পবিত্র জামাতের সঙ্গে মিলানো। আর এই জামাত তাদের সুন্নাতের উপর আযমত ও বিশ্বাসের সাথে জমে থাকার কারণে সঠিক অর্থে তাদের আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত বলার অধিকার রাখে। আর যারা সাহাবায়ে কেরামের খেলাফ করে এবং তাঁদের দোষারোপ ও সমালোচনা করা থেকে নিষেধ না করে, এমনকি তাঁদের সমালোচনা করাকে স্বীকৃতি প্রদান করে, বাস্তবে তারাই শিকড়হীন নতুন নতুন দীনের শাখা আবিষ্কার করছে এবং নতুন নতুন আনন্দদায়ক শিরোনামে দীন ও ইসলামকে ব্যাখ্যা করে দীনকে বহুমুখী বানিয়ে উম্মতের মাঝে মতানৈক্য ও মতভেদের জাল বিস্তার করছে এবং উম্মতকে দীনের নামে দুর্বল ও অনুপযুক্ত বানাচ্ছে। অতএব সঠিক অর্থে তারাই ফেরকাবাজ লোক, তারা জামাতের লোক নয় বরং তাদের সাথে জামাত শব্দটি যোগ করে দিয়েছে।

মোটকথা, উক্ত হাদীস দ্বারা একথা স্পষ্ট হলো যে, সাহাবাদের সত্যের মাপকাঠি স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বানিয়েছেন এবং তাঁর মানশা মোতাবেক সত্যের মাপকাঠি প্রমাণিত হয়েছে। যাদের থেকে আজ পর্যন্ত সকল উম্মত নিজেদের দোষ-ত্রুটি ও হক-বাতিল বুঝতে পারছে। এ কারণে রাসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদের উপর পূর্ণ ভরসা করে প্রকাশ্য শব্দ দ্বারা বলে দিলেন, তাদের তরিকা মানে আমার তরিকা। তিনি নিজের তরিকাকে তাদের তরিকা বলে এবং সকল উম্মতের জন্য তাদেরকে হুজ্জত স্বীকৃতি দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন, কেয়ামত পর্যন্ত উম্মতের হক ও বাতিলের ফয়সালা তাদের ইলম ও আমলের মাপকাঠিতে হবে।

নিজেকে সত্যের মাপকাঠি দাবি করা

মওদুদী সাহেব লিখিত 'দস্তুরে জামাত' এর বুনিয়াদী দফা-এ সাধারণভাবে একথার দাবি করে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যতীত কেউ সত্যের মাপকাঠি ও সমালোচনার ঊর্ধ্বে নয়। তাতে সর্বপ্রথম সাহাবায়ে কেরাম শামিল হন। তারপর সাহাবাদের প্রতি দোষারোপ ও সমালোচনা কার্যকরীরূপে

করা। এমনটি শুধু হাদীস শরীফের বিরোধিতাই নয় বরং একপর্যায়ে নিজেকে সত্যের মাপকাঠি হওয়ার দাবি করা। যিনি সাহাবাদের পর্যন্ত পরখ করার দুঃসাহস দেখিয়েছেন। কেমন যেন তিনি যে বুনিয়াদী উসূলকে ধুমধামের সাথে আন্দোলনের ভিত্তি বানিয়েছিলেন, সেটিকে তিনি নিজেই সর্বপ্রথম ভেঙে ফেললেন এবং পূর্বসূরী ও উত্তরসূরী সকল মানুষের জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যতীত নিজেই সত্যের মাপকাঠি হওয়ার ব্যর্থ চেষ্টা করলেন।

وَ لَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ نَسُوا اللّٰهَ فَاَنْسٰىهُمْ اَنْفُسَهُمْ ؕ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ○١٩

তোমরা তাদের মত হয়ো না, যারা আল্লাহ তায়ালাকে ভুলে গেছে। ফলে আল্লাহ তাদের আত্মবিস্মৃত করে দিয়েছেন। *[সূরা হাশর : ১৯]*

সাহাবাদের ইজতিমায়ী বা সমষ্টিগত আনুগত্য

উক্ত হাদীস শরীফে হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শব্দ প্রয়োগ দ্বারা বুঝা যায় যে, রাসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যতীত একজন দুজন সাহাবী সত্যের কষ্টিপাথর নয় বরং اصحابی বহুবচন শব্দ ব্যবহার করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যতীত সকল সাহাবায়ে কেরাম সত্যের মাপকাঠি স্বীকৃত হয়ে ওয়াজিবুল ইতায়াতের যোগ্য হয়েছেন, যার জন্য হাদীসসমূহে এক একজন, দুই-দুইজন, চার-চারজন ও তার চেয়ে বেশি, তারপর সাহাবাদের পুরো জামাতকে ওয়াজিবুল ইতায়াত বানিয়ে হুকুম জারি করেছেন। কারণ, মাপকাঠি যদি মাপকাঠি হওয়ার পরও ইতায়াতযোগ্য না হয়, তাহলে মাপকাঠি আর মাপকাঠি থাকে না। আর যখন মিয়ারে হক সাহাবা জামাতের সকলকে স্বীকৃতি দেওয়া হল, তাহলে কোন প্রকার প্রভেদ ছাড়া সকল সাহাবাকে ওয়াজিবুল ইতায়াতও সাব্যস্ত করা হল। কেননা, সম্ভাবনা রয়েছে, সন্দেহকারীদের সন্দেহ হতে পারে যে, যখন সাহাবাদের মধ্যে শাখাগত মাসায়েলে ইখতেলাফ থাকবে এবং মাসায়েলের মতানৈক্য প্রতিকূলতা পর্যন্ত গড়াবে, তাহলে অবশ্যই নিরুপায় হয়ে একজনের ইতায়াত ও আনুগত্য করে অবশিষ্টদের ইতায়াত হতে হাত গুটিয়ে নিতে হবে। অন্যথায় দুটি বিপরীতমুখী বস্তু এক করা অপরিহার্য হবে, যা আমল করা সম্ভব হবে না।

তাহলে তারপরও সকলের ইতায়াত ও অনুসরণ কোথায় থাকল এবং তা কিভাবে সম্ভব?

উক্ত প্রশ্নের উত্তর হল, যদি একজনের অনুসরণ অন্যদের দোষারোপ ও সমালোচনা হতে বিরত থেকে এবং সকলের প্রতি আযমত রেখে হয়, তাহলে তা সকলের অনুসরণ বলা হবে। যেমন নবুওয়াতের ধারাবাহিকতায় কার্যকরীরূপে একজন রাসূলের আনুগত্য করা হয়; কিন্তু সত্যের মানদণ্ড সবাইকে মনে করা হয় এবং আযমত ও নিষ্কলুষতা এবং পবিত্রতা ইত্যাদি ব্যাপারে সকলকে এক জ্ঞান করা হয়। সমালোচনা ও দোষ ধরার ব্যাপারে সকলকে নিষ্পাপ মনে করা হয়, তাহলে সকল নবীর অনুসরণ মনে করা হবে। অন্যথায় শুধু একজনের দোষ ও সমালোচনার ব্যাপারে মুখ খুললে হাজারজনের অনুসরণ করলেও অনুসরণ হবে না। বরং সকলের সাথে বিরোধিতা ও বিদ্রোহ করা হবে। কেননা, স্বয়ং সাহাবায়ে কেরাম শাখাগত বিষয়ে মতভেদ থাকা সত্ত্বেও পরস্পর একজন অপরজনের সম্মান দেওয়া ওয়াজিব মনে করেন। তার বিপরীত করা তারা সহ্য করতেন না।

যেমনিভাবে নবীগণ শরীয়তের দিক দিয়ে ভিন্ন-ভিন্ন থেকে একে অন্যের সত্যায়নকে আসল ঈমান স্বীকৃতি দিতেন। সুতরাং একজনের দোষারোপ ও ত্রুটি অন্বেষণ যখন সকলের বরখেলাপ করা আবশ্যক করে, তাহলে সকলের বিপরীত করলে সকলের সাথে বিদ্রোহ করা হবে। নিচের হাদীস শরীফে উক্ত বিষয়টির আলোকপাত করা হয়েছে–

اَصْحَابِىْ كَالنُّجُوْمِ بِاَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمُ اهْتَدَيْتُمْ

আমার সাহাবীরা তারকার ন্যায়; তাদের যাকে অনুসরণ করবে হেদায়াত পেয়ে যাবে।

اَيِّهِمْ শব্দ দ্বারা অনুসরণকে মুতলাক (শর্তহীন) রাখা হয়েছে যে, যে কারো অনুসরণ করা হবে হেদায়াত দেওয়া হবে। কিন্তু نُجُوْم শব্দ দ্বারা অনুসরণ মনে করা এবং হাদীস হিসেবে মেনে নেওয়া সকলের জন্য আবশ্যক করা হয়েছে। এই অর্থ নয় যে, যাকে অনুসরণ করবে তাকেই শুধু হেদায়াতের তারকা মনে করবে। সুতরাং আনুগত্য ও অনুসরণের আমল তো এক দুজন পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকে। কিন্তু নূর বিকিরণের আকিদা এক-দুজন পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকে না বরং সকলের জন্য মেনে নেওয়া জরুরি।

সাহাবায়ে কেরাম রা.-এর জামাত তো ওই জামাত, যাদের নাম নিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে দিয়েছেন, তারা উম্মতের বিভিন্ন চিন্তাধারার ফেরকাসমূহের হক ও বাতিলের মাপকাঠি এবং সমালোচনার ঊর্ধ্বে বলে দিয়েছেন। আর তাঁদের মানসিক গোলামি ও অনুসরণকে জরুরি ঘোষণা করেছেন।

কেয়ামত পর্যন্ত ব্যক্তিগত মাপকাঠি থাকবে

সাহাবা জামাত ব্যতীত অন্য কোন জামাতকে জামাতগতভাবে নাম নিয়ে সত্যের মাপকাঠি বলেন না। কিন্তু সত্যের মাপকাঠি হওয়ার জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ অবকাঠামো এবং মানদণ্ডমূলক গুণাবলি বর্ণনা করে দিয়েছেন। যেগুলো সামনে রেখে মোটামুটিভাবে সর্বকালে ব্যক্তিগত মানদণ্ড নির্ধারণ করা যেতে পারে।

একথা অস্বীকার করেননি যে, বিদ্যমান যুগের পর মানবিক দুর্বলতার সম্ভাবনাও রয়েছে এবং এমন দুর্বলতা সময় সময় প্রকাশও হয়েছে। কিন্তু সময় সময় এমন কমজোরির কারণে নিতান্ত ব্যক্তিগত মাপকাঠি হওয়ার মধ্যে বাধা সৃষ্টি হয় না। কেননা, প্রথমত তো মুত্তাকি উম্মত হতে কারো যিন্দেগীকে পবিত্র যিন্দেগী বলার জন্য এতটুকু যথেষ্ট যে, তাদের যিন্দেগীতে তাকওয়া ও পবিত্রতা প্রবল। আর ভুল-ভ্রান্তি, বিস্মৃতি এবং সময় সময় ইচ্ছাকৃত দুর্বলতা তো মানুষের জন্মগত উপাদান। দ্বিতীয়ত, পরবর্তী যুগের মানুষ স্রেফ এই অর্থে সত্য-মিথ্যার মাপকাঠি যে, তাদের সমষ্টিগত জীবন সামনে রেখে নিজের জন্য দ্বীনি রাস্তার আমলের খসড়া বানাবে এবং তা দ্বারা আমলকে নিয়ন্ত্রণ করবে। আমলের খসড়াকে নিজের উপযোগী করে নিজের হক ও বাতিলের ফয়সালা করবে না। এই অর্থে সত্যের মাপকাঠি হওয়া যে, তাদের কথা ও কাজ শরীয়তের দলিল। তাহলে এ ধরনের পবিত্র ব্যক্তিত্ব এবং মিয়ারী মানুষ সর্বযুগেই হতে থাকবে এবং উম্মতের আলোর মিনার প্রমাণিত হতে থাকবে।

সুতরাং হযরত মাদানী রহ. মানদণ্ডের এমন গুণাবলির উপর কিতাব ও সুন্নাতের আলোকে আলোকপাত করেছেন। আর এজন্য আলোকপাত করেছেন যে, হেদায়াতের রাস্তায় শুধু লিটারেচারের দ্বারা দিকনির্দেশনা হতে পারে না যতক্ষণ না এই ব্যক্তিদের কর্মের পোশাক সামনে প্রকাশ হয়। অন্যথায় আসমানি কিতাবসমূহের সঙ্গে নবীদের পাঠানোর প্রয়োজন হতো না। আসমানি কিতাবের অর্থ ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ করার জন্য সত্যের মাপকাঠি ওই পবিত্র ব্যক্তিত্বগণ হয়ে

থাকেন। তারা না হলে আসমানি কিতাবের অর্থ নির্ধারণে প্রত্যেক লোভাতুর ব্যক্তি স্বাধীন হয়ে যাবে।

ফলে কোন দিন হক ও বাতিলের সমাধা হবে না। এজন্যই কিয়ামত তক রাসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পর এমন মিয়ারী ব্যক্তিত্ব বনামে মুজাদ্দিদ, মুহাদ্দিস, ইমাম, মুজতাহিদ, আল্লামা ও ফকীহ ইত্যাদি আসতে থাকা জরুরি, যাদের মাপকাঠি দ্বারা উম্মতের সর্বসাধারণ ও বিশেষ ব্যক্তিবর্গ নিজেদের দ্বীনি আকিদা ও কার্যাবলিকে যাচাই করতে থাকবে এবং মোটামুটিভাবে তাদের উপর নিজেদের সমান করে রূহানি প্রশান্তি ও স্থিরতা হাসিল করতে থাকবে।

সুতরাং মওদুদী সাহেব তো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পর কাউকে সত্যের মাপকাঠি মানার জন্য তৈরি ছিলেন না। কিন্তু কিতাব ও সুন্নাহর ফয়সালা হল, রাসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পরে কিয়ামত পর্যন্ত মিয়ারী ব্যক্তিত্ব আসতে থাকবে। যারা পর্যায়ক্রমে হক ও বাতিলের মাপকাঠি প্রমাণিত হতে থাকবে। আর যারাই কিতাব ও সুন্নাহর শব্দাবলি হতে অবৈধ ফায়দা উঠানোর চেষ্টা করবে, তখন ঐ ব্যক্তিত্বরা নিজ-নিজ যুগের উপযোগী শিরোনাম দ্বারা তাদের অপব্যাখ্যার পর্দা ও রহস্যকে ভেদ করে আসল চেহারা উন্মুক্ত করবে।

যেমনটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

يَحْمِلُ هٰذَا الْعِلْمَ مِنْ كُلِّ خَلَفٍ عُدُوْلُهُ يَنْفُوْنَ عَنْهُ تَحْرِيْفَ الْغَالِيْنَ، وَانْتِحَالَ الْمُبْطِلِيْنَ، وَتَأْوِيْلَ الْجَاهِلِيْنَ

> এই ইলমকে সর্বযুগে মধ্যমপন্থী উত্তরসূরীরা পূর্বসূরীদের থেকে গ্রহণ করতে থাকবে এবং উগ্রপন্থী ও সীমালঙ্ঘনকারীদের দীনবিকৃতি ও বাতিলপন্থীদের মিথ্যা অপবাদ ও মূর্খদের দুর্বলতাসমূহকে রদ করতে থাকবে। *[মিশকাত শরীফ]*

যদি তাওফিক হয়, তাহলে ওই মিয়ারী ব্যক্তিত্ব এবং তাঁদের মাপকাঠি হওয়ার শানসমূহের বিস্তারিত ব্যাখ্যা আগত অন্য কোন রচনায় করব ইনশাআল্লাহ। অতএব হযরত শায়েখ মাদানী রহ.-এর মর্যাদাপূর্ণ চিঠিতে গুরুত্বপূর্ণ ও বুনিয়াদী আলোচনা ছিল রাসূল ব্যতীত অন্যদের মাপকাঠি হওয়া বিষয়, যাকে জনাব মওদুদী সাহেব আইনগতভাবে নিজের 'বুনিয়াদী দস্তুর' নামের পুস্তকে রদ করে দিয়েছেন। আর মাদানী রহ. সেটিকে আহলে হকদের বুনিয়াদি উসূল বলে দিলেন। ফলে উক্ত মতভেদ শাখাগত বিষয় থাকেনি বরং উসূলি বিষয় হয়ে

গেছে। হতে পারে, মওদুদী সাহেব ও তার সাথীরা উক্ত সাগরতুল্য দলিলগুলোকে রদ করতে সম্ভাব্য তদবির করবেন। কোন আন্দোলনকে পরিচালনা করার জন্য বুনিয়াদী মতানৈক্য সৃষ্টি করার দ্বারা কেমন যেন নিজ হাতে ওই আন্দোলনকে খতম করল। শাখাগত বিষয় তো মতানৈক্য ও ঐক্যবদ্ধ উভয় অবস্থায় চলতে পারে; কিন্তু উসূলগত মতানৈক্য এবং ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি একসাথে চলতে পারে না।

وما علينا الا البلاغ

২০ জমাদিউল আউয়াল, ১৩৭৫ হিজরী, বৃহস্পতিবার রাত।

পরিশিষ্ট

মানসিক গোলামি ও তাকলিদ

মানসিক গোলামি শব্দ দ্বারা মওদুদী সাহেব সম্ভবত তাকলিদ বোঝাতে চেয়েছেন। কিন্তু তাতে পরিভাষাগত ভুল সৃষ্টি হয়েছে। কেননা, গোলামি শব্দের নির্যাস হল, কারো সম্মুখে ঝুঁকে পড়া আর তাকলিদ অর্থ কারো কথা মেনে নেওয়া। একজন গোলাম তার মালিকের কামালাত ও সুন্দর গুণাবলির দিকে ঝোঁকে না; বরং তার জাতের সামনে ঝোঁকে– চাই তার মালিক গণ্ডমূর্খ ও আহম্মক হোক না কেন। কিন্তু একজন মুকাল্লিদ নিজের মুজতাহিদ ইমামের সামনে আসে এবং তার মাকাম ও সম্মানের অনুসরণ করে, যাকে সে আকল ও নকল তথা যুক্তি ও বর্ণনাগত বিদ্যার কামিল অনুসারী মনে করে। সে তার জাতের সামনে অবনত হয় না। অতএব গোলামির মধ্যে মুখ্য উদ্দেশ্য হয় মুনিবের সত্তা– তার গুণ নয়। আর তাকলিদের মধ্যে মুজতাহিদের গুণাবলি মুখ্য উদ্দেশ্য হয়– তার সত্তা নয়। গোলামির মধ্যে জোর-জবরদস্তি হয় যে, না গোলাম নিজের যোগ্যতা দ্বারা মালিক নির্বাচন করতে পারে, আর না স্বয়ং মালিকের যোগ্যতার প্রতি নজর রাখতে পারে। গোলামিতে প্রতিপাদ্য বিষয় হল ভয় ও আশা, মালিকানার প্রতিপাদ্য হল কঠোরতা ও রাগ। কোনোটাতেই উপলব্ধি ও দলিলের গ্রহণযোগ্যতা নেই। সুতরাং মানসিক গোলামির মধ্যে না নিজের উপলব্ধি মাঝখানে থাকে, না মালিকের কামাল। আর তাকলিদের মধ্যে থাকে আনুগত্য ও উৎসাহ, আকলি উপলব্ধি এবং আন্তরিক বিশ্বাস। তাতে না আছে জবরদস্তির ও ভয়-ভীতির কোন প্রশ্ন, আর না আছে ইমামে মুজতাহিদের কামালাত হতে বেখবর।

মোটকথা, গোলামি নির্বুদ্ধিতা থেকে সৃষ্টি হয় আর তাকলিদ আকল ও বুদ্ধির অনুসরণ থেকে। কেননা, তাকলিদ কারো সামনে মাথা নত করার নাম নয়, তার কথা মানার নাম। আর কথাও এমন, যা আকর্ষণ ও জবযামূলক নয় বরং যা ইলম কামালাত হতে বের হয় এবং বুঝে আসে। তারপর শুধু কামালাতের উপর নির্ভর হয় না বরং উপরের সাথে সম্পর্কও থাকে যে, এগুলো তার কথা নয় বরং উপরওয়ালার কথা। যে কথার সামনে মাথানত করা ভদ্র নফসের পরিচয়।

সুতরাং তাকলিদের মধ্যে অনুভূতি ও উপলব্ধি থাকে। তাতে দলিল-প্রমাণ তালাশ করা হয়। শাখাগত মাসায়েল নয়, আসল ও পূর্ণাঙ্গ বিষয় সম্পর্কিত হয়। যে কারণে অনুসরণীয় মুজতাহিদের ব্যক্তিত্ব আনুগত্যের জন্য নির্ধারিত হন। এখানে জাতিগত ভয়ভীতি ও হুজ্জতহীনতা থাকে না এবং ইতায়াত হয়, ইবাদত হয় না। সুতরাং কোথাও গোলামি ও আবদিয়াত (দাসত্ব) আর কোথায় ইত্তেবা ও আকিদত (ভক্তি)? কোথায় মতলববাজি, ভয় ও লালসা আর কোথায় মুহাব্বাত ও স্বাধীনতা? কোথায় উপলব্ধি ও দলিল-প্রমাণ আর কোথায় নিশ্চলতা ও অনুভূতিহীনতা? কোথায় সুধারণা ও আন্তরিক অনুগ্রহ আর কোথায় নারাজি ও মনোবেদনা? কোথায় আকল ও বিজ্ঞতা আর কোথায় জ্ঞানহীন পথ প্রদর্শন?

কোথায় মৃত চেরাগ আর কোথায় সূর্যের আলো! অতএব মানসিক গোলামি শব্দ যার অর্থ হল মেধাকে উপলব্ধি ও দলিল গ্রহণ হতে শূন্য করে কারো সত্তার সামনে নত করা এটি ওই তাকলিদের ভাষ্য হতে পারে না, যাতে মেধাগত উপলব্ধি জাগ্রত রেখে কারো ইলমি এবং কামালাতি সম্পর্ককে সম্মুখে রেখে সুধারণা এবং পূর্ণাঙ্গ দলিল-প্রমাণ চেয়ে তার তাকলিদের ভাষ্যকারের জন্য মানসিক গোলামির ন্যায় পূর্ণ শব্দের ব্যবহার মনে হয় উত্তেজনা বৃদ্ধি ও নতুন প্রজন্মের অন্তর ও দেমাগে আঘাত করে তাদের তাকলিদবিমুখ বানানোর পাঁয়তারা। কেননা, এক্ষেত্রে গোলামি শব্দ বেশি কার্যকর।

বর্তমানে ব্যক্তি হোক বা জামাত হোক, গোষ্ঠী হোক বা দেশ হোক, স্বাধীনতার নামে মূলে আঘাত করছে। পৃথিবীর ক্ষমতাধর জাতিগুলো যেহেতু দুর্বল লোকদের দাসত্বকে জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য বানিয়ে রেখেছে, যা দ্বারা জাতি দুর্বল হতে বাধ্য, এ জন্য তারা স্বাধীনতার হাত-পা নাড়াচ্ছে। বর্তমানকালে গোলামি শব্দটিকে তুচ্ছ দৃষ্টিতে দেখা হয়। গোলাম শব্দটি নজরে এলেই মানুষ ভ্রূকুঞ্চিত করে এবং তাচ্ছিল্যের সঙ্গে তা থেকে ভয়ে দূরে থাকে। এজন্যই তাকলিদের প্রতি ঘৃণা জন্মানোর জন্য তার চেয়ে উত্তম তদবির নেই। এজন্য তাকলিদের তরজমা এমন এক অপছন্দনীয় শব্দ দ্বারা করা হয়েছে, যে শব্দ নিজেই মানুষের দৃষ্টিতে তুচ্ছ ও অপদস্থ, যাতে এভাবে তাকলিদের ব্যাপারে মানুষের অন্তরে ঘৃণা পয়দা করা যায়। কিন্তু আমি বলেছি, মানসিক গোলামি ও তাকলিদ উভয়টির হাকিকতে আকাশ-বাতাস হতে বেশি পার্থক্য আছে। একটি অপরটির কোনমতে তরজমা হতে পারে না। বরং মানসিক গোলামি শব্দটি শরয়ী কোন শব্দ নয়। এটি কোন শরয়ী পরিভাষায় ব্যবহার হয় না। এটি এখানে ব্যবহার করা হয়েছে শুধু উত্তেজনা বাড়ানোর জন্য এবং গোপন উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে।

আমরা অবশ্যই তাকলিদের সমর্থক। কিন্তু তাকলিদ অর্থ মানসিক গোলামি মনে করি না। তাকলিদের মধ্যে ইত্তেবার পাশাপাশি অনুভূতিও থাকে, চাই ওই উপলব্ধি ইজমালি হোক বা তাফসিলি।

আল্লাহ তায়ালার ইরশাদ–

قُلْ هٰذِهٖ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي

আমি আল্লাহর দিকে বুঝে-শুনে দাওয়াত দেই আমি এবং আমার অনুসারীরা। *[ইউসুফ ১২ : ১০৮]*

এখানে সাহাবায়ে কেরামের (যাঁরা প্রথম অনুসারী) অনুসরণকে প্রমাণিত করা হয়েছে। আর অনুভূতি-অনুধাবনকেও প্রমাণিত করা হয়েছে। সর্বপ্রথম উপলব্ধি হয় এই কালাম কার, যার অনুসরণ করা হচ্ছে আর এই ব্যক্তিত্ব কে, যাঁর ইত্তেবা করা হচ্ছে। আর মানসিক গোলামির সার হল সম্পূর্ণ অনুভূতিহীনতা এবং প্রাণহীন পদার্থ, যা কোন মুমিনের স্বভাব হতে পারে না। উক্ত বিষয়বস্তুতে যত স্থানে আমি মানসিক গোলামি শব্দটি ব্যবহার করেছি, তা মওদুদী সাহেবের কথার নকল মাত্র, অন্যথায় আমাদের নিকট ইসলামি পরিভাষায় এটি একটি অর্থহীন শব্দ। এটি কোন শরয়ী মর্মের ভাষ্যকার হতে পারে না, না কোন আকলি বস্তুর। কাফেরদের পূর্বপুরুষদের তাকলিদের ব্যাপারে বলা হলে তো সম্ভব যে, কোন রকম প্রয়োগযোগ্য হয়ে যাবে।

اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ اَللّٰهُمَّ اَعِذْنَا مِنَ الْفِتَنِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ اَللّٰهُمَّ اجْعَلِ الْقُرْاٰنَ اِمَامًا لَّنَا وَاجْعَلْهُ حُجَّةً لَّنَا وَارْزُقْنَا عَمَلَهٗ بِفَضْلِكَ الْعَظِيْمِ يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ اَللّٰهُمَّ تَوَفَّنَا مُسْلِمِيْنَ وَ اَلْحِقْنَا بِالصَّالِحِيْنَ غَيْرَ خَزَايَا وَلَا مَفْتُوْنِيْنَ وَصَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهٖ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ اَجْمَعِيْنَ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ.

বয়ান : ৪

আগাযে বুখারী

স্বয়ং ইমাম বুখারী রহ. বলেন, جَعَلْتُه بَيْنِيْ وَبَيْنَ اللهِ حُجَّةً 'আমি এই কিতাবকে আমার ও আল্লাহর মাঝে হুজ্জত নির্ধারণ করলাম।' হুজ্জত তথা প্রমাণপত্র ও সনদ দ্বারা মুকাদ্দামার নিষ্পত্তি হয়, মানুষ কামিয়াব হয় এবং গ্রহণযোগ্য হয়।

এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল, গ্রহণযোগ্যতার জন্য এ কিতাবকে প্রামাণ্য দলিল নির্ধারণ করলাম। ইনশাআল্লাহ স্বয়ং মুসান্নিফ (লেখক)-ও মাকবুল এবং যারা হুজ্জত জেনে এ কিতাব অধ্যয়ন করবে, ইনশাআল্লাহ তারাও আল্লাহর নিকট মাকবুল হবেন। এ কিতাব তাদের জন্য প্রমাণপত্র। এমনটিই এ কিতাবের শান।

– হযরত হাকীমুল ইসলাম রহ.





আগাযে বুখারী

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَ نَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ، وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِىَ لَهٗ، وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُهٗ، اَرْسَلَهُ اللّٰهُ اِلٰى كَآفَّةٍ لِلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّ نَذِيْرًا وَدَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا•

اَمَّا بَعْدُ: كَيْفَ كَانَ بَدْءُ الْوَحْيِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَوْلُ اللَّهِ جَلَّ ذِكْرُهُ: إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ.

حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ اللَّيْثِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْمِنْبَرِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ. صدق رسول الله صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট ওহী আসা কিভাবে শুরু হয়েছিল? আর আল্লাহ তায়ালার ইরশাদ–

> নিশ্চয়ই আমি আপনার নিকট ওহী প্রেরণ করেছি যেমনিভাবে নূহ ও তারপর অন্যান্য নবীদের প্রতি প্রেরণ করেছিলাম।

হযরত হুমাইদী রহ. আমার নিকট বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, সুফিয়ান রহ. বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, হযরত ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আনসারী রহ. বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, হযরত মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম তামিমী রহ. আমাকে খবর দিয়েছেন যে, তিনি আলকামা ইবনে ওয়াক্কাস আল লাইসী রহ. হতে শুনেছেন। তিনি বলেন, আমি বয়ানের মিম্বর হতে হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রা. হতে শুনেছি। তিনি বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেছি যে, তিনি ইরশাদ করেছেন, নিশ্চয়ই আমল নিয়তের উপর নির্ভরশীল। আর প্রত্যেকে তা-ই পাবে যা তার নিয়ত হবে। যদি তার হিজরত দুনিয়া লাভের জন্য হয়, তাহলে সে দুনিয়া পাবে, আর যদি কোন নারীকে বিবাহ করার জন্য হয়, তাহলে তার হিজরত হবে যার জন্য সে হিজরত করেছে।

সূচনা

বুযুর্গানে মুহতারাম!

আমাদে সৌভাগ্য যে, আমরা বুখারী শরীফের ইফতিতাহ তথা প্রথম দরসে অংশগ্রহণ করতে পেরেছি। [১৩৯৮ হিজরী মোতাবেক ১৯ নভেম্বর ১৯৭৮ ঈসায়ী, রোজ রোববার, মক্কা শরীফের মাদরাসা সাওলাতিয়ার মসজিদ]

মুদাররিসদের সাধারণ নিয়ম হল, কোন ফন ও বিষয়ের গুরুত্বপূর্ণ কিতাব শুরু করার পূর্বে চারটি বিষয়ের প্রতি মনোনিবেশ করেন। সর্বপ্রথম মুসান্নিফের সংক্ষিপ্ত জীবনী তুলে ধরেন। দ্বিতীয় পর্যায়ে স্বয়ং তাসনিফের প্রতি মুতাওয়াজ্জুহ হন যে, স্বয়ং কিতাবের মাহাত্ম্য ও বড়ত্ব কেমন।

তৃতীয় পর্যায়ে কিতাবের আলোচ্যবিষয় কী, যে সম্পর্কে কিতাবে আলোচনা করা হয়েছে। চতুর্থ পর্যায়ে কিতাবের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কী? কেন এ কিতাব পড়বে?

এগুলোকে যদি ইলমি পরিভাষায় বর্ণনা করা হয়, তাহলে উক্ত চারটি বস্তু এমন হবে যে, সর্বপ্রথম ইল্লতে ফায়েলী অর্থাৎ তার ফায়েল কে? কার প্রতি আমরা মনোনিবেশ করছি? দ্বিতীয় ইল্লতে মাদ্দি তথা এটি কোন বস্তু, যার উপর মুসান্নিফ রহ. আলোচনা করছেন? তৃতীয় ইল্লতে সুরি তথা এই কিতাব ও তার আলোচ্যবিষয়ের বিন্যাস কিভাবে হয়েছে? চতুর্থ ইল্লতে গায়ী তথা এ কিতাব পড়ার উদ্দেশ্য ও লাভ কী?

অতএব মুদাররিসগণ সাধারণত চারটি বিষয়ে প্রথম পর্যায়ে আলোচনা করেন। সেগুলো হলো, ইল্লাতে ফায়েলী, ইল্লাতে মাদ্দী, ইল্লতে সুরী ও ইল্লতে গায়ী।

ইমামের জালালত বা শ্রেষ্ঠত্ব

মুসান্নিফ রহ.-এর জাত সম্পর্কে যতটুকু অবগতি রয়েছে, তা হল তিনি মুসলিম জাতির অন্তরে সূর্যের চেয়ে বেশি গ্রোথিত ও আলোকিত। এর চেয়ে বেশি পরিচয় করানোর প্রয়োজন নেই। প্রথম সারির লোক, অগ্রগামীদের একজন, ইমাম, হাফেজ ও লেখক ইত্যাদি যত গুণ একজন আহলে ইলমের মধ্যে থাকতে হয় তার সবকটি আল্লাহ তায়ালা তাঁর মধ্যে সমাবেশ করেছেন।

আনুমানিক ১৯২ বা ১৯৪ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেছেন। বয়স হয়েছিল বাষট্টি বছর। আর ওফাত পেয়েছেন ২৫৩ বা ২৫৬ হিজরীর কাছাকাছি সময়ে। আমি এ তিনটি বিষয় একত্রিত করলাম। তারিখ বলে দিলাম যে কোন্‌টি জন্মের আর কোন্‌টি মৃত্যুর এবং বয়স কত হয়েছিল। তারপর তিনটি জিনিসকে একটি কবিতায় একত্রিত করেছি–

كان البخارى حافظا محدثا جمع الصحيح مكمل التحرير

ميلاده صدق ومدة عمره فيها حميد والنقضى فى نور

ইমাম বুখারী রহ. হাফেজ ও মুহাদ্দিস এবং সম্পূর্ণ সহীহ বুখারীর লেখক ছিলেন। তার জন্ম صدق শব্দ থেকে বের হবে অর্থাৎ ১৯৪ হিজরী, তাঁর বয়স সীমা حميد শব্দ থেকে বের হবে অর্থাৎ ৬২ বছর আর মৃত্যু সন نور শব্দ থেকে অর্থাৎ ২৫৬ হিজরী। [আরবি বর্ণের সংখ্যা-মান দ্বারা বের করা হয়েছে।]

ইমামের আযমত ও জালালত সম্পর্কে যতটুকু জানা আছে, তা হল এই যে, মেধা, ন্যায়বিচার, যুহদ ও তাকওয়া এবং আমানতদারি ইত্যাদিতে এত বেশি প্রসিদ্ধ ছিলেন, যতটুকু আমরা সূর্যকে দেখি। সমগ্র উম্মাতে মুসলিমা ইমাম রহ.কে স্বতস্ফূর্তভাবে গ্রহণ করে নিয়েছিলেন।

আল্লাহ তায়ালা তাঁকে আশ্চর্যজনক স্মৃতিশক্তি দান করেছিলেন। তাঁর যুগে মানুষ মুখস্থনির্ভর ছিল। তখন বড়-বড় মুহাদ্দিস ও হাফেজুল হাদীস পয়দা হয়েছেন, যাঁদের স্মৃতি ও মেধাশক্তিকে আল্লাহপ্রদত্ত কারামাত বলা চলে। সাধারণত এমন স্মৃতিশক্তি হয় না। আল্লাহ তায়ালা তাঁর কালামকে বেশি প্রচার-প্রসার করার ইচ্ছা ছিল; তাই বিস্ময়কর মেধাশক্তি দান করেছিলেন, যেগুলোকে আমরা কারামাত বলতে পারি।

হেফজশক্তির কারামাত

ইমাম তিরমিযী রহ. মক্কায় সফর করছিলেন। তিনি যার শাগরেদ সেই শায়েখ তাঁর সাথে ছিলেন। এছাড়া আরো অনেক ছাত্র সাথে ছিল। তখন সকল ছাত্র শায়েখের নিকট দরখাস্ত করলেন, জাহাজে দীর্ঘ সফর হবে তো সেই সময় আমাদের হাদীস শরীফ পড়াবেন। শায়েখ বললেন, শর্ত হলো কাগজ, দোয়াত ও কলম সঙ্গে নিয়ে বসতে হবে। যে সকল হাদীস আমি লেখাব, তার সবগুলো লিখতে হবে।

হযরতের শর্ত সবাই মেনে নিল।

ইমাম তিরমিযী রহ.-এর নিকট কোন কলম-কাগজ ছিল না। কিন্তু শায়েখের দরসে অংশগ্রহণ করার প্রবল আগ্রহ ছিল। কিন্তু শায়েখ শর্ত আরোপ করেছেন। তাই তিনি এমন করলেন যে, সবার পিছনে বসতেন এবং এক হাঁটু দাঁড় করিয়ে বাম হাতটা তাতে রাখতেন আর ডান হাতকে এমনভাবে নাড়াতেন যে, কেউ দেখলে বুঝবে তিনি লিখছেন, যাতে শায়েখ একথা বোঝেন যে তাঁর নিকট কাগজও আছে এবং শিখছেনও।

এভাবে কয়েক দিন অতিবাহিত হল। একদিন শায়েখের নজর পড়লে তিনি দেখতে পেলেন তাঁর নিকট কাগজ-কলম কিছুই নেই। তিনি বললেন, আমি তো শর্তারোপ করেছিলাম। তুমি কাগজ-কলম ব্যতীত কেন এলে? তিনি বললেন, হযরত আপনার উদ্দেশ্য তো ছিল হাদীস সংরক্ষণ করা। এক সপ্তাহে হযরত যতগুলো হাদীস ইরশাদ করেছেন, তার সবগুলো সংরক্ষিত রয়েছে। তিনি প্রথম দিনের সকল হাদীস সকল সনদসহ বলে দিলেন। দ্বিতীয় দিনের হাদীস সনদসহ শোনালেন। এক কথায় সারা সপ্তাহের সকল হাদীস সনদসহ মুখস্থ শোনালেন। ফলে শায়েখ অত্যন্ত আনন্দিত হলেন এবং তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। তারপর বললেন, তুমি কাগজ-কলম ছাড়াই বসতে পারবে। তারপর হেফজের দশ দিন পর বললেন, প্রথম দিন এতগুলো হাদীস ছিল। আর তাদের সনদ হল এই। এভাবে সবগুলো হাদীস সনদসহ বলে দিলেন। এমন হেফজশক্তিকে কারামাত ছাড়া আর কী বলা যেতে পারে। সাধারণ হেফজশক্তিতে এমন সাধারণ হয় না।

স্মৃতির পরীক্ষা

ইমাম বুখারী রহ. একবার বাগদাদে গমন করেন। তখন মুহাদ্দিসগণের মধ্যে ব্যাপক আলোচনা হতে লাগল যে, এক নওজোয়ান এসেছেন, যিনি হাফিজুল হাদীস। তার হেফজশক্তির যে প্রসিদ্ধি ছিল, তা তারা বিশ্বাস করতে পারছিলেন

না। তাই তারা ইমাম বুখারী রহ.-এর মুখস্থশক্তির পরীক্ষা নেওয়ার ইচ্ছা করলেন। তারপর দশজন মুহাদ্দিস একত্রিত হয়ে প্রত্যেকে দশটি করে একশতটি হাদীস নির্বাচন করলেন। তারা তাকে শত হাদীসের পরীক্ষা নিতে চাইলেন। বিশাল মাহফিলের আয়োজন হল। প্রথম মুহাদ্দিস দশটি হাদীস বর্ণনা করলেন এবং সনদে উল্টা-পাল্টা করলেন। এক মতনের সনদকে অন্য মতনে ঢুকিয়ে দিলেন। এভাবে দশটি হাদীসও ওলট-পালট করলেন।

সবগুলো হাদীসে ইমাম বুখারী রহ. বলেছেন, আমি তাকে চিনি না। তারপর দ্বিতীয়জন একইভাবে ওলট-পালট করে বললেন, কোনটার সনদ আবার কোনটা মূল ইবারত একটি অপরটির ভিতর ঢুকিয়ে দিলেন। তিনি প্রত্যেক হাদীসের বেলায় বলে চললেন, আমি চিনি না, আমি চিনি না। এভাবে দশজন মিলে একশত হাদীস বর্ণনা করলেন। প্রত্যেক হাদীসের সময় ইমাম রহ. বললেন, আমি তাকে চিনি না।

ফলে মানুষ বলতে লাগল, অহেতুক প্রসিদ্ধ হয়ে গেছে মনে হয়। এই নওজোয়ানের মধ্যে না আছে হেফজশক্তি, না আছে খোদাভীরুতা। প্রত্যেক জিনিসে শুধু বলে 'আমি চিনি না'।

যখন তাদের সকলের বলা শেষ হল, তখন ইমাম বুখারী রহ. বললেন, সর্বপ্রথম মুহাদ্দিস এই বিন্যাসে দশ হাদীস বর্ণনা করলেন এবং সনদগুলো উল্টে দিলেন। শুনে নিন প্রথম হাদীসের সনদ এই, দ্বিতীয় হাদীসের সনদ এই, তৃতীয় হাদীসের সনদ এই। এভাবে দশ হাদীসের সঠিক সনদ বর্ণনা করে দিলেন। তারপর বললেন, দ্বিতীয় মুহাদ্দিস সাহেব এই দশটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। সেগুলোর মধ্যে এ খারাবিগুলো ছিল। সেগুলোর আসল সনদ এই-এই। এভাবে একশত হাদীসের বর্ণনা সহীহ সনদ দ্বারা বর্ণনা করে দিলেন। তখন সকল মুহাদ্দিসের মাথা নত হয়ে গেল এবং বলতে লাগলেন, যা শুনেছিলাম তা সত্য ছিল এবং বাস্তবে পেলাম। আর তিনি ইমামের স্তরে পৌঁছে গেছেন। ওখান থেকেই বুখারী রহ. ইমাম হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। অতএব ইমাম বুখারী রহ.-এর মেধা ও মুখস্থশক্তি, তাঁর খোদাভীরুতা, দুনিয়া ত্যাগ ও তাকওয়া কেমন যেন সূর্য হতেও প্রসিদ্ধ। এখন সারা জগদ্বাসী তাঁকে চিনে।

কিতাবের বড়ত্ব

যখন ইমামের হালত এমন, তাহলে তার রচনাবলিও তেমন হবে। অতএব বুখারী শরীফের জালালতে শান হল এই যে, সারা উম্মতে মুহাম্মাদি সেই

কিতাবকে বিনাবাক্যে গ্রহণ করে নিয়েছে এবং কিতাবুল্লাহর পরে তাকে সবচেয়ে বিশুদ্ধ কিতাব হিসেবে মেনে নিয়েছে।

কিছু আলেমের অভিমত হল, কিতাবুল্লাহর পর সবচেয়ে সহীহ কিতাব ইমাম মালিক রহ.-এর মুয়াত্তা। আর সেটি হাদীস শাস্ত্রের প্রথম সংকলন। কিন্তু মুয়াত্তা কিতাবে হাদীসের সাথে-সাথে আছার ও ফাতওয়াও রয়েছে। অতএব সেটি মিশ্রণযুক্ত। আর বুখারী শরীফে ইমাম বুখারী রহ. অনুসন্ধান করেছেন ও পরিষ্কার করেছেন। এমনকি প্রত্যেকটি বিষয়কে পৃথক-পৃথক বর্ণনা করেছেন। অধ্যায়-অধ্যায় ও পাঠ-পাঠ বিন্যাস করেছেন এবং এমন কড়া ও মজবুত শর্তারোপ করেছেন যে, অন্যান্য মতন ও সনদে এমন শর্ত পাওয়া যায় না। পরিশেষে উম্মতের ঐকমত্য হয়ে গেছে। প্রথম দরজার সনদের কিতাব হল কুরআনুল কারীম। তার সনদগুলো তাওয়াতুরের সনদ। এমন নয় যে তার রেওয়ায়েত তাওয়াতুরের বা তাওয়াতুর সনদ এবং তার সনদ জামাতবদ্ধ তাওয়াতুর। প্রত্যেক যুগেই হাজার-হাজার, লাখ-লাখ হাফেজে কুরআন বিদ্যমান ছিল। এজন্যই কুরআন জামাতবদ্ধ তাওয়াতুর। যার মধ্যে মিথ্যার অনুপ্রবেশের আশংকা হতে পারে না। তারপর হল হাদীসের দরজা।

আসমাউর রিজাল বা রাবীদের জীবনী

মুহাদ্দিসগণকে আল্লাহ তায়ালা উত্তম প্রতিদান এবং বড়-বড় মাকাম দান করুন। তাঁরা হাদীস শাস্ত্রে উম্মতের জন্য বহু বড় সামান দান করেছেন। তাঁরা হাদীস বর্ণনার ধারাবাহিকতায় পঞ্চাশ হাজার মানুষের ইতিহাস একত্রিত করেছেন, যাঁরা হাদীস বর্ণনাকারী বা রাবী। তাঁরা তাঁদের বংশ, কাজকর্ম, পেশা, মেধা, মুখস্থশক্তি ও ইনসাফ ইত্যাদি বর্ণনা করেছেন।

হাদীস মাপার পাল্লা

তারপর তাঁরা হাদীসের পরিভাষা নামে আরেকটি ভিন্ন শাস্ত্র আবিষ্কার করেন। হাদীসের স্থান ও স্তর কায়েম করেন। যদি হাদীসটি মারফু মুত্তাসিল হয় এবং রাবীদের প্রত্যেক তবকাতে সর্বনিম্ন তিন-তিনজন মানুষ থাকে, তাহলে তাকে মুতাওয়াতির বলে, যা হুকুমের ক্ষেত্রে ইয়াকিনের পর্যায়ে। তার অস্বীকারকারীকে কাফের বলা হবে। আর খবরে মুতাওয়াতিরের দ্বিতীয় স্তর হল, যার সনদের মধ্যে সাহাবা থেকে আজ পর্যন্ত সর্বনিম্ন দুজন রাবী থাকে। হ্যাঁ, কোথাও বেশি হয়ে গেলে অসুবিধা নেই। তবে দুজনের চেয়ে কম যেন না হয়, তাকে হাদীসে

মাশহুর বলে। তার হুকুম হল, জানে গালিব বা নিশ্চিত ধারণা, যা ইয়াকিনের কাছাকাছি। তৃতীয় দরজা হল খবরে ওয়াহিদ, যার রাবীর সংখ্যা সর্বনিম্ন একজন থাকে। তবে মধ্যখানে বেড়ে গেলে অসুবিধা নেই। তবে প্রত্যেক যুগেই যেন অন্তত একজন বর্ণনাকারী থাকে, ছেদ না হয়। একে খবরে ওয়াহিদ বলে, যার হুকুম সাধারণ বা মুতলাক ধারণা। এমন হাদীস অস্বীকারকারী কাফের হবে না। তবে ফাসিক অবশ্যই হবে। সে ফিসকের ন্যায় গুনাহে লিপ্ত হবে।

অতএব খবরে মারফু মুত্তাসিল তিন প্রকার হল। মুতাওয়াতির, মাশহুর ও খবরে ওয়াহিদ। তারপর সনদের মধ্যে যদি ইনকিতা বা কর্তন ও বিয়োগ আসে, তাহলে তাকে মাকতু বলে। যদি সাহাবাদের মধ্যে ইনকিতা হয়, তাহলে তাকে মুরসাল বলে। আর যদি ধারাবাহিক দুজন রাবীর মধ্যে ইনকিতা হয়, তাহলে তাকে মুদাল বলে। মোটকথা, হাদীসের প্রকারভেদ করা হল যে, হাদীসের মাশহুর, মুতাওয়াতির, মুদাল, মুশকিল, মুজমাল ও মাজহুল। প্রতিটির পৃথক-পৃথক স্তর বলে দেওয়া হল যে, কোন্‌টি কোন্ পর্যায়ের এবং তার হুকুম কী? মোটকথা, মুহাদ্দিসীনে কেরাম এমন মাপদণ্ড বানিয়েছিলেন যে, কোন লোভী যাতে এদিক-ওদিক না করতে পারে। ওই কাটা এমন কাটা যে, তার দ্বারা মেপে পানি ও দুধকে পৃথক করা যাবে এবং পরিচ্ছন্ন করা যাবে।

হাদীসসমূহ নির্বাচন

হাদীস নির্বাচনে হযরত ইমাম বুখারীর রহ. অনেক যাচাই-বাছাই করেছেন। তিনি সাত লাখ হাদীস থেকে মাত্র সাত হাজার হাদীস নির্বাচন করেছেন। যদি মুকাররারাতকে ধরা হয়, তাহলে সাত হাজার হয় আর বাদ দিলে চার হাজারের কিছু বেশি হয়। মোটকথা, কিতাবও জলিলুল কদর, তার রচয়িতাও জলিলুর কদর।

শানে কবুলিয়্যাত

স্বয়ং ইমাম বুখারী রহ. বলেন, جَعَلْتُهُ بَيْنِيْ وَبَيْنَ اللهِ حُجَّةً 'আমি এই কিতাবকে আমার ও আল্লাহর মাঝে হুজ্জত নির্ধারণ করলাম।' হুজ্জত তথা প্রমাণপত্র ও সনদ দ্বারা মুকাদ্দামার নিষ্পত্তি হয়, মানুষ কামিয়াব হয় এবং গ্রহণযোগ্য হয়।

এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল, গ্রহণযোগ্যতার জন্য এ কিতাবকে প্রামাণ্য দলিল নির্ধারণ করলাম। ইনশাআল্লাহ স্বয়ং মুসান্নিফ (লেখক)-ও মাকবুল এবং যারা হুজ্জত

জেনে এ কিতাব অধ্যয়ন করবে, ইনশাআল্লাহ তারাও আল্লাহর নিকট মাকবুল হবেন। এ কিতাব তাদের জন্য প্রমাণপত্র। এমনটিই এ কিতাবের শান।

কিতাবের আলোচ্যবিষয়

কিতাবের আলোচ্যবিষয় রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কালাম ও কর্ম বা আমলসমূহ। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মোবারক যবানে যা ইরশাদ করেছেন বা আমল করে দেখিয়েছেন অথবা কারো আমলের প্রতি রেজামন্দি প্রকাশ করে নীরব রয়েছেন এগুলো হাদীস বলে গণ্য।

ইসমতে আম্বিয়া বা নবীদের নিষ্পাপতা

নবীর কথা ও কাজকে শরীয়ত বলে। এজন্য নবীদের দীনের ব্যাপারে মাসুম হিসেবে সৃষ্টি করা হয়েছে। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকিদা হল, নবীগণ নবুওয়াত পাওয়ার পূর্বেও মাসুম এবং পরেও মাসুম। আর মাসুম ও নিষ্পাপ হওয়ার দ্বারা উদ্দেশ্য এই নয় যে, তাদেরকে অপারগ করে দেওয়া হয়েছে যে, তারা যেন পাপ না করেন। পাপ করার সকল শক্তি ও আসবাব বিদ্যমান; কিন্তু নফস বিরোধিতার শক্তি এত প্রবল যে, সাধারণ কাজও মাওলার সন্তুষ্টির বিপরীতে হতো না। নফসের শক্তি এবং নফসের প্রতিযোগিতার শক্তি এত অধিক পরিমাণে ছিল যে, খায়েশের আশংকাও রহিত হয়ে যেত। বরং একথা বলা যেতে পারে যে, নবীদের নফস বা আত্মা এত বেশি প্রশান্ত হত যে, নফসের মধ্যে যা খায়েশ আসত, তাও পাক-পবিত্র আসত। অপবিত্র ও নাপাক আসত না; এমনই পবিত্র ও পরিষ্কার করে নবীদের অন্তরকে সৃষ্টি করা হতো। যেমনটি হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রা. বলেছেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার শান এক বিস্ময়কর শান–

إِنَّ رَبَّكَ يُسَارِعُ فِي هَوَاكَ

আপনার প্রত্যেকটি খায়েশ পুরা করতে আল্লাহ তায়ালা এত তাড়াতাড়ি করেন যে, একদিকে অন্তরে খায়েশ পয়দা হয় আর অপরদিকে পুরা হয়ে যায়।

একথার অর্থ হল, নবীর অন্তরের খায়েশই পূত-পবিত্র। যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শূন্য তবিয়তে ছেড়ে দেওয়া হবে তো তবিয়ত ভালর দিকেই যাবে। খারাপের দিকে যাবে না। অতএব ভাল গালিব ও বিজয়ী হয়

আর খায়েশ তার অধীনে থাকে। প্রত্যেকটি খায়েশে নবীদের সর্বদা নজর থাকে আল্লাহ তায়ালার রেজামন্দির প্রতি। খারাপ ও মন্দ খায়েশ তাঁদের অন্তরে আসেই না। তাই তো বলা হয়েছে–

إِنَّ رَبَّكَ يُسَارِعُكَ فِي هَوَائِكَ

হেফাজতে আউলিয়া বা অলিদের পাপ হতে বেঁচে থাকা

নবীদের উসিলায় এবং তাদের জুতা মোবারকের বরকতে তাদের খাদেমদের থেকেও এমন ব্যক্তিত্ব পয়দা হন, যাদের অন্তর মুতমাইন থাকে এবং তাদের প্রতিটি খায়েশই পূত-পবিত্র হয়। যেমনটি হাদীস শরীফের হযরত উমর রা. সম্পর্কে বলা হয়েছে–

اَلْحَقُّ يَنْطِقُ عَلٰى لِسَانِ عُمَرَ

উমরের যবান সত্য বলে।

دَارَ الْحَقُّ مَعَه حَيْثُ دَارَ

উমর যেদিকে যান, হকও সেদিকে যায়।

কথা ছিল তো এমন হওয়ার যে, যেদিকে হক যাবে সেদিকে উমর যাবে। কিন্তু বলা হচ্ছে, যেদিকে উমর যাবেন সেদিকে হক যাবে। এটি হল সর্বোচ্চ মাকাম। আর সূচনাকারীর মাকাম হল এই যে, যেদিকে হক যাবে সেদিকে সূচনাকারী থাকে। কিন্তু যখন মশক ও অনুশীলনীর পরে সর্বোচ্চ হয় তারপর সে যেদিকে যাবে হক সেদিকে যাবে। এ কারণেই তাদের অন্তর পবিত্র এবং মুতমাইন বনে যায়, তখন তাতে ওই জিনিস আসে যা হক হয়। না হক বস্তু আসে না।

নবীদের খাদেমদের মধ্যে এমন ব্যক্তি রয়েছে যে, সে যেদিক ঝুঁকে পড়বে হকও সেদিকে ঝুঁকবে। তাহলে নবীদের শান তো আরো অনেক উঁচু ও উর্ধ্বে। মোটকথা, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কথা ও কর্ম এবং নীরবতা সবই শরীয়ত। কেননা, তিনি পাকই পাক এবং ভালই ভাল। তাই নাপাক ও মন্দ বের হতে পারে না। অতএব ইলমে হাদীসের আলোচ্যবিষয় হল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কথা, আমল ও সম্মতি।

কিতাবের উদ্দেশ্য

বুখারী পাঠের উদ্দেশ্য কী? আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা, পরকালের সফলতা এবং ইহকালের কল্যাণ লাভ। উভয় জগতের কামিয়াবী অর্জন করতে হলে মানুষকে

হাদীসের ইলমের প্রতি মনোনিবেশ করতে হবে। এ বিষয়টি সম্পূর্ণ এমন যে, আমি, আপনি ও দুনিয়ার সকল মানুষ নবীর উছিলা ব্যতীত আল্লাহ পর্যন্ত পৌছতে পারব না।

হাদীসের উছিলা বা হাদীসের মাধ্যম

মাঝখানে নবীদের মাধ্যম না হলে কেউ আল্লাহ পর্যন্ত পৌছতে পারে না। এটি নবীদের সদকা যে তারা মধ্যস্থতা করে বান্দাদের আল্লাহর সাথে জুড়ে দেন। অতএব নবীগণ এদিক থেকে মাধ্যম ওদিক থেকেও মাধ্যম। এদিকে মাখলুক হিসেবে গণ্য অপরদিকে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎকারী। তাই মাঝখানে যারা আসবে, তাদেরকে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক করাবেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মাধ্যম ব্যতীত কোন মানুষ আল্লাহ পর্যন্ত পৌছতে পারবে না।

তেমনিভাবে মানুষের ইলমি কালাম কুরআনের সাথে মিলতে পারে না যতক্ষণ না মধ্যস্থলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কালাম তথা হাদীস মাধ্যম হয়। হাদীসে নববী কুরআন হতে নিয়ে ফুকাহাদের দেওয়া হয়। তাই ফকীহর কালাম ও কুরআনুল কারীম এর মধ্যস্থলে হাদীস না হলে ফকীহর কালাম কুরআনের সঙ্গে মিলবে না। যেমন এক আল্লাহর সাথে নবীর মাধ্যম ব্যতীত সম্পর্ক করতে পারে না। তেমনিভাবে মানুষের কালাম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কালামের মাধ্যম ছাড়া আল্লাহর কালামের সাথে জুড়তে পারে না। সুতরাং হাদীস মাঝখানে মধ্যস্থতাকারী কুরআন থেকে নেয় এবং ফকীহদের প্রদান করে।

বয়ানুল কুরআন

এ কারণে হাদীসকে বয়ানুল কুরআন বলা হয়েছে। একটি হল কুরআন এবং আরেকটি হল বয়ানুল কুরআন তথা কুরআনের অর্থ। কুরআনুল কারীম হল এমন শব্দাবলি ও বাক্যাবলির নাম, যেগুলো আল্লাহর পক্ষ হতে নাযিল হয়েছে। তার অর্থও আল্লাহর পক্ষ থেকে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মোবারক অন্তরে নাযিল করা হয়েছে। অতএব কুরআন শব্দ ও অর্থ উভয়ের সমষ্টি। তার শব্দও আল্লাহর পক্ষ হতে নাযিলকৃত, অর্থও আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত। এমন নয় যে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের চিন্তা-ফিকির দ্বারা কুরআনের অর্থ নির্ধারণ করেছেন যে, তার অর্থ এমন হতে পারে। কুরআনের অর্থ ও মর্মকে আল্লাহ তায়ালাই সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন।

অতএব শব্দ ও অর্থ উভয়টিই আল্লাহপ্রদত্ত। প্রাথমিক অবস্থায় যখন ওহী নাযিল হত, তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বারবার পড়তে থাকতেন যেন ভুলে না যান। তখন আল্লাহ তায়ালা বললেন–

لَا تُحَرِّكْ بِهٖ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهٖ ۝١٦

তাড়াতাড়ি শিখে নেওয়ার জন্য আপনি বারবার ওহী পাঠ করবেন না।

আপনি তাড়াহুড়া করবেন না। আপনার কি ভুলে যাওয়ার ভয় হচ্ছে?

তারপর তিনি ইরশাদ করলেন–

اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهٗ وَقُرْاٰنَهٗ ۝١٧

কুরআনকে আপনার বক্ষদেশে জমানো আমার দায়িত্ব এবং আপনার যবান মোবারকে পাঠ করাও আমার দায়িত্ব।

এ নিয়ে কোন চিন্তা করবেন না। তারপর বললেন–

فَاِذَا قَرَاْنٰهُ فَاتَّبِعْ قُرْاٰنَهٗ ۝١٨

তারপর যখন আমি পাঠ করি নিজে বা কারো মধ্যস্থতায় তখন আপনি শ্রবণ করতে থাকুন।

শুধু কর্ণ মোবারক দ্বারা আকর্ষণ করুন; চিন্তা করতে হবে না। না আকলকে দৌড়াতে হবে, না ইন্দ্রিয়কে ব্যবহার রতে হবে। আপনি আকর্ষণ করুন। পরবর্তীতে তা জমা করা তথা মুখস্থ করানো, পাঠ করানো এগুলো আমার দায়িত্ব। অতএব কুরআনের শব্দাবলি মুখস্থ করানো এবং যবানে পাঠ করানোর গ্যারান্টি আল্লাহ তায়ালা দিয়ে দিয়েছেন। তারপর আবার বললেন–

ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهٗ ۝١٩

তারপর তার বিশদ বর্ণনা আমারই দায়িত্ব যে, তার অর্থ কী? তার মতলব কী? তার উদ্দেশ্য কী? *[সূরা কিয়ামাহ : ১৬-১৮]*

অতএব নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআনের শব্দাবলি ও অর্থসমূহ উভয়টির আমানতদার। তিনি পুরোপুরি আমানতদারির সাথে আল্লাহর কালামকে মানুষের নিকট পৌঁছে দিয়েছেন এবং আল্লাহর কালামের অর্থ ও উদ্দেশ্যগুলোও পৌঁছে দিয়েছেন।

হাদীসের গুরুত্ব ও তাৎপর্য

কুরআনুল কারীম আর ফকীহদের কালাম উভয়ের মাঝে মধ্যস্থতাকারী হল হাদীস। উভয় কালামের মাঝখানে হাদীস না হলে ফকীহদের কালাম হাদীসের সাথে জোড়া লাগে না। যেমনভাবে বান্দা ও আল্লাহর মাঝে নবীদের মধ্যস্থতা না হলে কোন বান্দা আপন খোদার সঙ্গে সম্পর্কে করতে পারে না। এজন্যই ইসলাম ও শরীয়তের মধ্যে হাদীসশাস্ত্রের গুরুত্ব রয়েছে। হাদীসশাস্ত্র পৃথিবীতে সবচেয়ে উন্নত ও প্রসিদ্ধ শাস্ত্র হিসেবে পরিগণিত। হাদীস শাস্ত্রের সবচেয়ে উন্নত ও গুরুত্বপূর্ণ কিতব হল ইমাম বুখারীর সহীহ বুখারী শরীফ, যাকে ইমাম বুখারী রহ. আল্লাহ ও বান্দার মাঝে হুজ্জত নির্ধারণ করেছেন। সেই কিতাব আজ শুরু হচ্ছে। এই কিতাবের প্রারম্ভে কয়েকটি আলোচনা রয়েছে, যেগুলো আসাতিজায়ে কেরামগণ আলোচনা করে থাকেন।

হাম্‌দ ও সালাত দ্বারা শুরু না করার কারণ

প্রথম কথা হল, সাধারণত সকল কিতাব হাম্‌দ ও সালাত দ্বারা শুরু করা হয়। হাদীসে বর্ণিত খুতবা থাকে। যেমন–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ ...

তাতে হামদও আছে সালাতও আছে এবং নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর দরূদ ও সালামও আছে। ইমাম বুখারী রহ. এই তরিকা অবলম্বন করেননি বরং শুধু বিসমিল্লাহ দ্বারা শুরু করলেন।

তাই সন্দেহ ও প্রশ্ন জাগে, ইমাম বুখারী রহ. প্রচলিত সাধারণ পদ্ধতিবিরোধী কাজ কেন করলেন? কিন্তু বাস্তবে এটি কোন প্রশ্ন বা অভিযোগ নয়। কারণ, সর্বপ্রথম এ প্রশ্ন করা হবে যে, উক্ত অভিযোগের মানশা কী? এবং ইমাম বুখারী রহ. কেমন হাদীস ও নস (বিধান)-এর বিরোধিতা করেছেন?

সুস্পষ্টত তিনি একটি প্রথার খেলাফ করেছেন। আর রেওয়াজ তো অকাট্য দলিল নয় যে, ইমাম তার অহেতুক পাবন্দী বা অনুসরণ করবেন। তাহলে ইমামের আসল উদ্দেশ্য বা মানশা কী? আসল মানশা হিসেবে নিম্নের কথাগুলো বলা হয়ে থাকে–

كُلُّ اَمْرٍ ذِىْ بَالٍ لَمْ يُبْدَأْ بِاسْمِ اللّٰهِ فَهُوَ اَقْطَعُ

যে সকল শানদার কাজ আল্লাহ তায়ালার নামে শুরু করা হয় না, সেগুলোর বরকত কর্তন করা হয়।

এই ছিল দলিল ও হুজ্জত।

কিন্তু এ হাদীসটি ছয় তরিকায় বর্ণিত হয়েছে। তার কালিমাগুলোর আকৃতি ভিন্ন-ভিন্ন। একটি রূপ হলো–

كُلُّ اَمْرٍ ذِىْ بَالٍ لَمْ يُبْدَأْ بِاسْمِ اللهِ فَهُوَ اَقْطَعُ

দ্বিতীয় আকৃতি হলো–

كُلُّ اَمْرٍ ذِىْ بَالٍ لَمْ يُبْدَأْ بِاسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ فَهُوَ اَقْطَعُ

তৃতীয় আকৃতি–

كُلُّ اَمْرٍ ذِىْ بَالٍ لَمْ يُبْدَأْ بِذِكْرِ اللهِ تَعَالٰى فَهُوَ اَقْطَعُ

তেমনিভাবে আরো তিনটি রূপে বর্ণিত হয়েছে। তবে সম্মিলিতরূপ হল জিকরুল্লাহর দ্বারা শুরু করা। তাতে বিসমিল্লাহও এসেছে, ইসমুল্লাহও এসে গেছে এবং জিকরুল্লাহও এসে গেছে। আর ইমাম বুখারী রহ. তো বিসমিল্লাহ দ্বারা শুরু করেছেন। তাহলে তাতে অভিযোগের কী আছে? আর বিসমিল্লাহর ভিতর জিকরুল্লাহও আছে, উত্তম জিকির আছে।

তারপর অভিযোগকারীগণ সন্দেহ করছেন, মুসান্নিফ রহ. হাম্‌দ ও সালাত কিতাবে লিখলে অসুবিধা কী ছিল? এখানে প্রশ্ন জাগে, না লিখলে অসুবিধা কী?

হাদীস শরীফে এসেছে–

كُلُّ اَمْرٍ ذِىْ بَالٍ لَمْ يُبْدَأْ بِذِكْرِ اللهِ تَعَالٰى فَهُوَ اَقْطَعُ

প্রত্যেক শানদার কাজ যাকে জিকরুল্লাহ দ্বারা শুরু করা হয়নি, তাতে বরকত হয় না।

এখানে হাদীসে لَمْ يُبْدَأْ শব্দটি এসেছে لَمْ يُكْتَبْ (লেখা হয়নি) শব্দ আসেনি। অতএব একথা বলা হয়নি যে, প্রত্যেক শানদার কাজের শুরুতে বিসমিল্লাহ না লিখলে বরকত কাটা হয়। তাই চাই যবান দ্বারা শুরু করুন, চাই লেখার দ্বারা শুরু করুন, চাই অন্তর দ্বারা শুরু করুন সর্বাবস্থায় হাদীসের উপর আমল হয়ে যাবে। সুতরাং এমন হতে পারে যে, তিনি হাম্‌দ ও সানা লিখেননি বরং যবানে বলে নিয়েছেন।

প্রতিটি হাদীসের শুরুতে আজকারে আশারাহ্ বা দশ জিকির

আমি তো বলি, প্রত্যেক হাদীসের শুরুতে আজকারে আশারাহ করেছেন, যা অন্য কোন কিতাবে দেখিনি। কিন্তু তা হাদীস শাস্ত্রের কায়দা-কানুনের বিপরীত নয়। বিভিন্ন রাবী লিখেছেন, বুখারী রচনায় ইমাম বুখারীর রহ.-এর তরিকা ছিল এমন যে, তিনি পবিত্র মক্কাতে সুদীর্ঘ ১৬ বছর অবস্থান করেছিলেন এবং সেখানে বসে বুখারী সমাপ্ত করেন। মক্কায় অবস্থানকালে তিনি বিভিন্ন স্থানে সফর করেন। কিন্তু অবস্থান করতেন মক্কা মুকাররামাতে। সেখানে বসে তিনি কিতাব সমাপ্ত করেছেন। তিনি বুখারী শেষ করেছেন এভাবে যে, প্রত্যেক হাদীস লেখার পূর্বে গোসল করতেন। তারপর দুই রাকাত নফল নামায পড়তেন। তারপর যখন পূর্ণরূপে হল্ হত তখন হাদীস লিখতেন।

সুতরাং তিনি প্রতিটি হাদীসের শুরুতে গোসল করতেন, নামায পড়তেন। তার ভিতর বিসমিল্লাহ আছে, আউযুবিল্লাহ আছে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর দরূদ ও সালাম আছে, তাকবির আছে, হাম্দ আছে, তাসবিহ আছে, তাহলিল তথা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ আছে; যেগুলোকে আজকারে আশারাহ বলে। এটি দীনের মধ্যে প্রসিদ্ধ আছে। নামাযে সকল জিকির জমা করা হয়েছে এবং তাতে ইতায়াত ও ইবাদতের সব অবস্থা বিরাজমান। তাই আমি বলি, আপনারা বলে থাকেন যে, ইমাম বুখারী রহ. তাঁর কিতাব জিকরুল্লাহ দ্বারা শুরু করেননি। আমি বলি, ইমাম বুখারী রহ. প্রতিটি হাদীস নামায এবং আজকারে আশারাহ দ্বারা শুরু করেছেন। তার চেয়ে বেশি আপনারা আর কী চান? যদিও তিনি কিতাবে আজকারে আশারাহ লিখেননি কিন্তু প্রত্যেক হাদীসের শুরুতে আজকারে আশারাহ করেছেন। তা করা ব্যতীত হাদীস লিখেননি।

আর হাদীসে তো لَمْ يَبْدَأْ শব্দ এসেছে لَمْ يَكْتُبْ শব্দ আসেনি। তাই তিনি শুরু এভাবে করেছেন যে, প্রত্যেক হাদীস লেখার পূর্বে নামায পড়তেন এবং প্রত্যেক নামাযে সকল জিকির আদায় করতেন। তো আপনারা বলুন, ইমাম বুখারী জিকির দ্বারা শুরু করেনি আর আমি বলি তিনি প্রত্যেক হাদীসকে আজকারে আশারাহ দ্বারা শুরু করেছেন। তার কোন নজির পেশ করেন। অতএব এটি কোন অভিযোগ হতে পারে? মোটকথা, এতে মুসান্নিফের উপর কোন প্রকার সন্দেহ থাকতে পারে না।

কিতাব শুরু করতে ইত্তেবায়ে সুন্নাতের গুরুত্ব

এখন যদি কেউ আরেকটু অগ্রসর হয়ে প্রশ্ন করে যে, আজকারের মধ্যে বিসমিল্লাহও শামিল এবং আলহামদুলিল্লাহও শামিল, তাহলে তিনি শুধু বিসমিল্লাহকে কেন খাস করলেন? الحمد لله نحمده কেন লিখলেন না? এমন প্রশ্ন ছাত্রসুলভ প্রশ্ন যে, তিনি কেন লিখেননি? শুধু বিসমিল্লাহ কেন লিখলেন?

আমি বলি, এখানেও ইমাম বুখারী রহ. সুন্নাতের অনুসরণ করেছেন। কারণ, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অভ্যাস ছিল, যখন তিনি মিম্বরে ওয়াজ ও খুতবা দিতেন, তখন পূর্ণ খুতবায়ে মাসুরা পড়তেন–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ

কিন্তু যখন সুলতানদের নিকট দাওয়াতে ইসলামের ফরমান পাঠাতেন, তখন তাতে শুধু বিসমিল্লাহ লিখতেন। তারপর লিখতেন–

مِنْ مُحَمَّدِ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ إِلٰى فُلَانٍ إِلٰى فُلَانٍ

অতএব রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অভ্যাস ছিল খুতবা এবং ওয়াজ করার শুরুতে পূর্ণ খুতবায়ে মাসুরাহ পড়তেন আর ফরমান লেখার সময় শুধু বিসমিল্লাহতে যথেষ্ট করতেন। সুতরাং ইমাম দেখলেন, হাদীস তো আসলে একটি ফরমান যা উম্মতের নামে পাঠানো হয়েছে। তাই তিনি স্রেফ বিসমিল্লাহর দ্বারা শুরু করলেন।

তরজমাতুল বাব ও হাদীসের মধ্যে সম্পর্ক

এখানে একটি প্রশ্ন জাগে, অধ্যায় কায়েম করা হয়েছে كَيْفَ كَانَ بَدْءُ الْوَحْيِ ওহী কিভাবে শুরু হয়েছে? আর হাদীস আনা হয়েছে إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ আর পরবর্তী হাদীসে ওহীর কাইফিয়্যাত বর্ণনা করা হয়েছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন আমার উপর ওহী দুভাবে আসে। ঘণ্টা বাজানোর পর যে গুঞ্জন সৃষ্টি হয় তেমন কিসিমের আওয়াজ শুনতে পাই। তা থেকে পরে শব্দ সৃষ্টি হয় এবং পৃথক-পৃথক হয় তথা সুস্পষ্ট হয়। অতএব অধ্যায়ের সাথে সম্পর্ক রাখতে হলে পরবর্তী হাদীস ওহীর হাদীস আনার প্রয়োজন ছিল। তো নিয়তের হাদীস কেন উল্লেখ করা হল? তাই এখানে প্রশ্ন জাগে, তাহলে তো তরজমাতুল বাব এবং প্রথম হাদীসের মধ্যে মুনাসাবাত কায়েম হল না। অথচ মুসান্নিফ রহ.-এর নিয়ম হল, যে বিষয়ের হাদীস আনেন সেই বিষয়ের অধ্যায়

কায়েম করেন। তাহলে হাদীস ও তরজমাতুল বাবের মধ্যে পরিপূর্ণ মুনাসাবাত হত। এখানে সুস্পষ্ট মুনাসাবাত বুঝে আসে না। কোথায় ওহী শুরু করা আর কোথায় আমলের নিয়ত।

কিন্তু গভীর চিন্তা করলে দেখা যাবে, কামেল মুনাসাবাত রয়েছে। আর তা এভাবে যে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মোবারক অন্তরে যখন ওহী আসত, তখন তাঁর অন্তরে প্রথমে এমন আগ্রহ পয়দা হত যে, যথাসম্ভব তা তাড়াতাড়ি উম্মতের মাঝে পৌঁছাব। এমনটিই হত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিয়ত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিয়ত থাকত ওহীকে বহন করব এবং উম্মতের জন্য ওহীকে আদায় করব। ওহী নাযিল হওয়ার প্রাক্কালে নবীদের উক্ত দুটি নিয়ত থাকত। এতে বুঝা গেল, ওহী নাযিল হওয়ার সময় সর্বপ্রথম যে জিনিসটি নবুওয়াতের অন্তরে আসত, তা হল নিয়ত বা ওহী বহন করা। অতএব بَدْءُ الْوَحْيِ এর পূর্ণ মুনাসাবত কায়েম হল إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ এর সাথে এভাবে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মোবারক কলবে ওহী নাযিল হওয়ার সময় এই নিয়ত থাকত যে, আমি তা বহন করব। এ কারণেই তিনি বারবার পড়তে থাকতেন, যা থেকে আল্লাহ তায়ালা বিরত রেখেছেন–

لَا تُحَرِّكْ بِهٖ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهٖ

হে নবী! আপনি তাড়াহুড়া করবেন না, আমি আপনার কলব মোবারকে জমা করে দিব।

অতএব কলব মোবারকে প্রথমে এই নিয়ত পয়দা হত যে, আমি এই ওহীকে নিজের ভিতর প্রবেশ করাব এবং এমনভাবে ইয়াদ করব, যাতে ভুলে না যাই। তো সর্বপ্রথম নবীর অন্তরে এ নিয়ত উদয় হত যে, আমি এই ওহীকে বহন করব এবং নিজের ভিতর ঢুকাব আর তাকে আত্মার অংশ বানাব।

তারপর দ্বিতীয় নিয়ত হত, তাকে উম্মতের নিকট পৌঁছাব এবং এই আমানতকে আদায় করব।

উক্ত আলোচনা দ্বারা প্রমাণিত হল, ওহীর সঙ্গে নিয়তের পুরোপুরি সম্পর্ক রয়েছে। নবীর উপর যখন ওহী আসত, তখন সর্বপ্রথম তার অন্তরে নিয়ত নির্ধারণ হত। এ কারণে যদি كَيْفَ كَانَ بَدْءُ الْوَحْيِ অধ্যায়ের পর নিয়তের হাদীস এনে থাকে, তাহলে পরিপূর্ণ মুনাসাবাত হয়েছে এমন হাদীসই আনা উচিত।

অতএব পূর্ণ মুনাসাবাত কায়েম হয়েছে বিধায় কোন সন্দেহ ও অভিযোগ অবশিষ্ট থাকল না।

ওহীর শুরুটা কিভাবে হয়েছে? কিভাবে ওহী এসেছে? এটি তো আল্লাহর কাজ যে, তিনি কিভাবে ওহী পাঠিয়েছেন? নবীর কাজ হল যখন তার নিকট ওহী আসত তো তিনি কী নিয়ত করতেন? তিনি নিয়ত করতেন, ওহী বহনও করব এবং তা আদায়ও করব। অতএব ওহী ও নিয়তের মধ্যে পূর্ণ মুনাসাবাত রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ আপনার সামনে যদি কুরআনের ওহী রাখা হয় অথবা হাদীসের ওহী রাখা হয়, তাহলে সর্বপ্রথম আপনার অন্তরে নিয়তই তো আসবে যে তাকে মেনে নিব। মেনে নেওয়ার পর এই নিয়ত আসে যে, তার উপর আমলও করব, তার বারাকাত ও ফায়দাসমূহও হাসিল করব। সুতরাং ওহীর নিয়তের সাথে প্রথম পর্যায়ের সম্পর্ক। তাই প্রথম আসবে ওহী, তারপর নিয়ত।

ইমামের তাফাক্কুহ বা ফেকাহর জ্ঞান

ইমাম বুখারী রহ. كَيْفَ كَانَ بَدْءُ الْوَحْيِ এর অধ্যায় কায়েম করে তারপর إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ হাদীস উল্লেখ করেছেন। এতে উভয়ের মাঝে পূর্ণ মুনাসাবাত বা সম্পর্ক জাহির হয় যে, ওহী হল প্রথম নম্বর আর নিয়ত হল দ্বিতীয় নম্বর। উভয়ের ভিতর পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য হল। এ কারণেই بَدْءُ الْوَحْيِ এর অধীনে উল্লিখিত হাদীস উল্লেখ করা স্থান উপযোগী প্রমাণিত হল। এতে ইমাম বুখারীর ইলমে ফিকহের আন্দায করা যায়। তিনি শুধু মুহাদ্দিস ছিলেন না বরং ফকীহও ছিলেন। তাঁর সামনে শুধু রেওয়ায়াত (বর্ণিত জ্ঞান) ছিল না বরং দিরায়াত (বুদ্ধিগত জ্ঞান)ও ছিল। স্রেফ হাদীসের শব্দাবলিই সামনে ছিল না বরং হাদীসের অর্থ, তার হাকায়েক এবং মারেফতও তাঁর অন্তরে বিদ্যমান ছিল। অতএব তিনি ইলমে রেওয়ায়াত ও ইলমে দিরায়াত উভয়ের সমষ্টি ছিলেন। এজন্যই উলামায়ে কেরাম লিখেন, যদি ইমাম বুখারীর ফিকাহ দেখতে চাও, তাহলে তার কিতাবের তরজমাতুল বাবগুলো দেখে নাও। উদাহরণস্বরূপ এই বাব (অধ্যায়) كَيْفَ كَانَ بَدْءُ الْوَحْيِ, باب الصلوة ও باب الايمان ইত্যাদি। আর নিচে বর্ণনাগুলো নিয়ে এসেছেন। সুতরাং ইমাম বুখারীর রহ. ফিকাহ দেখতে হলে তাঁর কিতাবের বাব ও তরজমাগুলো দেখতে হবে; তাহলে অনুমান করা যাবে।

ইমামের ইজতেহাদের মর্যাদা

এজন্যই ইমাম বুখারী রহ. ইজতিহাদের মর্যাদা রাখেন। তবে প্রসিদ্ধ আছে যে, তিনি শাফীঈ মাযহাব অনুসারী ছিলেন। তাঁর অধিকাংশ আমল শাফীঈ মাযহাব অনুযায়ী হত। কিন্তু যখন হাদীসসমূহে গবেষণা করা হয় এবং তাঁর মতামত লক্ষ করা হয়, তো দেখা যায় কিছু অভিমতে ফিকহে হানাফীকে প্রাধান্য দেন, কতেকে ফিকহে শাফীঈকে এবং কিছুতে ইমাম মালেক রহ.-এর ফিকাহকে প্রাধান্য দেন। এভাবে তিনি বিভিন্ন মাযহাবের প্রাধান্য বর্ণনা করেন, যা দ্বারা বুঝা যায়, তিনি নিজেই একজন মুজতাহিদ এবং তাঁর নিজস্ব একটি অভিমত রয়েছে। অতএব তিনি নিজে শুধু মুকাল্লিদই নন বরং মুজতাহিদও। চাই তার ইজতিহাদ যে স্তরের হোক কিন্তু তা তো ইজতিহাদই বটে। সুতরাং তাঁর ফিকহী যোগ্যতা তাঁর তারাজিম ও অধ্যায়গুলো দেখলে বুঝে আসে।

তাই আমি বলি كَيْفَ كَانَ بَدْءُ الْوَحْيِ এটি হল তরজমা এবং তার নিচে إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ এর হাদীস এনেছেন। তা দ্বারা তাঁর ফিকহী জ্ঞান অনুমান করা যায় যে, ওহী ও নিয়তের কেমন সামঞ্জস্য তাঁর অন্তরে এসেছিল যে, তিনি ওই হাদীসই উল্লেখ করলেন, যা بَدْءُ الْوَحْيِ এর সাথে অধিক সম্পর্কযুক্ত ও মুনাসাবাত রাখে। সুতরাং ইমাম বুখারী রহ. যদি বিসমিল্লাহ দ্বারা শুরু করেন, তাহলে সুন্নাতের ইত্তেবা করেছেন। আর কিতাবের শুরুতে ওহীর শুরুর আলোচনা এনে তিনি শরীয়তের মূল মগজ উল্লেখ করেছেন, যার মাকাম প্রথম পর্যায়ে। তারপর بَدْءُ الْوَحْيِ এর সাথে নিয়তের হাদীস আনার দ্বারা তার ফিকহি ইলম বুঝা যায়, ওহীর সাথে নিয়তের কত গভীর সম্পর্ক।

হাদীসের বিশদ ব্যাখ্যা

তারপর হাদীস বর্ণনা করলেন–

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ

(অনুবাদ পূর্বে করা হয়েছে)

মৌলিক পূর্ণাঙ্গ কথা

উল্লিখিত হাদীসের তিনটি অংশ আছে। প্রথম অংশ–

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

এটি একটি আছলে কুল্লি, যাতে নির্ধারিত কোন ইশারা নেই। উক্ত কথার সারকথা হল, আমল নিয়ত অনুযায়ী। নিয়ত ভাল, আমল ভাল। নিয়ত খারাপ আমল খারাপ। আমল নিয়তের অনুগামী।

কতক উলামা বলেছেন–

إِنَّمَا ثَوَابُ الْأَعْمَالِ بِالنِّيَّاتِ

আমলের দ্বারা যে প্রতিদান ও সাওয়াব মিলে তা নিয়তের দ্বারাই মিলে।

আর কতক বলেন–

إِنَّمَا صِحَّةُ الْأَعْمَالِ بِالنِّيَّاتِ

যতক্ষণ না নিয়ত সহীহ হবে ততক্ষণ আমল শুদ্ধ হবে না।

প্রত্যেকের ব্যাখ্যাতেই অভিযোগ আছে। কারণ, শরীয়তে কিছু আমল এমন রয়েছে, যেগুলোর মধ্যে নিয়ত না হলে শরীয়ত তা গ্রহণ করে নেয়, মেনে নেয়। একজন নাপাক ব্যক্তি যার উপর গোসল করা ফরজ সে নিয়ত ছাড়া পানিতে সাঁতার কেটেছে, ডুব দিয়েছে তো শরীয়ত তার আমলকে গ্রহণ করে নেয়, সে পাক হয়ে যাবে এবং নামায আদায় করতে পারবে। অথবা একজন ওজু করল নিয়ত করল না, তবুও তার ওজু নামাযের চাবি হবে, শরীয়ত সেই অজুকে গ্রহণযোগ্য মনে করে। অতএব একথা বলা যে, নিয়ত ব্যতীত আমল সহীহ হবে না এটি চলার মত উসূল ও বিধান নয়। কারণ, অনেক আমল এমন আছে, যেগুলো সহীহ হয়ে যায় এবং শরীয়ত সেগুলোকে গ্রহণ করে নেয় অথচ নিয়ত করে না।

তবে এ বিষয়টি জরুরি যে, আমলের সাওয়াব ততক্ষণ পর্যন্ত মিলবে না যতক্ষণ না নিয়ত হবে। যদিও নিয়ত ছাড়া অজু হয়ে যাবে এবং নামাযের চাবিও হয়ে যাবে; কিন্তু সাওয়াব পাবে না যতক্ষণ না তাকাররুবের (আল্লাহর নৈকট্য লাভের) নিয়ত করবে। নামাযও সেই পর্যায়ে সহীহ হয়ে যাবে।

তার চেয়ে বেশি সাধারণ কথা হল, যেমন নিয়ত তেমন আমল, নিয়ত ভাল তো আমল ভাল। নিয়ত খারাপ তো আমল খারাপ। অতএব صِحَّةُ وَوُجُوْدُ الْاَعْمَال الْاَعْمَال ব্যাখ্যা সহীহ নয়। তবে ثَوَابُ الْاَعْمَال এমন পর্যায়ে সহীহ হতে পারে। অথবা গ্রহণযোগ্য শব্দ উহ্য ধরে বলা যে إِنَّمَا تُعْتَبَرُ الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ আমল গ্রহণযোগ্য হয় নিয়ত দ্বারা। যেমন নিয়ত তেমন আমল। এভাবে সকল অর্থই মুহাদ্দিসগণ উল্লেখ করেছেন।

তো হাদীসের প্রথম বাক্যটি إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ এটি একটি আছলে কুল্লী। তাতে কোন আমলের উল্লেখ নেই। যে কোন আমল তার আওতায় এসে যাবে।

নিয়তের উপকারিতা

তারপর দ্বিতীয় বাক্য وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى (যেমন নিয়ত করবে তেমন প্রতিদান পাবে।) এটি আসলে একটি প্রশ্নের উত্তর। কেননা, যখন আপনি কোন কাজের নিয়ত করবেন, তখন প্রশ্ন জাগবে, এ নিয়ত দ্বারা কি কোন ফায়দা মিলবে, না নিয়ত শুধুই নিয়ত থেকে যাবে? কোন ফল পাব কিনা? অথবা অন্তরের ধারণা যে, আমি নিয়ত করেছি। অতএব দ্বিতীয় বাক্যে তার উত্তর দেওয়া হল, না তাতে উপকার হবে। যদি নিয়ত ভাল থাকে তাহলে মহান আল্লাহর নিকট আমল গ্রহণযোগ্য হবে। তার কারণে প্রতিদান ও পুরস্কার মিলবে। আর যেমন নিয়ত করবে, তা-ই সে পাবে। যদি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নৈকট্যের নিয়ত করে, তাহলে তা অর্জন হবে। আর জাগতিক মুসলেহাতের নিয়ত করে, তাহলে জাগতিক উপকার মিলে যাবে। কিন্তু নিয়ত বেকার যাবে না। অবশ্যই তার জন্য ফলাফল মিলবে।

আমলের শুরু ও প্রকাশ

এজন্য শরয়ীভাবে বলা হয়েছে, نية المرء خير من عمله মানুষের নিয়ত তার আমল হতে উত্তম। অর্থাৎ আমলের শুরুটা হয় নিয়ত থেকে। সর্বপ্রথম আমল করে অন্তর, যা নিয়ত। তারপর হাত ও পা আমল করে; তা হল আমলের আকৃতি। অতএব সর্বপ্রথম আমলের শুরু হল অন্তর। আর তা নিয়তের আকৃতিতে। তাই যে ব্যক্তি আমলের নিয়ত করল, কেমন যেন সে নিজের দিল ও অন্তর দ্বারা আমল করল। এখনও আমল প্রকাশ হয়নি, তা প্রকাশ হবে হাত-পা দ্বারা। কিন্তু তা দ্বারা উপকার ও ফায়দা প্রস্তুত হবে।

হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে, কেউ নিয়ত করল অমুক নেক কাজটি করব, এখনও করেনি তবুও ফেরেশতা একটি নেকী লিখে যান, তাতে পরকালে সাওয়াব মিলবে। অতএব সাধারণ নিয়ত দ্বারাও সাওয়াব মিলে।

কিন্তু যদি খারাপ ও বদ আমলের নিয়ত করে, তাহলে কিয়াসের তাকাজা ছিল তো একটি গোনাহ লেখা হবে; কিন্তু লেখা হয় না। আর যদি নিয়ত পরিবর্তন হয়ে যায়, বদ কর্মটি করব না, তাহলে বিরত থাকার কারণেও একটি নেকী লিখবে। এটিই একটি নেকীর কাজ। তা অন্তরে-অন্তরে হচ্ছে এবং নিয়তের কারণে ফলাফল কার্যকর হচ্ছে।

সুতরাং প্রথম বাক্যে সাওয়াব ও আজাব কোনটাই উল্লেখ না করে শুধু একটি বিধান বর্ণনা করা হয়েছে যে, যেমন নিয়ত তেমন আমল। আর দ্বিতীয় বাক্যে উপকার অর্জনের প্রতি ইশারা যে, নিয়ত বেকার যাবে না এবং যেমন নিয়ত হবে তেমন ফলাফল কার্যকর হবে।

إِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

যেমন নিয়ত করবে তেমনি পরবর্তীতে পেয়ে যাবে। দুনিয়া বা জাগতিক নিয়ত করলে দুনিয়া এসে যাবে। আর আখেরাত নিয়ত করলে আখেরাত এসে যাবে।

নিয়তের ফলাফল

যে ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এ হাদীস ইরশাদ করা হয়েছিল অর্থাৎ হাদীসের শানে নুযুল ওই সাহাবী, যিনি এমন নিয়তে মদিনায় হিজরত করেছিলেন যে, অমুক মহিলা ধনাঢ্য, যার নাম উম্মে কায়েস; তাকে বিবাহ করব। সে তো মালদার; তো কিছু সম্পদের মালিক হব। তিনি এমন নিয়ত করে হিজরত করেছিলেন। এ পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত হাদীস ইরশাদ করা হয়–

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

যা নিয়ত করেছে, তা পাবে। যদি স্ত্রীর নিয়ত করে তাহলে তা মিলে যাবে; কিন্তু আল্লাহ মিলবে না। হ্যাঁ, যদি খোদাকে পাওয়ার নিয়ত করে, তাহলে খোদাকে পেয়ে যাবে। অর্থাৎ যেমন নিয়ত তেমন ফলাফল। সুতরাং দ্বিতীয় বাক্যে নিয়তের ফলাফল বলা হয়েছে, নিয়ত বেকার যায় না বরং তাতে উপকার অর্জন হয়। দুনিয়া ও আখেরাতে তা দ্বারা মানুষ উপকার লাভ করে।

এটি ছিল একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা

এক সাহাবীর উপাধি ছিল 'মুহাজিরে উম্মে কায়েস'। এ নামে তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেন যে, তিনি উম্মে কায়েসের জন্য হিজরত করেছেন। একজন মহিলার নিয়তে হিজরত করেছেন। পরে তিনি নিয়ত ঠিক করে নেন এবং তাওবা করেন।

মোটকথা, প্রথম বাক্যটি আছলি কুল্লী আর দ্বিতীয় বাক্যটি ওই আছল থেকে লাভবান হওয়ার বর্ণনা যে, মানুষ নিয়ত দ্বারা উপকৃত হবে। যেমন নিয়ত করবে তেমন ফলাফল প্রকাশ পাবে। আর তৃতীয় বাক্যটি একটি আংশিক উদাহরণ-

فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ

তারপর যার হিজরত হবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে তো তার হিজরত হবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্য। আর যার হিজরত হবে দুনিয়া লাভের জন্য অথবা কোন মহিলাকে বিবাহের জন্য তাহলে তার হিজরত হবে যার জন্য সে হিজরত করেছে।

সুতরাং প্রথম বাক্যে মৌলনীতি বর্ণিত হয়েছে। দ্বিতীয় বাক্যে উপকারিতা বর্ণনা করা হয়েছে। আর তৃতীয় বাক্যে আংশিক উদাহরণ বর্ণনা করা হয়েছে।

হাদীসের ব্যাপকতা

একথা স্পষ্ট যে, উক্ত তিন দরজা বা স্তর যা দ্বারা কোন একটি দাবি সম্পৃক্ত ও প্রস্তুত হয়। প্রথমে দাবি উত্থাপন কর, তারপর তার উদ্দেশ্য বর্ণনা কর, তারপর তার একটি বোধগম্য দৃষ্টান্ত বর্ণনা কর। তাহলে দাবি পরিষ্কার ও প্রমাণিত হয়ে যাবে। অতএব উক্ত হাদীসটি সমষ্টিগত অর্থপূর্ণ হাদীস। যে সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, ছয়টি বস্তু আমাকে দেওয়া হয়েছে, যা পূর্ব যুগের নবীদের দেওয়া হয়নি। তন্মধ্যে একটি হল أُوتِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ আমাকে সমষ্টিগত অর্থপূর্ণ বাক্য দেওয়া হয়েছে যে, ছোট বাক্য কিন্তু তা থেকে ইলমের দরিয়া প্রবাহিত হয় এবং হাজার-হাজার মাসায়েল বের হয়। সুতরাং এই হাদীসটি জাওয়ামিউল কিলামের অন্তর্ভুক্ত যে, তাতে তিনটি বাক্য রয়েছে। আর তিনটির ভিতর তিনটি ইলম এবং প্রত্যেকটির ফায়দা ভিন্ন-ভিন্ন। একটি আছলে কুল্লি, দ্বিতীয়টি উপকারী কুল্লি আর তৃতীয়টি হল আংশিক দৃষ্টান্ত।

মোটকথা, এ হাদীসটি পরিপূরক হাদীস, যা হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রা. মিম্বরে দাঁড়িয়ে ইরশাদ করেছিলেন।

চিন্তা করে দেখুন, যদি এই একটি হাদীসের উপর আমল করা হয়, তাহলে আমলকারী কামিয়াব। প্রত্যেক বিষয়ে নিয়ত করে নিলে তাহলে দুনিয়াও দীন হয়ে যাবে। পোশাক পরিধানের সময় যদি এমন নিয়ত করা হয় যে, আল্লাহর হুকুম শরীর ঢেকে ওয়াজিব পূরণ করছি, তাহলে তা ইবাদত হিসেবে গণ্য হবে। তার জন্য প্রতিদান ও সাওয়াব মিলবে। আহার করার প্রাক্কালে এ নিয়ত করে নিলে যে ইবাদতের জন্য শক্তি অর্জনের উদ্দেশ্যে আহার করছি, যাতে শক্তি অর্জন করে আল্লাহর জিকির ও ইবাদত করতে পারি, তাহলে খাবারও ইবাদত হবে। ঘরে প্রবেশের সময় যদি এমন নিয়ত থাকে যে, সুন্নাতের ইত্তেবা হল ঘরে প্রবেশের সময় সালাম ও আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে প্রবেশ করা, তাহলে ঘরে প্রবেশও ইবাদত হবে। অতএব সারা দুনিয়াকে নিয়ত দ্বারা দীন বানানো সম্ভব। খারাপ নিয়ত হলে ইবাদতও খারাপ হবে আর ভাল ও উন্নত নিয়ত হলে আদত-অভ্যাসও ইবাদতে পরিণত হবে।

উক্ত হাদীসটি জাওয়ামিউল কিলামও এবং তাতে দীনের নির্যাসও বর্ণনা করা হয়েছে যে, দীনের শুরু হয় নিয়ত থেকে।

মানুষ যখন ইসলাম গ্রহণ করে, তখন তার নিয়ত এমনই হয়ে থাকে যে, আমি আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করছি। তাহলে নিয়ত দ্বারা দীন শুরু হল। এখন শুধু আমলের দরজা বাকি। এ হাদীসটি পরিপূরক এবং দীনের আসল উসূলও। এ জন্যই ইমাম বুখারি রহ. উক্ত হাদীস শরীফকে শুরুতে নিয়ে এসেছেন।

জরুরি সতর্কতা

দ্বিতীয় আরেকটি উপকারিতা হলো, কেমন যেন ইমাম রহ. ছাত্রদের উদ্দেশ্য করে ইরশাদ করছেন, যারা বুখারী পাঠের জন্য বসেছ, তোমরা এখনই নিজেদের নিয়তকে শুদ্ধ করে নাও যে, বুখারী কেন অধ্যয়ন করছ। যদি নিয়ত সহীহ থাকে, তাহলে শেষ পর্যন্ত দীন হবে। আর যদি নিয়তে ভুল হয়, উদাহরণস্বরূপ কেউ এজন্য বুখারী শরীফ অধ্যয়ন করছে, যাতে তাকে সবাই হাদীসবিশারদ বা মুহাদ্দিস বলে। তাহলে তার উদ্দেশ্য হল প্রসিদ্ধি লাভ করা, আল্লাহকে পাওয়া উদ্দেশ্য হবে না। আর যদি কেউ বুখারী পড়ে দুনিয়া উপার্জনের জন্য, তাহলে দুনিয়া অর্জন হবে; কিন্তু আখেরাত অর্জন হবে না।

এ কারণে ইমাম রহ. উক্ত হাদীস শুরুতে এনে কেমন যেন ছাত্রদের শতর্ক করছেন, সর্বপ্রথম নিজের নিয়ত ঠিক করে নাও। কেন তুমি বুখারী পড়ছ? তোমার উদ্দেশ্য কী? শেষ পর্যন্ত যেমন নিয়ত করবে তেমন ফলাফল প্রস্তুত হতে থাকবে। অতএব উক্ত হাদীসটি জাওয়ামিউল কিলাম এবং দীনের ভিত্তি এবং সারা জগতের মানুষের জন্য একটি সংক্ষিপ্ত উপদেশও আর পরিপূরকও।

এ কারণেই ইমাম বুখারী রহ.-এর তাকওয়া ও যুহ্দের পাশাপাশি তার মেধা ও ধীশক্তির বিচার হয়ে যায় যে, তিনি কেমন বিস্ময়কর পদ্ধতিতে নিজের কিতাবকে শুরু করেছেন। আমি আপনাদের সামনে এ কয়েকটি বাক্য পেশ করলাম। ছাত্রদের সামনে তো এগুলো দশ মিনিটের কথা। কিন্তু এখানে যেহেতু ছাত্র ব্যতীত আরো লোক রয়েছে তাই কিছুটা বিস্তারিত হল। অন্যথায় দরসের তরিকা হল সংক্ষিপ্ত ও মুজমাল শব্দ ব্যবহার করা। তাই এখানে দশ মিনিটের কথা ছিল। কিন্তু শ্রোতা অনুপাতে কিছুটা বিস্তারিত ব্যাখ্যা করতে হয়।

উক্ত ব্যাখ্যায় কিছু বিষয়গত বস্তু বেরিয়ে এসেছে, কিছু হাদীস এসেছে, ইমাম রহ.-এর কিছু আযমত ও মহত্ত্বের শান সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত হয়েছে। কিতাবেরও আযমাত-মহত্ত্বের শান বর্ণিত হয়েছে এবং কিতাব শুরুর কিছু বরকতও আলোচনা করা হয়েছে।

এখন আসুন, আমরা সকলে মিলে দোয়া করি, আল্লাহ তায়ালা যেন এ মাদরাসাটিকে অনেক দিন পর্যন্ত কায়েম রাখেন, যার মাধ্যমে দীন প্রসার হচ্ছে, পবিত্র হিজায ভূমিতে ইলমের চর্চা হচ্ছে এবং যে ছাত্ররা ভর্তি হচ্ছে তারা যেন নিজ ইলম দ্বারা লাভবান হতে পারে। আল্লাহ তায়ালা যেন তাদেরকে কামাল ও পূর্ণ বানিয়ে শেষ পর্যন্ত পৌছান, যেখানে এ পর্যন্ত অনেক উলামা ও ফুযালা পৌছেন ও ফারেগ হয়েছেন। তাঁরা দীনের বড়-বড় কাজ আঞ্জাম দিয়েছেন।

اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ اَللّٰهُمَّ اَعِذْنَا مِنَ الْفِتَنِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ اَللّٰهُمَّ اجْعَلِ الْقُرْاٰنَ اِمَامًا لَّنَا وَاجْعَلْهُ حُجَّةً لَّنَا وَارْزُقْنَا عَمَلَهٗ بِفَضْلِكَ الْعَظِيْمِ يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ اَللّٰهُمَّ تَوَفَّنَا مُسْلِمِيْنَ وَ اَلْحِقْنَا بِالصَّالِحِيْنَ غَيْرَ خَزَايَا وَلَا مَفْتُوْنِيْنَ وَصَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهٖ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ اَجْمَعِيْنَ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

বয়ান : ৫

তালিম ও তাদরিস

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাদের শিক্ষা দিয়েছেন। সাহাবায়ে কেরাম তাবেঈনদের শিক্ষা দিয়েছেন। আর তাবেঈনগণ তাবে-তাবেঈনদের শিখিয়েছেন। এভাবে শিক্ষার ধারা আমাদের পর্যন্ত এসে পৌঁছেছে। আর এটা তালিম দ্বারাই সম্ভব হয়েছে; শুধু ইলম দ্বারা নয়। ইলম তো রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর; তা তাঁর বরকতপূর্ণ সত্তার সঙ্গে বিশেষিত। যদি তিনি না শিখাতেন, তাহলে আমরা কিভাবে আলেম হতাম? ইলম আমাদের পর্যন্ত কিভাবে পৌঁছত? ইলম তালিমের মাধ্যমে আমাদের পর্যন্ত পৌঁছেছে। অতএব, মানবিক বৈশিষ্ট্য ও ইনসানী কামাল বা পূর্ণতা মূলত তালিম-তায়াল্লুমের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এটিই সর্বোচ্চ মর্যাদা, যা মানুষকে অন্যান্য সৃষ্টির উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছে। অন্যথায় সাধারণ ইলম তো প্রাণীজগতেরও রয়েছে; তবে কম-বেশির পার্থক্য। আমাদের মধ্যে বেশি, ওদের মধ্যে কম। কিন্তু আছে তো। হ্যাঁ, তাদের মাঝে উস্তাদ নেই আর আমাদের উস্তাদ আছে।

– হযরত হাকীমুল ইসলাম রহ.





তালিম ও তাদরিস

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَ نَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ، وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ، وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُهٗ، اَرْسَلَهُ اللّٰهُ اِلٰى كَآفَّةٍ لِلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّ نَذِيْرًا وَدَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَ سِرَاجًا مُّنِيْرًا• اَمَّا بَعْدُ: فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ•

مَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّؤْتِيَهُ اللّٰهُ الْكِتٰبَ وَ الْحُكْمَ وَ النُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُوْلَ لِلنَّاسِ كُوْنُوْا عِبَادًا لِّيْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَ لٰكِنْ كُوْنُوْا رَبّٰنِيّٖنَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُوْنَ الْكِتٰبَ وَ بِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُوْنَ ۝ ৭৯ صدق الله العظيم

কোন মানুষকে আল্লাহ কিতাব, হেকমত ও নবুওয়াত দান করার পর সে বলবে যে, তোমরা আল্লাহকে পরিহার করে আমার বান্দা হয়ে যাও– এটা সম্ভব নয়। বরং তারা বলবে, তোমরা আল্লাহওয়ালা হয়ে যাও। যেমন তোমরা কিতাব শিখাতে এবং যেমন তোমরা নিজেরাও শিখতে। *[আলে ইমরান ৩:৭৯]*

বাস্তব অবস্থা

বুযুর্গানে মুহতারাম!

আজ যে মোবারক জামিয়ার ভিত্তি স্থাপন করা হচ্ছে, তা একজন সম্মানিত ব্যক্তিত্বের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করে করা হচ্ছে। অর্থাৎ দারুল উলুম দেওবন্দের প্রতিষ্ঠাতা হযরত কাসেম নানুতুবী রহ.-এর নামে এই জামিয়া প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। এটি আমাদের সকলের জন্য সৌভাগ্যের বিষয় যে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হল তা আবার একজন সম্মানিত ব্যক্তিত্বের সাথে সম্পর্ক করে। এটি একটি বহু বড় নেয়ামত।

এ সম্পর্কে আমি উক্ত আয়াত তেলাওয়াত করেছি এবং এ সম্পর্কে কিছু কথা পেশ করব। ইনশাআল্লাহ সংক্ষিপ্ত সময়ে সমাপ্ত করব। আমাকে তো ঘণ্টা-সোয়া ঘণ্টা সময় দেওয়া হয়েছে। মনে হয় তা শেষ হবে না। মোটকথা, আমি চেষ্টা করব নির্ধারিত সময়ের ভিতর কয়েকটি কথা পেশ করতে।

মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে শরীয়তের দাবি

উলামাদের মধ্যে অন্যতম একটি আলোচ্য বিষয় হল মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের বিষয়টি। মানুষকে বলা হয় আশরাফুল মাখলুকাত বা সৃষ্টির সেরা জীব। আর শরীয়তও একথার দাবি করে যে, মানুষ হল আশরাফুল মাখলুকাত। বিবেকের দাবিও তাই এবং ইন্দ্রিয়ও একই বিষয়ের সাক্ষ্য প্রদান করে। অতএব শরীয়ত, আকল ও অনুভূতিশক্তি সবার দাবি হল মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব এবং আশরাফুল মাখলুকাত। কুরআনুল কারীমে বলা হয়েছে–

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيْٓ اٰدَمَ وَحَمَلْنٰهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنٰهُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ وَفَضَّلْنٰهُمْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيْلًا ۝٧٠

নিশ্চয়ই আমি বনি আদমকে সম্মানিত করেছি এবং জলে ও স্থলে তাদেরকে উন্নত করেছি। তাদেরকে উত্তম ও পবিত্র রিজিক আহার করার জন্য দিয়েছি এবং তাদেকে অনেক মর্যাদা দান করেছি। আমি যত কিছু সৃষ্টি করেছি, তাদের মধ্যে মানুষকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি। *[সূরা বনি ইসরাঈল :৭০]*

অতএব মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব এবং তাদের আশরাফুল মাখলুকাত হওয়া উক্ত আয়াত দ্বারা পুরোপুরি প্রমাণিত। আর কুরআনুল কারীমের দাবিও একই যে, মানুষই সর্বশ্রেষ্ঠ।

মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে আকলের দাবি

আকল তথা যুক্তিও একথার সাক্ষ্য প্রদান করে যে, পৃথিবীতে মানুষই সেরা ও উন্নত। কারণ, তারাই সারা পৃথিবীকে ব্যবহার করে। পৃথিবী তাদের উপর হস্ত ক্ষেপ ও ব্যবহার করতে পারে না। আসমান, জমিন, চন্দ্র-সূর্যসহ সকল বস্তু তাদের ব্যবহৃত এবং সবকিছুতেই তাদের হস্তক্ষেপ রয়েছে।

তারা জমিনকে শুধু খননই করতে সক্ষম নয় বরং তাতে বাড়ি নির্মাণও করতে পারে। এমনকি জমিনের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কেও অবগত। তারা জমিনের বৈশিষ্ট্য ও প্রভাব থেকে বিভিন্ন বস্তু পরিষ্কার করে। সূর্যের আলো এবং তাপ থেকেই শুধু লাভবান হয় না বরং তার কিরণ ও গরম থেকে মেশিন আকারে বস্তু বানিয়ে ব্যবহার করছে।

তারা শুধু গ্রহ ও সৌরজগতের আলো এবং গরম দ্বারাই উপকৃত হচ্ছে না বরং গ্রহের পৃষ্ঠে পৌছার জন্য চেষ্টা করে চলছে এবং যন্ত্রও আবিষ্কার করছে। এতে সফলও হয়েছে। অর্থাৎ তারা গ্রহকে ব্যবহার করারও ইচ্ছা রাখে এবং চেষ্টা করে যাচ্ছে। খোলা আকাশেও তাদের হস্তক্ষেপ রয়েছে। জমিনেও আছে, সমুদ্রেও আছে। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন–

اَلَمْ تَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَاَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهٗ ظَاهِرَةً وَّبَاطِنَةً

তোমরা কি দেখ না, আল্লাহ তায়ালা আসমান ও জমিনসমূহকে কাজে লাগিয়েছেন? আসমান ও জমিনে যত ধনভাণ্ডার রয়েছে, সবই মানুষের কাজে আসে। আল্লাহ তায়ালা তাঁর নেয়ামতসমূহকে মানুষদের জন্য পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন। *[সূরা লুকমান : ২০]*

মানুষের ব্যাপারে যে সমস্ত দাবি করা হয়েছে, তা অন্য কোন মাখলুকের ব্যাপারে করা হয়নি। তাদেরকে উত্তম বলা হয়েছে, ব্যবহারকারী বলা হয়েছে এবং আবিষ্কারক বলা হয়েছে। আর এগুলো হল একটি দাবি।

দার্শনিকদের দৃষ্টিতে শ্রেষ্ঠত্বের কারণ

প্রশ্ন জাগে, মানুষ কেন উত্তম? তাদের শ্রেষ্ঠত্বের বৈশিষ্ট্য ও ভিত্তি কী? তাদের কী বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা অন্যদের মধ্যে পাওয়া যায় না, যার কারণে তারা সবচেয়ে উন্নত ও উত্তম?

দার্শনিকদের দাবি হল, মানুষের মধ্যে এমন একটি জাওহার তথা মৌলিক উপাদান রয়েছে, যা অন্য মাখলুকে নেই। আর তাহলো আকল বা বুদ্ধি। এ কারণেই মানতিকবিদগণ মানুষের সংজ্ঞা দেন 'হাইওয়ানে নাতিক' নামে। অর্থাৎ এমন জানদার প্রাণী, যার আকল আছে এবং আকল দ্বারা কাজ জিজ্ঞেস করতে পারে, যা অন্য প্রাণীর মধ্যে নেই। এ কারণে মানুষকে আশরাফুল মাখলুকাত বলা হয়। অতএব শ্রেষ্ঠত্বের ভিত্তি হল আকল, যা শুধু তার মধ্যেই বিদ্যমান। এটি সাধারণত দার্শনিকদের দাবি।

দার্শনিকদের দৃষ্টিভঙ্গিতে ভুল

আমি মনে করি, উক্ত দাবি কিছুটা অসম্পূর্ণ। তবে মোটামুটি সহীহ। কিন্তু স্রেফ আকলের উপর ভিত্তি করে মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের দাবি করা যথেষ্ট নয়। কারণ, কমবেশি আকল-বুদ্ধি অন্যান্য প্রাণীদেরও রয়েছে। আকল দ্বারা মানুষ কিয়াস তথা তুলনা করে যে, একটা জানা বস্তুকে কিয়াস করে অজানার হুকুম জানে। অতএব আকলের সবচেয়ে বড় কাজ হল কিয়াস ও ফলাফল বের করা। অর্থাৎ কোন বিদ্যমান জিনিস থেকে বস্তু আবিষ্কার করা। এ কাজ আকল দ্বারা করা হয়। আমি মনে করি, জানোয়ারও এমন কাজ করতে পারে যে, একটি বস্তুর মধ্যে যে বিধান রয়েছে সেটি অন্য বস্তুতে লাগিয়ে দিবে। একটি কুকুর এক স্থানে দাঁড়িয়ে আছে, তখন তাকে যদি লাঠি দ্বারা আঘাত করা হয়, তাহলে দ্বিতীয় দিন সে ওখানে আসবে না। কুকুর মনে-মনে কিয়াস করবে, গতকাল ওখানে গিয়েছিলাম তো পিটুনি খেয়েছিলাম, আজ যদি আবার সেখানে যাই, তাহলে আবার পিটুনি খেতে হবে।

তাহলে বলুন, এটি কুকুরের আকল নয় তো কি? প্রথম দিন পিটুনি সে নিজে খেয়েছে। সে প্রথম পিটুনি খেয়ে দ্বিতীয় দিন পিটুনি খাওয়া থেকে বাঁচতে পারছে শুধু আকল ও বুঝ থাকার কারণে। সে বুঝে ফেলেছে, যে ঘটনা গতকাল ঘটেছে আজও তা পুনরায় ঘটতে পারে। অতএব মানুষ কিয়াস করতে জানে এবং কুকুরও জানে। মানুষের মধ্যে আকল আছে, কুকরের মধ্যেও আছে। হ্যাঁ, কম-বেশির কথা ভিন্ন। মানুষের মধ্যে বেশি আছে কুকুরের মধ্যে কম। কম ও বেশি

তো মানুষের মধ্যেও হয়ে থাকে– সবার আকল বুদ্ধি তো সমান হয় না। কিছু মানুষ হাকিম হয় কিছু হয় মেধাহীন। কেউ নির্বোধ হয়, কেউ হয় তীক্ষ্ণ মেধার অধিকারী। কারো মেধা অনেক, কারো মেধা কম। অনেকের আকল উচ্চ পর্যায়ের, অনেকের অনেক নিম্ন পর্যায়ের। তাই যখন আপনাদের আকলের কম ও বেশি পার্থক্য রয়েছে এবং কম আকলের অধিকারীকেও যদি আকলওয়ালা ও বুদ্ধিমান বলেন, তাহলে তার যে আমল কুকুরের মধ্যেও রয়েছে, তাকে কেন বুদ্ধিমান বলেন না। আপনাদের সমান আকল তার নেই কিন্তু কম তো আছে। অতএব মানুষ যদি একথা দাবি করে বসে থাকে যে, আমি বুদ্ধিমান অন্য কেউ নয়, তাহলে এটি কোন বুদ্ধির কথা নয়।

শিয়ালের চালাকির কথা তো প্রসিদ্ধ। তারা কখনও এমন চালাকি করে যে, মানুষ পর্যন্ত অসহায় ও পরাজিত হয়ে যায়। সুতরাং সাধারণত আকল ও অনুভূতি সকল প্রাণীদের দেওয়া হয়েছে। তবে কম-বেশির তফাৎ আছে। যেমন কম-বেশির তফাৎ বনি আদমের মধ্যে আছে। তেমনি প্রাণী জগতের মধ্যেও আছে। এজন্যই শ্রেষ্ঠত্বের ভিত্তি শুধু আকলের উপর রাখা আমার বুঝে আসেনি। যেহেতু এই জাওহার অন্যান্য প্রাণীর মধ্যেও রয়েছে– চাই কম-বেশি হোক।

শুধু ইলমও শ্রেষ্ঠত্বের কারণ নয়

কিছু দার্শনিকদের দাবি হল, আকল শ্রেষ্ঠত্বের ভিত্তি নয়। বরং ইলম ও জ্ঞান হল শ্রেষ্ঠ হওয়ার ভিত্তি। কারণ, মানুষ ব্যতীত অন্য প্রাণীদের ইলম দেওয়া হয়নি।

আমি বলি, ইলমও পুরোপুরি শ্রেষ্ঠত্বের ভিত্তি হতে পারে না। তবে মোটামুটি সহীহ হতে পারে। কিন্তু তার উপর আমি নির্ভর করতে পারি না। কারণ, স্বয়ং কুরআনের দাবি হল, প্রাণীদেরও ইলম দেওয়া হয়েছে। আবার সাধারণ ইলম নয় বরং শরীয়তের আহকামের ইলম। ইবাদত ও আনুগত্যের ইলম যেমন মানুষকে দেওয়া হয়েছে, তেমনি প্রাণীদেরও দেওয়া হয়েছে।

মানুষ ব্যতীত অন্যান্য প্রাণীর ইলম ও জ্ঞান আছে

কুরআনুল কারীমে ইরশাদ হয়েছে–

كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيْحَهُ

নিশ্চয়ই প্রত্যেক বস্তু নিজের নামায ও তাসবিহকে জেনে নিয়েছে।

শুধু আপনিই নামায পড়েন না বরং পৃথিবীর অণু-পরমাণু পর্যন্ত নামায পড়ে। প্রাণীজগতও নিজেদের নামায মূর্খের মতো পড়ে না বরং জেনে-শুনে পড়ে। এখানে كُلٌّ এর সাথে قَدْ শব্দটি এসেছে, যা দৃঢ়তা বুঝানোর জন্য আসে, ইয়াকিন বুঝানোর জন্য ব্যবহার হয় এবং সেটি অতীতকালের ক্রিয়ার শুরুতে এসেছে, যার অর্থ হল নিশ্চিতরূপে প্রত্যেক বস্তু জেনে ফেলেছে। আর كُلٌّ শব্দের মধ্যে জড়পদার্থ, বৃক্ষরাজি ও প্রাণীজগৎ সবাই শামিল। সুতরাং শরীয়ত সবার জন্য ইলমকে প্রমাণিত করে এবং সেই 'ইলম'ও শরীয়তের ইলম অর্থাৎ সবাই নিজেদের তাসবিহ ও নামায সম্পর্কে অবগত।

হযরত শাহ রফিউদ্দিন সাহেব রহ. লিখেছেন, কায়েনাতের ছোট-বড় সকল বস্তু নামাযী এবং তারা নামায পড়ে। কিন্তু সকলের নামায তার অবস্থা অনুযায়ী। তিনি লিখেছেন, বৃক্ষরাজির নামায হল কিয়াম বা দাঁড়ানো অবস্থায়। তাদের নামাযে রুকু-সিজদা নেই। তারা এক পায়ে দাঁড়িয়ে আল্লাহর স্মরণে সময় ব্যয় করছে আর যবানে বলছে, আপনি আমাদেরকে যেভাবে বানিয়েছেন আমরা আপনার সেইভাবে আনুগত্য করছি। আমরা এদিক-ওদিক কাত হচ্ছি না, আমরা নিচে পড়ছি না এবং সিজদাও করছি না। আমরা এক পায়ে দাঁড়িয়ে কিয়ামের হালতে নামায আদায় করছি। আমরা আপনার আনুগত্যের মধ্যে লেগে আছি। সার্বিক অর্থে মুসলিম।

وَلَهٗٓ اَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

অর্থাৎ প্রতিটি বস্তু মুসলিম ও ইবাদতগুজার। বৃক্ষের নামায হল কিয়াম অর্থাৎ তাদেরকে এমনভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে যে, মনে হচ্ছে তারা দাঁড়িয়ে আছে।

তিনি আরো লেখেন, চতুষ্পদ প্রাণীদের নামায হল রুকু। তাদের নামাযে সিজদা ও কিয়াম নেই। আল্লাহ তায়ালা চার পা বিশিষ্ট জানোয়ারদের এমনভাবে সৃষ্টি করেছেন যে, তারা সর্বাবস্থায় রুকু হালতে ইবাদতে মশগুল। তাদের নামায রুকু। জমিনের যতো পোকা-মাকড় রয়েছে, তাদের নামায সিজদা। রুকু ও কিয়াম নেই। এভাবে তারা নামায আদায় করছে। পাহাড়ের নামায তাশাহহুদ বা বৈঠক অবস্থা অর্থাৎ হাঁটু ঠেকিয়ে বসে নামায পড়ছে যেমনভাবে নামাযী ব্যক্তি হাঁটু ফেলে বসে আত্তাহিয়াতু পড়ে, তেমনিভাবে পাহাড় নামায পড়ছে। তাদের নামাযে কিয়াম, রুকু ও সিজদা কিছুই নেই। যদি পাহাড় সিজদা করতে থাকে, তাহলে সারা পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে। তাই গনিমত যে পাহাড় একই স্থানে তাশাহহুদ অবস্থায় বসে আছে।

জান্নাত-জাহান্নামের নামায হল শুধু দোয়া করা, প্রার্থনা করা ও চাওয়া হল জান্নাত ও জাহান্নামের নামায। জান্নাত প্রার্থনা করছে– হে আল্লাহ! আমাকে পূর্ণ করে দাও। জাহান্নামও বলছে, হে আল্লাহ! আমাকে পূর্ণ করে দাও। আল্লাহ তায়ালা তাদের সাথে ওয়াদা করেছেন, কিয়ামতের দিন তোমাদের পূর্ণ করে দেব। সকল জাহান্নামীদের যখন জাহান্নামে প্রবেশ করানো হবে তারপরও জাহান্নাম খালি থাকবে, তখন জাহান্নাম বলবে–

هَلْ مِنْ مَّزِيْدٍ، هَلْ مِنْ مَّزِيْدٍ!

আরো দিন, আরো দিন! আপনি পূর্ণ করে দেওয়ার ওয়াদা করেছেন; আমি সারা জীবন পেট ভরার প্রার্থনা ও দোয়া করেছি। আজ আমার পেট ভরে দিন। তখন পাহাড় ও জমিনকে নিক্ষেপ করা হবে। তারপরও বলবে, আরো দাও আরো দাও। জাহান্নাম একটি বিশাল জগত যা হাজারো পৃথিবীর সমতুল্য। যখন সমস্ত কিছু নিক্ষেপ করা শেষ হয়ে যাবে তারপরও তার পেট ভরবে না, সে ক্ষুধার তাড়নায় বারবার বলতে থাকবে–

هَلْ مِنْ مَّزِيْدٍ، هَلْ مِنْ مَّزِيْدٍ!

আরো দাও, আরো দাও! হাদীস শরীফে এসেছে, আল্লাহ নিজের কুদরতি পায়ের গোঁড়ালি জাহান্নামের মুখে রাখবেন।

তখন জাহান্নাম বলবে–

قَدْ إِمْتَلَأْتُ

ব্যস; আমি পূর্ণ হয়ে গেছি। এখন আমার মনে দুঃখ নেই, তখন তার প্রার্থনা পুরো হবে।

জান্নাতও প্রার্থনা করবে আমাকে ভরে দাও। সকল জান্নাতি জান্নাতে প্রবেশ করবে, তারপরও হাজারো মহল বাড়ি এবং শহর জনশূন্য থাকবে। জান্নাত বলবে, আপনি ওয়াদা করেছিলেন আমাকে পূর্ণ করে দিবেন। এখন আল্লাহ তায়ালা একদল নতুন মাখলুক সৃষ্টি করবেন। তাদের দ্বারা জান্নাত আবাদ করাবেন। ফলে জান্নাতের প্রার্থনা পূর্ণ হবে। সুতরাং জান্নাত ও জাহান্নামের নামায হল দোয়া করা ও প্রার্থনা করা।

ফেরেশতাদের নামায হল কাতারবন্দী হওয়া। কোটি-কোটি ফেরেশতা রুকুতে আছে, কোটি-কোটি ফেরেশতা সিজদারত আছে, কোটি-কোটি ফেরেশতা কিয়ামের অবস্থায় আছে। কোটি-কোটি ফেরেশতা বাইতুল মামুর তাওয়াফে মশগুল। হাদীস শরীফে এসেছে, আসমানে চার আঙ্গুল পরিমাণ স্থান খালি নেই,

যেখানে কোন না কোন ফেরেশতা কোন ইবাদতে লিপ্ত নয়। অতএব ফেরেশতাদের নামায হল কাতারবন্দী হওয়া। অর্থাৎ তারা শৃঙ্খলার সঙ্গে দাঁড়িয়ে নামায আদায় করছে। কেউ রুকুতে আছে, কেউ সিজদাতে আবার কেউ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নামায পড়ছে।

যত গ্রহ-নক্ষত্র ঘুরছে; যেমন আদিকালের দার্শনিকদের মতে সূর্য ঘূর্ণায়মান এবং আধুনিক কালের দার্শনিকদের মতে জমিনও ঘূর্ণায়মান। তারা পৃথিবীকে একটি গ্রহ মনে করে এবং সূর্যকে একটি নক্ষত্র মনে করে। উভয়টি নিজ-নিজ ধারায় ঘূর্ণায়মান। তাদের নামায হল দৌড়ানো ও ঘূর্ণন। তারা যেখান থেকে ঘোরা শুরু করে ওখানে পুনরায় ফিরে আসে। তারপর ওখান থেকে চলে আবার ওখানেই ফিরে আসে। অতএব এমনভাবে ঘোরা ও চক্কর লাগানো তাদের নামায। সুতরাং বিশ্বজগতের প্রতিটি অণু ও পরমাণু স্ব-স্ব অবস্থা ও সৃষ্টিগত অবস্থান মোতাবেক নামায, তাসবিহ ও তাহলিলে লিপ্ত।

হাদীসসমূহে বিভিন্ন জানোয়ারের তাসবিহাত বর্ণিত হয়েছে। একটি পাখি রয়েছে যাকে 'তিতর' বলা হয়; তার তাসবিহ হল–

كَمَا تَدِيْنُ تُدَانُ

যেমন কর্ম তেমন ফল।

কিছু জানোয়ার বলে–

سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ

তেমনিভাবে বিভিন্ন জানোয়ারের তাসবিহ বর্ণিত হয়েছে। ময়ূর একথা বলে, তিতর একথা বলে, তোতা একথা বলে ইত্যাদি। আমরা মনে করি, তারা শিস দিচ্ছে। কিন্তু আসলে তারা তাসবিহ ও তাহলিল পাঠ করছে তাদের নিজস্ব ভাষায়।

এ সম্পর্কে বলা হয়েছে–

وَاِنْ مِّنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ وَلٰكِنْ لَّا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ

বিশ্বজগতে এমন কোন বস্তু নেই যা আল্লাহর তাসবিহর মধ্যে মশগুল নেই। কিন্তু তোমরা তাদের তাসবিহ বুঝছ না।

তারা নিজের ভাষায় তাসবিহ পড়ছে। আপনারা তো আপনাদের ভাইদেরই ভাষা বুঝেন না। যদি কেউ ইংরেজী ভাষায় তাসবিহ পাঠ করে, তাহলে আপনি কি বুঝবেন? পশুর ভাষায় কেউ তাসবিহ পাঠ করলে আপনি কি বুঝবেন?

যাদের ভাগ্যে হজ্ব করা নসিব হয়েছে, তারা দেখতে পেয়েছেন পূর্ব ও পশ্চিমের লোকেরা আসে। পশতুভাষীরা পশতু ভাষায় আল্লাহকে স্মরণ করছেন, বাঙালীরা বাংলা ভাষায় আল্লাহকে স্মরণ করছেন, পাঞ্জাবীরা পাঞ্জাবী ভাষায় আল্লাহকে স্মরণ করছেন। দোয়া ও প্রার্থনা করছেন। অন্যরা এ ব্যাপারে অজ্ঞ ও মূর্খ। তারা ভাববে, না জানি কি সমস্যা করছেন। কী উল্টা-পাল্টা বকছেন। কিন্তু তাদের এসব কথার মধ্যে অনেক ইলম রয়েছে, অনেক জিকির রয়েছে। অনেক তাসবিহ রয়েছে, যেগুলো তারা পুরা করছেন। কিন্তু আমরা সেগুলো বুঝতে পারছি না।

যেমন– টেলিগ্রাফকারী যখন 'তারবার্তা' পাঠায়, তাকে বিষয়বস্তু বলে দেওয়া হয়। তখন আপনি দেখবেন, আপনার সামনে সে একটি পিতলের চাবির উপর হাত রেখে খট-খটা খট, খট-খটা খট করছে আর কিছুই বলছে না। আপনি বলবেন, আজব মানুষ! আমি এসেছি তারবার্তার মাধ্যমে সংবাদ পাঠাব আর সে খট-খটা খট করছে। কিন্তু আপনার খবর নেই– এই খট-খটা খট এর মাধ্যমে এক দেশ হতে অপর দেশে ইলম যাচ্ছে। এক রাষ্ট্র থেকে আরেক রাষ্ট্রে বার্তা পৌঁছে। যে পরিভাষাগুলো টেলিগ্রাফকারী জানে, যদি আপনি সেগুলো সম্পর্কে অবগত হন, তাহলে টেলিগ্রাফ সম্পর্কিত সব ইলম আপনার হাসিল হবে। আপনি জানতে পারবেন, এই খট-খটা খট এর ভিতর কী জিনিস লুকিয়ে রয়েছে।

তেমনিভাবে আপনি যদি পাখিদের বুলি সম্পর্কে জ্ঞাত হতে পারেন, তাহলে বুঝতে পারবেন কেমন আজিমুশ্বান তাসবিহ, তাহলিল ও জিকরুল্লাহ তাদের যবানে সর্বদা জারী থাকে। আল্লাহ তায়ালা মুজেযা হিসেবে যাকে জানিয়ে দিয়েছেন তিনি বুঝতে পারতেন। হযরত সুলাইমান আ. বলতেন–

قَالَ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ

হে লোকেরা! আমাকে পাখিদের বুলি শেখানো হয়েছে।

তিনি বলতে পারতেন, কাক একথা বলছে, কবুতর একথা বলছে। আল্লাহ তায়ালা আমাকে জানোয়ারের বুলি শিখিয়েছেন। কিন্তু কোন কলেজ ও স্কুল এর মাধ্যমে নয় বরং মুজেযা হিসেবে তাদের ভাষা তাঁর অন্তরে ইলহাম করেছিলেন।

প্রত্যেক প্রাণীদের ভাষা আছে, মানুষেরও একটা ভাষা আছে। ভারতের ভাষা আলাদা, সিন্দুদের ভাষা পৃথক, পাঞ্জাবীদর ভাষা ভিন্ন। তেমনিভাবে তীতরের ভাষা ভিন্ন, তোতার ভাষা ভিন্ন। সকলেই নিজ-নিজ ভাষায় তাসবিহ ও তাহলিল করে থাকে।

আমি বলছিলাম, শুধুই ইলম দ্বারা যদি মানুষ আশরাফুল মাখলুকাত হয়, তাহলে ইলম পাখিদেরও আছে, প্রাণীকূলেরও আছে। আবার ইলম সাধারণ ইলম নয় বরং তাসবিহ, তাহলিল এবং শরীয়ত ও নামাযের ইলম। হ্যাঁ একথা ভিন্ন যে, আপনার নামাযকে আল্লাহ তায়ালা পরিপূর্ণ করেছেন। আপনার নামাযের মধ্যে বৃক্ষরাজির কিয়ামের নামায আছে, চতুষ্পদ জানোয়ারের রুকুর নামায আছে, পোকা-মাকড়ের সিজদা আছে, পাহাড়-পর্বতের বৈঠক আছে, জান্নাত ও জাহান্নামের দোয়া আছে, ফেরেশতাদের কাতারবন্দি রয়েছে, রয়েছে গ্রহ-উপগ্রহের ঘূর্ণন। এ কারণে দু রাকাতের কমে কোন নামায নেই। দুই রাকাত অর্থ, যে কর্মগুলো প্রথম রাকাতে করা হয়েছে, সেগুলো দ্বিতীয় রাকাতের ফিরে এসে পুনরায় সে-ই করবে। এই হিসেবে আপনার নামাযে ঘূর্ণনও রয়েছে। যদি আপনার জন্য ঘূর্ণনের নামায হতে পারে, তাহলে সূর্যের জন্য কেন হতে পারবে না? যদি আপনার এক রাকাত থেকে অন্য রাকাতের দিকে যাওয়া এবং চক্কর খাওয়া ইবাদত হতে পারে, তাহলে জমিন যদি চক্কর খায়, তাহলে কেন তা ইবাদত হবে না? অতএব তাদের ইবাদতের তরিকা ভিন্ন এবং ইলমও ভিন্ন। সুতরাং ইলম আশ্‌রাফুল মাখলুকাত হওয়ার ভিত্তি হতে পারে না।

ইলম ও আকলে মানুষ ও অন্যান্য মাখলুকের মধ্যে যদি কিছু পার্থক্য হতে পারে তাহলে স্বয়ং মানুষদের মধ্যেও পার্থক্য হবে।

ইলমে মাহসুসাত তথা অনুভবযোগ্য জ্ঞান অনেক মামুলি ইলম। এমন ইলম গাধারও আছে। আপনিও সূর্য দেখেন গাধাও সূর্য দেখে। আপনারও অনুভূতি আছে, গাধারও আছে। আপনি ভূমি দেখতে পান সেও দেখতে পায়। অতএব অনুভূতিশক্তিতে জানোয়ার ও মানুষ সমান-সমান। সিদ্ধান্তে পৌঁছা আকলের সাথে সম্পর্ক রাখে। আর কম-বেশি আকল তো জানোয়ারদেরও রয়েছে। এমনকি তাদের ইলমের মর্যাদাও আছে। আপনি আল্লাহর আহকাম জানেন; এমন মর্যাদা জানোয়ারেরও আছে। আপনি অনেক অনেক কামিল একথা সঠিক আর ওরা অনেক অসম্পূর্ণ তাও ঠিক। তাহলে আমি বলব, সকল মানুষ কি আলেম, সবাই কি শরীয়তের আহকাম জানে? যদি সবাই সবকিছু জানত, তাহলে এই 'জামিয়া কাসেমিয়া' প্রতিষ্ঠা করার কী প্রয়োজন ছিল? এই মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করার কী দরকার ছিল? সবাই মায়ের পেট থেকে আলেম হয়ে পয়দা হত। অতএব সবাই একপর্যায়ের নয়। আপনার মধ্যে যদি কিছু ইলম থাকে, তাহলে কম-বেশি ইলম জানোয়ারের মধ্যেও আছে। আপনার যদি আকল-বুদ্ধি থাকে, তাহলে কম-বেশি জানোয়ারের মধ্যেও রয়েছে। আপনার বুঝ থাকলে,

তাদের মধ্যেও আছে। তাহলে আপনার মধ্যে কী বস্তু রয়েছে যে, আপনি সৃষ্টির সেরা জীব? আপনি কিভাবে দাবি করেন, আপনি উত্তম মাখলুক?

আপনি বলবেন, আমি বাড়ি নির্মাণ করতে পারি। তাহলে কাকও বলবে, আমি বাসা নির্মাণ করতে পারি। আপনি বলবেন, আমি তলাবিশিষ্ট বাড়ি নির্মাণ করতে পারি, তাহলে বাবুই নামে একটি ছোট্ট পাখি বলবে, আমি বিল্ডিং বানাতে পারি- যাতে বাথরুম আলাদা, শয়নকক্ষ পৃথক, শিশুদের রুম ভিন্ন, দোলনা আলাদা। আর কেমন মজবুত বাড়ি? অর্থাৎ দুই-তিনটি ঘাসের তার হয়ে থাকে, যা দ্বারা সে নিজের ঘরকে বাবলা গাছের সঙ্গে টানা দেয়। তা অন্ধকারে থাকে, বৃষ্টি আসে, বাতাস আসে, বাবলা গাছ উপড়ে পড়ে যায়; কিন্তু এত কিছুর পরও তার বাসা ভাঙ্গে না! সে এতো পোক্ত বিল্ডিং নির্মাণ করে, যাতে রুম থাকে। অতএব আপনি অহেতুক দাবি করেন, আমরা বড়-বড় ইঞ্জিনিয়ার। তাহলে বাবুই পাখি বলবে, আমিও বড় ইঞ্জিনিয়ার, আমিও কয়েক তলা বিশিষ্ট বাড়ি বানাতে পারি।

মধুপোকা বলবে, আমি তোমাদের চেয়ে বড় কারিগর। কেননা, মৌমাছির চাকে আট স্তরে ছিদ্র থাকে। আপনি হয়তো যন্ত্র দ্বারা এমন নিখুঁত ও সমান-সমান ছিদ্র অনেক কষ্টে বানাতে পারবেন আর ওরা যন্ত্র ছাড়া শুধু মুখের অনুমানে ছিদ্র বানিয়ে ফেলে। তারপর তাতে ভিন্ন-ভিন্ন এলাকা নির্মাণ করে। এক অংশে মধু থাকে, যা জাতির খোরাক, এক অংশে বাচ্চা থাকে এবং এক অংশে মা-বাবা থাকে। এসবকিছু যেমনভাবে আপনারা করেন, ওরাও করে। আপনাদের যেমন খাদ্যমন্ত্রী রয়েছে, তেমনি তাদেরও খাদ্যমন্ত্রী রয়েছে।

আপনি বলবেন, হযরত আমরা জাতির শৃঙ্খলা জানি, তাদের পরিচালনা করতে পারি, আমাদের একজন প্রেসিডেন্ট থাকে, প্রধানমন্ত্রী থাকে, জানোয়ারের কী এমন ভাগ্য আছে? তাহলে মধুপোকা বলবে, হ্যাঁ! এসবকিছুই আমাদের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে। আমাদের মধ্যে আমির আছে। সবচেয়ে বড় মধু পোকাকে আরবি ভাষায় 'ইয়াসুব' বলে। তার ইশারাতে সকল মধুপোকা নড়াচড়া করে। সে যেখানে বসবে, হাজার পোকা সেখানে বসবে। আর ওখানেই মৌচাক তৈরি হবে। এমন হওয়ার কোন সুযোগ নেই যে, সর্দার পোকা চলে গেছে আর অন্য পোকারা যায়নি।

অতঃপর জাতির পরিচালনার এ-অবস্থা যে, অপরাধীদের শাস্তি দেওয়া আর আনুগত্যশীলদের সম্মানিত করা এগুলোও মৌমাছির মধ্যে বিরাজমান। আপনি দেখে থাকবেন, যেখানে মধুপোকার বাসা থাকে তার নিচে কিছু মাছি ভেঙে দূরে পড়ে থাকে। তাদের মৃত্যুর কারণ এমন হয়ে থাকে যে, যদি কোন মাছি কোন বিষজাতীয় বৃক্ষে বসে এবং বিষমিশ্রিত মধু চুষে আসে, তাহলে তাদের আমীরুল

মুমিনীন ততক্ষণাৎ চিনে ফেলেন যে, সে বিষমিশ্রিত মধু নিয়ে এসেছে। যদি সে এখানে বসে পড়ে এবং তা যদি মধুতে মিশিয়ে ফেলে, তাহলে পুরা জাতি ধ্বংস হয়ে যাবে। তখন আমির তার গর্দান ছিঁড়ে নিচে ফেলে দেয়। তারপর আরো আশ্চর্য বিষয় হল, তাদের মধ্যে কোন প্রকার আন্দোলন ও প্রতিবাদ হয় না যে, আমিরকে পদত্যাগ ও অপসারণ করানোর জন্য তাকবীর দিয়ে দাঁড়িয়ে যাবে। বরং সবাই বলতে থাকে, আমাদের আমির যা করেছেন মঙ্গলের জন্য করেছেন। তার মধ্যে যতটুকু ইলম আছে, আমাদের মধ্যে তা নেই। তিনিই জাতির ভাল-মন্দ জানেন। তাই তারা তার হত্যার উপর রাজি থাকে।

এ বিষয় সম্পর্কে কুরআনুল কারীমে ইরশাদ হয়েছে–

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يّٰٓاُولِي الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ۝ ١٧٩

হে বুদ্ধিমানগণ! কেসাসের মধ্যে তোমাদের জন্য জীবন রয়েছে। *[সূরা বাকারা : ১৭৯]*

একজনকে হত্যা করা হয় যাতে জাতি বাঁচতে পারে। তেমনিভাবে মাছির সর্দার বলে, একজন হত্যা কর, যাতে সকল জাতির জীবন অবশিষ্ট থাকে। যদি তাকে ছেড়ে দেই, তাহলে সমগ্র জাতি ধ্বংস হয়ে যাবে। অতএব শৃঙ্খলার ইলম ও রাষ্ট্রনীতির ইলম তার মধ্যে রয়েছে, ইঞ্জিনিয়ারিং ও নির্মাণ বিদ্যা রয়েছে। সুতরাং অনর্থক দাবি করছেন, আমরা ইঞ্জিনিয়ার, আমরা রাজনীতিবিদ, আমরা জাতি পরিচালনা করতে জানি। এগুলো তো জানোয়াররাও পারে।

হাঁস যখন আসে তো সর্বদা তিনজন করে আসে– দুই কাতার হয়ে চলে আর আগে আগে আমীর চলে। যেমনভাবে প্যারেড গ্রাউন্ডে সৈন্যবাহিনী কাতারবন্দি হয়ে যায় এবং তারা লেফটেন্যান্টের আওয়াজে চলে। তেমন শান হাঁসের মধ্যেও বিদ্যমান। যখন ওরা ঝিলে বসে আর সামান্য ভয় হয়, তখন ওদের আমীর অর্থাৎ হাঁসা যে পূর্ণ রাত এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকে, যাতে তার পুরো দল আরামে ঘুমাতে পারে। আমি কষ্ট করি। এ কারণে আরাম ও শান্তি অর্জনের নাম নেতাগিরি নয়, আমীরত্ব জাতির জন্য কষ্ট সহ্য করার নাম। আমার জাতির আরাম পৌঁছে এ জন্য আমির সারারাত কষ্ট করে। সামান্য ভয়ের সন্দেহ হলে সে একটা আওয়াজ দেয়। এতে সকল হাঁস সতর্ক হয়ে যায়। দ্বিতীয় আওয়াজ দিলে পাখা উঠায়, তৃতীয়বার আওয়াজ দিলে পথ চলা শুরু করে। যেমনভাবে ফৌজী কমান্ডার রণভেরি বাজিয়ে দেন। সৈনিকদের পরিভাষায় প্রথমবার বাজানোর দ্বারা প্রস্তুত হয়, দ্বিতীয়বার ইউনিফর্ম পরিধান করে, তৃতীয়বার হাতিয়ার তাক করে, চতুর্থবার মার্চ করে। অতএব আপনারা অনর্থক দাবি করেন

যে, আমরাই যোদ্ধা, আমরাই যুদ্ধের কমান্ডার, আমরাই যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী, আমরাই সমরবিদ্যায় পারদর্শী, আমরাই আরবি ও অনারবী বিদ্যায় পারদর্শী। এগুলো জানোয়ারও জানে। অতএব ইলম আশরাফুল মাখলুকাতের ভিত্তি হতে পারে না।

এখন যদি বলেন, হযরত! আমরা তো অনেক উন্নত ও দামি কাপড় বুনতে পারি। খাবারও ভাল ভাল গ্রহণ করি। আমরা পোলাও, জর্দা, বিরিয়ানি খাই। গাধা এগুলো কোথায় পাবে? সুতরাং আমরাই সর্বশ্রেষ্ঠ মাখলুক। আমি বলি, একথা তখনই বলতে পারেন, যখন গাধা আপনার জর্দা-পোলাওয়ের প্রতি লোভ করে। আপনি যেমন গাধার ঘাসকে তুচ্ছ নজরে দেখেন, তেমনিভাবে গাধাও আপনার পোলাও-জর্দাকে তুচ্ছ নজরে দেখে।

অর্থাৎ আপনি আপনার শ্রেণী মোতাবেক আহার করেন আর গাধা তার শ্রেণী মোতাবেক আহার করে। অথবা আপনাদের মধ্যে শ্রেণীগত পার্থক্য হল, খাওয়া ও ক্ষুধা দুটিতে কোন পরখ নেই। আপনারও খাওয়ার চাহিদা আছে, তাদেরও চাহিদা আছে। অতএব আহার না করা শ্রেষ্ঠত্ব হতে পারে। বাড়ি নির্মাণ, ইঞ্জিনিয়ার হওয়া শ্রেষ্ঠত্বের কারণ নয়। রাজনীতির ইলমও উত্তম হওয়ার দলিল হতে পারে না। প্রাণীদের মধ্যে রাজনীতির জ্ঞান রয়েছে। এখন বলবেন, আমরা বড়-বড় ডাক্তার, আমরা চিকিৎসা করি। আমি বলি, প্রাণীদের মধ্যেও বড়-বড় ডাক্তার আছে।

আমার একবার রাজপুতানা যাওয়ার সুযোগ হয়েছিল। আমার শ্বশুর মরহুম মৌলভী মাহমুদ সাহেব রহ. আন্দরগড় রাজ্যের মন্ত্রী ছিলেন। ওখানে যেহেতু হিন্দুদের রাজত্ব ছিল, তাই বানরহত্যা নিষেধ ছিল। বানররা খুব ক্ষতি করত, রুমের দরজা খোলা থাকলে কেউ কাপড় নিয়ে যেত, কেউ পাত্র নিয়ে যেত। এমন ঘটনা নিত্যদিনের। আর বানরগুলো এত ক্ষতিকারক যে, শুধু কি কাপড় নিয়ে যেত, বরং দেওয়ালে বসে দেখিয়ে দেখিয়ে কাপড় ছিঁড়ে ফেলত। তাদের অহেতুক রাগ আসত; কিন্তু উপায় তো নেই, কারণ হত্যা করা যাবে না। তবুও গোপনে-গোপনে দু-চারটি হত্যা করেছি। মেরে মেরে রাতের বেলায় বাইরে ফেলে দিতাম। কিন্তু এতে বানর কমে যেত না, পরদিন আবার আসত এবং একই কাহিনী করত।

তো আমি প্রতিজ্ঞা করলাম, শ-পঞ্চাশটি বানর মেরে ফেলব। এতে কিছুটা কমবে এবং অন্তর শীতল হবে। এ নিয়তে তিন-চার রুপির বিষ ক্রয় করলাম এবং কয়েক সের আটা খরিদ করলাম। বিষ ও আটা মিশ্রিত কয়েকটি রুটি তৈরি করে ছাদে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রেখে দিলাম এবং দেখার জন্য বসে গেলাম।

মনে-মনে কল্পনা করতে লাগলাম, বানর আসবে আর খাবে এবং মরবে আর আমি আনন্দিত হব।

কিন্তু দুই-তিনটি বানর এল। তারা বড় সেয়ানা প্রাণী। তারা দেখল, রুটি ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে। কিন্তু রুটির কাজ তো ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা নয়। অতএব এতে কিছু একটা রহস্য আছে। তারা বসে বসে দেখতে লাগল। রুটি ধরার জন্য অগ্রসর হল না। যেগুলো এসেছিল ওরা চলে গেল। আমি মনে করলাম, আমার তদবির ফেল। তারা বুঝে ফেলেছে। ওরা ওদের বস্তিতে গিয়ে জানাল, তারপর ১৪/১৫টি মোটাতাজা বানর এল, ওরা অবস্থা দেখতে লাগল। কেমন যেন তাদের মনে প্রশ্ন উদয় হল, রুটি এভাবে পড়ে থাকে না। এগুলো যেহেতু পড়ে আছে, তাহলে এতে কোন রহস্য আছে। তারপর ওরাও চলে গেল। তারপর ১০/১৫ মিনিট পর পঞ্চাশ-ষাটটি মোটাতাজা ও চৌধুরী পর্যায়ের বানর এল। ওরা রুটির চারপাশ ঘিরে বসে গেল। কেমন যেন তারা গোল মিটিং বসিয়েছে যে, এ রুটিগুলো কেন পড়ে আছে। এতে কী রহস্য আছে? ওরা রুটির দিকে তাকাচ্ছে; কিন্তু ভয়ে কেউ আগাচ্ছে না।

পরিশেষে একটা বৃদ্ধ বানর এগিয়ে এসে একটি রুটি ভেঙ্গে নাকে ধরল। তারপর পরপর আরো দুটি গেল এবং রুটি ভেঙ্গে ঘ্রাণ নিল। তারপর মনে হয় একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে; তাই ওরা সবাই ভেগে গেল। আমি ভাবলাম, তদবির ফেল হয়েছে। কিন্তু ওরা আমার চেয়েও চালাক ছিল। এভাবে দেখতে দেখতে দশ-বিশ মিনিট না যেতেই শদুয়েক বানর চলে এল এবং প্রত্যেকের হাতে তাজা গাছের ডাল, যাতে পাতাও ছিল। তা নিয়ে চলে এল। মনে হল সৈন্যবাহিনী এসেছে। ওরা ঢালহাতে এল এবং রুটিগুলো টুকরো টুকরো করল। কারণ, তাদের সংখ্যা থেকে রুটি কম ছিল।

কবি বলেন–

نیم نانے برخورد مرد خدا بذل درویشاں کند نیمے دگر

ওরা দরবেশ ছিল। তাই বলল, আপন উদ্দেশ্য পূরণ ঠিক নয়, বণ্টন করে খাও, সবার ভাগে পড়া উচিত।

অতএব সংখ্যা মোতাবেক টুকরা করল। তারপর প্রত্যেকে একটি টুকরো খেল এবং বৃক্ষের পাতা খেল। তারপর দম্ভভরে চলে গেল। ওদের মধ্য হতে কেউ বেহুশও হল না, মরা তো দূরের কথা। সুতরাং ওরা বুদ্ধিমান প্রমাণিত হল আর আমি বেকুফ প্রমাণিত হলাম যে, রুটিও গেল আটাও গেল, সময়ও নষ্ট হল। আর আমার মনের বাসনা থেকেই গেল এবং ওরা নিরাপদ ও নিশ্চিন্তে চলে

গেল। ওদের এমন গাছের শিকড় সম্পর্কে জ্ঞান ছিল, যার মধ্যে বিষপ্রতিশেধক রয়েছে। বিষ হত্যাকারী ছিল, ওরা বিষ আহার করল এবং সাথে-সাথে বিষপ্রতিশেধক পাতা খেল। ফলে কিছুই প্রভাব পড়ল না। সুতরাং আপনাদের অহেতুক দাবি যে, আমরা বড়-বড় ডাক্তার, ওদের মধ্যেও ডাক্তার রয়েছে, ওরাও গাছ-গাছড়ার বৈশিষ্ট্য জানে। তবে আপনি শত-শত জানেন আর ওরা দু-চারটি জানে এতটুকু পার্থক্য; কিন্তু জানে তো।

অতএব ডাক্তারি বিদ্যা বলুন, অনুভূতিবিদ্যা বলুন সবগুলোতে জানোয়ারদেরও অংশীদারিত্ব রয়েছে। তাই আপনারা অহেতুক দাবি করে বসে আছেন যে, আমরা আশরাফুল মাখলুকাত। কেননা, আমাদের ইলম ও জ্ঞান রয়েছে। এসব ইলমের নমুনা রয়েছে। তাই নিয়মমাফিক প্রশ্ন থেকে যায় যে, মানুষ আশরাফুল মাখলুকাত হওয়ার বুনিয়াদ কী? শুধু আকল যথেষ্ট নয়। কারণ, তা অন্যান্য প্রাণীদের মধ্যে রয়েছে। ইলম; তাও যথেষ্ট নয়, তাও অন্যদের ভিতর আছে। বিভিন্ন ধরনের ইলমও যথেষ্ট নয়; তাও তাদের ভিতর আছে। তাহলে ভিত্তি কী জিনিস হতে পারে?

সকল সৃষ্টজীবের মধ্যে জ্ঞান ও বুদ্ধি রয়েছে

যদি চিন্তা করা হয় এবং ইনসাফের সাথে দেখা হয়, তাহলে একটা বৈশিষ্ট্য দেখা যাবে, যা মানুষের মধ্যেও আছে, অন্য মাখলুকের মধ্যেও আছে। এমনকি ফেরেশতাদের মধ্যেও আছে। অর্থাৎ ফেরেশতারাও আলেম। যখন আল্লাহ তায়ালা হযরত আদম আ.কে ফেরেশতাদের মোকাবেলায় দাঁড় করালেন এবং বললেন,

يَاٰدَمُ اَنْۢبِئْهُمْ بِاَسْمَآئِهِمْ

হে আদম! এই বস্তুগুলোর নাম বলে দাও।

তিনি তখন প্রত্যেক বস্তুর নাম ও বৈশিষ্ট্য বলে দিলেন। তখন ফেরেশতারা বলেছিল–

سُبْحٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَآ اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا

নিঃসন্দেহে আপনি পবিত্র, আমাদের জানা নেই যতটুকু আপনি আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন তার চেয়ে বেশি।

এতে বুঝা গেল, ফেরেশতাদের ইলম শিখানো হত। তাদের নিকটও ইলম ছিল। তবে আদম আ.-এর মত ছিল না। যেহেতু প্রাণীদের ইলম রয়েছে, তাহলে ফেরেশতাদের তো আরো বেশি হওয়া উচিত। আকল, ইলম ও বুঝ ফেরেশতাদেরও ছিল, তাদের থেকে কম মর্তবার মালিক জিন্নাতদেরও আছে। তাদের থেকে নিম্নমানের প্রাণীজগতেরও আছে, ওদের চেয়ে নিম্নপর্যায়ের বৃক্ষরাজি ও জড়পদার্থেরও আছে। তাই মানুষের দাবি করার অধিকার নেই যে, আমাদের আকল-বুদ্ধি আছে; তাই আমরা বড়। আমাদের ইলম আছে; আমরা বড়। ইলম সকলের মধ্যে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে বিদ্যমান।

ইলম স্থানান্তর করা মানুষের বৈশিষ্ট্য

একটি বিষয় রয়েছে, যা মানুষ ব্যতীত অন্যদের মাঝে পাওয়া যায় না। আর তাহল তালিম। অর্থাৎ অন্যকে শিখানো, অন্যকে তৈরি করা, অন্যকে তারবিয়াত তথা দীক্ষা দেওয়া। ফেরেশতাদের মধ্যে নেই, জিন্নাতদের মধ্যে নেই, প্রাণীদের মধ্যে নেই। প্রাণীদের মধ্যে যতটুকু ইলম রয়েছে, তা তাদের তবিয়ত বা স্বভাবগত ইলম, যা আল্লাহ তায়ালা তাদের অন্তরে ঢেলে দিয়েছেন। ওরা কোন মক্তব-মাদরাসা থেকে শিক্ষা পায়নি।

আজ এখানে জামিয়া কাসেমিয়া প্রতিষ্ঠা হচ্ছে। আপনারা কি কখনও শুনেছেন যে, প্রথম আকাশে কোন জামিয়া কায়েম হয়েছে আর ফেরেশতারা মুদাররিস ও উস্তাদ হয়ে পড়াতে বসে গেছেন। অথবা অন্য কোন আকাশে মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে অথবা জিন জাতি খোলা প্রান্তরে কোন মাদরাসা-মক্তব খুলেছে? একজন অপরজনের নিকট শিক্ষার মাধ্যমে ইলম পৌঁছানো শুধু মানুষের কাজ। ফেরেশতাকূলের যে ইলম রয়েছে, তা তাদের তবয়ী রং অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা যতটুকু তাদের অন্তরে ইলহাম করেছেন। তাদের ইলম ইচ্ছা ও অনুভূতি ব্যতীত। প্রাণীকূলের মধ্যে যতটুকু ইলম রয়েছে, তা ওদের ভিতর শিখানোর কারণে আসেনি, বরং আল্লাহর পক্ষ থেকে সৃষ্টিগতভাবে ওদের মধ্যে ঢেলে দেওয়া হয়। ওরা আলেম হয়ে যায়। কিন্তু মানুষ সৃষ্টিগত ইলমের পাশাপাশি অর্জিত ইলমের অধিকারী হন। তারা শিখেন ও শিখান, যা তাদের মস্তিষ্কে আছে তা অন্যদের নিকট স্থানান্তর করেন। সেই ইলম মোতাবেক তারবিয়াত প্রদান করেন, ট্রেনিং করেন, মশক ও অনুশীলন করেন। এই শিক্ষকতার বৈশিষ্ট্য পৃথিবীতে মানুষ ছাড়া অন্যদের নেই। না ফেরেশতাদের মাঝে তালিম ও তারবিয়াতের ব্যবস্থা আছে, না জিনদের মাঝে, না প্রাণীজগতের মাঝে। মানুষের

মধ্যে বিভিন্ন ধরনের ইলম রয়েছে। তোতা পাখির যতটুকু ইলম আছে, তা তার ভিতরেই আছে, সে অন্যকে শিখাতে পারে না। অন্য তোতাদের যতটুকু ইলম হাসিল হয় তা আল্লাহর পক্ষ হতেই আসে, তা সীমাবদ্ধ। সে তৃতীয় তোতাকে শিখাতে পারে না।

ফেরেশতাদের মধ্যে যতটুকু ইলম আছে, তা তাদের জাতের জন্য, তা তারা অন্যদের মাঝে স্থানান্তরিত করতে পারে না। আর মানুষদের নিকট যে ইলম রয়েছে, তা তারা তাদের শিশুদের শিখাতে পারে, পরবর্তীদের পড়াতে পারে। অতএব আজলের (অনাদি) ইলম আজলী (অনন্ত) থাকে। এ শুধু মানুষের বৈশিষ্ট্য। সুতরাং মুয়াল্লিম, উস্তাদ, তালিম, তালকিন ও তারবিয়াত এগুলো শুধু মানুষের বৈশিষ্ট্য। আর এটিই তাদের উত্তম ও শ্রেষ্ঠত্বের কারণ। মানুষ একথা বলতে পারে যে, আমি সবচেয়ে উত্তম; যে বস্তু আমার ভিতর আছে তা কারো মধ্যে নেই। আমি নিজের ইলম হাজারো মানুষের ভিতর স্থানান্তরিত করতে পারি। অন্য মাখলুকরা পারে না। কেননা, তাদের নিকট ইলম স্থানান্তর হয়ে আসেনি। তাদের ইলম তাদের তবিয়তে জমা করা। তাদের এতটুকু অনুভূতি নেই যে, তাদের মধ্যে ইলম রয়েছে। কিন্তু তার মধ্যে ইলম রয়েছে। তবে মানুষ জানে, অনুভব করতে পারে যে, আমার মধ্যে একশ মাসআলার ইলম আছে। আমি একশ মাসআলার ইলম অন্যদের পর্যন্ত পৌছাতে পারব। অতএব মানুষের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হল, তালিম-তরবিয়াত অর্থাৎ চেষ্টা মেহনত দ্বারা হাসিল করা ইলম এবং চেষ্টা-মেহনত করে অন্যকে পৌছানো।

তো ইলম দু-ধরনের। একটি ইলমে লাজেমী অর্থাৎ তবিয়াত বা সৃষ্টিগত ইলম, যা সবার ভিতর আছে। আর অপরটি ইলমে মুতায়াদ্দী তথা স্থানান্তরশীল ইলম। তা শুধু মানুষের মধ্যেই বিদ্যমান। একজন অন্যজনকে প্রদান করে। এভাবে চলে আসছে। যে ইলম হযরত আদম আ.কে দেওয়া হয়েছিল, তা আজ পর্যন্ত সংরক্ষিত। হাজার-হাজার বছর অতিবাহিত হওয়ার পরও জন্মগতভাবে স্থানান্তরিত হয়ে চলে আসছে। ওই ইলমের মধ্যে হযরত নূহ আ. যা বাড়িয়ে ছিলেন তাও বিদ্যমান। হযরত ইবরাহীম ও হযরত মুসা আ. যা বৃদ্ধি করেছিলেন, তা আজও বিদ্যমান। তারপর সেগুলোর মধ্যে পূর্ণতার লেবেল নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমনভাবে লাগালেন যে, প্রতিটি বস্তু ও ইলমের প্রত্যেক সীমাকে এত পরিমাণ পূর্ণতা দিলেন যে, প্রকারভেদ হিসেবে আরো বৃদ্ধি করার সুযোগ নেই। তিনি এমন উসূল ও কুল্লিয়াত জানিয়ে দিয়েছেন যে, কিয়ামত পর্যন্ত লাখ-লাখ শাখা-প্রশাখা তা থেকে বের হতে থাকবে এবং মানুষের মধ্যে ওই ইলমের পিপাসা বাকি থাকবে না। সকল নবী ইলম ও

কামালসমূহের তালিম দ্বারা অগ্রগামী হয়েছেন, তারবিয়াতের মাধ্যমেই উন্নতি লাভ করেছেন। অতএব তালিম ও তারবিয়াত সর্বদা চালু থাকবে এবং বৃদ্ধি পেতে থাকবে। এ বিষয়টি মানুষ ব্যতীত অন্যদের নেই। তাই একথা বলা যেতে পারে যে, মানুষ এ জন্য উত্তম যে, সে একজন মুয়াল্লিম।

নববী শিক্ষার আযমত

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

إِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا

আমাকে মুয়াল্লিম বানিয়ে পাঠানো হয়েছে।

অর্থাৎ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এত বড় আলেম ছিলেন যে, সারা কায়েনাতে এত বড় মাপের আলেম আর কেউ হয়নি। ইলমের মর্যাদায় আল্লাহ তায়ালার পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্থান। তিনি একদিকে ছিলেন আলেম, অপরদিকে ছিলেন মুয়াল্লিম। তাঁর সবচেয়ে বড় কামাল হল, তিনি নিজের পবিত্র জীবনে অন্তত এক লাখ চব্বিশ হাজার সদস্যকে পূত-পবিত্র নমুনায় তৈরি করেছিলেন, যাঁরা তাঁরই রঙে রঙিন ছিলেন। তাঁরা তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করতেন। তাঁরা নিজেদের রক্তের ফোঁটা ঝরাতে দ্বিধাবোধ করতেন না। এমন এক লাখ চব্বিশ হাজার নমুনা তালিম ও তারবিয়াত দ্বারাই করেছিলেন। তিনি তালিম দ্বারা মাসায়েল শিখাতেন আর তারবিয়াত দ্বারা অন্তরের রাস্তা ঠিক করতেন। অন্তর নির্মাণ করতেন। তারবিয়াত হল বাতেনী তালিম, যার মাধ্যমে অন্তর থেকে অন্তরে ইলম ও কামালাত পৌঁছানো হয়।

বাতেনী শিক্ষা প্রদান

হাদীসে হযরত উমর ফারুক রা. সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, হযরত খাব্বাব ইবনে আরাত রা. নামায পড়ছিলেন। আর কুরআনুল কারীম সম্পর্কে বলা হয়েছে–

أُنْزِلَ الْقُرْآنُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ

প্রথম দিকে কুরআনকে সাত ভাষার পড়ার ইজাজত দেওয়া হয়েছিল। হযরত খাব্বাব রা. নিজ ভাষা মোতাবেক নামায পড়ছিলেন। আর হযরত উমর ফারুক রা.-এর কুরাইশ ভাষায় কুরআন মুখস্থ ছিল। ভাষার পরিবর্তনে অর্থের মধ্যে কোন পার্থক্য হত না। আরবে সাতটি বড়-বড় গোত্র ছিল, যাদের ভাষা

সাহিত্যপূর্ণ ছিল। তাদের মধ্যে সর্বোচ্চ মর্যাদার কবিলা হল কুরাইশ, তারপর বনী তামীম, তারপর বনী ইসরাইল ইত্যাদি ইত্যাদি। আর ভাষাগুলোর পরস্পর পার্থক্য ছিল এমন যে, আমাদের দেশের দিল্লি ও লক্ষ্ণৌ এর ভাষার পার্থক্য। অথবা দিল্লী ও হায়দারাবাদের সবাই উর্দু ভাষা বলে; কিন্তু কিছুটা উচ্চারণ ও বাচনভঙ্গির পার্থক্য, পরিভাষা ও আঞ্চলিকতার তফাৎ। দিল্লীবাসী ও লক্ষ্ণৌবাসী অর্থ একই বুঝে; কিন্তু অর্থ বোঝানোর জন্য উভয়ের এলাকায় ভিন্ন-ভিন্ন শব্দ ও ভাষা রয়েছে। উদ্দেশ্য উভয়ের একই। স্রেফ উচ্চারণ ও বাচনভঙ্গির পার্থক্য।

যাহোক, ইসলামের শুরু যুগে সাত ভাষায় কুরআন পড়ার অনুমতি ছিল। হযরত খাব্বাব রা. নিজ ভাষায় কুরআন তেলাওয়াত করলেন। হযরত উমর ফারুক রা. তার আগে-পরে সবই শুনলেন আর তিনি পড়তেন অন্য ভাষায়। আর তিনি তো আল্লাহর হুকুমের ব্যাপারে কঠিন হৃদয়ের মানুষ ছিলেন। তিনি ততক্ষণাৎ হযরত খাব্বাব রা.কে ধরে বললেন, তুমি কোন দীন পালন করছ? হে মুনাফিক! তুমি কুরআন ভুল তেলাওয়াত করছ? আমি এখনই তোমার গর্দান উড়িয়ে দেব। তাকে ধাক্কা মারতে মারতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে নিয়ে গেলেন এবং বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! সে ভুল তেলাওয়াত করছে। তিনি বললেন, তাকে ছেড়ে দাও। তারপর হযরত খাব্বাবকে বললেন, তুমি পড়। তিনি তাঁর নিজস্ব ভাষায় তেলাওয়াত করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হ্যাঁ; এভাবেই তা নাযিল হয়েছে। তারপর হযরত উমর রা.কে বললেন, এবার তুমি পড়। তিনি কুরাইশের ভাষায় তেলাওয়াত করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হ্যাঁ; এভাবে কুরআন নাযিল হয়েছে।

তখন হযরত উমর ফারুক রা.-এর অন্তরে সন্দেহ সৃষ্টি হল যে, এটি কেমন কুরআন, যে যেভাবে পড়ে তাকেই বলে দেওয়া হয়, এভাবেই নাযিল হয়েছে। যখন তার সন্দেহ ওয়াসওসার রূপ ধারণ করে, তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাথে-সাথে তাঁর বুকে হাত বুলালেন এবং বললেন, হে খাত্তাবের বেটা!

হযরত উমর রা. নিজে বলেন, আমার মনে হল সারা আসমান আমার সামনে খুলে গেল। জাহির হয়ে গেল। আমার আসল অবস্থা বুঝে এসে গেল। এটিও একটি শিক্ষা ছিল। কিন্তু তা ভাষাগত তালিম ও শিক্ষা ছিল না, তা ছিল বাতেনী তাসাররুফ ও বাতেনী শিক্ষা।

হাত মোবারক বুকে বুলিয়ে দেওয়া, অন্তরে হাত মারা ছিল বাতেনী তালিম। নববী অন্তরের ফয়েজ হাতের নড়াচড়ার ফলে উমরের অন্তরে পৌঁছে। যেমন

বিদ্যুতের একটি তারকে অন্য তারের সঙ্গে যুক্ত করে কোন মানুষের নিকট পৌছালে তার দ্বারা পুরো বিদ্যুৎ লোকটির নিকট পৌঁছে যায়। তেমনিভাবে অন্তরে যে ইলমি বিদ্যুৎ ছিল তা তিনি তাঁর হাত মোবারক দ্বারা পৌঁছালেন। এটি ছিল বাতেনী তালিম। সুতরাং তিনি যবান দ্বারাও তালিম দিতেন, পবিত্র অন্তরের মনোনিবেশ দ্বারাও তালিম দিতেন। হাত মোবারক ব্যবহার করেও তালিম দিতেন। তালিম প্রদান শুধু মানুষের বৈশিষ্ট্য। নবীগণ হলেন প্রথম উস্তাদ, যাঁরা দুনিয়াকে তালিম ও তারবিয়াত দেওয়া শিখিয়েছেন। এটি মানুষের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য, যার ভিত্তিতে মানুষ আশরাফুল মাখলুকাত বা সৃষ্টির সেরা।

তালিমই হল নবুওয়াত

নবুওয়াত হল তালিমের নাম। নবী এসেছেন 'ইমবা' করার জন্য। আর 'ইমবা' বলা হয় সংবাদ প্রদান করা এবং ইলম পৌঁছানোকে। সুতরাং নবুওয়াতের নির্যাস হল তালিম ও তারবিয়াত বা শিক্ষা-দীক্ষা। নবুওয়াতের চেয়ে বড় কোন মাকাম নেই। এতে প্রমাণিত হয়, তালিমের চেয়ে বড় কোন মাকাম নেই। তালিম এমন একটি বৈশিষ্ট্য যা মানুষদের দেওয়া হয়েছে– অন্যদের দেওয়া হয়নি। জিন জাতি ও ফেরেশতাদের মাঝে কোন পয়গাম্বর নেই। বরং জিন ও ফেরেশতাকে মানব-নবীদের অনুসারী ও অনুগামী বানানো হয়েছে। মানুষদের মধ্যে যেমন ইহুদী আছে, নাসারা আছে, খ্রিস্টান আছে, মুসলিম আছে, তেমনিভাবে জিনদের মধ্যে ইহুদী, নাসারা, খ্রিস্টান, নাস্তিক, বেদীন সব ধরনের জিন রয়েছে। তারাও ঐ নবীদের উপর ঈমান রাখে। কেউ ঈসা আ.কে নবী মানে, কেউ মুসা আ.কে, কেউ তাঁদের পূর্বের কোন নবীকে মানে। তাদের জাত থেকে কোন নবী নেই। নবী শুধু মানুষদের থেকে হয়ে থাকে। জিনদেরকে তাদের অনুগামী বানানো হয়। অতএব পয়গম্বরীর অর্থ তালিম ও তারবিয়াত ছাড়া আর কী হতে পারে? নবুওয়াতের কাজ হল ইলম দ্বারা আলোকিত করা, ইলম দ্বারা নূরানী বানানো। সুতরাং এটিই সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য, যা দ্বারা মানুষ আশরাফুল কায়েনাত ও আশরাফুল মাখলুকাত হয়।

তালিম ব্যতীত মানবতা থাকে না

সারকথা হল, তালিম ইনসানের বৈশিষ্ট্য। আর বৈশিষ্ট্য বলা হয় ঐ জিনিসকে, যা বস্তুর অস্তিত্বের সাথে সম্পৃক্ত। অতএব মানুষের মধ্যে যতক্ষণ তালিমের বৈশিষ্ট্য থাকবে, তখন সে মানুষ থাকবে। যখন থাকবে না, তখন মানুষ আর

মানুষ থাকবে না। তার থেকে মনুষ্যত্ব ও মানবতা খতম হয়ে যাবে। তালিম যদি মানুষের বৈশিষ্ট্য হয়, তাহলে তালিম থাকলে মানুষও মানুষ থাকবে। আর তালিম না থাকলে মানুষ বড় সমস্যায় পড়ে যাবে, তারা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। তালিম যখন থাকবে না, তখন ইলম থাকবে না। আর ইলম যখন থাকবে না, তখন মানুষ জড়পদার্থ, বৃক্ষলতা থেকেও নিম্নমানের হয়ে যাবে। এতে প্রতীয়মান হয়, মানুষের মর্যাদা ও উন্নতি তালিম-তায়াল্লুম এবং তারবিয়াত দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়। এগুলো না থাকলে ইনসান ইনসান থাকবে না।

মাদরাসাগুলো মনুষ্যত্বের মাধ্যম

আজ যত মাদরাসা ও মকতব প্রতিষ্ঠা হচ্ছে, এগুলো মূলত মানবিক বৈশিষ্ট্যকে উজ্জ্বল করার জন্য। এ সবকিছু করা হচ্ছে মানুষের শ্রেষ্ঠত্বকে টিকিয়ে রাখার জন্য। যদি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা না করা হয়, জামিয়া প্রতিষ্ঠা না করা হয়, ধরে নেওয়া যাক আলিম মিটে গেছে, তাহলে মনুষ্যত্বও মিটে যাবে। তালিম ও তায়াল্লুমের সকল কাজ মানুষকে অবশিষ্ট রাখার জন্য। কেননা, তালিম মানুষের বৈশিষ্ট্য। এ দৃষ্টিকোণ থেকে জামিয়া কাসেমিয়া কায়েম হওয়া একটা সৌভাগ্যের কাজ এবং মোবারক আলামত। এটি মনুষ্যত্ব টিকিয়ে রাখার একটি মাধ্যম। এটি যত মজবুত হবে, মনুষ্যত্ব ততই মজবুত হবে। যত ভাল হবে এবং ইখলাসের সাথে তালিম দেওয়া হবে বাস্তবে মনুষ্যত্ব ততই উন্নত হবে।

প্রমাণপুষ্ট বিশুদ্ধ ইলম

কোন ইলম ওই পর্যন্ত উন্নত ও মর্যাদাশীল হতে পারে না, যতক্ষণ না তার যোগাযোগ ও সম্পর্ক বিশুদ্ধ হয়। ইলম হাজারো আছে; কিন্তু যখন আপনি বলবেন, আমার এই ইলম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে এসেছে, তাহলে ওই ইলম বিশুদ্ধ ও প্রমাণপুষ্ট হবে, যেন সীলযুক্ত হল, পাকাপোক্ত হল। আর যদি বলেন, আমার অভিমত এমন, তাহলে দুনিয়াবাসী বলবে, আপনার রায় আপনার নিকট থাকুক। আমাদের রায় এমন। প্রত্যেক মানুষের পৃথক-পৃথক রায় থাকে। কিন্তু মানুষ যখন বলবে, যা কিছু বলছি তা সবই আল্লাহর রাসূলের বলা কথা, তোমরা মাথা পেতে মেনে নাও, তাহলে সবাই বলবে, হ্যাঁ আমরা মাথা নত করে মেনে নিলাম।

সনদ বা প্রমাণ কী জিনিস? সম্মানিত ব্যক্তিত্বের দিকে ইলমের সম্পর্ক কায়েম করা হলে ইলমের মধ্যে সম্পর্কের দ্বারা গ্রহণযোগ্যতা আসে। যদি সম্পর্ক ও

যোগাযোগ না হয়, তাহলে গ্রহণযোগ্য হয় না। তার বাস্তব ও মূল কারণ এই যে, ইলম একটি মিরাছি বস্তু, যা উত্তরাধিকারী সূত্রে প্রাপ্ত। যেমন– হাদীস শরীফে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

إِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا إِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ

নবীগণ তাঁদের ওয়ারেসদের জন্য টাকা-পয়সা রেখে যান না, ধন-সম্পদ ও বাড়ি-গাড়ি রেখে যান না; তারা রেখে যান ইলম ও মারেফত, চারিত্রিক গুণাবলি, জাহেরি ও বাতেনী ইলম। এগুলোই নবীদের মিরাসী সম্পদ।

ইলমি উত্তরাধিকারের শর্ত

হাদীস শরীফে বলা হয়েছে–

الْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ

আলেমগণ নবীদের ওয়ারিশ।

আলেমগণ নবীদের রেখে যাওয়া সম্পদের মালিক হন। কিন্তু সম্পদ কখন পাবে? যখন নসব ও জন্মসূত্র সঠিক হয়। পিতার সম্পদ সন্তান তখনই পায়, যখন বাস্তবে প্রমাণিত হয় যে, সে বাপের সন্তান। আর যদি ছেলে একথা বলে যে, তিনি আমার পিতা নন, তাহলে কিভাবে সম্পদ পাবে? অথবা যোগসূত্রের মধ্যস্থলে কোন কর্তন হয়ে গেছে। দাদার যুগ থেকে কোন একটি সম্পদ চলে আসছে আর তা পিতার নিকট পৌঁছেছে। তখন সে মাঝখান থেকে একটি মাধ্যম কর্তন করে ফেলল। তাহলে যা ধারাবাহিকভাবে আসছিল, তখন ধারাবাহিতা রইল না। তাহলে মিরাস ফিরে যাবে; সে তা পাবে না। তাই মিরাস তখনই মিলবে, যখন সর্বোচ্চ উত্তরাধিকারী পর্যন্ত যোগাযোগ বা সম্পর্কের ধারাবাহিকতা এক থাকবে। উদাহরণস্বরূপ দ্বীনি ও ইসলামি ইলমসমূহে এবং ওই ইলমসমূহে যা আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছবে আমাদের সর্বোচ্চ মুরেছ হলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তাঁর সর্বপ্রথম রূহানি সন্তানরা হলেন সাহাবায়ে কেরাম রা.। তাঁদের পরে দ্বিতীয় পুরুষ তাবেঈন। তাঁদের পরে তাবে-তাবেঈন। তাঁদের পরে ইমামগণ, মুজতাহিদগণ, মুহাদ্দিসীন কেরাম, ফুকাহায়ে ইজাম। এভাবে স্তর বাই স্তর জামাত বাই জামাত সবাই ওয়ারেস হয়ে চলে আসছেন এবং একটি মজবুত সিলসিলা কায়েম হচ্ছে।

সুতরাং আজ আপনি কুরআন পাঠ করবেন। বললেন, কুরআন আমার বাপ-দাদার বানানো কিতাব নয় এবং তা আল্লাহর রাসূলের আনীত কিতাব। আর

আমার সিলসিলা হল, আমি এই হাদীস অমুকের নিকট পড়েছি, তিনি অমুকের নিকট পড়েছেন, তিনি অমুক থেকে শুনেছেন। এভাবে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছে যায়। প্রতিটি হাদীসের সনদ মুহাদ্দিসগণের নিকট বিদ্যমান। তারপর হাদীসসমূহের প্রকারভেদে সনদ বা যোগসূত্র যদি সন্দেহের উর্ধ্বে হয় এবং নিশ্চিতভাবে উত্তরাধিকারী প্রমাণিত হয়, তাহলে উক্ত হাদীস হুকুমের দিক থেকে কুরআনের পর্যায়ে এসে যাবে, যেমনভাবে কুরআনের অস্বীকারকারী কাফের হয় তেমনিভাবে ওই হাদীসের অস্বীকারকারীও কাফের হবে। আর যদি উত্তরাধিকারী সম্পর্ক ইয়াকিনি বা নিশ্চিত না হয় বরং ধারণাগত হয়, তাহলে তার অস্বীকারকারী কাফের হবে না, তবে ফাসেক হয়ে যাবে। বিদায়াতী হয়ে যাবে। যদি তার চেয়েও নিম্ন পর্যায়ের সম্পর্ক হয় অর্থাৎ সন্দেহযুক্ত হয়, তাহলে এমন হাদীস অস্বীকারকারী কাফের ও ফাসিক কোনটাই হবে না।

সুতরাং হাদীসের ইলমের স্তর সনদের উপর নির্ভরশীল। এ কারণে মুহাদ্দিসীনে কেরামগণ ৪ লাখ হাদীস বর্ণনাকারী ব্যক্তিদের জীবনী রচনা করেছেন। তাতে তাদের পেশা, তাদের কাজকর্ম এবং কিভাবে তাদের নিকট হাদীস পৌঁছেছে ইত্যাদি বিষয় সংরক্ষিত রয়েছে। অতএব আলহাম্দুলিল্লাহ একজন মুসলমানের ওই বৈশিষ্ট্য রয়েছে যে, সে তার রাসূলের একটি বাক্য শ্রবণ করবে তো তার সনদ রাসূল পর্যন্ত পৌঁছাতে পারবে। অর্থাৎ যে বলতে পারবে, এই সনদের মাধ্যমে উক্ত ইলমের মিরাস আমার নিকট পৌঁছেছে; এ কারণে আমি সঠিক অর্থে রূহানিভাবে রাসূলের সন্তান আর আমি সহীহ অংশীদার। অতএব মিরাস তখনই অর্জন হবে, যখন উপর থেকে নিচ পর্যন্ত বংশধারা মিলানো থাকবে। যদি মধ্যস্থলে কর্তন হয়ে যায়, তাহলে মিরাসের অংশ খতম হয়ে যাবে।

এমন রূহানি মিরাসী সম্পর্ক থাকলে ইলমের মিরাস পাওয়া যাবে। এখান থেকে উস্তাদ-ছাত্রের সম্পর্ক কায়েম হবে যে, তিনি আমার উস্তাদ আর তিনি আমার ওস্তাদের উস্তাদ এভাবে রাসূল পর্যন্ত পৌঁছে। আর তা শুধু নামের উপর নির্ভর করে নয় বরং প্রত্যেকের জীবনীসহ জেনে-শুনে। আর যদি আপনি মাঝখান থেকে সাহাবীকে বাদ দেন, তাহলে আমাদের পর্যন্ত ইলম পৌঁছবে না, তাবেঈকে বাদ দিলে ইলম পৌঁছবে না। কেননা, যোগাযোগসমূহ ভেঙে পড়েছে। অথবা আপনি কাউকে উস্তাদ না বানিয়ে নিজেই বললেন, এই ইলম আমার উপর এসেছে। তারপর তাতে কোন যোগসূত্র কায়েম করলেন না, তাহলে নবীর মিরাস প্রমাণিত হবে না, তা ইলম বলে গণ্য হবে না। ইলম হল যা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সনদ সূত্রে আপনার নিকট পৌঁছেছে।

ইসলামি ইলমের বৈশিষ্ট্য

সনদ তথা যোগসূত্র ইসলামের বৈশিষ্ট। বর্তমান বিশ্বে অন্য কারো নিকট আল্লাহপ্রদত্ত কিতাবের সনদ নেই। কিন্তু ইসলাম ধর্মে রাসূলের কালাম পর্যন্ত সনদ বিদ্যমান। মুসলমানগণ হাদীস বর্ণনাকারী থেকে নিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত সনদ মিলাতে পারে।

সনদের গুরুত্ব

কুরআন ও হাদীসের সদন তো আছেই। ফিকাহ শাস্ত্রের যে কিতাবসমূহ রয়েছে, সেগুলোর সনদও বিদ্যমান। ইমাম মুহাম্মদ রহ. যে মাবসুত কিতাব লিখেছেন, তার সব বর্ণনা বিদ্যমান যে, এটি আমি অমুক থেকে শুনেছি, তিনি অমুক থেকে শুনেছেন। এভাবে ইমাম মুহাম্মদ পর্যন্ত পৌঁছে। তেমনিভাবে তাসাউফের সনদ রয়েছে রিসালায়ে কুশাইরিয়াহ, যা তাসাউফ এর বুনিয়াদী কিতাব। তাসাউফ সংক্রান্ত যত মাসায়েল ও পরিভাষা রয়েছে, সেগুলোর সনদ জুনাইদ বাগদাদী রহ. ও আবুবকর শিবলী রহ.দ্বয় পর্যন্ত পৌঁছে। আর তাদের থেকে জনাব রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছে। সুতরাং ইসলামের বৈশিষ্ট্য হল, মুসলমানগণ দীনের প্রত্যেকটি বিষয়কে সনদের সাথে কবুল করবে। তাদের নিকট সনদ ও হুজ্জতের দলিলবিহীন কোন কথা নেই। কয়েকটি শব্দ বর্ণনা করলেই তার সনদ আছে। উদাহরণস্বরূপ আমি কুরআন শরীফ হিফজ করেছি। আমি যদি সনদ বলি, তাহলে আল্লাহ তায়ালা পর্যন্ত এর সনদ পৌঁছে। আমাকে তাজবিদসহ আমার উস্তাদ কারী আবদুল ওয়াহিদ খান সাহেব রহ. হেফজ করিয়েছেন। তাঁকে তাজবিদসহ কারী আবদুর রহমান রাহমানি রহ. হেফজ করিয়েছেন। তাকে কারী ইবরাহীম সাহেব মক্কী রহ. তাজবিদসহ মুখস্থ করিয়েছেন। এভাবে সাহাবী উবাই ইবনে কাব পর্যন্ত সনদ পৌঁছে। উবাই ইবনে কাবকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেফজ করিয়েছেন। অতএব যত মুজাব্বিদ ও কারী রয়েছেন, সকলের সনদ বিদ্যমান।

তাসাওউফের সিলসিলার মধ্যে যে শাজারা পাঠ করা হয়, তা তাসাউফের সনদ। যেমন– বলা হয়ে থাকে, আমি অমুক শায়েখের নিকট বাইয়াত হয়েছি, তিনি অমুকের নিকট অমুকের নিকট এভাবে হযরত আলী পর্যন্ত পৌঁছে। তারপর হযরত নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছে দেন। যে শাজারা পাঠ করা হয়, তা মূলত নসবনামা। তো ফুকাহাদের সনদ ভিন্ন,

মুহাদ্দিসীনদের সনদ ভিন্ন, কুররা ও মুজাব্বিদদের সনদ ভিন্ন, সুফীদের সনদ আলাদা। মোটকথা, প্রতিটি বিষয়ের সনদ রয়েছে, যা অন্য কোন ধর্মে নেই।

সিলসিলা তালিম দ্বারা-ই বাকি রাখা সম্ভব

প্রতিটি বিষয়ে সনদ শুধু মুসলমানদের বৈশিষ্ট্য। একথার নির্যাস হলো, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাদের শিক্ষা দিয়েছেন। সাহাবায়ে কেরাম তাবেঈনদের শিক্ষা দিয়েছেন। আর তাবেঈনগণ তাবে-তাবেঈনদের শিখিয়েছেন। এভাবে শিক্ষার ধারা আমাদের পর্যন্ত এসে পৌছেছে। আর এটা তালিম দ্বারাই সম্ভব হয়েছে; শুধু ইলম দ্বারা নয়। ইলম তো রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর; তা তাঁর বরকতপূর্ণ সত্তার সঙ্গে বিশেষিত। যদি তিনি না শিখাতেন, তাহলে আমরা কিভাবে আলেম হতাম? ইলম আমাদের পর্যন্ত কিভাবে পৌছত? ইলম তালিমের মাধ্যমে আমাদের পর্যন্ত পৌছেছে।

অতএব, মানবিক বৈশিষ্ট্য ও ইনসানী কামাল বা পূর্ণতা মূলত তালিম-তায়াল্লুমের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এটিই সর্বোচ্চ মর্যাদা, যা মানুষকে অন্যান্য সৃষ্টির উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছে। অন্যথায় সাধারণ ইলম তো প্রাণীজগতেরও রয়েছে; তবে কম-বেশির পার্থক্য। আমাদের মধ্যে বেশি, ওদের মধ্যে কম। কিন্তু আছে তো। হ্যাঁ, তাদের মাঝে উস্তাদ নেই আর আমাদের উস্তাদ আছেন। মানুষদের মধ্যে সর্বপ্রথম উস্তাদ হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তারপর সাহাবায়ে কেরাম রা., তারপর ইমামগণ, তারপর আলেমগণ।

বাতিলের প্রতিরোধ তালিমের উপর নির্ভরশীল

يَحْمِلُ هٰذَا الْعِلْمَ مِنْ كُلِّ خَلَفٍ عُدُوْلُهُ يَنْفُوْنَ عَنْهُ تَحْرِيْفَ الْغَالِيْنَ، وَانْتِحَالَ الْمُبْطِلِيْنَ، وَتَأْوِيْلَ الْجَاهِلِيْنَ

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, প্রত্যেক অগ্রগামীর পর অনুগামী সৃষ্টি হতে থাকবে, যারা হবেন এ ইলমের ধারক-বাহক। এঁরা এঁদের এই জ্ঞান দ্বারা বিভ্রান্তি ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের মনগড়া মিথ্যার পর্দা উন্মোচন করতেই থাকবেন। ইলমের ফায়েজের মাধ্যমে বাতিলের অসারতা প্রমাণ করতেই থাকবেন এবং জাহেলদের বিভ্রান্তিকর ঠুনকো তাবিলের পর্দা উন্মুক্ত করতেই থাকবেন।

ইলম তার উজ্জ্বল দ্যুতি নিয়ে সামনে আসতেই থাকবে এবং হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য হতেই থাকবে।

এই ইলমের বদৌলতে প্রত্যেক যুগে এমন কিছু মনীষী থাকবেন, যারা সীমালঙ্ঘনকারীদের পরিবর্তনের পর্দাকে উন্মোচন করে দিবেন এবং বাতিলদের মিথ্যা অপবাদের পর্দা দূরীভূত করতে থাকবে এবং মূর্খদের দুর্বল ব্যাখ্যাগুলোকে খণ্ডন করতে থাকবে। প্রত্যেক যুগেই এমন থাকার খবর দেওয়া হয়েছে।

এমন মানুষ তালিমের মাধ্যমেই হবে, অতএব আসল ও বুনিয়াদী বস্তু হল তালিম যার উপর উম্মত নির্ভরশীল। ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব নির্ভর করে। এই তালিমের জন্যই মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই মাদরাসা মূলত মনুষ্যত্ব কায়েম রাখার জন্য প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে। মনুষ্যত্ব জাগে না এবং মানসিক বৈশিষ্ট্য বাকি থাকে না যদি মাদরাসা ও মক্তব না থাকে। এজন্যই আমার স্নেহভাজনদের এবং মাদরাসার সাহায্যকারী হযরতদেরকে জামিয়া কাসেমিয়া প্রতিষ্ঠা করায় মোবারকবাদ জানাই।

তালিম ও তায়াল্লুমের দৃষ্টিতে মনোনীত ব্যক্তিত্ব

তার চেয়ে বেশি মোবারকবাদ পাওয়ার যোগ্য এ বিষয়ের জন্য যে, এই জামিয়া কাসেমিয়ায় যা শিক্ষা দেওয়া হবে, তাকে একজন মহান ব্যক্তিত্বের সাথে সম্পর্ক করা হয়েছে। যিনি বাস্তবে ইলম-এর দিক থেকে উঁচু মাপের এবং উস্তাদের দৃষ্টিতেও উঁচুমানের, তিনি হলেন হযরত কাসেম নানুতুবী রহ., যিনি দারুল উলুম দেওবন্দের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি এমন দশ-বারজন শাগরেদ সৃষ্টি করেন এবং প্রস্তুত করেন, যাঁদের উপর ভারতবর্ষে উলুমে হাদীস নির্ভর করে।

হযরত মাওলানা শায়খুল হিন্দু মাহমুদুল হাসান রহ. তিনি দেওবন্দে সুদীর্ঘ চল্লিশ বছর পর্যন্ত হাদীসের খেদমত করেছেন। হাজার-হাজার ছাত্র-ফারেগীন তার ফয়েয প্রাপ্ত হয়েছেন। শায়খুল হিন্দের ছাত্র কারা?

হযরত শিব্বির আহমাদ উসমানি রহ. বর্তমানে পাকিস্তানের শায়খুল ইসলাম, হযরত হুসাইন আহমাদ মাদানী তিনি ভারতের শায়খুল ইসলাম। আরো যারা রয়েছেন, তারা হলেন মাওলানা উবাইদুল্লাহ সিন্দি রহ., মুফতি কেফায়াতুল্লাহ সাহেব রহ., মৌলভী আবদুল আলী সাহেব, যিনি মাদরাসায়ে আব্দুর রবের মুহাদ্দিস ছিলেন। মাওলানা আহমাদ হাসান সাহেব আমরুহি, যিনি মাদরাসা শাহী মুরাদাবাদ এর মুহাদ্দিস ছিলেন।

এক কথায় যেখানে যেখানে বড়-বড় মাদরাসা রয়েছে, সেখানে হযরতের ছাত্ররা হাদীস ও ফিকহ পৌছে দিয়েছেন।

মাদরাসার প্রয়োজনীয়তা

হযরত নানুতুবী রহ.-এর বিশেষ শান ছিল, তিনি দেওবন্দ প্রতিষ্ঠার পর যেখানে যেতেন, মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করতেন। আমরুহায় মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন, মুরাদাবাদে মাদরাসাতুল গুরাবা প্রতিষ্ঠা করেন, আম্বিটা, শাহজাহানপুর, বেরলী ইত্যাদি স্থানে মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। তেমনিভাবে গলারঠিতে মাদরাসা কায়েম করেন। তিনি তার মুরিদ ও শাগরেদদের মাদরাসা করার প্রতি জোর তাকিদ করতেন। আজ আমরা দেখতে পাই, যেখানে মাদরাসা রয়েছে, সেখানে কিছু ইলমের আলো আছে। আর যেখানে মাদরাসা নেই, সেখানে যার মনে যা চায় বলে বেড়াচ্ছে। যেখানে অন্ধকার ছড়িয়ে পড়ছে, ওখানে সনদযুক্ত ইলমের চিহ্ন নেই। অথবা মাওজু বর্ণনা বা সনদবিহীন বর্ণনা মানুষ পড়ে থাকে। কিন্তু মুহাদ্দিসের ন্যায় উস্তাদের মত বসে সহীহ সনদের সাথে ইলমকে পৌছাবে এবং সহীহ ও গাইরে সহীহ পরখ করবে এমন লোক পাওয়া যায় না। যেখানে মাদরাসা রয়েছে, সেখানে এ জিনিসটি পাওয়া যায়।

তারবিয়াতের দরজাসমূহ

ইরশাদ হয়েছে–

مَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّؤْتِيَهُ اللّٰهُ الْكِتٰبَ وَ الْحُكْمَ وَ النُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُوْلَ لِلنَّاسِ كُوْنُوْا عِبَادًا لِّيْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ

কোনো মানুষের জন্য উচিত নয়... কেমন মানুষের জন্য? যাকে আল্লাহ তায়ালা ইলম দিয়েছেন, নবুওয়াত দিয়েছেন, সেই ব্যক্তি মানুষদেরকে বলবে, 'তোমরা আল্লাহকে পরিহার করে আমার গোলাম হয়ে যাও'। (আলে ইমরা ৩:৭৯)

এমন কথা ও কাজ তার জন্য জায়েয নেই। বরং সে বলবে–

وَلٰكِنْ كُوْنُوْا رَبّٰنِيّٖنَ

তোমরা রাব্বানি হও, রবওয়ালা হও, আল্লাহওয়ালা হও, আমার বান্দা ও গোলাম কখনও হয়ো না। *[আলে ইমরা ৩ :৭৯]*

রাব্বানী কাকে বলে?

সহীহ বুখারীতে এসেছে, হযরত ইবনে আব্বাস রা. রাব্বানীর ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে–

الَّذِي يُرَبِّي النَّاسَ بِصِغَارِ الْعِلْمِ قَبْلَ كِبَارِهِ

রাব্বানী বলা হয়, যিনি আল্লাহর মাখলুককে ছোট-ছোট মাসায়েল দ্বারা তারবিয়াত দিয়ে বড় মাসায়েল পর্যন্ত পৌছান।

শুধু বড় ও সমষ্টিগত মাসায়েল পেশ করা রাব্বানীদের শান নয়। রাব্বানীগণ শুধু আনুষঙ্গিক মাসায়েল পেশ করেন। কখনও নামাযের মাসায়েল, কখনও ওজুর মাসায়েল, কখনও বিবাহ ও তালাকের মাসায়েল, কখনও মুয়ামালা ও মুয়াশারাতের ছোট-ছোট, খুটিনাটি মাসায়েলের উপর তারবিয়াত দেন। তারপর বড়-বড় ইলম ও মাসায়েল পেশ করেন। এ কাজ করতে তিনি নিজেকে ছোট ও তুচ্ছ জ্ঞান করেন না যে, আমি এত বড় আলেম; আমি নামাযের কি মাসয়ালা বয়ান করব? ওজুর মাসয়ালা কিভাবে বলব?

সবচেয়ে বড় পুঁজি হল, প্রাথমিক পর্যায়ে মাখলুককে ছোট মাসায়েলের তারবিয়াত দিবে, যাতে আমলি যিন্দেগী ঠিক হয়ে যায়। তারপর উঁচু মাসায়েল বয়ান করবে।

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে এক ব্যক্তি হাজির হয়ে আরজি পেশ করল–

عَلِّمْنِيْ يَا رَسُوْلَ اللهِ غَرَائِبَ الْعِلْمِ

হে আল্লাহর রাসূল! ইলমের কিছু বিরল বস্তু, কিছু রহস্য এবং কিছু সূক্ষ্ম বিষয় ইরশাদ করুন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন–

هَلْ عَرَفْتَ رَأْسَ الْعِلْمِ؟

তুমি সূক্ষ্ম ও দুর্লভ ইলম শিখতে এসেছ; তোমার নিকট কি মূল ইলম আছে? বুনিয়াদী ইলম তোমার কাছে আছে কি, যার ওপর সূক্ষ্মতার ইমারত দাঁড় করানো যাবে?

সে বলল–

مَا شَاءَ اللهُ

আল্লাহ তায়ালা যতটুকু ইচ্ছা করেছেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন–

هَلْ عَرَفْتَ اللهَ؟

আল্লাহকে চিনতে পেরেছ?

সে বলল, মাশাআল্লাহ! আমার যোগ্যতা অনুযায়ী চিনতে পেরেছি।

আল্লাহর রাসূল বললেন–

هَلْ عَرَفْتَ الْمَوْتَ؟

তুমি তোমার মৃত্যুকে চিনে ফেলেছ?

সে বলল, মাশাআল্লাহ! তিনি বললেন, প্রথমে উক্ত দুটি ইলমের হক পুরা কর; তারপর আমার কাছে এস। তারপর সূক্ষ্ম ইলম বলব। প্রথমে এগুলোর উপর আমল করে নাও।

অতএব রাব্বানী ওই ব্যক্তি, যিনি প্রথমে ছোট-ছোট আমল বলে দেন এবং আস্তে-আস্তে বড় ইলম পর্যন্ত পৌছান। সুতরাং কুরআনুল হাকিমে ইরশাদ হয়েছে যে, যাকে ইলম, হিকমত এবং নবুওয়াত দেওয়া হয় তার এই দায়িত্ব নেই যে, সে লোকদের বলবে, হে লোকসকল! আমার বান্দা হয়ে যাও। আমার ইবাদত কর। বরং তারা বলবে, তোমরা রাব্বানী হও, আল্লাহওয়ালা হও।

তালিম ব্যতীত রাব্বানী তৈরি হয় না

وَلٰكِنْ كُوْنُوْا رَبّٰنِيّٖنَ

তোমরা রাব্বানী হয়ে যাও, রবওয়ালা হয়ে যাও।

কিভাবে হবে? সামনে তার পন্থা বর্ণন করা হচ্ছে–

بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُوْنَ الْكِتٰبَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُوْنَ

তোমরা কিতাবের যেভাবে তালিম দাও এবং তালিম ও তায়াল্লুমের কর্ম গ্রহণ কর, এভাবে তোমাদের রাব্বানী হতে হবে।

সারকথা, দরস ও তাদরিস তথা পড়া ও পড়ানোর কর্ম না থাকলে রাব্বানিয়াত পয়দা হওয়া মুশকিল। ওয়াজ-নসীহত এবং বক্তৃতা তো মুজাকারা মাত্র, যা ভুলে যাওয়া বিষয়কে স্মরণ করিয়ে দেয়। তা তারবিয়াতের জিনিস নয়। বক্তৃতা তো

সাময়িক বস্তু। অতএব বক্তৃতা বা খুতবা এগুলো তারবিয়াত করতে পারে না; এগুলো শুধু মুযাকারা এবং স্মরণ করানো যে, তুমি যে সবক ভুলে গেছ তা আবার শুরু কর। তাহলে যেগুলো এখনো পড়েনি, সেগুলো স্মরণ কিভাবে করানো হবে?

সুতরাং রব্বানী তৈরির প্রকৃত পথপ্রদর্শক হল তালিম ও তাদরিস। আর তালিম-তাদরিসও কিতাবের সাথে সম্পৃক্ত।

بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُوْنَ الْكِتٰبَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُوْنَ

অর্থাৎ কিতাবুল্লাহ সামনে রেখে তার দরস প্রদান কর। এমন কিতাবের তালিম দাও যা ইলমের উৎস।

মোটকথা, রাব্বানিয়াত তালিম-তারবিয়াত ব্যতীত পয়দা হয় না। আর তালিম ও তায়াল্লুম হল, মানুষের বৈশিষ্ট্য, যা অন্যদের মাঝে পাওয়া যায় না। এতে প্রতীয়মান হয়, সঠিক অর্থে রাব্বানী বানানো মানুষের কাজ, অন্যদের কাজ নয়। এমনকি ফেরেশতাও যদি চেষ্টা করে, তাহলে মানুষদের রাব্বানী বানাতে পারবে না। তারা বড়জোর ইলম পৌঁছাতে পারবে। তারা তার অর্থ না-ও জানতে পারে। যেমন তারা কিতাবী ইলম পৌঁছায়। কিন্তু সঠিক অর্থে তা বুঝা, হৃদয়ঙ্গম করা এবং বুঝানো মানুষের কাজ। এ কারণে প্রথমে ইলম, তারপর তালিম, তালিমের পর উস্তাদ, তারপর সনদ এবং উস্তাদের সনদ ও বংশ সঠিক থাকা, তাহলে ইলম গ্রহণযোগ্য হবে।

সনদের মর্যাদা

আলহাম্দুলিল্লাহ জামিয়া কাসেমিয়ার যে উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হয়েছে, তাতে তিনটি বিষয় চলে এসেছে। ইলম এসেছে, তালিম এসেছে এবং তালিম এর সঙ্গে এক বড় জাত বা সত্তার সম্পর্ক (সনদ) তাও চলে এসেছে। আর সেই জাত হলেন আল্লাহ তায়ালার মকবুল জাত।

আমি তো বলে থাকি, আমাদের আসল অস্তিত্ব হল নেসবত বা সম্পর্ক (সনদ) দ্বারা। অস্তিত্ব অর্থ আমাদের হাত-পা, স্থান ও ঘরবাড়ি নয় বরং আমাদের অস্তিত্ব নেসবত দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। একজন মুমিন কেন মুমিন? তার ঈমানী অস্তিত্ব কী? মুমিনের নেসবত নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে। মুমিন যখন মুমিন হিসেবে নিজের পরিচয় তুলে ধরবে, তখন সে বলবে, আমি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর গোলাম। আমার এতটুকুই পরিচয়। এতটুকু সম্পর্ক তো হল যে, আমি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-

এর গোলাম। ব্যস, আমার পরিচয় এতটুকুই। আমার এতটুকু নেসবত আছে যে, আমি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর লোক। আমি অন্য কারো নয়, বরকতময় জাতের এক গোলাম। যেমন রৌদ্রকে যদি জিজ্ঞেস করা হয়, তুমি কে? তাহলে এ ছাড়া সে আর কী বলতে পারে যে, আমি হলাম সূর্যের একটি ছায়া।

সুতরাং সূর্যের দিকে সম্পর্ক কায়েম করাই তার অস্তিত্ব। যদি রৌদ্র সূর্য হতে কর্তন হয়ে যায়, তাহলে তার অস্তিত্বই টিকবে না। সারকথা হল, বাস্তবে অস্তিত্ব হল নেসবত ও সনদের নাম। আমাদের ইলম যদি কোন পবিত্র জাতের প্রতি সম্পর্কযুক্ত হয়, তাহলে সেই ইলম কার্যকরী ও গ্রহণযোগ্য। যদি কোন জাতের সঙ্গে নেসবতযুক্ত না হয়, শুধু নিজের জাত থেকে বের হয়, তাহলে তাকে অহংকার বলা হবে। তার নাম ইলম রাখা হবে না। তাকে উলঙ্গপনা ও কুমন্ত্রণার সমষ্টি বলা হবে চাই আকল ও যুক্তিও তাতে যোগ দিক।

ইলমি সম্পর্ক

কারণ, শুধু আকল উলুম সৃষ্টি করতে পারে না। কেননা, আকল সহীহ পথেও চলে, ভ্রান্ত পথেও চলে। তার ভুল ও শুদ্ধ হওয়ার তো মাপকাঠি থাকা চাই, যার দ্বারা যাচাই করে আমরা বলতে পারব, এই আকল সঠিক, এই আকল ভ্রান্ত। একজন দার্শনিক বলেন, সূর্য ঘোরে, আরেকজন বলেন, জমিন ঘোরে, একজন দাবি করে বলে, আল্লাহর অস্তিত্ব আছে, আরেকজন বলে একেবারেই অস্তিত্ব নেই। পরিপূর্ণ দলিল-প্রমাণ বিদ্যমান। একজন বলেন, কিয়ামত আসবে। অপরজন বলেন আসবে না; পৃথিবী হল পুরাতন– এমনিতেই আসছে ও চলছে। তারা সবাই জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান; কিন্তু দাবি বিপরীতমুখী। একজনের দাবি সত্য হবে আরেকজনের দাবি মিথ্যা হবে। অথচ উভয়ে আকল থেকে বলেছেন।

যেহেতু আকল ভুলও করতে পারে এবং সহীহও হতে পারে। সুতরাং ভুল ও শুদ্ধ নিরুপণের একটি মানদণ্ড থাকা চাই, যা দ্বারা যাচাই করে আমরা বলতে পারব, এই আকল সহীহ আর ওই আকল ভ্রান্ত। অতএব আকলের কষ্টিপাথর হল বর্ণিত ইলম এবং আল্লাহর ওহী। এই ইলমের উপর যাচাই করে আমরা বলব, এই আকল সঠিক বলছে আর ওই আকল ভুল বলছে। এই আকলের দাবির সাথে আল্লাহর ইলমের মিল আছে আর ওই আকলের দাবির সাথে আল্লাহর ইলমের মিল নেই। কোন বিষয়ে আকল অকাট্য আর কোন বিষয়ে শুধুই ধারণামাত্র। তাই আকলের সুস্থতা ও অসুস্থতা নির্ভর করে আল্লাহর ওহীর উপর। তার আমল ও মৌলিক বুনিয়াদ হল ওহী। আর ওহীর ইলমের নেসবত

রয়েছে যে তা আল্লাহর ইলম, তাঁর রাসূলের ইলম, রাসূলের সাহাবীদের ইলম, সাহাবীদের তাবেঈনদের ইলম। এই নেসবতই ইলমকে গ্রহণযোগ্য বানিয়েছে। যদি নেসবত বা সম্পর্ক না থাকে, একজন এমনিতেই বলে দিল যে, এটি আমার ইলম, তাহলে তাকে দেওয়ালে ছুড়ে মারা হবে এবং বলা হবে, তোমার ইলম আছে তো আমাদেরও ইলম আছে। আমরা তোমার কথা কেন মানব? আমরাও তো মানুষ যেমন তুমি মানুষ। কিন্তু যখন উভয়ে মিলে বলবে, তা আমারও ইলম নয়, তোমারও ইলম নয় বরং আল্লাহর ইলম, তাহলে উভয়ে মাথানত করবে এবং নিঃসন্দেহে আপনাকেও নত করতে হবে। আল্লাহর ইলমের অর্থ হল, যা তার পক্ষ হতে এসেছে, যার নেসবত আল্লাহর দিকে।

নেসবতের গ্রহণযোগ্যতা

নেসবত দ্বারা ইলম বড় হয় এবং গ্রহণযোগ্য হয়। জামিয়া কাসেমিয়া শব্দের মধ্যে যেমন তালিমের দিকে ইঙ্গিত রয়েছে, তেমনি নেসবতের দিকেও ইঙ্গিত রয়েছে যে, এটি একটি এমন সত্তার স্মারক, যিনি সারা ভারতবর্ষের মুয়াল্লিম ও উস্তাদ ছিলেন, যার হাতে বড়-বড় মুহাদ্দিস তৈরি হয়েছেন, যিনি হাজার-হাজার ও লাখ-লাখ মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেছেন। আপনি দেখবেন, পাকিস্তানের প্রতিটি প্রদেশে ও অঞ্চলে মাদরাসা রয়েছে। আফগানিস্তানে গিয়ে গ্রামে গ্রামে ফুযালায়ে দেওবন্দ দেখেছি। বার্মায় গ্রাম ও শহরে ফারেগীনে দেওবন্দ ও মাদরাসা দেখতে পেয়েছি। আকিয়াবে যাওয়ার পর প্রায় চারশত আলেম একত্রিত হয়েছেন যারা দেওবন্দের ছাত্র; তারা সাক্ষাৎ করার জন্য এসেছিলেন। আফ্রিকা গেলে হাজার-হাজার ফুযালা দেখতে পাবেন। সুতরাং স্থানে স্থানে মাদরাসা এবং ফুযালা ও মুয়াল্লিম দেখতে পাওয়া আসলে তা হযরত কাসেম নানুতুবী রহ.-এর ফয়েয ও বরকত। তিনি দারুল উলুম দেওবন্দ প্রতিষ্ঠা করে ইলমের একটি কারখানা চালু করেছেন যে, ওখান থেকে ইলমের মেশিন নির্মাণ হতে থাকবে।

হযরত নানুতুবী রহ. সাত বছর বয়সে স্বপ্ন দেখেছিলেন যে, তিনি বাইতুল্লাহর ছাদে দাঁড়িয়ে আছেন আর তাঁর হাত ও পায়ের আঙ্গুলসমূহ থেকে দুধের নহর প্রবাহিত হচ্ছে, যা পৃথিবীর আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে পড়ছে। তখন তার মামা মৌলভী আবদুস সামী রহ. ওই স্বপ্নের ব্যাখ্যা করেছিলেন যে, আল্লাহ তায়ালা তোমার মাধ্যমে উলুমে নবুওয়াত দান করবেন।

কোন সময় কারো ধারণা হয়নি যে, নানুতা নামক একটি বস্তি, যা ভারতের সাহারানপুরে অবস্থিত। তার এমন কোন বৈশিষ্ট্য ছিল না যে, সেখানে এমন একজন মহান ব্যক্তিত্ব জন্ম নিবেন, যার মাধ্যমে পূর্ব ও পশ্চিম সমগ্র বিশ্বে

ইলমের দরিয়া প্রবাহিত করবেন। যখন দারুল উলুম প্রতিষ্ঠা হল, তখন মানুষ বলাবলি করতে লাগল, এটিই তার ছোটবেলার স্বপ্নের ব্যাখ্যা।

আজ মদিনাতে দারুল উলুমের নকশায় মাদরাসা শরইয়্যাহ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। তা প্রতিষ্ঠা করেছেন দারুল উলুমের ফুযালাগণ। মক্কা মুকাররমায় মাদরাতুল ফালাহ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন হযরত মাওলানা ইসহাক সাহেব অমৃতসরী রহ., যিনি দেওবন্দের ফারেগ ছিলেন। মক্কা হোক, মদীনা হোক, বুখারা হোক, বলখ হোক, আফগানিস্তান হোক, আফ্রিকা হোক, বাংলাদেশ হোক ইত্যাদি রাষ্ট্রে হাজার-হাজার মাদরাসা রয়েছে। দারুল উলুম দেওবন্দ প্রায় বিশ হাজার এমন ব্যক্তিত্ব সৃষ্টি করেছে, যাদের উপর ফতওয়া নির্ভর করে, হাদীস নির্ভর করে, কুরআনের তালিম নির্ভল করে, তাঁদের মধ্যে ত্বরিকতের মাশায়েখ রয়েছেন, সুফীবাদের তালিমও তাঁদের মধ্যে রয়েছে।

নেসবতের সম্মান

এই সত্তা, যার ফয়েজে হাজার-হাজার আলেম তৈরি হয়েছে, হাজার-হাজার মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাঁর দিকে নেসবত করা নিঃসন্দেহে আমাদের জন্য ইজ্জতের কারণ এবং এই ইজতিমারও ইজ্জত যে, তার দিকে নেসবত করার কারণে গ্রহণযোগ্যতা পাবে। আর গ্রহণযোগ্যতাও মাকবুল নেসবত দ্বারাই আসে।

আপনারা মক্কা মুকাররমা গিয়ে বাইতুল্লাহর ওয়ালকে অত্যন্ত আযমত ও ইজ্জতের সাথে চুমু খান। কেন? কারণ, তার সাথে আল্লাহ তায়ালার নেসবত রয়েছে। তার নাম বাইতুল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহর ঘর। অথচ আল্লাহ তায়ালা কি ওখানে থাকেন? তিনি শরীর হতে পবিত্র, শরীরের উর্ধ্বে। কিন্তু একটা নেসবত আছে, যে নেসবতের কারণে বাইতুল্লাহ মুকাররাম ও মুয়াজ্জাম হয়েছে এবং আল্লাহ তায়ালার তাজাল্লির প্রকাশস্থল হয়েছে।

অতএব বাইতুল্লাহ সম্মানযোগ্য এবং ওয়াজিবুল ইজ্জত হয়েছে নেসবতের কারণে। বায়তুল্লাহর উপরের গেলাফ যা আপনারা পাকিস্তান থেকে সেলাই করে দিয়েছিলেন, তা যখন তাতে পরিধান করানো হল তখন আপনারাই তাকে চুমু দেন। যদিও ওখানে লাগানোর পূর্বে চুমু দেওয়া অত্যন্ত ভুল ও গর্হিত কাজ। কেননা, তখনও তার সাথে কাবার নেসবত যুক্ত হয়নি। যখন সম্পর্ক হল, তখন চুমু খেলেন। অতএব যখন তাকে বাইতুল্লাহ এর উপর ঝুলানো হল এবং তাতে সম্পর্ক করানো হল তখন বরকতের প্রভাব এল। তারপর আপনি তাকে চুমু

দিলে আপনার জন্য ইজ্জত আসবে এবং মকবুল হবে। সুতরাং পর্দার মধ্যে গ্রহণযোগ্যতা হল যখন তা কাবার দেওয়ালে লাগল। আর কাবার মধ্যে গ্রহণযোগ্যতা এল যখন তার সাথে আল্লাহর নাম লাগল। তাই মসজিদে হারাম সমস্ত মসজিদ হতে উত্তম। আর মসজিদে হারাম যে শহরে তার নাম বালাদে আমীন বা নিরাপদ শহর হয়ে গেল। কেননা, তা মসজিদে হারামের শহর। মক্কা শহর যে প্রদেশে অবস্থিত, তা হিজাযের পবিত্র প্রদেশ বনে গেছে। কারণ, তাতে মক্কা অবস্থিত। অতএব নেসবতের কারণে ফযিলত ও বড়ত্ব আসে। তেমনি ইলম নিজেই বড় বস্তু। তা যদি কোন বড় ব্যক্তিত্বের সাথে নেসবত হয়, তাহলে আরো বড় হিসেবে প্রকাশ পায়। এজন্যই এই জামিয়ার প্রতিষ্ঠা এবং তার প্রতিষ্ঠারা উভয়ে মোবারকবাদ পাওয়ার যোগ্য।

এ কয়েকটি বাক্য উক্ত আয়াতের অধীনে এই জামিয়ার প্রতিষ্ঠার পরিপ্রেক্ষিতে পেশ করলাম। দোয়া করুন, আল্লাহ যেন জামিয়াকে সুদৃঢ় করেন এবং তাকে ইলমের ফায়যানের মাধ্যম বানান। আর তার জন্য এমন সাহায্যকারী সৃষ্টি হয়ে যায়, যাতে সে তার উদ্দেশ্য পূরণে অগ্রগামী হতে পারে। ইলম ছড়াতে পাতে, ইলমের মিনার গড়তে পারে।

اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ اَللّٰهُمَّ اَعِذْنَا مِنَ الْفِتَنِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ اَللّٰهُمَّ اجْعَلِ الْقُرْاٰنَ اِمَامًا لَّنَا وَاجْعَلْهُ حُجَّةً لَّنَا وَارْزُقْنَا عَمَلَهٗ بِفَضْلِكَ الْعَظِيْمِ يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ اَللّٰهُمَّ تَوَفَّنَا مُسْلِمِيْنَ وَ اَلْحِقْنَا بِالصَّالِحِيْنَ غَيْرَ خَزَايَا وَلَا مَفْتُوْنِيْنَ وَصَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهٖ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ اَجْمَعِيْنَ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

(১২ শাবান ১৪০৮ হিজরী)

বয়ান : ৬

আমলের প্রভাব

যাকাতের একটি বৈশিষ্ট্য হল, তা দ্বারা হুসনে মুআশারাত পয়দা হয়। রোযার একটি বিশেষত্ব হল, তা দ্বারা নফস থেকে কামভাব ও জৈবিক চাহিদা হ্রাস পায়। যাকাতের একটি বৈশিষ্ট্য হল, তা দ্বারা অন্তর হতে কৃপণতার খারাবি দূর হয়। তেমনিভাবে নামাযের একটি বৈশিষ্ট্য হল, তা দ্বারা আল্লাহ দর্শনের যোগ্যতা সৃষ্টি হয় এবং ব্যাকুলতা পয়দা হয়।

– হযরত হাকীমুল ইসলাম রহ.





আমলের প্রভাব

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَ نَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ، وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ، وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُهٗ، اَرْسَلَهُ اللّٰهُ اِلٰى كَآفَّةٍ لِلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّ نَذِيْرًا وَدَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَ سِرَاجًا مُّنِيْرًا• اَمَّا بَعْدُ: فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ •

حٰفِظُوْا عَلَى الصَّلَوٰتِ وَ الصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى ۗ وَ قُوْمُوْا لِلّٰهِ قٰنِتِيْنَ○ ২৩৮ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيْمُ

সমস্ত নামাযের প্রতি যত্নবান হও, বিশেষ করে মধ্যবর্তী নামাযের ব্যাপারে। আর আল্লাহর সামনে একান্ত আদবের সাথে দাঁড়াও। *[সূরা বাকারা : ২৩৮]*

ভূমিকা

বুযুর্গানে মুহতারাম!

হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন–

اَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِیْ بِیْ

আমি বান্দার ধারণার অনুরূপ। বান্দা আমার ব্যাপারে যেমন ধারণা রাখবে, তার সাথে আমার ব্যবহার তদ্রূপ হবে।

যদি আপনি একজন অকর্মণ্যের ব্যাপারে সুধারণা করে ফেলেন, তাহলে এটি কোন আশ্চর্যের বিষয় নয় যে, আল্লাহ তায়ালা তাকে কর্মঠ ও কর্মী বানিয়ে দিবেন।

এ মুহূর্তে আমার বেশি কিছু বলার হিম্মত নেই। সফর দীর্ঘ হওয়ার দরুন শক্তিও নেই। অনেক ক্লান্ত। এ কারণে দীর্ঘ সময় দিতে পারব না। তবে জলসার সম্মানার্থে কয়েকটি বাক্য অবশ্যই পেশ করব।

বাহ্যিক বস্তুর বৈশিষ্ট্য

একটি মূলনীতি জেনে নেই যে, আল্লাহ তায়ালা দুনিয়ার প্রতিটি বস্তুর মধ্যে একেকটি বৈশিষ্ট্য রেখেছেন। খাদ্য হোক বা ওষুধ হোক প্রতিটি বস্তুতে বৈশিষ্ট্য রয়েছে। ব্যবহার করার দ্বারা এ বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়। উদাহরণস্বরূপ গুলে-বনফশা (এক প্রকার ফুল, ইংরেজি নাম ঠরড়ষবঃ) কফ দূর করে, এটি তার বৈশিষ্ট্য। যখন তা ব্যবহার করবেন আপনার কফ-ঠাণ্ডা থাকলে আরোগ্য মিলবে। মুলাঠির বৈশিষ্ট্য হল, সে কাশি দূর করে। যখন কাশি হবে তখন তা ব্যবহার করলে আল্লাহ তায়ালা কাশি দূর করে দেবেন। অতএব প্রত্যেক ওষুধের একটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে। তেমনিভাবে প্রতিটি খাদ্য জাতীয় বস্তুর বৈশিষ্ট্য রয়েছে। গমে এক ধরনের বৈশিষ্ট্য, ছোলায় আরেক ধরনের বৈশিষ্ট্য, চালে আরেক ধরনের বৈশিষ্ট্য। এভাবে প্রত্যেক বস্তুতে আলাদা-আলাদা বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

কর্মের বৈশিষ্ট্য

উপরে যা বর্ণিত হয়েছে, সেগুলো ছিল বাহ্যিক বস্তু। সেগুলোতে তো বৈশিষ্ট্য থাকবেই। মানুষের প্রত্যেক কাজে আলাদা-আলাদা বৈশিষ্ট্য রয়েছে, প্রত্যেক অবস্থা এবং আন্দাযে পৃথক-পৃথক তাসির ও প্রভাব রয়েছে। যদি কারো সামনে

এক ইশারা করেন, তাহলে দয়া প্রদর্শন বুঝাবে আর অন্য ইশারা করলে যুদ্ধ বেঁধে যাবে। কাউকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখালে ফাটল দেখা দেবে আর কাউকে সালাম করার জন্য হাত উঠালে মহব্বত সৃষ্টি হবে। মুখ সামনা-সামনি রেখে কথা বলার প্রতিক্রিয়া এক ধরনের আর মুখ অন্যদিকে ফিরিয়ে কথা বলার প্রতিক্রিয়া ভিন্ন। প্রত্যেক অবস্থা এবং বস্তুর আসর ও প্রভাব ভিন্ন-ভিন্ন।

এভাবে বুঝে নিন যে, শরয়ী আমলের ভিতরও বৈশিষ্ট্য ও আসর আছে। আল্লাহ তায়ালা যত আমল নির্ধারণ করেছেন, প্রত্যেক আমলের একেকটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে এবং তার একটি বিশেষ প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া আছে। যখন ব্যবহার করা হবে, তখন প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পাবে।

রোযার বৈশিষ্ট্য

রোযার একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও বিশেষত্ব রয়েছে। আর তাহল নফসের ক্রোধ। যখন আপনি নফসের দানা-পানি বন্ধ করে দিবেন এবং তাকে নিয়ন্ত্রিত ও বাধ্য করে দিবেন, তখন সে নত হয়ে গুনাহের দিকে ধাবিত হওয়া থেকে বিরত থাকবে। নফস একটা নেশাজাতীয় বস্তুর ন্যায়। যত বেশি খাদ্য দেওয়া হবে, তত শক্তি বৃদ্ধি পেতে থাকে, পাপ দেখতে থাকে। সাত দিন ক্ষুধার্ত রাখলে তবিয়ত পাপের প্রতি ধাবিত হবে না। কেননা, তখন নফসের মধ্যে জান থাকে না। অতএব রোযার হুকুম দেওয়া হয়েছে নফসের ক্রাধ দমনের জন্য। রোযা তাকে অপারগ কবে দিবে, যাতে সে প্রকাশ্যে কোন কাজ না করতে পারে, সে বাধ্য হয়ে থাকে।

এজন্য হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে, রোযা রাখার মধ্যে নফস তো দমন হয় এবং তার প্রভাব ও বৈশিষ্ট্য তো পরাজিত হয়ই, তার পাশাপাশি শয়তানেরও বিরোধিতা হয়। রমযান মাসে শয়তানকে বন্দি করা হয়। সে যেভাবে প্রকাশ্যে প্রভাব ফেলত তা কমে যায়। এ কারণে যতই পাপী মুসলমান হোক না কেন সে রমযানকে অবশ্যই সম্মান করে। যদিও সে রোযা পালন করে না; কিন্তু রমযান মাসে প্রকাশ্যে আহার করতে লজ্জাবোধ করে। সে রোযা রাখেনি একথা বলতে লজ্জাবোধ করে। এটি রোযার একটি প্রভাব।

যাকাতের বৈশিষ্ট্য

যাকাতেরও একটি বিশেষত্ব রয়েছে। তার প্রথম বিশেষত্ব হল, কৃপণতার খারাবি মানুষ হতে দূরীভূত হয়, কৃপণতার স্পৃহা কমে যায়। দ্বিতীয়টি হল, দরিদ্রের জীবনে নেমে আসে সহজতা ও আসানী। ফলে সুন্দর মুআশারাত বা সমাজব্যবস্থা সৃষ্টি হয়। গরিবদের উপর আপনি যত বেশি ব্যয় করবেন, তারা তত বেশি আপনার অনুগত হবে এবং নিবেদিত হয়ে যাবে। আপনি তো এমনিতেই আনন্দিত হলেন যে, আমি ফরজ আদায় করেছি, যাকাত দিয়েছি। আর গরিবরা মনে করবে, আপনি তার উপর দয়া এবং অনুগ্রহ করেছেন। ফলে ধনী-গরিবের মধ্যে একটি সুসম্পর্ক কায়েম হবে। আর এটিই সুন্দর মুআশারাতের ভিত্তি।

সুতরাং যাকাত দ্বারা যেমনভাবে আত্মার ভিতর প্রভাব পড়ে যে, তা থেকে কৃপণতার খারাপ গুণ দূর হয়ে যায়, তেমনিভাবে মুআশারাতের সৌন্দর্যও সৃষ্টি হয় এবং তামাদ্দুনের সৌন্দর্যও প্রকাশ পায়। আর ধনী ও গরিবদের মাঝে পরস্পর একতা সৃষ্টি হয়। এগুলো হল যাকাতের বিশেষত্ব।

বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পাওয়ার শর্ত

যখন আপনি তা ব্যবহার করবেন, তখন বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পাবে, প্রভাব প্রকাশ পাবে। কেউ যদি ব্যবহার না করে তার কথা ভিন্ন। যেমন কেউ যদি ওষুধ ব্যবহার না করে, তাহলে রোগ দূর হবে কিভাবে? শুধু ডাক্তারের ব্যবস্থাপত্র দ্বারা তো রোগ সারবে না। ব্যবহার ও সেবন করলে দূর হবে। শরয়ী আমলগুলোও একই রকম। প্রতিটি আমলের একটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে। কিন্তু প্রকাশ পাবে তখনই যখন আমল করা হবে।

বৈশিষ্ট্যবিদ্যায় পারদর্শীদের আনুগত্য

আল্লাহ তায়ালা শারীরিক ডাক্তার সৃষ্টি করেছেন। ডাক্তার, কবিরাজ ও হাকিমগণ ঔষধের বৈশিষ্ট্য ও প্রভাব-প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে জানেন। তারা রোগীর অবস্থা দেখে ব্যবস্থাপত্র লেখেন। রোগী ডাক্তারের আনুগত্য করলে আরোগ্য পাবে, না করলে রোগ পড়ে থাকবে এবং বৃদ্ধি পাবে, ধ্বংসের কাছাকাছি চলে যাবে। ডাক্তারগণ জানেন। অন্যরা ঔষধের বৈশিষ্ট্য ও প্রতিক্রিয়া জানে না। এজন্যই ডাক্তারদের আনুগত্য করতে হয়।

যদি কোন ডাক্তার সাহেব ব্যবস্থাপত্র লেখেন আর রোগী তাকে বলে, আপনি গুলেবনফশা ছয় মাশা পরিমাণ লিখলেন কেন? এক তোলা কেন লিখলেন না? আর মুলাঠি তিন মাশা লিখলেন কেন, ছয় মাশা লিখতে পারলেন না? তাহলে ডাক্তার তাকে কান ধরে ডাক্তারখানা হতে বের করে দিবেন এবং বলবেন, তুমি কি আমাকে তালিম্ দেওয়ার জন্য এসেছ, না ওষুধের ব্যবস্থাপত্র নিতে এসেছ? অতএব অবশ্যই রোগীর ডাক্তারকে মান্য করতে হবে। তিনি যতটুকু লিখে দেন এবং যে সময় নির্ধারণ করেন, সেই সময়, সেই পরিমাণ ব্যবহার করতে হবে।

তারপর পরিহারযোগ্য বস্তু যা লিখবেন তাও বর্জন করতে হবে। যদি না করেন, তাহলে উপকার পাবেন না। ঠাণ্ডা কফ দূর করার জন্য ডাক্তার সাহেব গুলেবনফশা দিলেন। তা আপনি সঠিক সময়ে, সঠিক পরিমাণ পান করলেন, কিন্তু সকাল থেকে বিকাল পর্যন্ত বরফমিশ্রিত শরবত পান করতে থাকলেন, তাহলে ঠাণ্ডার আরো অবনতি হবে, বৃদ্ধি পাবে। অতএব ঔষধ ক্রিয়া করবে না যদি পরিহারযোগ্য বস্তু পরিহার না করেন।

প্রত্যেক চিকিৎসার মধ্যে দুটি বস্তু থাকে। একটি ঔষধ অপরটি হল বর্জনীয় বিষয়। যদি একাগ্রতার সাথে বর্জনীয় বস্তু বর্জন করা হয়, তাহলে রোগ অর্ধেক ভাল হয়ে যায়, ওষুধ দ্বারা বাকি অর্ধেক ভাল হতে পারে। কিন্তু সর্বাবস্থায় ডাক্তারের আনুগত্য করতে হবে। নিজের অভিমত পেশ করার সুযোগ নেই যে, ব্যবস্থাপত্রে পাঁচটি ওষুধ কেন লিখলেন, ছয়টি কেন লিখলেন না? অভিমত পেশ করার রোগীর অধিকার নেই। তখন ডাক্তার বলবেন, আমি ডাক্তারি বিদ্যার দৃষ্টিকোণ থেকে জানি কী পরিমাণ ওষুধ লাগবে। তোমার যদি চিকিৎসা করাতে হয়, তাহলে এই ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী ঔষধ ব্যবহার কর।

ঠিক একই অবস্থা রূহানি চিকিৎসা অর্থাৎ শরীয়তের ব্যাপারে। আল্লাহ তায়ালা যা কিছু নাযিল করেছেন, তার জন্য রূহানি চিকিৎসকও নাযিল করেছেন। তারা হলেন নবীগণ। নবীদের তালিম দ্বারা তাদের ওয়ারাসা বা উত্তরাধিকারী সৃষ্টি হয়, যাদেরকে উলামায়ে রাব্বানী বলা হয়। তাঁরা নবীদের থেকে মিরাস পান। আর রূহানি চিকিৎসাবিদ্যা তাঁদের নিকট আসে। কোন রোগী এলে তারাও ব্যবস্থাপত্র লিখেন। তারা প্রত্যেক রোগীর রোগ মোতাবেক ঔষধ নির্ধারণ করেন। যদি রোগী বলে, আপনি অমুক সময় আমাকে দুই রাকাত নামায পড়তে বললেন কেন? আমি চার রাকাত কেন পড়ব না? তখন তিনি কান ধরে বের করে দিবেন যে, তুমি চিকিৎসার জন্য এসেছ, না আমাকে তালিম দেওয়ার জন্য এসেছ? তোমার জন্য এতটুকু আবশ্যক। শরীয়ত একটি তাসবিহকে শতবার পাঠ করতে বলেছে। রোগীর অধিকার নেই, একথা বলা যে, সোয়া শত হতে

পারল না? কেন নব্বই করা হল না? আল্লাহ তায়ালা যত পরিমাণ নির্ধারণ করেছেন, তা-ই উপকারী হবে। যা করেননি তা উপকারী হবে না। অতএব প্রতিটি আমলের বৈশিষ্ট্য রয়েছে। রোযার বৈশিষ্ট্য আছে, যাকাতের আছে, হজ্বের আছে ও নামাযের আছে।

নামাযের বৈশিষ্ট্য

নামাযের বৈশিষ্ট্য ও প্রভাব কী? নামাযি ব্যক্তির মধ্যে আল্লাহর দিদার লাভের যোগ্যতা সৃষ্টি হয়। নামায তরক করলে সেই ব্যক্তি হাশরের ময়দানে আল্লাহর দিদার লাভের যোগ্য হবে না, সেদিন আল্লাহর দর্শন হতে বঞ্চিত ও মাহরুম হবে। অতএব নামাযের বৈশিষ্ট্য হল নামাযি ব্যক্তির অন্তরে আল্লাহর দিদারের যোগ্যতা পয়দা করা।

দিদারে ইলাহীর মর্যাদা

দুনিয়ায় নামাযের মধ্যে আপনি আল্লাহকে আকিদার চোখে দেখেন। কেননা, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, নামায এমনভাবে পড় যে, তুমি আপন চোখে আল্লাহকে দেখছ। এই আকিদার সাথে নামায পড়লে আপনি আকিদার চোখে আল্লাহ তায়ালাকে দেখলেন। চর্মচোখে দেখলেন না। বুযুর্গগণ, ওয়ালীগণ, কাশফের চোখে আল্লাহর তাজাল্লি দেখেন। তারা যখন নামায পড়েন, তখন তাদের সামনে আল্লাহর নূরের তাজাল্লি থাকে। কিন্তু কিয়ামতের পরে এমন একটি সময় আসবে, যখন আল্লাহ তায়ালার সরাসরি দিদার হবে, তখন যারা তাকে দেখার জন্য দুনিয়াতে চর্চা ও অনুশীলন করেছে অন্তর দ্বারা, ইন্দ্রিয় শক্তি দ্বারা এবং বাতেনী চোখ দ্বারা, তারা সেদিন চর্মচোখ দ্বারা প্রকাশ্যভাবে দেখতে পারবে। তারা আল্লাহ তায়ালাকে প্রকাশ্যভাবে দেখতে পাবে, আল্লাহ তায়ালার বিভিন্ন তাজাল্লি প্রকাশ পাবে, বান্দারা তা দেখতে পারবে। আল্লাহর দিদারের যোগ্যতা একমাত্র নামাযিগণই পাবে।

হাদীস শরীফে এসেছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদ শরীফে তাশরীফ রাখলেন। তখন চৌদ্দ তারিখের রাতের চাঁদ চমকাচ্ছিল আর আলো ছড়িয়ে পড়ছিল। সাহাবাগণ চাঁদ ও তার আলোকে দেখছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, তোমরা চাঁদ দেখছ, একজনের দেখার কারণে অন্যজনের দেখতে অসুবিধা হয় না তো? সে নিজ স্থানে দেখতে পারছে, সে তার স্থানে দেখতে পারছে। তার দেখার মধ্যে দ্বিতীয় ব্যক্তি বাধা হয়নি,

দ্বিতীয় ব্যক্তির দেখার মধ্যে প্রথম ব্যক্তি বাধা হয়নি। পৃথিবীর কোটি-কোটি মানুষ একসঙ্গে একই সময়ে চাঁদ দেখতে পাচ্ছে– কেউ কারো জন্য বাধা সৃষ্টিকারী হচ্ছে না।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তেমনিভাবে কিয়ামতের ময়দানে বান্দা আল্লাহ তায়ালাকে দেখবে। কোটি-কোটি মানুষ হবে; কিন্তু কেউ কারো জন্য বাধা হবে না। যেমনভাবে তোমরা চাঁদকে দেখতে পাচ্ছ।

ফজর ও আসরের বৈশিষ্ট্য

তারপর তিনি আরো ইরশাদ করলেন, যদি তোমাদের যোগ্যতা অর্জন করতে হয়, তাহলে ফজর ও আসর নামাযের পাবন্দী কর। তাহলে আল্লাহর দিদারের মাধ্যম হতে পারে। বৈশিষ্ট্য তো সব নামাযে রয়েছে; কিন্তু বিশেষত উক্ত দুই নামাযে আল্লাহ তায়ালার দিদারের যোগ্যতা বেশি হয়।

স্পষ্টভাবে তার কারণ এই বোঝা যায় যে, উক্ত দুই নামাযে আলিমুল গায়েব আল্লাহ তায়ালা মানুষের নিকটবর্তী হয়ে যান। যে সকল ফেরেশতা আমল লিপিবদ্ধ করেন, তারা দিনে একদল আর রাতে আরেক দল দায়িত্ব পালন করেন। দিনের দায়িত্বশীলগণ ফজর নামাযের সময় আসেন আর রাতের দায়িত্বশীলগণ তাদেরকে দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে চলে যান। তারা সারাদিন লিখেন। যখন আসরের নামায পড়া হয়, তখন রাতে দায়িত্বশীলদের চার্জ দিয়ে চলে যান। রাতে তারা আমল লেখেন। ফজর নামাযের সময় আবার কোটি-কোটি ফেরেশতা অবতরণ করেন, যারা দিনের আমল লিখবেন।

তেমনিভাবে আসর নামাযের সময়ও একত্রিত হয়। প্রত্যেক বান্দার নিকট দুজন ফেরেশতা থাকেন, যারা আমল লিপিবদ্ধ করেন। তাই মানুষ এক কোটি হলে ফেরেশতা হবে চার কোটি। মোটকথা কোটি-কোটি ফেরেশতা সকাল-বিকাল অবতরণ করেন।

ফজর ও আসরে ফেরেশতা অবতরণের হেকমত

আল্লাহ তায়ালার আশ্চর্যজনক হিকমত হল, তিনি উক্ত দু-নামাযে ফেরেশতাদের পালাবদল রেখেছেন। তা কেন রাখলেন? কারণ, যখন হযরত আদম আ.কে জমিনের খেলাফত বা প্রতিনিধিত্ব দেওয়া হচ্ছিল এবং আল্লাহ তায়ালা বলেছিলেন–

إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً

আমি পৃথিবীতে আমার প্রতিনিধি নির্ধারণ করব, যে আমার পক্ষ হতে দুনিয়াতে আমার বিধান পরিচালনা করবে। আমার পক্ষ থেকে প্রতিনিধিত্ব করবে। যে বিধানাবলি আমি বান্দাদের জন্য জারি করব, সেগুলো সে প্রচার ও প্রসার করবে। আমি এমন নায়েব নির্ধারণ করব। তখন ফেরেশতাদের চিন্তা ও সন্দেহ হল, যার কারণ ছিল এই–

أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ

আপনি পৃথিবীতে এমন জাতিকে খলিফা বানাচ্ছেন, যারা দুনিয়াতে রক্তপাত ঘটাবে, বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে, আমরা এত এত খাদেম কোথা চলে গেলাম, যারা সর্বদা আপনার তাসবিহ-তাহলিলে মত্ত থাকি? *[সূরা বাকারা ২ : ৩০]*

কেমন যেন তারা পর্দার আড়ালে দাবি করছিল, প্রতিনিধিত্ব আমাদের দেন। মানবজাতি নিছক ফাসাদ সৃষ্টিকারী ও রক্তপাত ঘটানো জাতি।

মানবেতিহাস রক্তে ভরপুর, রক্তে রঞ্জিত। হযরত আদম আ.-এর যুগ থেকে মানুষ দ্বারা মানুষের রক্তপাত শুরু হয়েছিল। তা আজও বন্ধ হয়নি। বরং বেড়েই চলেছে। মানুষ মানুষকে ছিঁড়ে-ফেড়ে খাচ্ছে।

আমি বলি, মানুষকে হিংস্র প্রাণী বলা যায় না। কারণ, হিংস্র প্রাণী; উদাহরণস্বরূপ বাঘ। সে তো বাঘকে আক্রমণ করে, মারে না। সে তো বকরিকে আক্রমণ করে। অন্য প্রাণীকে ছিঁড়ে-ফেড়ে খায়। আর মানুষ? নিজের ভাই ও বন্ধুকে ছিঁড়ে-ফেড়ে খায়। পৃথিবীতে যত ধ্বংসাত্মক অস্ত্র তৈরি হচ্ছে, মানুষই আবিষ্কার করছে। সেগুলো তো মানুষদের ধ্বংস করার জন্য হচ্ছে। সাপ, বিচ্ছু ও হিংস্র প্রাণীদের জন্য তো তোপ-কামান ও বন্দুক তৈরি হচ্ছে না। মানুষ মানুষকে ধ্বংস করার জন্য ধ্বংসাত্মক অস্ত্র তৈরি করছে। সুতরাং মানবেতিহাস রক্তে ভরপুর। মানুষ মানুষের রক্তপাত করছে। মানুষ মানুষের মধ্যে ফাসাদ সৃষ্টি করছে। মানুষ কিছুটা শুদ্ধ হতে চায়; কিন্তু ফাসাদ সৃষ্টি ইসলাহের পথকে রুদ্ধ করে দেয়। অতএব মানুষের মধ্যে ফাসাদও রয়েছে, রক্তপাতও রয়েছে।

সুতরাং ফেরেশতাকূল আরজি পেশ করেছিলেন যে, এ জাতির মধ্যে রক্ত ভরপুর, ফাসাদ ভরপুর; আপনি এদের প্রতিনিধি করবেন? তারা তো প্রতিনিধিত্ব নষ্ট

করে ফেলবে। আমরা আপনার খাদেম কোথা গেলাম, যারা দিন-রাত তাসবিহ ও তাহলিলে লিপ্ত আছি? আমাদেরকে খলিফা বানান।

খেলাফতে আদম আ.-এর উপর সন্দেহের বিজ্ঞোচিত উত্তর

আল্লাহতায়ালা ফেরেশতাদের সন্দেহের একটি উত্তর এই দিলেন যে–

إِنِّيْ أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ

আমি বাস্তব অবস্থা জানি, যা তোমরা জান না।

ফেরেশতারা নিশ্চুপ হয়ে গেল। কিন্তু এমনটি জরুরি নয় যে, চুপ থাকার দ্বারা অন্তরের সন্দেহও দূর হয়ে যাবে। হাকিমের হুকুম দ্বারা মানুষ নত হয়, আদব রক্ষার্থে চুপ হয়ে যায়। তাতে অন্তরের সন্দেহ ও আশংকা দূর হওয়া জরুরি নয়। এজন্য হিকমতসুলভ দ্বিতীয় উত্তর দিলেন। আর তা ছিল এই–

وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْأَسْمَآءَ كُلَّهَا

হযরত আদম আ.কে সমস্ত কিছুর নাম শিখিয়ে দিলেন।

পৃথিবীতে যত বস্তু আছে, সবার নাম বলে দিলেন। সবকিছুর বৈশিষ্ট্য ও প্রভাব বলে দিলেন। আল্লাহ তায়ালার যেসব পবিত্র নাম রয়েছে, তাও বলে দিলেন। সেই নামগুলোর বৈশিষ্ট্য ও প্রভাব-প্রতিক্রিয়া জানিয়ে দিলেন। এককথায় আল্লাহ তায়ালার নাম ও কায়েনাতের সকল বস্তুর নাম আদম আ.কে বলে দিলেন। তারপর ফেরেশতাদের বললেন–

أَنْبِئُوْنِيْ بِأَسْمَآءِ هٰؤُلَآءِ إِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ

যদি তোমরা নিজের দাবিতে (যা তোমাদের অন্তরে রয়েছে যে, আমরাই খেলাফতের হকদার) সত্যবাদী হও, তাহলে এই কয়েকটি বস্তুর নাম বলে দাও।

কেননা, খেলাফত ইলম ও জ্ঞানের মাধ্যমে চলে। আর ইলমের সর্ব প্রথম মাকাম হল কোন বস্তুর নাম জানা। নাম যদি জানা না থাকে, তাহলে বস্তুটি একেবারেই অপরিচিত থাকে। নাম জানা থাকলে তালাশ করা যায় আর জানা না থাকলে কার নিকট কী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবে? কী বলে জিজ্ঞেস করবে? অতএব ইলমের প্রাথমিক দরজা নাম জানা।

তারপর দ্বিতীয় পর্যায়ে ওই নামগুলোর পদবী জানতে হবে যে, এগুলো কী কী জিনিস, যেগুলোর এই নাম। তারপর এগুলোর কর্ম কী? তারপর সেগুলোর হাকিকত কী এবং এদের জযবা কী? এটি হল ইলমের ৪র্থ দরজা। এক ইলমের পর আরেক ইলম, তারপর আরেক ইলম, তারপর আরেক ইলম এভাবে ইলমের স্তর বের হতে থাকবে। কিন্তু প্রাথমিক স্তরের ইলম হল বস্তুর নাম জানা। অতএব আল্লাহ তায়ালা হযরত আদম আ.কে যাদের উপর নির্দেশক বা হাকিম বানাতে চেয়েছিলেন এবং যাদের শৃঙ্খলিত করার এরাদা ছিল, তাদের সকলের নাম, বৈশিষ্ট ও প্রভাব বলে দিলেন।

তারপর ফেরেশতাদের বললেন, এগুলোর নাম তোমরা বল। তারা বলতে পারল না। কারণ, ফেরেশতাদের যাকে যে কাজে নিয়োজিত করেছেন, তারা ওই কাজ সম্পর্কিত বস্তুর নাম সম্পর্কে অবগত; কিন্তু অন্য নাম সম্পর্কে অবগত নয়। যে-ফেরেশতারা বৃষ্টি ও মেঘের দায়িত্বে নিয়োজিত, তারা বৃষ্টিসংক্রান্ত অবস্থাদি জানেন; কিন্তু অন্য কিছুর অবস্থা জানেন না। যারা আমল লেখেন, তারা আমল সম্পর্কে ইলম রাখেন; কিন্তু আমলের বাইরে যা আছে সেগুলোর ব্যাপারে তাদের খবর নেই। অতএব প্রত্যেক ফেরেশতা যে-যে কাজে নিয়োজিত সে সেই কাজ সংক্রান্ত বস্তুর নাম জানেন। সমস্ত দুনিয়ার সকল বস্তুর নাম তাদের বলা হয়নি। এই সমগ্র দুনিয়ার সাথে তাদের সম্পর্ক নেই। মোটকথা, ফেরেশতাকূল উত্তর দিতে পারেননি।

তারপর আল্লাহ তায়ালা আদম আ.কে বললেন–

يَاٰدَمُ اَنْۢبِئْهُمْ بِاَسْمَآئِهِمْ

হে আদম! বস্তুসমূহের নাম বল।

হযরত আদম অনর্গল বক্তব্য শুরু করলেন, এটি আকাশ, এটি জমিন, এটি বদনা, এটি রুটি এবং তাদের প্রভাব হল এই এই, তাদের বৈশিষ্ট্য এমন, এমন, তিনি সকল বস্তুর নাম, বৈশিষ্ট ও প্রভাব গুণতে লাগলেন। এগুলোর ইলম ফেরেশতাদের নিকট ছিল না।

এখন ফেরেশতাকূল নিশ্চুপ হয়ে গেলেন এবং বললেন–

سُبْحٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَآ اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا ؕ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ

নিঃসন্দেহে আপনি পূত-পবিত্র! আপনি আমাদের কাজের পরিধির ভিতর দিয়ে যে সকল বস্তুর নাম বলে দিয়েছেন, আমরা শুধু সেগুলোর নাম জানি। সবকিছুর নাম জানি না। আদম তো সব কিছুর নাম জানে, আসমানের বস্তুর নাম, জমিনে

উৎপন্ন বস্তুর নাম এবং আসমানের বাসিন্দাদের ঠিকানা ও তাদের প্রভাব-বৈশিষ্ট্য, গ্রহ-নক্ষত্রের খবর, চাঁদ-সুরুজের খবর, চাঁদ-সুরুজের প্রভাবের খবর, মানবশরীরের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের খবর, পাকস্থলির কী কাজ, কলিজার কী কাজ, কল্‌বের কী কাজ, মস্তিষ্কের কী কাজ প্রভৃতি। প্রতিটি বস্তুর জ্ঞান হযরত আদম-এর সামনে প্রকাশ করেছেন। ফেরেশতাদের জন্য করেননি।

পরিশেষে তারা মেনে নিল এবং চুপ হয়ে গেল। তারপর বলল, আপনি পবিত্র! আমাদের মধ্য হতে নায়েব ও প্রতিনিধি বানানোর অধিকারী আদমই। কিন্তু তারপরও উত্তর দেওয়ার আরেক ধাপ অবশিষ্ট রয়েছে। আর তা হল এই যে, ফেরেশতারা বলেছিল, তারা জমিনে বিশৃঙ্খলা করবে, রক্ত ঝরাবে। একথার উত্তর এখনও দেওয়া হয়নি।

এ-কথা তো প্রমাণ হয়ে গেল যে, আদম তোমাদের থেকে ইলম বেশি রাখে। এ-উত্তরও দেওয়া হল যে, আদমের হাকিকত আমি তোমাদের থেকে বেশি জানি। কিন্তু তোমরা বলেছিলে, তারা ফাসাদকারী হবে, রক্তপাত ঘটাবে এ-কথার উত্তর এখনও দেওয়া হয়নি।

আল্লাহ তার হেকমতসুলভ উত্তর এভাবে দিলেন যে, যেখানে কোন ভাল কাজ হয় এবং এতে লোকজন একত্রিত হয়, তখন তিনি ফেরেশতাদের আদেশ দেন ওই মজলিসে যাওয়ার জন্য। তিনি তাদের বলেন, মজলিসে যাও; সেখানে মানুষ একত্রিত হয়েছে, সেখানে অনেক আল্লাহওয়ালা আছে, আল্লাহর নামের আলোচনা হচ্ছে, মাসআলার আলোচনা হচ্ছে। হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে–

إِنَّ لِلّٰهِ مَلَائِكَةً سَيَّاحِيْنَ

আল্লাহর নিকট কোটি-কোটি ফেরেশতা আছে, যাদের কাজ হল দুনিয়াতে ঘোরা-ফেরা করা।

তারা দেখতে থাকে, মানুষ কে কী করছে। যখন দেখতে পায়, দুনিয়াতে খায়ের ও বরকতের মজলিস হচ্ছে এবং তাতে মাসআলার আলোচনা হচ্ছে, তখন তারা দৌড় শুরু করে এবং যারা পিছনে রয়েছে তাদেরকে আহ্বান করতে থাকে–

هَلُمُّوْا إِلٰى مَقْصَدِكُمْ

দৌড়াও! তোমাদের উদ্দেশ্য এই মজলিসে পূর্ণ হচ্ছে।

তারাও তাদের পিছনের ফেরেশতাদের ডাকতে থাকে। এভাবে মজলিসের চতুর্পাশে কোটি-কোটি ফেরেশতা জটলা বাঁধে।

غَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ

ফেরেশতারা মজলিসকে ঢেকে ফেলে এবং রহমত তাদের ঘিরে নেয়।

এখন মজলিস শেষ হওয়ার পর আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাদের বলেন, অথচ তিনি ফেরেশতাদের যখন মজলিসে আসেন তা দেখেছেন, মজলিসের আলোচনা সম্পর্কে জানেন, মজলিস শেষে আকাশে উঠছেন তাও তিনি দেখেছেন। তারপরও তাদের নিকট জিজ্ঞেস করছেন। সবকিছু জানার পরও জিজ্ঞেস করেন, হেকমতের কারণে যে, তোমরা আমার বান্দাদের কোন অবস্থায় পেয়েছ?

তারা উত্তর দেয়, তারা আপনার জিকিরে সময় কাটাচ্ছে। তারা কী জিকির করছে?

তারা আপনার জান্নাত প্রার্থনা করছে এবং জাহান্নাম হতে পানাহ চাচ্ছে।

আল্লাহ বলেন, তারা জান্নাত চাচ্ছে; তারা কি জান্নাত দেখেছে? অথবা জাহান্নামকে কী তারা দেখে ফেলেছে যে তা থেকে পানাহ্ চাচ্ছে?

ফেরেশতারা বলে, না তারা কিছুই দেখেনি। তারা নবীদের যবান হতে শুনেছে এবং ঈমান এনেছে যে, জান্নাত সত্য, জাহান্নাম সত্য।

এখানে তাদের বুঝিয়ে দিলেন, তোমরা জান্নাত ও জাহান্নাম স্বচক্ষে দেখতে পাচ্ছ, যদি তোমরা রাত-দিন তাসবিহ ও তাহলিলে লিপ্ত থাক, তাহলে তোমাদের কী কামালাত! কামালাত তো তাদের, যারা এর কিছুই না দেখেও আমার তাসবিহ, তাহলিল এবং জিকিরে লিপ্ত আছে। তারপর বলেন, হে ফেরেশতারা! আমি তোমাদেরকে সাক্ষী রেখে বলছি, যত মানুষ এই মজলিসে ছিল এবং তারা যা চাচ্ছিল, আমি তা দিয়ে দিলাম অর্থাৎ জান্নাত। আর যা থেকে পানাহ্ চাচ্ছিল আমি তা থেকে তাদের পানাহ্ দিলাম অর্থাৎ জাহান্নাম। আর আমি তাদের ক্ষমা করে দিলাম।

তখন ফেরেশতারা আরয করেন, ইয়া আল্লাহ! অনেক মানুষ তো এমন ছিল, যারা বাড়ি হতে এ নিয়তে এসেছিল যে, আমি মজলিসে অংশগ্রহণ করব। কিন্তু কতক তামাশা দেখার জন্য কাছে এসে দাঁড়িয়েছে; তাদের তো উদ্দেশ্য ছিল না এই মজলিসে আসার। যখন নিকট দিয়ে যাচ্ছিল, তখন জিজ্ঞেস করেছিল, ভাই! এখানে কী হচ্ছে? আমিও কিছুক্ষণ দেখে যাই; তাই দাঁড়িয়ে গেল। হে আল্লাহ! তারাও কি ক্ষমার ভিতর শামিল হবে? আল্লাহ উত্তরে বলবেন–

هُمُ الْقَوْمُ لَا يَشْقٰى جَلِيْسُهُمْ

এ মজলিসে আসন গ্রহণকারীরা এমন জাতি যে, তাদের আশপাশের লোকেরাও বঞ্চিত থাকে না।

তারাও ক্ষমার অন্তর্ভুক্ত। সবাই ক্ষমা পেয়ে যাবে।

এখানে প্রশ্ন জাগে, যখন তিনি একটি বড় মাহফিলের লোকদের ক্ষমা করবেন, যার মধ্যে হাজারো মানুষ একত্রিত হয়েছে, তাহলে এর কী প্রয়োজন ছিল যে, ফেরেশতারা আসমানসমূহে উঠবে এবং তাদের নিকট জিজ্ঞেস করবে, আমার বান্দারা কী করছে? তারা উত্তর দিবে, তারপর তাদেরকে সাক্ষী মানবে এবং ক্ষমার ঘোষণা করবে। অতঃপর মাহফিলের প্রতি লক্ষ করলে দেখা যাবে মাহফিল তো একটি নয়, একই সময়ে হাজারো জলসা হচ্ছে, পাকিস্তানে আজ এখানে মজলিস হচ্ছে, আমাদের জানা নেই অন্যান্য শহরে কত মাহফিল হচ্ছে। আর প্রতিটি মাহফিলে ফেরেশতারা আসেন। তারপর উপরে উঠে যায়ন এবং আল্লাহ তায়ালা প্রশ্ন করেন ও ক্ষমা করেন.।

অতঃপর শুধু পাকিস্তান নয়, হিন্দুস্তানের শহরগুলোতেও হয়তো অনেক জলসা হচ্ছে, তুর্কিস্তানের শহরগুলোতেও হচ্ছে, আরব মুলুকেও হচ্ছে; পৃথিবীর সকল দ্বীনি মাহফিল গণনা করলে লক্ষ-লক্ষ মজলিস হবে।.তো প্রত্যেক মাহফিলে ওই ফেরেশতারাই অবতরণ করে, তারপর উপরে উঠে তাদের প্রশ্ন করে।

তাই এখানে প্রশ্ন জাগে, যখন মাফ করার মাফ করে দেবে, এ কাজের কী প্রয়োজন ছিল যে, ফেরেশতারা আসবে এবং তাদের জিজ্ঞেস করবে আর তাদের সাক্ষ্য বানাবে যে, তোমরা সাক্ষী থাক, আমি তাদের ক্ষমা করে দিলাম।

আল্লাহ তায়ালার উক্ত কাজ করা মূলত ফেরেশতাদের সন্দেহের উত্তর দেওয়া যে, তোমরা একদিন বলেছিলে, মানুষের ইতিহাস রক্তে ভরপুর, তারা তো ওই মানুষই যারা সর্বদা আমার জিকিরে মগ্ন থাকে। তোমরাও তাদের মজলিসে হাজির হয়ে উপকৃত হয়েছ। সুতরাং মানবজাতির মধ্যে তারাও শামিল, যারা জিকরুল্লাহয় ব্যস্ত, মাসআলা শ্রবণে মশগুল, কিতাব ও সুন্নাতের আহকাম শিখাতে লিপ্ত, তাই তোমরা কিভাবে সকল মানবজাতির উপর ঢালাওভাবে এই হুকুম প্রয়োগ করছ যে, তারা সবাই ফাসাদ সৃষ্টিকারী হবে? সবাই রক্তপাত ঘটাবে? তাদের মধ্যে এও তো রয়েছে যে, এক লক্ষ ফাসাদকারী একদিকে আর একজন নেককার ব্যক্তি একদিকে। তার কারণে হাজার-হাজার মানুষের নাজাত হবে। তাদের মধ্যে এমন ব্যবস্থা রয়েছে। এটি হল তোমাদের অন্তরে লুকায়িত সন্দেহের উত্তর।

ফেরেশতাদের উপর প্রমাণ পরিপূর্ণ করা

যখন হজ্ব অনুষ্ঠিত হয়, তখনও একই অবস্থা করা হয়, কোটি-কোটি ফেরেশতা একত্রিত হয়। আল্লাহ তায়ালা তাঁদের জিজ্ঞেস করেন, এই মানুষগুলো খালি মাথায়, খালি পায়ে, ময়লাযুক্ত হয়ে পাথর-ভূমিতে পড়ে আছে। তারা কেন পড়ে আছে? তারা এখানে কেন এসেছে? আমার মহব্বত তাদের এখানে টেনে এনেছে। অতএব এই মহব্বতের দাবি হল, যত লোক হজ্ব করতে এসেছে আমি সবাইকে ক্ষমা করে দিলাম। তারা আজ এমন পূত-পবিত্র হল, যেন তাদের মা তাদেরকে আজ ভূমিষ্ট করেছে।

ফেরেশতাদের উপর হুজ্জতকে পূর্ণ করা হয় যে, তারাই ওই মানুষ যাদের সম্পর্কে তোমরা ঢালাওভাবে বলেছিলে, তারা অত্যন্ত ফাসাদ সৃষ্টিকারী হবে, রক্তপাতকারী হবে। এখন দেখে নাও তারা কি রক্তপাত ঘটাচ্ছে? তারা কি ফাসাদ ছড়াচ্ছে? তারা আমার জিকিরে লিপ্ত, আমার আনুগত্যে মশগুল।

মোটকথা, এমনসব স্থানে ফেরেশতাদের পাঠানো হয়, যাতে কার্যকরীভাবে তাদের কথার উত্তর পেয়ে যায় যে, তোমরা যে জাতির সকলের উপর ঢালাও হুকুম লাগিয়েছিলে, এরা ফাসাদকারী জাতি, এরা খেলাফতের যোগ্য নয়। তারা সবাই এমন নয়। নিঃসন্দেহে রক্তপাতকারী বেশি হবে; কিন্তু তাদের মাঝে কম-বেশি এমন মানুষও থাকবে, যারা আল্লাহর নাম নিবে, তাদের জন্যই দুনিয়া টিকে থাকবে। একজনও না থাকলে দুনিয়া থাকবে না।

মানুষের জিকিরের কারণে দুনিয়া টিকে আছে

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

لَاتَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى يُقَالَ فِى الْاَرْضِ اللهُ اللهُ

কিয়ামত ওই পর্যন্ত সংগঠিত হবে না, যতক্ষণ একজন আল্লাহ-আল্লাহ উচ্চারণকারী বেঁচে থাকবে।

যখন একজনও থাকবে না, তখন কিয়ামত কায়েম হবে এবং সমগ্র বিশ্বকে ওলট-পালট করে দেওয়া হবে।

এতে প্রতীয়মান হয়, দুনিয়া টিকে আছে আল্লাহর নামের উপর। যখন আল্লাহর নামের উচ্চারণ বন্ধ হয়ে যাবে, তখন দুনিয়া ধ্বংস হয়ে যাবে।

অন্য ভাষায় আমরা এভাবে বলতে পারি যে, এই পৃথিবী টিকে আছে আল্লাহর জিকিরকারীদের উপর। যতক্ষণ আল্লাহর নাম উচ্চারণকারী থাকবে, ততক্ষণ দুনিয়া কায়েম থাকবে। যখন থাকবে না, তখন দুনিয়া নিঃশেষ করে দেওয়া হবে।

যে দেশে আল্লাহর নাম উচ্চারণকারী অবশিষ্ট থাকবে না, সেই দেশ আস্তে-আস্তে ধ্বংসের দিকে ধাবিত হবে। আর যে দেশের সকলেই আল্লাহ-আল্লাহ করে, সেই দেশ বাকি থাকবে এবং উন্নতির দিকে ধাবিত হবে। সুতরাং আল্লাহর নামের মধ্যে উন্নতি। অতএব যেখানে আল্লাহ-আল্লাহ জিকিরকারীরা একত্রিত হয়, সেখানে ফেরেশতাদের পাঠিয়ে উত্তর দেওয়া হয় আর তাদেরকে সাক্ষী বানানো হয়, তোমরা সাক্ষী থাকো; আমি তাদের ক্ষমা করে দিলাম।

তেমনি আরেকটি চিত্র এ-ও যে, ফজর ও আসরের নামাযের সময় লক্ষ-লক্ষ ফেরেশতা একত্রিত হয়। যখন দিনে ডিউটিকারীরা উপরে ওঠে, তখন রাতের দায়িত্বশীলদের কাজ বুঝিয়ে দেয়। আল্লাহ তায়ালা তাঁদের জিজ্ঞেস করেন, বান্দাদের কোন হালাতে রেখে এসেছ? তারা উত্তর দেয় তাদেরকে নামাযে রেখে এসেছি এবং একথা বলে–

اَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّوْنَ وَتَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّوْنَ

> যখন আমরা আমলনামা এবং চার্জ নিতে গেলাম, তখন নামায পড়তে দেখলাম, যখন রেখে এলাম তখনও তারা নামাযরত ছিল।

অর্থাৎ চলে আসার সময় নামাযে দেখে এলাম এবং দ্বিতীয়বার যখন গেলাম তাদের নামাযে পেলাম। কেমন যেন আল্লাহ তাদের উত্তর দিচ্ছেন, তারা এই মানুষ যাদের ব্যাপারে তোমরা সংশয় প্রকাশ করেছিলে যে, তারা বড় ফাসাদকারী হবে। এগুলো কি ফাসাদকারীদের কাজ? যখন তোমরা গেলে, তাদের নামাযে লিপ্ত পেলে। যখন ফিরে এলে তখনও নামাযে লিপ্ত ছিল, ইবাদতে লিপ্ত ছিল। ফেরেশতাদের সংশয়ের কারণে তাদের প্রমাণকে পরিপূর্ণ করা হবে।

মোটকথা, আমার এতগুলো কথার উদ্দেশ্য ছিল যে, প্রত্যেক আমলের বৈশিষ্ট্য ও প্রভাব আছে। তো নামাযের বৈশিষ্ট্য হল, তা দ্বারা আল্লাহ তায়ালার দিদারের যোগ্যতা পয়দা হয়। নামায তরককারীর মধ্যে এই যোগ্যতা পয়দা হয় না।

কারণ, নামায একটি পরিপূর্ণ ইবাদত। ইবাদতের মধ্যে স্বাদ-আনন্দ তখন আসে, যখন আবেদ-মাবুদ সামনাসামনি থাকেন। যদি মাবুদ একেবারেই অদৃশ্য

থাকেন, তাহলে নামাযে স্বাদ আসবে না। তখন ইবাদতকারী বলবে, একটি খেয়ালি বস্তুর ইবাদত করছি, তিনি তো আমার সামনে নেই। আর নামাযের প্রকৃত ও মূল মাকসাদ হল আবেদ ও মাবুদ সামনা-সামনি থাকা। এ কারণে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যখন জিবরাঈল আ. তাঁকে জিজ্ঞেস করেন–

مَا الْإِحْسَانُ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟

হে আল্লাহর রাসূল! ইহসান কী জিনিস?

বললেন–

أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ

> ইহসান হল, আল্লাহর ইবাদত এমনভাবে কর যে, কেমন যেন তুমি স্বচক্ষে তাঁকে দেখছ। অর্থাৎ এমন কল্পনা ও ধ্যান কর যে, আমি আল্লাহর সামনে উপস্থিত। আর যদি তোমার মধ্যে এতটুকু শক্তি না থাকে, তাহলে কম করে হলেও এতটুকু কল্পনা কর যে, আল্লাহ তোমাকে দেখছেন। তাঁর দৃষ্টির আড়ালে তুমি নও।

মোটকথা, দেখা ও সামনা-সামনি হওয়া ইবাদতের রূহ। আর ইহসানওয়ালা তখনই হতে পারবে, যখন মাবুদ ইবাদতকারীর সামনে থাকেন। অতএব আল্লাহ তায়ালার শান সম্পর্কে আমরা কাল্পনিক চোখে দেখতে পারি যে, মাবুদ আমাদের সামনে আছেন আর আমরা তাঁরই ইবাদত করছি।

দুনিয়াতে রাব্বানীর তাজাল্লির প্রকাশ

অধিক ইবাদত করলে অন্তরে আলো সৃষ্টি হবে। তখন আল্লাহর তাজাল্লি ও নূর প্রকাশ পেতে থাকবে। তবে তার সত্তাকে দেখা যাবে না। তাঁর জাত হল অগণিত পর্দার ভিতর। আল্লাহ তায়ালার সত্তাকে কিয়ামতের পরেও দেখতে পারবে না। তিনি এত সূক্ষ্ম, চমকদার ও নূরানী যে, মানবচক্ষু যতই সূক্ষ্ম হোক না কেন তার এত শক্তি হবে না যে, আল্লাহর বরকতময় জাত দেখতে সক্ষম হবে। আল্লাহর তাজাল্লি দেখতে পারবে, যা তাঁর উল্টো দিক থেকে প্রকাশ পাবে। অর্থাৎ আল্লাহর উল্টো দিক বিভিন্ন আকৃতিতে প্রকাশ পাবে, তা দেখে নিবে। আল্লাহর জাতকে কখনও দেখা সম্ভব নয়। কিন্তু তাঁর তাজাল্লি প্রকাশ পায় আর তা আল্লাহওয়ালাগণ দেখতে পান।

আখেরাতের তাজাল্লি

অবশ্য কিয়ামতের দিন ওই তাজাল্লিকে দেখতে পারবে, যা তাঁর জাতের নিকটবর্তী, অর্থাৎ যা তাঁর জাতের একেবারেই নিকটের। কেমন যেন সেই তাজাল্লি দেখা তাঁর জাতকে দেখা। তবে জাত দেখতে পারবে না, শুধু তাজাল্লি দেখতে পারবে। কেননা, জান্নাতিদের সবচেয়ে বড় মাকাম ও মর্যাদা হল আল্লাহর দিদার।

আল্লাহর দরবার

হাদীস শরীফে এসেছে, প্রতি সপ্তাহে আল্লাহর দরবার সংঘটিত হবে। জান্নাতে তো সপ্তাহ থাকবে না; কিন্তু এক সপ্তাহ পরিমাণ পর-পর আল্লাহর দরবার অনুষ্ঠিত হবে। উপর ও নিচে একশত জান্নাত থাকবে আর প্রতিটি জান্নাত সাত আসমান ও সাত জমিন হতে বড়। আর একশত জান্নাতের উপর হল কুরসির অবস্থান, তার উপর সমুদ্র, সমুদ্রের উপর আল্লাহর আরশ। অতএব কুরসি জান্নাতসমূহের ছাদের উপর। তাতে আল্লাহর দরবার হবে।

ওই দরবার কোথায় অনুষ্ঠিত হবে?

হাদীস শরীফে তার ব্যাখ্যা এভাবে এসেছে যে, হযরত জিবরাঈল আ. একবার উপস্থিত হলেন। তখন তাঁর হাতে ছিল একটি আয়না। আয়নাটির মধ্যস্থলে একটি সূক্ষ্ম বস্তু ছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, এই সূক্ষ্মতা কেমন? তিনি বললেন, এর নাম মাযীদ। বললেন, মাযীদ কী জিনিস? বলা হল, হে আল্লাহর রাসূল! জান্নাতের একটি ময়দানের নাম মাযীদ। সেটি এত বড় হবে যে, লাখ-লাখ বছর যাবত ওই ময়দানে ঘুরে বেড়াচ্ছি; কিন্তু আজ পর্যন্ত তার কিনারার হদিস পাইনি। এই ময়দানের প্রতিটি বস্তু সাদা। ভূমি সাদা, পাথর সাদা, ঘাস সাদা। সবকিছুই সাদা। উক্ত ময়দানকে জুমুয়ার দিন সাজানো হবে, তামাম মাঠে বিছানা বিছানো হবে। তার বিছানা আল্লাহ তায়ালার কুরসি, যার আলোচনা কুরআনুল কারীমে রয়েছে–

وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ ۚ وَلَا يَئُوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ۚ

তাঁর সিংহাসন সমস্ত আসমান ও জমিনকে পরিবেষ্টন করে আছে। আর সেগুলোকে ধারণ করা তার পক্ষে কঠিন নয়।

সমস্ত আসমান ও জমিন হতে কুরসি অনেক বড়। কিন্তু যখন ওই ময়দানে কুরসি বিছানো হবে, তখন মনে হবে, এক বিশাল ময়দানে একটি ছোট্ট রশি পড়ে আছে। ওই বিছানা মধ্যস্থলে বিছানো হবে। তার চতুর্পার্শ্বে নবীদের মিম্বর থাকবে, যেগুলো হবে নূরের তৈরি। প্রতিটি মিম্বরে উম্মতদের কুরসি থাকবে। প্রত্যেক নবীর উম্মত তার মিম্বরের পিছনে বসবে। আর কুরসিগুলো সাজানো হবে মর্যাদা অনুপাতে। যার আমল নবীদের নিকটবর্তী হবে, সে তাঁদের কাছাকাছি আসনে বসবে। আর যার আমল অনেক নিম্নমানের হবে, সে অনেক দূরে বসবে। এভাবে প্রত্যেকে তার আমল অনুপাতে আসন গ্রহণ করবে।

আল্লাহর দরবারে জান্নাতিদের অংশগ্রহণ

যখন দরবারের দিন আসবে, তখন সকল জান্নাতি দরবারে শরীক হওয়ার জন্য যাবে। তার দূরত্ব হবে লাখ-লাখ মাইল। সবাই বাহনে আরোহণ করে যাবে। বাতাসে চলার সিংহাসন থাকবে। সেখানে ইঞ্জিনের তৈরি বাহন থাকবে না। জেট বিমান থাকবে না যে, তা মেরামত করতে হবে। বরং তা ধ্যানশক্তির অধিনে থাকবে। সিংহাসনে বসে শুধু চলার ধারণা করবে তো চলতে থাকবে। সিংহাসন চলতে থাকবে এবং লাখ-লাখ মাইলের দূরত্ব হবে। ওখানে সকলের বাহনগুলো নিমেষে ভাঁজ করে ফেলবে। কেউ হাওয়াই আসনে যাবে, কেউ বোরাকে যাবে। মর্যাদা অনুপাতে বাহন থাকবে।

সবাই ওই মাঠে এসে কুরসিতে বসে যাবে। কিন্তু সেখানে এমন কেউ থাকবে না, যারা বলবে, ভাই! আপনি এখানে বসেন। এই চেয়ার আপনার, এই সিট আপনার। এখানে বসবেন না। বরং প্রতিজন নিজ কলবের সাক্ষ্য দ্বারা আপন সিংহাসন চিনে ফেলবে এবং ঠিক ওই কুরসিতে গিয়ে বসবে, যেখানে তার নাম লেখা থাকবে। এমনটি হবে না যে, একজন অপরজনের চেয়ারে বসে যাবে। মানুষ একত্রিত হবে এবং ময়দান ভরে যাবে। তাদের মধ্যে যারা একেবারেই সাধারণ ও নিম্ন শ্রেণীর হবে, যারা দুনিয়াতে আমলে অলসতা করেছিল, তাদের জন্য কুরসিগুলোর পিছনে একটি চত্বর থাকবে, সেখানে মিশক ও আম্বরের গালিচা থাকবে। তারা ওখানে বসা থাকবে।

এখন যখন পুরো মজমা ভরে গেল, তখন আল্লাহর সিংহাসন মধ্যস্থলে। তাতে তাঁর নূরের তাজাল্লি শুরু হবে। যেমনটি হাদীসসমূহে বলা হয়েছে। যখন মহান আল্লাহর তাজাল্লি হতে থাকবে, তখন অনুভব হবে, তার ভারে সিংহাসন মটমট করছে, যেন এখনই ভেঙ্গে যাবে। ভেঙ্গে যাওয়ার উপক্রম শারীরিক ভারের

কারণে নয়। তিনি শরীর হতে পবিত্র। তিনি শরীরেরও সৃষ্টিকর্তা, রূহেরও সৃষ্টিকর্তা। তা হবে তাঁর আযমতের বোঝা, তাঁর কামালাতের বোঝা, যা মানুষ অনুভব করবে। তা উপলব্ধি ও শারীরিক বোঝা হবে না। মোটকথা, সিংহাসন এমনভাবে মরমর করবে যে, মনে হবে, ভারী বোঝা বহন করতে সক্ষম নয়।

তো আল্লাহর তাজাল্লি এসে গেল। আল্লাহ তায়ালা এবার মধ্যস্থলে বিদ্যমান। নবীগণ তাঁর চতুর্পার্শ্বে মিম্বরে বসা। তাঁদের পিছনে আগে-পরে কোটি-কোটি উম্মত বসে আছে।

আল্লাহর দরবারে শরাবে ত্বহুর পরিবেশন

হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাদের বলবেন, কুরআনুল কারীমে আমি যে ওয়াদা করেছিলাম–

وَسَقٰهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُوْرًا

এক প্রকার পবিত্র শরাব পান করাব, তা আমার বান্দাদের মাঝে বণ্টন কর। ফেরেশতারা বণ্টন করে দিবে। কেমন যেন তা শাহী দরবারের পক্ষ হতে মেহমানদারী। সবাই তা পান করবে। ফলে সবার মধ্যে আনন্দ ও খুশি বিরাজ করবে। উক্ত শরাব নেশাদার হবে না। তবে রূহানি নেশা অবশ্যই হবে। অর্থাৎ দুনিয়ার শরাবের মধ্যে তো নেশা থাকে। পান করার পর জ্ঞান-বুদ্ধি লোপ পায়, মানুষ পাগল হয়ে যায় এবং পাগলামি করতে থাকে। কিন্তু ওই শরাব পান করার পর আকলের মধ্যে আরো তেজ বৃদ্ধি পাবে। মারেফতে ইলাহী এবং উলুমে রাব্বানী আরো খুলতে থাকবে। নূর ও বরকত বেড়ে যাবে।

হযরত দাউদ আ.-এর মুনাজাত পাঠ

হযরত দাউদ আ. যাকে আওয়াজের মুজেযা দেওয়া হয়েছিল। তাঁর আওয়াজ এত পবিত্র ও আনন্দদায়ক ছিল যে, তিনি যখন আল্লাহর হাম্‌দ ও সানার (প্রশংসার) মুনাজাত পাঠ করতেন, তখন প্রাণীকূল-পক্ষীকূল সকলেই তাঁর চারপাশে সমবেত হয়ে মাথা দোলাতে থাকত এবং মাতাল হয়ে যেত। আল্লাহ তাকে বলবেন, হে দাউদ! দরবারীদের মুনাজাত পাঠ করে শোনাও, যা তুমি দুনিয়াতে পাঠ করতে এবং ওই মুজেযার আওয়াজে শোনাও। হযরত দাউদ হাম্‌দ ও সানার মুনাজাত শুরু করবেন। তাঁর আওয়াজ থাকবে মুজেযার আওয়াজ আর দরবারের মানুষগুলো সবাই আল্লাহওয়ালা। এখানে নবীগণ

রয়েছেন, কোটি-কোটি ফেরেশতা রয়েছে। তদুপরি স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা উপস্থিত। তাহলে অনুমেয় যে, তার প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া কেমন হতে পারে! যখন মুনাজাত পড়তে থাকবেন, তখন আশ্চর্য ধরনের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া জাহির হবে। সবাই তাতে মত্ত হয়ে যাবে, ডুবে যাবে।

জামালে খোদাওয়ান্দি দেখার আবেদন

তারপর আল্লাহ তায়ালা বলবেন–

سَلُوْنِيْ مَا شِئْتُمْ

যার মনে যা চায়, আমার নিকট চাও, আমার কাছে আবেদন কর।

বান্দা বলবে, এমন কোন নেয়ামত রয়েছে যা আপনি আমাদের দেননি? জান্নাত তো সমস্ত নেয়ামতের সম্মিলনকেন্দ্র। ওখানে অসম্পূর্ণতা ও ঘাটতির কোন চিহ্নও নেই। প্রতিটি জিনিসেই শুধু কামাল আর কামাল। যখন আপনি সবকিছুই দিয়ে দিলেন, তখন আমরা আর কী প্রার্থনা করব? আমাদের ধারণার ঊর্ধ্বের জিনিস পেয়ে গেছি। এখন আর কী চাইব তার ধারণাও করতে পারি না। ইরশাদ হবে, না, তোমরা চাও।

যখন কারো বুঝে আসবে না, তখন সবাই মিলে আলেমদের প্রতি মনোনিবেশ করবে যে, আপনারা ফতোয়া দিন, পরামর্শ দিন আমরা কী আবেদন করব? আমরা তো সবকিছুই পেয়েছি।

আমি বলি, মানুষ দুনিয়াতে আলেমদের থেকে দূরে থাকে; কিন্তু ওখানে পিছু ছাড়বে না। ওখানেও ফতোয়ার প্রয়োজন হবে, আলেমদের প্রয়োজন হবে। পদ ও ইলম ব্যতীত দুনিয়াতে কাজ চলে না, আখেরাতেও চলবে না। আলেমগণ ফতোয়া দিবেন, এখনও একটি বস্তু পাওনি; তা প্রার্থনা কর। নিঃসন্দেহে সব নেয়ামত পেয়ে গেছ; কিন্তু একটি বস্তু এখনও রয়ে গেছে, এখনও পাওনি। আর তা হল আল্লাহ তায়ালার জামাল ও সৌন্দর্য। সেটা-ই চাও। তখন বান্দাগণ আবেদন করবে, হে আল্লাহ! আপনার জামাল মোবারক দেখান। আপনি সমস্ত নেয়ামত দিয়েছেন; কিন্তু এই নেয়ামত দেননি। তাদের আবেদন মঞ্জুর হবে।

নিয়ামতে মাযীদ

আল্লাহ তায়ালা বলবেন–

اَنْ كُنَا اَنْتُمْ

প্রত্যেক বস্তু নিজ নিজ স্থানে অবস্থান কর।

যদি তা না বলতেন, তাহলে–

لَأَحْرَقَ سُبُحَاتُ وَجْهِهٖ مَا بَيْنَ يَدَيْهِ

তাঁর চেহারা মোবারকের পরিচ্ছন্নতা ও উজ্জ্বলতা প্রতিটি বস্তুকে জ্বালিয়ে ভস্ম করে দিত।

তাই তিনি নিজেই বলে দিয়েছেন সবকিছুকে নিজ নিজ স্থানে অবস্থান করতে। তারপর পর্দাসমূহ উঠতে শুরু হয়ে যাবে। সকল পর্দা সরে যাবে, শুধু একটিমাত্র পর্দা বাকি থাকবে। তখন মানুষের অবস্থা হবে এরূপ যে, একে তো শরাবে ত্বহুরের নেশা আছেই; তার উপর হযরত দাউদ আ.-এর তেলাওয়াত দ্বারা মারেফাতের নেশা বৃদ্ধি পেয়েছে। তার উপর আল্লাহ তায়ালার জামাল দর্শন করে এত পরিমাণ মত্ত হয়ে যাবে যে, কারো হুশ থাকবে না এবং মনে করতে থাকবে, ইতোপূর্বে আমরা কোনো নেয়ামত পাইনি। আজ আমরা নেয়ামত পেলাম। শরীয়তের পরিভাষায় উক্ত নেয়ামতের নাম 'মাযীদ'।

হযরত জিবরাঈল আ. বললেন, সেটিই হল মাযীদ ময়দান। সেখানে মাযীদ নামক নেয়ামত মিলবে, যার সম্পর্কে কুরআনুল কারীমে ইরশাদ হয়েছে–

وَلَدَيْنَا مَزِيْدٌ

আমি নিয়মমাফিক সবাইকে তার প্রাপ্য দেব। তবে আমার কাছে আরো বাড়তি কিছু রয়েছে, যা পরে দেব।

আর এই নেয়ামতই হল সেই বর্ধিত নেয়ামত বা মাযীদ।

মাযীদ দিবস ও তার আদব

শরীয়তের পরিভাষায় জুমুয়ার দিনকে মাযীদ দিবস বলে। দুনিয়াতে আখেরাতের ময়দানে মাযীদের নকল রাখা হয়েছে জুমুয়ার দিনকে। জুমুয়ার দিন কেমন যেন দরবারে খোদাওয়ান্দির দিন। সেদিন ইমাম এবং খতীব আল্লাহর নায়েব হয়ে মিম্বরে বসেন। এ কারণে বলা হয়েছে, ইমামের নিকটে বসার চেষ্টা কর। যে

ব্যক্তি জুমুয়ার দিন ইমামের নিকট বসার অভ্যাস করবে, সে ওই দিন আল্লাহ ও নবীদের নিকট বসতে পারবে। আর যে দুনিয়াতে অলসতা করবে, পিছনে থাকবে, সে আখেরাতেও পিছনে থাকবে। এজন্য বলা হয়েছে–

إِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ فَلَا صَلَاةَ وَلَا كَلَامَ

ইমাম যখন খুতবা বলার জন্য বের হবে, তখন না কথা বলার অনুমতি আছে, না নামায পড়ার অনুমতি আছে, না তেলাওয়াত করার অনুমতি আছে।

তখন সবচেয়ে বড় ইবাদত হল মানুষ খতীবকে দেখবে। যদি দেখা না যায়, তাহলে কম করে হলেও তার কথাগুলো কান দিয়ে শ্রবণ করবে। আর আওয়াজ শুনতে না পেলে আওয়াজের প্রতি লক্ষ করবে; অর্থাৎ খতিবের প্রতি মনোনিবেশ করবে। তখন এটিই সবচেয়ে বড় কাজ। জুমুয়ার খুতবা সাধারণ ওয়াজ নয়। সাধারণ ওয়াজে কথাও বলতে পারবে এবং একজন অপরজনকে দেখতেও পারবে। কিন্তু খুতবার আদব হল, পাথর ও খড়কুটা দ্বারাও খেলতে পারবে না। নামায ও জিকির করতে পারবে না। শুধু ইমামকে দেখবে। এই সময় এটিই সবচেয়ে বড় ইবাদত।

কেননা, বলা হয়েছে–

مَنْ مَسَّ الْحَصَا فَقَدْ لَغَا

যে পাথরকণা ধরল, সে অনর্থক কাজ করল, যে চাটাইয়ের কোন টুকরো ধরল, সে অহেতুক কাজ করল।

তার এটা কাজ নয়; তার কাজ হল খতীবকে দেখা। দেখা না গেলে অন্তত তার দিকে তাকিয়ে থাকবে। আওয়াজ শুনতে না পেলে তার দিকে মনোযোগী হবে। মোটকথা, সর্বদা ইমামের প্রতি মনোনিবেশ করবে। দুনিয়াতে যে জুমুয়ার দিনে ইমামের প্রতি যতটুকু মনোনিবেশ করতে পারবে, সে পরকালেও আল্লাহর দিকে ততটুকু মনোনিবেশ করতে পারবে। অতএব জুমুয়া হল আল্লাহ তায়ালার দরবারের বাস্তব প্রতিচ্ছবি, যা আমাদেরকে দুনিয়াতে দেওয়া হয়েছে। ওই মাঠের নাম ময়দানে মাযীদ এবং দিনের নাম মাযীদ। তদ্রূপ জুমুয়ার দিনের নামও মাযীদ। কেননা, এই দিন সাওয়াব ও প্রতিদান বেশি দেওয়া হয়।

এখন আমার আবারো পূর্বের হাদীস স্মরণ এল যে, ইবাদতের মধ্যে আসল হল মাবুদ সামনে থাকা এবং তাকে দেখে-দেখে ইবাদত করা। কিন্তু দুনিয়াতে দেখা অসম্ভব। এমনকি আল্লাহর জাতকে আখেরাতেও দেখা যাবে না। শুধু নূরের

তাজাল্লি দেখা যাবে, তার বিপরীত দিককে দেখা যাবে। কোন চক্ষু তার জাতকে দেখতে সক্ষম নয়।

لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ ۫ وَهُوَ يُدْرِكُ الْاَبْصَارَ ۚ وَهُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ ۝١٠٣

দৃষ্টিসমূহ তাকে পেতে পারে না। অবশ্য তিনি দৃষ্টিসমূহকে পেতে পাবেন। *[সূরা আন'আম ১০৩]*

আল্লাহর দিদার সম্পর্কে মুতাযিলা সম্প্রদায়ের মতামত

মুসলমানদের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য ফেরকা হল মুতাযিলা ফেরকা। তারা দিদারে খোদা অস্বীকার করে। তারা বলে, দিদার-ফিদার কিছুই হবে না, হওয়া অসম্ভব ও দুষ্কর। তারা তাকে যুক্তিগত ও বুদ্ধিগতভাবে অসম্ভব বলে যে তা হতে পারে না।

আহলে হকের অভিমত

কিন্তু আম্বিয়ায়ে কেরাম এবং আহলে হকের অভিমত হল, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালার দিদার হবে।

কুরআনুল কারীমে ইরশাদ হয়েছে–

وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ ۝٢٢ اِلٰى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ۝٢٣ وَوُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ ۝٢٤

সেদিন অনেক মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হবে। তারা তাদের পালনকর্তার দিকে তাকিয়ে থাকবে। *[সূরা কিয়ামা : ২২]*

এবং কাফেরকে ধমকি দেওয়া হয়েছে–

كَلَّآ اِنَّهُمْ عَنْ رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوْبُوْنَ ۝١٥

কাফেরকে ধমকি দেওয়া হয়েছে যে, তোমরা আল্লাহকে দেখতে পারবে না তোমাদের মাঝে এবং আল্লাহর মাঝে পর্দা পড়ে যাবে। *[মুতাফফিফিন ৮৩:১৫]*

অতএব না দেখার ধমকি তখনই সম্ভব, যখন দেখা সম্ভব। সুতরাং কুরআনুল কারীম এবং সকল আসমানি কিতাব ও সকল নবীর অভিমত হল, পরকালে আল্লাহর দিদার নসিব হবে। একমাত্র মুতাযিলা ফেরকা তার বিরোধিতা করে। তারা বলে, যুক্তির নিরিখে অসম্ভব।

তর্কযুদ্ধে মুতাযিলাদের পরাজয়

বাদশাহ মামুনুর রশিদের শাসনকালে মুতাযিলা ফেতনার উৎপাত শুরু হয়। তাদের দল ভারী হতে থাকে। তারা প্রকাশ্যে বলতে থাকে আল্লাহর দিদার অসম্ভব। বাস্তবে তো দেখা যাবেই না আকলগতভাবেও সম্ভব নয়। তারা আকল ও যুক্তিকে দলিল হিসেবে লোকসমাজে পেশ করে। ফলে মানুষ ফেতনায় জড়াতে থাকে। উলামায়ে কেরাম উত্তর দেওয়া শুরু করেন। কিন্তু সূক্ষ্ম মাসয়ালার অভিযোগ তাড়াতাড়ি বুঝে এলেও উত্তর দেরিতে বুঝে আসে। বিষয়টি ছিল সূক্ষ্ম; তাই অভিযোগ সবার বুঝে এলেও জবাব বুঝে আসছিল না। ফলে ফেতনা বৃদ্ধি পাচ্ছিল আর আলেমগণ ফেতনা রোধে অপারগ হচ্ছিলেন।

পরিশেষে তারা যুগের শায়েখ হযরত শিবলী রহ.-এর খেদমতে উপস্থিত হলেন এবং বললেন, হযরত! আমাদের সক্ষমতা অনুযায়ী তাদের উত্তর দিয়েছি; কিন্তু আমাদের জবাবগুলো ইলমি বা জ্ঞানগত, আর সর্বসাধারণ তো ইলমি কথা বুঝতে পারে না। এ কারণে বিভিন্ন সন্দেহ তাদের অন্তরে বদ্ধমূল হচ্ছে। উত্তরগুলো তাদের অন্তরে বসেনি। এখন আমরা কী করব? আপনি অন্তর ব্যবহার করে এবং আন্তরিক তাওয়াজ্জুহ প্রদান করে একটা কিছু করুন, যাতে ফেতনা দূর হয়। শুধু ইলমি জবাব দ্বারা সম্ভব নয়।

হযরত শায়েখ শিবলী রহ. বললেন, আচ্ছা ঠিক আছে। তোমরা ঘোষণা করে দাও, আমি মুতাযিলাদের সঙ্গে মুনাযারা (তর্কযুদ্ধ) করব।

ঘোষণা হয়ে গেল। বাগদাদের জামে মসজিদে লাখ-লাখ মানুষ একত্রি হল। প্রথম তো এজন্য যে, আজ শায়েখ শিবলী রহ. ওয়াজ করবেন, যিনি কোন দিন ওয়াজ করেন না।

এখানে একটি নতুন জিনিস জানা হল যে, শায়েখ শিবলী রহ. কোন দিন মাহফিলে ওয়াজ করতেন না। আজ তিনি ওয়াজ করবেন তাই লাখ-লাখ মানুষ সমবেত হল।

দ্বিতীয়ত মাহফিলের নাম ছিল মুনাযারা। আর মুনাযারা মূলত ঝগড়াকে বলে। চাই তা ইলমি ঝগড়া হোক, ঝগড়া তো! সর্বসাধারণ ঝগড়াকে খুব পছন্দ করে। কোন শিক্ষার মজলিস হলে কেউ আসে না, ঝগড়া হলে হাজার-হাজার লোক জমা হয়ে যায়। তাই লোকেরা বলতে লাগল, আজ মুনাযারা হবে, বাহাস হবে, বড় তামাশা হবে। ফলে লাখ-লাখ মানুষ সমবেত হল।

মঞ্চ তৈরি হল। হযরত শিবলী রহ. আসন গ্রহণ করলেন। মুতাযিলাদের আলেমগণ সারিবদ্ধভাবে সামনে বসে পড়ল।

শায়েখ তাদের জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের দাবি কী? তারা বলল, আমাদের দাবি হল, আল্লাহর দিদার অসম্ভব। কখনও হতে পারে না। আকল সায় দেয় না। আমলিভাবেও সম্ভব নয়।

আল্লাহওয়ালাদের নিকট হাকায়েক বা মূল রহস্য উদ্ভাসিত হয়। তারা শাব্দিকভাবে দীর্ঘ বয়ান করেন না। তারা ক্ষিপ্রতার সাথে অন্তরকে ধরে ফেলেন। তিনি দুই মিনিটে সমাধান করে দিলেন। ফলে সকল মুনাযারা ও বাহাস নিঃশেষ হল।

তিনি মুতাযিলাদের বললেন, তোমাদের দাবি ও দলিল বহাল থাকুক, আমি সে ব্যাপারে আলোচনা করব না। আমি তোমাদের অন্তরকে জিজ্ঞেস করতে চাই যে, তোমাদের মন কি আল্লাহকে দেখতে চায়? সবাই বলল, মন তো আল্লাহকে দেখতে চায়। তিনি বললেন, তোমাদের কথা প্রমাণ করে আল্লাহর দিদার সম্ভব। কারণ, অসম্ভব বস্তুকে দেখার তামান্না কখনও অন্তরে উদয় হবে না। এমন জিনিসের তামান্না ও আকাঙ্ক্ষা আসে, যা দেখা সম্ভব। মানুষ কখনও তামান্না করে না যে আমি কান দ্বারা দেখব। কারণ, কানের ভিতর দেখার শক্তি নেই। মানুষ চোখ দ্বারা দেখার তামান্না করে। তারা কখনও এমন তামান্না করে না যে, আমি জিহ্বা দ্বারা আওয়াজ শুনব। কারণ, জিহ্বা স্বাদ গ্রহণের জন্য, শ্রবণের জন্য নয়। এজন্য কান দ্বারা শ্রবণের, চক্ষু দ্বারা দর্শনের আর জিহ্বা দ্বারা স্বাদ গ্রহণের তামান্না করে। এমনটি হতে পারে না যে, চোখের কাজ জিহ্বা দ্বারা করবে, জিহ্বার কাজ চোখ দ্বারা করবে। এমন তামান্না অন্তরে আসতেই পারে না।

শায়েখ রহ. তাদেরকে বললেন, যখন তোমাদের অন্তরে তামান্না উদয় হলো যে, আমরাও আল্লাহকে দেখব, অতএব তোমাদের অন্তরে তামান্না পয়দা হওয়াই দলিল, আল্লাহকে দেখা সম্ভব। যাকে দেখা সম্ভব নয়, তাকে দেখার তামান্না অন্তরে কখনও উদয় হবে না। তো দেখা সম্ভব তোমাদের অন্তর দ্বারা প্রমাণিত হল। আর বাস্তবে দেখা সম্ভব তা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। এখন বলো তোমাদের কী অভিযোগ ও প্রশ্ন? এখন তারা চুপচাপ বসে আছে। তাদেরকে গ্রেফতার করা হল। তাই কিসসা খতম হয়ে গেল। বাহাস শেষ হল, অনেক দিনের ফেতনা এক মিনিটে নিঃশেষ হল।

আমার এত কথা বলার উদ্দেশ্য ছিল, আল্লাহর দিদারের তামান্না সবার অন্তরে রয়েছে যে, আমি আমার মাবুদকে দেখব। এই আশায় তারা নামায পড়ে, এই আশায় ইবাদত করে।

দিদারে খোদাওয়ান্দি ধাপে-ধাপে উন্নত হয়

নামাযে মানুষ আল্লাহকে আকিদার চোখে দেখে। আরো উন্নতি হলে স্বপ্নের চোখে দেখে। আরো উন্নত হলে কাশফের চোখে দেখে। মৃত্যুর পর যখন আরো উন্নতি হবে, তখন চর্মচোখে দেখা শুরু করবে। সুতরাং স্তর বাই স্তর আল্লাহর দিদার এখন থেকেই শুরু হয়ে গেছে। নামাযের মধ্যে কল্পনা এবং আকিদা দ্বারা দেখা হল প্রাথমিক দেখা। তা উন্নত হতে-হতে পরিশেষে ওই বস্তু চোখের সামনে ভেসে উঠবে, যা অন্তরে জমে ছিল। একটি জন্মগত ও তবিয়তগত বিধান হল, যদি কোন জিনিসকে কল্পনা করে অন্তরে গচ্ছিত করে, তাহলে কিছু দিন পর মনে হবে তা চোখের সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

কোন এক বুযুর্গের নিকট কেউ বাইয়াত হল। তিনি তাকে জিকির ও আমল বলে দিলেন। সে অনেক মেহনত ও মুজাহাদা করল। কিন্তু ইখলাস ও নিষ্ঠা নসিব হচ্ছে না যে, সকল বস্তু হতে সম্পর্ক দূর হয়ে শুধু আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক কায়েম হবে। শায়েখ তাকে অনেক পরীক্ষা ও চিকিৎসা করলেন; কিন্তু হালত পরিবর্তন হয় না। এরপর শায়েখ তাকে বললেন, তুমি কোন বস্তুকে বেশি ভালবাস? সে বলল, আমি মহিষ বেশি মহব্বত করি।

যেমন রূহ, তেমন ফেরেশতা। এই নীতিতে তিনি বললেন, আচ্ছা বসে বসে চিল্লা পালন কর। চল্লিশ দিন পর্যন্ত মহিষের কল্পনা কর। তিনি তাকে চিল্লা করালেন। সে কামরায় বসে গেল। পূর্ব থেকেই তবিয়ত মহিষের প্রতি ধাবিত ছিল। এখন কল্পনা করতে লাগল। ফলে তা অন্তরে বদ্ধমূল হতে লাগল। চল্লিশ দিন পরে শায়েখ তার নিকট এলেন। বললেন, বাইরে এসে দরজ খোল। সে বলল, বাইরে আসব কী করে, দরজায় মহিষ দাঁড়িয়ে আছে, সে বাধা দিচ্ছে ও আগলে দিচ্ছে। অথচ সেখানে কোন মহিষ ও অন্য কিছুই ছিল না। কিন্তু অন্তরে মহিষ এমনভাবে বসে গেছে যে, চোখ দ্বারা তা-ই দেখছে। তাই মনে করছে, মহিষ দরজা আগলে দাঁড়িয়ে আছে।

এটি একটি স্বাভাবজাত বিষয় যে, যে জিনিস মানুষের অন্তরে বসে যায়, তা কল্পনার আকার ধারণ করে চোখের সামনে ভাসতে থাকে।

সুতরাং যখন অন্তরে কল্পনা হবে যে, আমি আল্লাহকে দেখছি, তখন আকিদার চোখে দেখবে। তারপর উন্নতি লাভ করে স্বপ্নে দেখবে, তাহলে এমন একটা সময় আসবে যখন স্বচক্ষে আল্লাহকে দেখতে পারবে। যেভাবেই দেখুক, দিদার হবেই। অতএব আসল নামায কিয়ামতের দিন হবে।

রূহের উর্ধ্বগমন এবং আরশের নিচে সিজদা

হাদীস শরীফে এসেছে, যখন মানুষ ইন্তিকাল করে, তখন তার রূহকে আকাশসমূহের দিকে উঠানো হয়। নেককার মানুষের রূহ হলে লাখ-লাখ ফেরেশতা সাথে থাকে। তার জন্য প্রথম আসমান খুলে যায়। প্রথম আসমানের ফেরেশতারাও তার সঙ্গী হয়। পরবর্তী আসমানে আরোহণ করলে তা-ও খুলে দেওয়া হয়। তখন ওখানকার ফেরেশতারা তাকে সংবর্ধনা জানায়। এভাবে আরশের নিচে পৌঁছে এবং সিজদা করে। অতএব যে আমল আরশের নিচে হল, তা ইন্তিকালের পর ভাগ্যে জুটল। ইন্তিকালের পূর্বে তা মুশকিল ও অসম্ভব।

জাগতিক জযবাগুলো আলমে বরযাখে প্রকাশ পাবে

যার অন্তরে নামাযের ধ্যান-খেয়াল থাকবে, সে আলমে বরযাখেও (কবরজীবন) নামাযের ধ্যান-খেয়াল নিয়ে যাবে এবং হাশরেও নামাযের জযবা ও আগ্রহ নিয়ে হাজির হবে। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, যখন মৃত ব্যক্তিকে কবরে রাখা হয়, তখন দুজন ফেরেশতা এসে তাকে প্রশ্ন করে, তার পুরো জীবনের জরিপ নেয়। তারা তিনটি প্রশ্ন করে–

তোমার রব কে?

তোমার দীন কী?

এই ব্যক্তি কে?

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দিকে ইশারা করে বলবেন, তিনি কে?

হাদীস শরীফে আরো বর্ণিত হয়েছে, মৃত ব্যক্তির নিকট এমন মনে হয় যে, সূর্য অস্তমিত হওয়া নিকটবর্তী, রৌদ্র হলুদ রং ধারণ করেছে মাগরিবের সময় অতি নিকটে। অথচ ওখানে সূর্য থাকবে না; কিন্তু সময়ের সাদৃশ্য হবে তেমন।

তখন ফেরেশতারা জিজ্ঞেস করবে, তোমার রব? মৃত ব্যক্তি বলবে, মিয়া! দূরে যাও, আগে নামায পড়তে দাও, সময় কমে আসছে, সূর্য ডুবে যাবে। আমার আসরের নামায কাজা হয়ে যাবে। তখন একজন ফেরেশতা অপরজনকে বলবে,

তাকে রবের প্রশ্ন করে কী লাভ? সে তো তার রবের জন্য এত মস্ত যে, এখানেও নামায পড়তে তৈরি। দ্বিতীয়জন বলবে, আমি জানি, সে সত্য-সত্য উত্তর দিবে। কিন্তু আমাদের তো দায়িত্ব প্রশ্ন করার। তাই প্রশ্ন করে দায়িত্ব পালন করে নিব। আমরা জানি উত্তর সঠিক দেবে; কিন্তু পড়তে দাও। একথা কারা বলবে? যাদের দুনিয়াতে নামাযের অভ্যাস থাকবে। আর যারা দুনিয়াতে নামাযকে নষ্ট করবে, তাদের উক্ত কথা বলার সুযোগ হবে না। তার জন্য তো দুনিয়াতে সময় নেই নামায পড়ার ও রোযা রাখার। অতএব দুনিয়ায় যে জিনিসের চর্চা করবে, সেই জিনিসই সামনে আসবে। যে জিনিসের অভ্যাস করবে, তা-ই প্রকাশ পাবে।

জাগতিক জযবা আখেরাতে প্রকাশ পাবে

হাদীসে ইরশাদ হয়েছে–

تُحْشَرُوْنَ كَمَا تَمُوْتُوْنَ وَتَمُوْتُوْنَ كَمَا تَحْيَوْنَ

যে হালতে ইন্তিকাল হবে, হাশর সেই অনুযায়ী হবে। আর ইন্তিকাল হবে সে হালতে যে হালতে জীবন যাপন করবে।

জীবন যদি খেলাধুলা এবং বিভিন্ন আরাম-আয়েশে অতিবাহিত হয়, তাহলে মৃত্যুর সময় ওই সমস্ত ধ্যান-খেয়াল থাকবে। কবর থেকে ওঠার সময়ও ওই বস্তুর ধ্যান-খেয়াল থাকবে।

আর যদি আল্লাহর জিকির এবং তার ফরজ হুকুম পালন এবং নবীর তরিকায় জীবন অতিবাহিত হয়, তাহলে এই জযবা ও খেয়াল মৃত্যুর সময় থাকবে। সে চিন্তা করবে, কোনভাবে যাতে আমার নামায কাজা না হয়, আমার দৈনিক ওয়াযিফা ছুটে না যায়। সে যখন কবর হতে উঠবে, তখন একই জযবা থাকবে যে কোনমতেই যেন আমার নামায ও দৈনিক তাসবিহ-তাহলিল নষ্ট না হয়। পরবর্তীতে সে বুঝতে পারবে, আমি তো এখন দুনিয়াতে নই, এখন তো আমি হাশরের ময়দানে। হাদীসে এসেছে, কোন হাজী লাব্বাইক, লাব্বাইক বলছে আর ঘটনাক্রমে সে বাহন থেকে পড়ে মারা গেল, তাহলে কিয়ামতের দিন যখন সে কবর থেকে উঠবে, তখন লাব্বাইক লাব্বাইক বলতে বলতে উঠবে। সে মনে-মনে ভাববে, আমি আরাফাতের ময়দানে আছি। পরে সে জানতে পারবে, সেটি হাশরের ময়দান, আরাফাতের ময়দান নয়। কিন্তু দুনিয়ায় যে জযবা ছিল তা-ই থেকে যাবে। অতএব মৃত্যু আসলে বিচ্ছিন্নকারী নয় যে, কোন জিনিস একেবারেই বিচ্ছিন্ন করে ফেলবে। বরং মৃত্যু হল দুনিয়ার জযবা ও ধ্যান-

ধারণাকে পূর্ণকারী। সেগুলোকে পূর্ণতায় পৌঁছিয়ে নফসের জাওহার তথা মূল ধাতু বানিয়ে দেয়। অতএব যে অবস্থায় জীবন অতিবাহিত হবে, সেই অবস্থায় মৃত্যু আসবে। আর যে অবস্থায় মৃত্যু হবে সেই অবস্থায় হাশর হবে।

তো আমি বলছিলাম, দুনিয়াতে যার নামাযের অভ্যাস ছিল, সে সময় নষ্ট করে নামায পড়ত না বরং সময়মত নামায পড়ত। সময় নষ্ট হতে থাকলে, কমতে থাকলে পেরেশান হয়ে যেত, ব্যাকুল হয়ে যেত যে, আমার নামায যেন কাজা না হয়। সেই ব্যক্তি কবরে বলবে, আমাকে নামায পড়তে দাও, পরে আস, সময় চলে যাচ্ছে; নামায পড়তে দাও। আর যার দুনিয়ায় অভ্যাস ছিল না, সে আখেরাত তথা হাশরেও একই জযবা নিয়ে উঠবে।

আরশের ছায়ায় নামায পড়ার আকাঙ্ক্ষা

আমাদের আকাবির হাজী ইমদাদুল্লাহ সাহেব মুহাজিরে মক্কী রহ. যিনি পুরো দেওবন্দি জামাতের শায়খে ত্বরীকত ছিলেন; তিনি বলতেন, কিয়ামত দিবসে আল্লাহ তায়ালা যদি আমাকে জিজ্ঞেস করেন, হে ইমদাদ! কী চাইবে চাও, কী প্রার্থনা করবে কর। তখন আমি আর্জি পেশ করব, হে আল্লাহ! আমার জান্নাতের প্রয়োজন নেই, হুর চাই না, প্রাসাদ চাই না, বাগান দরকার নেই। আমাকে আপনার আরশের নিচে দেড় গজ স্থান দিন যেথা দাঁড়িয়ে আমি নামায পড়তে থাকব। আল্লাহওয়ালারা নামাযে এত স্বাদ পান যে, রাজত্ব ছেড়ে দিতে প্রস্তুত; কিন্তু নামায ছেড়ে দিতে প্রস্তুত নন।

নামাযের স্বাদ

হাদীস শরীফে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

جُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ

নামাযে আমার চক্ষুদ্বয়ের শীতলতা রাখা হয়েছে।

নামায পড়লে চক্ষু ঠাণ্ডা হয়, অন্তরে আনন্দ ও প্রশান্তি সৃষ্টি হয়।

মোটকথা, নামায এমন একটি বস্তু, তা দ্বারা অন্তরে আনন্দ ও প্রশান্তি আসে এবং দিদারে খোদাওয়ান্দির যোগ্যতা এবং ব্যাকুলতা সৃষ্টি হয়। এটি নামাযের বৈশিষ্ট্য ও প্রভাব।

যাকাতের একটি বৈশিষ্ট্য হল, তা দ্বারা হুসনে মুআশারাত পয়দা হয়। রোযার একটি বিশেষত্ব হল, তা দ্বারা নফস থেকে কামভাব ও জৈবিক চাহিদা হ্রাস পায়। যাকাতের একটি বৈশিষ্ট্য হল, তা দ্বারা অন্তর হতে কৃপণতার খারাবি দূর হয়। তেমনিভাবে নামাযের একটি বৈশিষ্ট্য হল, তা দ্বারা আল্লাহ দর্শনের যোগ্যতা সৃষ্টি হয় এবং ব্যাকুলতা পয়দা হয়। সুতরাং ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহর সাথে বিশেষ সম্পর্ক নামায দ্বারাই হয়।

সত্তাগত ইবাদত

ইবাদতের মধ্য একমাত্র মৌলিক ইবাদত হল নামায। এছাড়া অন্যান্য ইবাদত বিভিন্ন কারণে ইবাদতে রূপান্তরিত হয়েছে। সত্তাগতভাবে ইবাদত নয়। একমাত্র নামাযই সত্তাগতভাবে ইবাদত। কারণ, ইবাদত অর্থ সর্বোচ্চ যিল্লতি ও হীনতা ও অবমাননা প্রকাশ করা অর্থাৎ আল্লাহর সামনে সর্বোচ্চ যিল্লতি ও অবমাননা ইখতিয়ার করা। কেননা, আল্লাহ এমন সত্তার নাম, যাঁর মধ্যে শুধু ইজ্জতই ইজ্জত অর্থাৎ সর্বোচ্চ ইজ্জত। ইজ্জতের এমন কোন মাকাম ও স্তর নেই, যা তার মধ্যে নেই। এজন্য তাঁর জাতের সামনে এমন যিল্লতি প্রকাশ করা উচিত যার পরে যিল্লতির আর কোন মাকাম নেই। অর্থাৎ সর্বোচ্চ যিল্লতি প্রকাশ করা উচিত। কিন্তু যাকাতে সর্বোচ্চ যিল্লতি ও অবমাননা কোথায়?

যাকাত তো আপনি গরিবকে দান করেন। দান করা তো আল্লাহ তায়ালার শান। অতএব যাকাত প্রদান করে আল্লাহর জাতের সঙ্গে সদৃশ্যতা সৃষ্টি করছেন। তিনিও দাতা, আপনিও দাতা। তো তাতে যিল্লতির কী থাকল? যাকাত তো আসলে ইজ্জতের বস্তু। যখন তাতে যিল্লতির কোন চিহ্ন নেই, তাহলে ইবাদত হল কিভাবে?

আপনি রোযা পালন করেন, আহার ছেড়ে দেন, পান করা পরিহার করেন, স্ত্রী পরিত্যাগ করেন। এগুলো তো সবই আল্লাহর শান। তিনি আহার থেকে মুক্ত, পান করা থেকে মুক্ত, স্ত্রী থেকে মুক্ত। অতএব এগুলোর দ্বারা আল্লাহর সঙ্গে সাদৃশ্য হল। তাতে যিল্লতি কোথায়?

রোযা তো সত্যিকারের ইজ্জতের মাকাম। মোটকথা রোযাও সত্তাগতভাবে ইবাদত নয়, তাতে সর্বোচ্চ বেইজ্জতি নেই। কিন্তু নামায শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যিল্লত ও অবমাননা জাহির করা ছাড়া অন্য কিছু নয়। প্রথমে আপনি চাকর ও গোলামের ন্যায় হাত বেঁধে দাঁড়ান এবং গোলামের মত গর্দান নত করেন। এটি বেইজ্জতির প্রাথমিক ধাপ, যা আপনি আপনার রবের সামনে পেশ করেন।

তারপর আরো অগ্রসর হয়ে মাথানত করেন, রুকু করেন, তাতে প্রাথমিক স্তর থেকে বেইজ্জতি আরো বেশি। তার তৃতীয় স্তর হল, নাক, কপাল ভূমিতে ঘর্ষণ করেন, যা সর্বোচ্চ অবমাননা। তারপর আরো যিল্লতি প্রকাশ করে তাশাহহুদে বসে ভিক্ষা প্রার্থনা করেন যে, হে আল্লাহ! আমাকে এই জিনিস দাও, ভিক্ষা চাওয়া সবচেয়ে অপমানকর কাজ।

অতএব নামাযে যতগুলো কাজ রয়েছে– দাঁড়ান, রুকু, সিজদা ও তাশাহহুদ– সবকিছুর মধ্যে নিজের অক্ষমতা ও যিল্লতি প্রকাশ পায়। এজন্য যদি সঠিক অর্থে ইবাদত থাকে, তাহলে তা একমাত্র নামায। অন্যান্য ইবাদতগুলো ভিন্ন কারণে ইবাদত হয়েছে। যাকাত মৌলিকভাবে ইবাদত নয়। ইবাদত কিভাবে হল? আল্লাহর আদেশ পালনার্থে। আল্লাহর হুকুম হল যাকাত দাও। আপনি হুকুম পুরা করলেন। অতএব ইরশাদ পুরা করার কারণে ইবাদত হল। তেমনিভাবে রোযাও মৌলিক ইবাদত নয়। হুকুম পালনার্থে ইবাদতে পরিণত হয়েছে। কিন্তু নামায মৌলিকভাবেই ইবাদত। কেননা, নামাযের মধ্যে যতগুলো অবস্থা রয়েছে, সবই যিল্লত প্রকাশের মাধ্যম।

তারপর নামাযের ভিতর যা কিছু পাঠ করা হয়, যা কিছু পাঠ করে থাকেন, তাসবিহ-তাহলিল এগুলোতে হয়তো আল্লাহ পাকের বড়ত্ব ও আযমত প্রকাশ করেন বা নিজের ত্যাগ প্রকাশ করেন। আল্লাহর আযমত প্রকাশ করেন যে, সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি রহমান ও রহীম, যিনি কিয়ামত দিবসের মালিক। অথবা নিজের ত্যাগ কুরবানী প্রকাশ করেন যে–

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۝

আমরা আপনারই ইবাদত করি এবং আপনার সকাশেই প্রার্থনা করি।

এছাড়া নামাযের মধ্যে যত জিকির ও আমল রয়েছে, সবগুলোর একই পরিস্থিতি। তাই সত্যিকার অর্থে ইবাদত হলো নামায। অন্যান্য ইবাদত কারণবশত ইবাদত হয়েছে। সেগুলো সত্তাগতভাবে ইবাদত নয়। স্পষ্ট কথা হল, প্রত্যেক ইবাদতকারীর মধ্যে এমন জযবা হবে যে, আমার মাবুদ সামনে থাকবেন, আমি তাকে দর্শন করব, যাঁর ইবাদত করছি। সবাই এই জযবা নিয়ে দাঁড়াবে।

জযবা ইবাদতের সান্ত্বনা

আল্লাহ তায়ালা জযবাকে ইবাদতের সান্ত্বনা বানিয়েছেন যে, দুনিয়াটা গন্ধযুক্ত স্থান। আল্লাহর দিদার এখানে হতে পারে না। অতএব আকিদা ও বিশ্বাসের চক্ষু দ্বারা আল্লাহকে দেখা, অন্তরে ইয়াকিনের সাথে কল্পনা যে, আমি আল্লাহকে দেখছি। তারপর আমি আরো আলো বৃদ্ধি করব, তোমরা কিছু দেখতে পারবে, আল্লাহর নূর কিছুটা নজরে পড়বে। তারপর আমি আরো জাহির হব, চোখ দ্বারাও আল্লাহর তাজাল্লি দুনিয়াতে দেখতে পারবে। তারপর আরো অনেক প্রকাশ হব। তবে তা মৃত্যুর পর কিয়ামতের দিন। সেদিন আমার জাতের সমপর্যায়ের তাজাল্লি প্রকাশ করব। বান্দারা আপন চক্ষু দ্বারা আপন প্রভুকে দেখবে।

তো বলছিলাম, যেমনিভাবে ঔষধের পৃথক-পৃথক বৈশিষ্ট্য ও প্রভাব রয়েছে, তেমনিভাবে ইবাদতেরও পৃথক-পৃথক বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

পূর্ণাঙ্গ শরীয়তের উপর আমলের প্রভাব

ওষুধে যেমনিভাবে মাত্রা ও পরিমাণ রয়েছে, যা বিজ্ঞ ডাক্তার নির্ধারণ করেন যে, এই ওষুধ তিন মাশা পরিমাণ আর ওই ওষুধ এক তোলা পরিমাণ, তেমনিভাবে তাসবিহাতের সংখ্যা শারে' তথা শরীয়তপ্রণেতা নির্ধারণ করেছেন। রুকুতে سبحان ربي العظيم বলবে তো কমপক্ষে তিনবার বল। তিন থেকে কম যেন না হয়। পাঁচবার, সাতবার বলো; কিন্তু তিনবারের কম নয়। তার চেয়ে কম সুন্নাত মোতাবেক হবে না। এমনিভাবে سبحان ربي الاعلى সর্বনিম্ন তিনবার বল। সূরা ফাহিতা একবার পড়, এতে তাকরার বা ডাবল নেই। অন্য সূরা পড়বে তো একবার পড়, তাতেও তাকরার নেই। বৈঠকে দুরুদ পড়বে একবার, তাতেও তাকরার নেই।

সুতরাং প্রতিটি জিনিসে কোথাও তাকরার আছে, কোথাও তাকরার নেই। যেখানে তাকরার আছে, সেখানে সংখ্যা নির্ধারিত রয়েছে যে, এত সংখ্যক পড়বে, দুবার বা তিনবার। তেমনিভাবে নামাযসমূহের রাকাতসংখ্যা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। ফজরের নামায দু-রাকাত, মাগরিবের নামায তিন রাকাত। অন্যান্য নামায চার-চার রাকাত। এখানে কারো অধিকার নেই একথা বলা যে, চার রাকাতওয়ালা নামাযকে কেন পাঁচ রাকাতবিশিষ্ট করেনি এবং তিন রাকাতবিশিষ্টকে দু-রাকাত কেন করেনি?

তাহলে ডাক্তার যেভাবে তার বিদ্যার আলোকে উত্তর দিয়েছেন যে, যতটুকু ওষুধ প্রয়োজন ততটুকুই ব্যবস্থাপত্রে লিখে দেব। রোগীর কম-বেশি করার অধিকার নেই, তেমনিভাবে নবীদের পক্ষ হতে উত্তর হবে যে, আল্লাহ তায়ালা এ পরিমাণ জিকিরের ওষুধ নির্ধারণ করেছেন, আমিও তা-ই নির্ধারণ করেছি। আমাদের তাতে কম-বেশি করার কোন অধিকার নেই। যতটুকু এসেছে ততটুকু ব্যবহার কর। বেশি করলে ধ্বংস হয়ে যাবে। কেউ যোহরের নামায পড়বে তো এসো আজ আট অথবা বার রাকাত পড়ে নেই; তাহলে উক্ত নামাযকে মুখের উপর ছুঁড়ে মারা হবে এবং ধ্বংসের নিকটবর্তী হবে। কারণ, সে একটু বাড়িয়েছে। কিন্তু বেশিও নাজায়েয এবং কমও নাজায়েয। যে পরিমাণ শারে'-এর পক্ষ হতে নির্ধারিত, তা-ই রাখতে হবে। এ কারণে যখন পূর্ণাঙ্গ শরীয়তের উপর আমল হবে, তখন পরিপূর্ণ রূহানি সুস্থতা নসিব হবে। যেমন গুলেবনফশা পান করলেন তো ঠাণ্ডা দূর হল, মূলাঠি খেলেন কাশি দূর হল, ইয়াকুতি খেলেন দেমাগে শক্তি বৃদ্ধি পাবে, ক্লান্তিরোধক ওষুধ খেলেন তো অন্তরে প্রশান্তি পয়দা হবে। আর যদি উপরে বর্ণিত সবগুলোকে একত্রিত করে খান, তাহলে পূর্ণ সুস্থতা মিলবে। একই প্রক্রিয়া শরীয়তের মধ্যে। প্রতিটি আমলের পৃথক-পৃথক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যদি কেউ পূর্ণাঙ্গ শরীয়তের উপর আমল করে, তাহলে পরিপূর্ণ রূহানি সুস্থতা অর্জিত হবে এবং পুরোপুরি সক্রিয় হবে।

উক্ত আলোচনা দ্বারা উদ্দেশ্য হল একথা পেশ করা যে, আমার-আপনার মুক্তি দুনিয়া ও পরকালে উভয় স্থানে শরীয়তের ইত্তেবার উপর নির্ভরশীল। আমরা সবাই রূহানি রোগী– কেউ খায়েশের পূজারি, কেউ সন্দেহের ভিতর লিপ্ত, কেউ আকিদার খারাবিতে যুক্ত, কেউ অহংকারের খারাবিতে যুক্ত, কেউ মন্দ কর্মে লিপ্ত। এ সকল খারাবি দূর করার বস্তু হল কুরআন, হাদীস ও শরীয়ত। যখন সবগুলোকে ব্যবহার করবেন, তখন আকিদার ফেতনা থাকবে না, আমলের ফেতনা থাকবে না, কোন রোগ বাকি থাকবে না। সবকিছু ভাল হয়ে যাবে।

ইলম ও আমলের বুনিয়াদ

যেমন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ

আমি তোমাদের মধ্যে দুটি ভারী বস্তু রেখে গেলাম। যদি সেগুলো শক্ত করে ধারণ কর, তাহলে কখনও পথহারা হবে না, কোন প্রকার ফেতনায় পড়বে না।

দুটি ভারী জিনিস কী? একটি আল্লাহপ্রদত্ত কিতাব, অপরটি আমার সুন্নাত। অর্থাৎ আমার উত্তম আদর্শ। ইলম অর্জন কর কুরআন থেকে আর আমল গ্রহণ কর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বরকতপূর্ণ জাত থেকে। ইলম ও আমল শুদ্ধ ও দুরস্ত হলে ইলমি ফেতনার নিপাত হবে, যা মানুয়ের আকাঈদকে ধ্বংস করে এবং আমলি ফেতনা নিঃশেষ হবে, যা ইত্তেবায়ে সুন্নাতকে নষ্ট করে এবং মানুষকে বিদয়াত ও নিষিদ্ধ কর্মে লিপ্ত করে। অতএব মুনকারাত ও বিদয়াত কর্ম খতম হতে পারে না যতক্ষণ না সুন্নাত তরিকাকে সামনে রাখা হবে। আর ইলমি ফেতনা এবং সন্দেহ নিঃশেষ হবে না যতক্ষণ না কুরআনকে ফলো করা হয়। এ দুটির সমষ্টিকে শরীয়ত বলে। শরীয়তের ভিত্তি এ দুটি। একটি আল্লাহর কিতাব, অপরটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাত। সুতরাং একটি থেকে ইলম অর্জন কর অপরটি হতে আমল গ্রহণ কর। একটি দ্বারা চিন্তা-চেতনা শুদ্ধ কর আর অপরটি দ্বারা চরিত্র দুরস্ত কর।

আখলাক ও কামালাতের সমষ্টি হল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বরকতপূর্ণ জাত এবং আমলে সালেহরও সমষ্টি হল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বরকতময় জাত। আর পূর্ণাঙ্গ ইলমের সমষ্টি কুরআনের জাত। এই দুই জাতকে যদি আপনি বরণ করেন, তাহলে কখনও ফেতনায় পড়বেন না। মুসলিমগণ যখনই ধ্বংস হয়েছে উক্ত দুটিকে পরিহার করার কারণে হয়েছে। আর যখন গ্রহণ করেছে, মুক্তি পেয়েছে, উন্নতি লাভ করেছে।

মোটকথা, এ কয়েকটি কথা পেশ করলাম। আমি বলেছিলাম, খুব অল্প সময় কথা বলব; এখন মস্তিষ্কের শক্তি বেশি নেই এবং যোগ্যতাও নেই। অনেকটা দুর্বলও। কিন্তু কথা বেড়ে যাচ্ছে।

সত্যিকারের অন্বেষণকারী

মূল উদ্দেশ্য হল ইত্তেবায়ে শরীয়তকে আসল মনে করা, ইত্তেবায়ে সুন্নাতকে আসল জ্ঞান করা। এর জন্য যা কিছু অর্জন করা জরুরি, জানা প্রয়োজন, সেগুলো অর্জন কর। আপনি নিজে যদি আলেম হন, তাহলে আপনার ইলমের আলোকে সুন্নাতের অনুসরণ করুন। আর আলেম না হলে আপনার জন্য কুরআনুল কারীম পদ্ধতি বলে দিয়েছে–

فَسْئَلُوْٓا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ۝

তোমরা না জানলে জ্ঞানীদের নিকট জিজ্ঞেস কর।

তাদের নিকট প্রশ্ন করে ফতোয়া নিয়ে নাও। তারপর সেই অনুযায়ী চল। তাই নিজের অনুযায়ী চল বা অন্যের ইলমের উপর ভরসা করে তার নিকট জিজ্ঞেস করে-করে চল। যদি মনে অনুসন্ধানের মনোভাব থাকে, তাহলে হয়তো নিজে ইলম অর্জন করে, না হয় আলেমদের থেকে জিজ্ঞেস করে-করে চলতে বাধ্য হবে। আর যদি তলব না থাকে, তাহলে কিছুই নেই। এ জন্য আমি বলি, পানি বেশি অন্বেষণ কর না। প্রথমে নিজের মধ্যে পিপাসা সৃষ্টি কর। পিপাসা সৃষ্টি হলে পানি নিজেই আপনার নিকট এসে যাবে। আর তালাশ না থাকলে কিছুই অর্জন হবে না। যেমনটি ডক্টর ইকবাল রহ. তাঁর প্রসিদ্ধ পদ্যগ্রন্থ শিকওয়াহ ও জাওয়াবে শিকওয়াহ-এর এক স্থানে বলেছেন–

راہ دکھلائیں کسے، رہرو منزل ہی نہیں

আমি তো পথ দেখাতে প্রস্তুত, কিন্তু পথিক পাব কোথায়?

جس سے تعمیر ہو آدم کی، وہ گل ہی نہیں

পথ দেখাতে হলে পথিক তো থাকতে হবে। যে মাটি দ্বারা আদম সৃষ্টি, ওই মাটিই তো নেই।

আল্লাহ তায়ালা ভাল জানেন মানুষের মধ্যে মাটি কোথা হতে এসেছে যে তাদের মধ্যে শরীয়াত, সুন্নাত ও দীনের অনুকরণের কোন জযবা আসে না। এতে বুঝা যায়, মাটিই খারাপ হয়ে গেছে। সেই মাটি কোথায় হারাল, যা দ্বারা আদম তৈরি? তারপর বললেন–

ہم تو مائل بہ کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں

راہ دکھلائیں کسے، رہرو منزل ہی نہیں

আমি তো অনুগ্রহ করতে প্রস্তুত; কিন্তু অনুগ্রহপ্রার্থী তো নেই।
পথ দেখাব কাকে, পথিক তো নেই।

হাদীস শরীফে এসেছে আল্লাহর তাজাল্লি প্রতিদিন পৃথিবীর আসমানে নামে এবং তিনি কুদরতি হাত মোবারক প্রসারিত করেন এবং বলতে থাকেন–

أَنَا الرَّازِقُ مَنْ ذَا الَّذِيْ يَسْتَرْزِقُنِيْ

أَنَا الْغَافِرُ مَنْ ذَا الَّذِيْ يَسْتَغْفِرُنِيْ

আমি রিজিকদাতা। কে আছে রিজিক প্রার্থনাকারী? আমি ক্ষমাশীল, ক্ষমা করা আমার কাজ, কেউ কি আছে ক্ষমা প্রার্থনাকারী?

রাতের তৃতীয়াংশ পর্যন্ত তিনি ডাকতে থাকেন। যাদেরকে আল্লাহ পাক তাওফিক প্রদান করেন, তারা প্রার্থনা করতে পারে, দোয়া করতে পারে। অন্যথায় আমরা যেভাবে শুয়ে পড়ে থাকি, তখন একথা বলা হয় যে, আমি তো দিতে প্রস্তুত; কিন্তু প্রার্থনাকারী তো নেই। আর রাস্তা দেখাব কারে; পথিক যে নেই।

এ কারণে আমি বলি, শরীয়ত ও সুন্নাতের অনুসরণ সহজ হয়ে যাবে। আগে তোমার ভিতর তৃষ্ণা জাগাও, জযবা পয়দা কর যে, আমি আনুগত্যশীল হয়ে বাঁচব। বিদয়াতী হয়ে নয়। এমন হব না যে, নিজে আবিষ্কার করে দীন বানিয়ে দিব আর বলব, যা রেওয়াজ হয়ে গেছে, রসম হয়ে গেছে তা-ই দীন। বরং প্রতিটি কাজে আল্লাহর রাসূলের ইরশাদ এবং সাহাবাদের আমল দেখব। তাদের আমল থেকে যা প্রমাণিত হবে, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাত দ্বারা যা প্রমাণিত হবে, সেই মোতাবেক চলব। আর গণ্ডগোল ও ভেজালযুক্ত যত পথ রয়েছে, বিবাহ-শাদী হোক, আনন্দ ও শোকের হোক- প্রতিটি কর্মে আমার রাসূলের নমুনা ও আদর্শ দেখব এবং সেই অনুযায়ী আমল করব। এতে কোন ঘাটতি নেই, অপদস্ততা নেই। এটি সহজ পথ। বাস্তবে দুনিয়া উপার্জন দুষ্কর ও কষ্টকর। দুনিয়ার হাঙ্গামায় পড়ে হাজার-হাজার দায়িত্বের বেড়ি নিজের কাঁধে নিজেই পরেছেন এবং নিজেকে জেলখানায় বন্দি করেছেন। শরীয়ত বন্দিদশা হতে মুক্তি দেওয়ার জন্য এসেছে। স্বাধীনতা ও সহজতার সাথে কাজ করে দুনিয়াও উপার্জন কর এবং আল্লাহ পর্যন্তও পৌঁছে যাও।

এজন্য আমি এ কয়েকটি বাক্য পেশ করলাম-

آب کم جو، تشنگی آور بدست

পানি অন্বেষণ বেশি কর না, পিপাসা জাগাও। পানি নিজে নিজেই প্রস্তুত হয়ে যাবে।

ইত্তেবায়ে হক, শরীয়তের উপর আমল করে এবং আখেরাতের মুক্তির পিয়াসী হওয়া উচিত। নিজের মৃত্যুকে স্মরণ কর, পৃথিবী ধ্বংস হওয়ার কথা স্মরণ কর। একদিন তো খতম হবেই, যে দিন জবাবদিহি করতে হবে। সেজন্য কিছু না কিছু প্রস্তুত হওয়া প্রয়োজন।

হাকিমসুলভ কথা

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদীসে সুন্দর হাকিমসুলভ কথা বলেছেন। আর নবীদের থেকে বেশি হাকিমসুলভ কথা কে বলতে পারে? তিনি বলেছেন–

إِعْمَلْ لِلدُّنْيَا بِمِقْدَارِ بَقَائِكَ فِيهَا وَاعْمَلْ لِلْآخِرَةِ بِمِقْدَارِ بَقَائِكَ فِيهَا

দুনিয়ার জন্য এতটুকু কাজ কর যতটুকু দুনিয়াতে থাকবে আর পরকালের জন্য ততটুকু কাজ কর যতটুকু ওখানে থাকবে।

ইহকালে হাতেগোনা কয়েক দিন থাকতে হবে; তো অল্প কাজই যথেষ্ট। আর পরকালে অনন্তকাল থাকতে হবে; তাই এর জন্য অনেক আমলের প্রয়োজন।

এ কয়েকটি কথা পেশ করলাম। শরীরে শক্তি ও সামর্থ্য ছিল না; কিন্তু মাহফিলের সম্মান আমাকে অপারগ করল। মানুষ একত্রিত হল, মাইক প্রস্তুত করা হল, তখন একজনকে বসিয়ে দেন আর ভদ্রতার সাথে বলে দেন যে আমরা একেবারেই বয়ান করার আবেদন করছি না, আপনি ইচ্ছা করলে করতে পারেন, নাও পারেন। এটি হল উত্তম পদ্ধতিতে বয়ানের জন্য মাজবুর করা। আর যখন জলসায় মানুষ জমা হয়ে যায় এবং লাউডস্পীকার প্রস্তুত হয়ে যায়, তাহলে মানুষ বোকামি করে বয়ান করবে। আপনি তো মুক্ত হয়ে গেলেন যে আমরা তো আপনাকে আদেশ করিনি এবং বাধ্য করিনি। আপনি দোয়া করে উঠে গেলেও এতে আমরা রাজি ছিলাম। কিন্তু অবস্থা এমন হয়ে গেল যে, আমাকে কিছু বলার জন্য অপারগ করে ফেলল। ইচ্ছা ছিল অল্প কথা বলব; কিন্তু কিছুটা বেশি হয়ে গেল। তবে উপকারী বস্তু বর্ণনা করা হয়েছে, অনেক মাসআলা জানা হয়েছে। এখন দোয়া করুন, যাতে আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে তাঁর মর্জি মোতাবেক চলার তাওফিক দেন। তাঁর রাসূলের সুন্নাত মোতাবেক চলার তাওফিক দেন। আমাদের অন্তরে দীনের সম্মান দান করেন, মৃত্যুর স্মরণ ও কিয়ামত দিবসে উপস্থিতির জযবা পয়দা করেন আর আল্লাহর সম্মুখে জবাবদিহির জযবা সতেজ রাখেন।

(২রা যিলহাজ্ব, ১৪০৮ হিজরী, রোজ শুক্রবার)

বয়ান : ৭

দোয়ার আদব

দোয়া হল ইবাদতের নির্যাস। কেননা ইবাদত অর্থ সর্বোচ্চ যিল্লতি ও অপমান প্রকাশ করা। সর্বোচ্চ যিল্লতি গ্রহণ করাই ইবাদতের হাকিকত। মানুষ সর্বোচ্চ পর্যায়ে বিনীত হবে এবং এমন বেইজ্জতি গ্রহণ করবে যে, তার পরে বেইজ্জতির আর কোনো স্তর নেই– এটাই ইবাদতের হাকিকত।

হাত প্রসারিত করে প্রার্থনা করার চেয়ে অধিক যিল্লতি আর কিছুতে নেই। বান্দা যখন আল্লাহর নিকট ভিক্ষা প্রার্থনা করবে, তখন উচিত সর্বোচ্চ পর্যায়ের যিল্লতি প্রকাশ করা। কেননা সর্বোচ্চ যিল্লত-অপমান ওই সত্তার সম্মুখে গ্রহণ করা যেতে পারে, যাঁর ইজ্জত সর্বোচ্চ। যাঁর ইজ্জতের পর ইজ্জতের আর কোনো স্তর নেই। সুতরাং আল্লাহর পবিত্র সত্তা যেহেতু সর্বোচ্চ ইজ্জতময়; তাই তাঁর সামনে সর্বোচ্চ যিল্লত পেশ করা উচিৎ। যে যিল্লতের পর আর কোনো যিল্লত নেই। আর দোয়ার মাঝেই সর্বোচ্চ যিল্লত নিহিত রয়েছে।

– হযরত হাকীমুল ইসলাম রহ.



দোয়ার আদব

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ، وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ، وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُهٗ، اَرْسَلَهُ اللّٰهُ اِلٰى كَآفَّةٍ لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّ نَذِيْرًا وَدَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَ سِرَاجًا مُّنِيْرًا•

اَمَّا بَعْدُ: فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ•

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ؕ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ○ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيْمُ

হে মুমিনগণ! জুমুয়ার দিন যখন নামাযের আযান দেওয়া হয়, তখন তোমরা আল্লাহর জিকিরের দিকে ত্বরা কর এবং বেচাকেনা বন্ধ কর। এটা তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমরা বুঝ। *[সূরা জুমুয়া : ৯]*

সাইয়্যেদুল আইয়্যাম বা দিবসসমূহের সরদার

বুযুর্গানে মুহতারাম!

কোন ভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করার সময় নেই। জুমুয়ার নামাযের পূর্বে সংক্ষিপ্ত সময়ে এলোমেলো কয়েকটি কথা আরয করব। যে কারণে আমরা একত্রিত হয়েছি, তাহল জুমুয়া। তো জুমুয়া আমাকে আলোচ্য বিষয় নির্ধারণ করে দিল। জুমুয়া সম্পর্কে কয়েকটি কথা পেশ করা হবে।

জুমুয়া সম্পর্কে হাদীস শরীফে এসেছে, জুমুয়া হল সাইয়্যেদুল আইয়্যাম অর্থাৎ সকল রাতের সর্দার এবং তামাম দিবসের বাদশাহ এবং তাকে মুমিনদের ঈদও বলা হয়েছে।[১]

জুমুয়া সমন্বয়কারী ও পরিপূরক

জুমুয়া আরবি ভাষার একটি শব্দ, তার উৎস মূল হল ج م ع অর্থাৎ জুমুয়া শব্দের মধ্যে একত্র করা এবং সমন্বয় করার শান বিদ্যমান। জুমুয়া বিক্ষিপ্ত অংশকে একত্রিত করে। এ কারণে তাকে জুমুয়া বলে।

যখন থেকে আল্লাহ তায়ালা জুমুয়ার দিন সৃষ্টি করেছেন, তখন থেকেই সর্বদা তার কাজ হল বিক্ষিপ্ত অংশ একত্রিত করা। যত বড়-বড় কাজ এবং সম্মানিত বিষয় দুনিয়াতে প্রকাশ হয়েছে, তা জুমুয়ার দিনে হয়েছে। আর জুমুয়ার দিনের কর্মগুলোতে সমন্বয়কের শান রয়েছে।

মানব অঙ্গসমূহের সমন্বয়

সর্বপ্রথম জুমুয়ার দিনে মানুষের বিক্ষিপ্ত অংশগুলো একত্রিত করা হয়, যা দ্বারা মানুষ সৃষ্টি করা হয়। হযরত আদম আ.-কে সৃষ্টি করার জন্য আল্লাহ তায়ালা হযরত জিবরাঈলকে জুমুয়ার দিন ইরশাদ করেন, জমিনের প্রত্যেক স্থান হতে কিছু-কিছু মাটি সংগ্রহ করে এক মুষ্টি মাটি নিয়ে এস। তা দ্বারা আমি একটি নতুন সৃষ্টজীব তৈরি করব। ঘটনাটি অনেক দীর্ঘ; ঘটনা শুনানো আমার উদ্দেশ্য নয়। হযরত জিবরাঈল আ. মাটি আনতে গেলেন, তখন জামিন আপত্তি করল, আমি আমার অংশ দিতে চাচ্ছি না। কারণ, আমার দ্বারা এমন মাখলুক তৈরি হবে, যাদেরকে আগুনে জ্বালানো হবে। তাহলে আমি অহেতুক কেন মসিবতে লিপ্ত হব। তাই আমাকে ক্ষমা করুন। তাঁর দয়া হল; তাই মাটি না নিয়ে চলে এলেন।

তারপর হযরত ইসরাফিল আ.কে পাঠানো হল। তাঁর নিকট জমিন আপত্তি উত্থাপন করল এবং ক্ষমা প্রার্থনা করল। তারও রহম এল। তিনি মাটি না নিয়ে চলে এলেন। তারপর হযরত মিকাঈল আ.-কে পাঠানো হল। তিনিও মাটি

---

[১]. যেহেতু তিনি জুমুয়ার বয়ানের পাশাপাশি দোয়ার আদব সম্পর্কে বেশি আলোচনা করেছেন, তাই এই বয়ানের নাম দেওয়া হয়েছে 'দোয়ার আদব'।

আনতে পারলেন না। তারপর আজরাঈল আ.কে পাঠানো হল, জমিন তাঁর কাছেও ফরিয়াদ জানাল। তিনি বললেন, তোমার ফরিয়াদ রক্ষা থেকে মালিকের হুকুম পালন করা বেশি উঁচু কাজ। আল্লাহ আমাকে আদেশ করেছেন মাটি একত্রিত করার জন্য, আমাকে সর্বাবস্থায় জমা করতে হবে, চাই কেউ জান্নাতে যাক বা জাহান্নামে যাক। তিনি সকল অংশ জমা করলেন এবং আল্লাহর সামনে পেশ করলেন। আদম আ.-কে বানানো হল। প্রথমে তার মূর্তি তৈরি করা হয় আর আজরাঈল আ.-কে বলা হয় মাখলুকের মৃত্যুর জন্য তোমাকে নির্ধারণ করলাম। কেননা, যার মৃত্যু যখন নির্ধারিত তা থেকে এক মিনিট বিলম্ব হতে পারবে না। যদি তুমিও তাদের মত ফরিয়াদ শুনতে, তাহলে মরণকালে সকলেই ফরিয়াদ করবে যে আল্লাহর ওয়াস্তে কয়েক মিনিট সুযোগ দিন আর যদি দিয়ে দাও তাহলে পৃথিবীর নেযাম ঠিক থাকবে না। অতএব তোমার মত সদস্যই মৃত্যুর কাজের জন্য উপযোগী। সুতরাং তোমাকে মৃত্যুর কাজে নিয়োগ করা হল। মোটকথা, হযরত আদম আ.-এর অংশগুলো জুমুয়ার দিন একত্রিত করা হয় এবং মূর্তি নির্মাণ করা হয়। তো জুমুয়ার দিনে সমন্বয়কের শান পূর্ব থেকে চলে আসছে।

শরীয়ত একত্রকরণ

হযরত আদম আ.-কে যখন জান্নাত থেকে জমিনে নিক্ষেপ করা হয়, সেই দিনটি ছিল জুমুয়ার দিন। আর সেই সময় মানুষের আমলগুলো একত্রিত করা অগ্রগণ্য ছিল, যে আমলসমূহ দ্বারা কল্যাণ লাভ সহজ হবে, যে শরয়ী আমল দ্বারা তাদের উন্নতি হবে। আর তা দুনিয়াতে পৌঁছার পর সম্ভব ছিল। সুতরাং মানুষ যেদিন দুনিয়াতে এসেছে সেদিন শরীয়তও এসেছে। জান্নাতে শরীয়তের প্রয়োজন ছিল না। প্রয়োজন ছিল না আহকাম ও কানুনের। দুনিয়াতেই তার প্রয়োজন ছিল। দীন ও শরীয়ত বিভিন্ন রঙে এসেছে। সকল নবী বিভিন্ন শরীয়ত নিয়ে আগমন করেছেন। এক লক্ষ চব্বিশ হাজারের মত পয়গম্বর দুনিয়াতে এসেছেন। দীন সবার একই ছিল, উসূল একই ছিল; কিন্তু শরীয়ত ভিন্ন-ভিন্ন ছিল। সকল শরীয়ত দুনিয়াতে একত্রিত হয়েছে। তার মূল কারণ হল হযরত আদম আ.-এর দুনিয়াতে অবতরণ। অতএব বিক্ষিপ্ত শরীয়তকে একত্রিভূত করার দিনও জুমুয়ার দিন। তাই প্রথমে জুমুয়ার দিনে আদম আ.-এর অংশগুলোকে একত্রিত করা হয়। তারপর বিধিবিধানের অংশগুলোকে। আর এই দিনেই হযরত আদমের হযরত হাওয়া আ.-এর সঙ্গে মিলন হয়।

কিয়ামত সংঘটিত হবে শুক্রবার

জুমুয়ার দিন কিয়ামত সংঘটিত হবে। এই দিনে আগে-পরের সকলকে এক ময়দানে একত্রিত করা হবে। এই উঁচু-নীচু ও পাহাড়-সাগরসমৃদ্ধ ভূমি সমতল হয়ে যাবে। কুরআনুল কারীম ইরশাদ হয়েছে, ওই দিন জমিনকে এমন করে দেওয়া হবে যে, তা আর উঁচু-নীচু থাকবে না, থাকবে না পাহাড়, সাগর ও নদী বরং রুপার প্লেটের ন্যায় সমতল হয়ে যাবে। সকল বনি আদমকে কবর হতে উত্তোলন করে সেই স্থানে একত্রিত করা হবে। ওখানে আদম আ.-এর সকল সন্তানদের একত্র করা হবে–

يَوْمٌ مَّجْمُوْعٌ لَّهُ النَّاسُ

সেদিন সকল মানুষকে জমা করা হবে।

সেদিন জুমুয়ার দিন হবে। যেদিন কিয়ামত কায়েম হবে সেদিনও জুমুয়াার দিন।

মোটকথা, আদম আ.-এর মাটি জুমুয়ার দিনে জমা হয়েছে। শরীয়তের বিধান একত্রিত হওয়ার কারণও জুমুয়ার দিন। তারপর সকল মানুষকে এক স্থানে, এক মাঠে একই দিনে জমা করা হবে। অতএব জুমুয়া শব্দের ভিতর পরিপূরক অর্থের শান রয়েছে। বিক্ষিপ্ত বস্তুকে একত্রিত করার শান রয়েছে।

এজন্য তাকে ঈদুল মুমিনীন বা মুমিনদের ঈদের দিন বলা হয়। যেন পুরা মহল্লা, পুরা একটি শহরের বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা মানুষগুলো জমা হয়ে এক স্থানে আসে। তাদেরকে জুমুয়ার দিন জমা করে। এ কারণে তাতে একত্রিকরণ ও একীভূত করার শান পাওয়া যায়।

জুমুয়ার দিন নির্ধারণে বিভিন্ন জাতির পরীক্ষা

জুমুয়া এমন একটি দিন, যার দ্বারা দুনিয়ার বড়-বড় জাতিকে পরীক্ষা করা হয়েছে। পরীক্ষায় শুধু মুসলিম জাতি সফলকাম হয়েছে।

আর তা এভাবে যে, আল্লাহ তায়ালার ইলমে জুমুয়ার দিন নির্ধারিত ছিল যে, সেদিন তার ইবাদত করা হবে। সকল কর্মব্যস্ততা পরিত্যাগ করে দিনের অধিকাংশ সময় আল্লাহর ইবাদতে লিপ্ত থাকবে। কিন্তু তখনও তিনি এই দিন কোন্‌টি তা প্রকাশ করেননি।

কালক্রমে ইহুদী জাতি যখন দুনিয়ায় এল তিনি তাদের বললেন, ইবাদতের জন্য একটি দিন নির্বাচন কর। যদি তোমরা ওই দিনটি নির্বাচন কর, যা আমার ইলমে রয়েছে, তাহলে তোমাদেরকে সফলকাম জাতি মনে করা হবে; অন্যথায় নয়। তখন ইহুদী জাতি ধারণা ও চিন্তা করে শনিবার দিনকে ইবাদতের জন্য নির্বাচন করল। তারা তাদের নির্বাচনের ভিত্তি এই নির্ধারণ করল যে, শনিবার হল আরামের দিন; অর্থাৎ রোববার থেকে পৃথিবী সৃষ্টি শুরু হয়েছে আর শুক্রবার শেষ হয়েছে। তাহলে শনিবার আরাম করেছেন। অতএব এই দিনটি যেহেতু অবসরের দিন; সুতরাং এটি আনন্দের দিন হওয়া উচিত। তাই ইহুদীরা উক্ত দিনকে ঈদের দিন মনে করত এবং ইবাদত করত। কিন্তু তাদের নির্বাচন আল্লাহর ইলমে নির্ধারিত দিন পর্যন্ত পৌঁছেনি।

পৃথিবীতে নাসারা জাতির আবির্ভাব হওয়ার পর আল্লাহ তায়ালা তাদের বললেন, একটি দিন ইবাদতের জন্য নির্বাচন কর। আমার ইলম মোতাবেক তোমাদের নির্ধারণ যদি হয়ে যায়, তাহলে পরীক্ষায় তোমাদেরকে সফলকাম মনে করা হবে। তারা রোববার দিন শনাক্ত করে নিল এবং তাকে ঈদের দিন হিসেবে স্বীকৃতি দিল। আর তারা তাদের কাজের ভিত্তি হিসেবে বলতে লাগল, পৃথিবী সৃষ্টির প্রথম দিন হল রোববার। তার শুরুর দিন সাধারণত আনন্দের হয়ে থাকে। তাই তারা রোববারকে নির্ধারণ করল। সেই দিনকে তারা ইবাদতের জন্য বেছে নিল। মুসলিম জাতি পৃথিবীতে আসার পর তাদের সামনে তিনি একই প্রশ্ন রাখলেন। সারা সপ্তাহের একটি দিন ইবাদতের জন্য নির্বাচন করে নাও। যে দিনের অধিকাংশ সময় তোমরা ইবাদতে ব্যয় করতে পারবে।

মুসলিম জাতি নিজেদের অনুমানের মাধ্যমে শুক্রবার তথা জুমুয়ার দিনকে নির্ধারণ করল ইবাদতের জন্য। তারা দলিল পেশ করল, জুমুয়ার দিন হল 'ইয়াওমুত তাকমিল' তথা পূর্ণতার দিন। অর্থাৎ দুনিয়া সৃষ্টির শুরু হল রোববার আর শেষ হল জুমুয়াবার। আর জুমুয়াবারের শেষ ঘণ্টায় হযরত আদম আ.কে সৃষ্টি করা হয়েছে।

জুমুয়ার দিন দোয়া কবুল হওয়ার সময়

এ কারণে জুমুয়ার দিনের শেষ সময়টুকু আল্লাহর নিকট মকবুল। এ সময়ে যে ব্যক্তি দোয়া করার জন্য বসে যাবে, তার যে-কোনো দোয়া কবুল হবে। আর সময়টি হল সর্বশেষ ঘণ্টা, যে ঘণ্টার মধ্যে সূর্য অস্তমিত হয়। এ শেষ সময়কে মকবুল স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে যে, সে সময় যা দোয়া করবে কবুল করা হবে।

এমন ধারণা কেউ করবে না যে, অনেক সময় দোয়া করি; কিন্তু কবুল হওয়ার কোন আলামত দেখি না। অথচ হাদীসে রয়েছে, কবুল করা হবে। আমি অনেকবার দেখেছি, দোয়া করেছি কিন্তু কবুল হয়নি। ১ মাস, ২ মাস অপেক্ষা করেছি; কিন্তু তারপরও কবুলিয়াতের চিহ্ন দেখিনি।

কলবি দোয়া কবুলযোগ্য

প্রথমে এ বিষয়ে চিন্তা করা বা নজর করা উচিত যে, দোয়ার কিছু শর্ত ও আদব রয়েছে। ওই শর্ত ও আদবগুলো পূর্ণ করে যদি মানুষ দোয়া করে, তাহলে তা কবুল না হওয়ার কথা নয়। ওই আদব ও শর্তগুলো যদি পরিহার করা হয়, তারপর দোয়া কবুল না হয়, তাহলে দোয়া কবুল হওয়ায় সময়ের তো কোন দোষ নেই। দোষ আমাদের। যথা হাদীস শরীফে বলা হয়েছে–

أَنَّ اللهَ تَعَالَى لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِنْ قَلْبٍ غَافِلٍ لَاهٍ

খেলাধুলায় মত্ত অন্তরের দোয়া আল্লাহ তায়ালা কবুল করেন না।

আল্লাহর কাছে দোয়া করছে আর ধ্যান-খেয়াল অন্যদিকে নিবদ্ধ রয়েছে– কখনও স্ত্রীর প্রতি, কখনও সন্তানের প্রতি, কখনওবা ব্যবসা-বাণিজ্য এবং কখনও বাড়ির প্রতি ফিরে যাচ্ছে। মোটকথা, ধ্যান-খেয়াল ভাগ-বাটোয়ারা হচ্ছে এবং কলবে ওয়াসওয়াসা পয়দা হচ্ছে আর হাত দোয়ার জন্য উঠে আছে। এমন দোয়া কবুল করা হয় না।

যার দোয়া কবুল করা হয়, তার সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে–

أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ

কে নিঃসহায়ের ডাকে সাড়া দেন, যখন সে ডাকে? *[সূরা নমল : ২৭ : ৬২]*

অস্থির ও ব্যাকুল হয়ে মানুষ যখন প্রার্থনা করে, তখন তার দোয়া কবুল না হওয়ার সম্ভাবনা নেই। কিন্তু দিলে যদি ব্যাকুলতা না থাকে বরং প্রথাগত দোয়া করছে– মনের মধ্যে অস্থিরতা নেই, ধ্যান-খেয়াল বিক্ষিপ্ত ও ভাগাভাগি হচ্ছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন, আমি এমন দোয়া কবুল করি না, এ শুধু মৌখিক ও শাব্দিক দোয়া। আমি অন্তরের গভীরের দোয়া কবুল করি। অন্তরের অন্তস্তল থেকে মানুষ দোয়া করলে কবুল না হওয়ার সম্ভাবনা নেই। অতএব দোয়া কবুল হওয়ার প্রথম শর্ত হল অস্থিরতা ও ব্যাকুলতা।

হারাম সম্পদ দোয়া কবুলের অন্তরায়

হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, কোন একজন সাহাবা রা. আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! কতক মানুষ দোয়া করে; কিন্তু কবুল হয় না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-ইরশাদ করলেন–

مَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، وَيَقُوْلُ يَارَبِّ يَارَبِّ، فَأَنّٰى يُسْتَجَابُ لَهُ

তাদের খাদ্য হারাম, পানীয় হারাম, পোশাক হারাম এবং হারাম দ্বারা লালিত হয়েছে আর মুখে বলছে হে রব! হে রব! এমন দোয়া কিভাবে কবুল হবে?

অর্থাৎ দোয়া কবুল হওয়ার জন্য আবশ্যক হল দোয়ার জন্য পাক-পবিত্র হয়ে যেতে হবে। কোন রাজা-বাদশার দরবারে যাওয়ার বিধান হল, ভাল কাপড় পরিধান করতে হয়, শরীর পরিষ্কার করতে হয়, গোসল করে সুগন্ধি মেখে যেতে হয়। এগুলো না করে গন্ধযুক্ত শরীর ও কাপড় নিয়ে বাদশার দরবারে যেতে চাইলে তার দরবারে বসতে দিবে না বরং কান ধরে বের করে দেবে। আর বলবে, সে রাজদরবারের আদবের বিপরীত করেছে, তার কথা শোনা তো দূরের কথা, তাকে বসতেই দেবে না। সে বেয়াদব, বাদশার দরবারের আদব রক্ষা করেনি। তেমনিভাবে হারাম কাপড় পরে এবং হারাম খাবার খেয়ে দোয়ার জন্য যাওয়া তেমন, যেমন কাপড়ে অতিরিক্ত নাপাক লাগিয়ে যাওয়া। বরং এগুলো তো বাহ্যিক নাপাক যা পানি দ্বারা ধৌত করা যায়। গোনাহের নাপাকি তো উহ্য ও অদৃশ্য নাপাক, যা পানি দ্বারা ধৌত করা যায় না। তা আরো দুর্গন্ধময় বস্তু। আল্লাহ তায়ালার দরবারে মানুষ যদি দুর্গন্ধযুক্ত হয়ে হাজির হয়, তাহলে তাকে বসতেই দিবে না, দোয়া কবুল করা তো অনেক দূরের কথা।

সেদিকেই ইশারা করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তার পোশাক হারাম, খাবার হারাম, পানীয় হারাম, আর সে বলছে হে রব! হে রব! কিভাবে দোয়া কবুল করা হবে? সে তো দুর্গন্ধ লাগিয়ে উপস্থিত হয়েছে।

যেমনভাবে দোয়ার আদব ছিল, অন্তরে খেলাধুলা থাকবে না, ধ্যান-ধারণা ভাগ-বাটোয়ারা হবে না, তেমনিভাবে এটিই দোয়ার আদব যে, মানুষ পবিত্র হয়ে যাবে, নিয়ত শুদ্ধ করে যাবে, হালাল উপার্জনের পোশাক পরে যাবে। ইশাআল্লাহ দোয়া কবুল হবে।

বাধ্য-বাধকতা ও শর্তযুক্ত দোয়া

দোয়া করার সময় কিছু মানুষ বাধ্য-বাধকতামূলক কথা যোগ করে বলে, হে আল্লাহ! আমাকে বাড়ি দাও, যা এমন-এমন রঙের হবে, ডিজাইনের হবে, এমন নকশার হবে। এভাবে বলা বেয়াদবি ও গোস্তাখি। হাদীস শরীফে এসেছে, এক গ্রাম্যলোক দোয়া করছিল–

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ الْقَصْرَ الْاَبْيَضَ فِی الْجَنَّةِ

হে আল্লাহ! আমাকে জান্নাতে মহল দিবেন, তার রং হবে সাদা, এত বড় হবে, এমন এমন তলাবিশিষ্ট হবে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি কোন্ পদ্ধতির দোয়া করছ? তুমি সাধারণভাবে চাও। যদি জান্নাতে প্রবেশ করতে পার, তাহলে এটিই বড় নেয়ামত। প্রবেশ করাটাই সবচেয়ে বড় নেয়ামত। তুমি যে বাধ্য-বাধ্যকতা যুক্ত করলে সে মহল এমন হবে, পরিমাপ এতো হবে, রং এ ধরনের হবে। নাউযুবিল্লাহ! এ তো আল্লাহ তায়ালার জাতের উপর আবশ্যক করা যে, দেখুন আমাকে এই জিনিস দিতে হবে। এমন দোয়া বেয়াদবি ও গোস্তাখি বৈ নয়। মানুষ সাধারণভাবে প্রার্থনা করবে। কোন ভিক্ষুক যদি আপনার দরজায় এসে হাঁক দিয়ে একথা বলে যে, আমাকে পোলাও পাকিয়ে দাও, চীনা মাটির থালা হতে হবে, তার রং হবে সবুজ, ফুলবিশিষ্ট, তাহলে আমি ভিক্ষা কবুল করব। তখন মালিক বলবে, হে নির্বোধ, আমার দরজা হতে সরে যা, এগুলো আমি কোত্থেকে আনব? এতো আমার সন্তানদের জন্যও নেই। আমি তো এমন থালা ব্যবহার করি না, তোমার জন্য কোথা হতে আনব? আর ভিক্ষা করার এটি কেমন নীতি? অতএব তাকে বের করে দেবে। সুতরাং তার চেয়ে বেশি গোস্তাখি হল, আল্লাহ তায়ালার দরবারে প্রার্থনা করা এবং শর্ত ও বাধ্য-বাধকতা আরোপ করা, যা বাস্তবেই তার উদ্দেশ্য, যার কারণে সে পেরেশান ও অপারগ। এমন জিনিস তার নিকট প্রার্থনা করা অবশ্যই আদব পরিপন্থী। এমন দোয়া ফিরিয়ে দেওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

রহমতবিরোধী শর্ত দ্বারাও দোয়া রদ হয়

মানুষ যদি দোয়ার মধ্যে এমন বাধ্যতা যুক্ত করে, যা আল্লাহ তায়ালার প্রশস্ত রহমতের বিরোধী, যেমন হাদীস শরীফে এসেছে, এক লোক দোয়ার করল–

اَللّٰهُمَّ ارْحَمْنِیْ وَلَا تَرْحَمْ عَلٰی اَحَدٍ

হে আল্লাহ! আমার উপর রহম কর, অন্য কারো উপর রহম করো না।

তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন–

لَقَدْ تَحَجَّرْتَ وَاسِعًا

হে আল্লাহর বান্দা! তুমি একটি অসীম ও সুপ্রশস্ত জিনিসকে সংকীর্ণ করে ফেললে।

আল্লাহ রহমত এমন বস্তু যা সকল জগতে বণ্টন করে দিলেও সামান্য পরিমাণ কমবে না। আর তুমি বলছ আমাকে রহম কর আর কারো উপর করো না। এটি তো পূর্বের কথার চেয়েও বেশি গোস্তাখি ও বেয়াদবি।

অতএব খেলাধুলায় মত্ত অন্তর দ্বারা দোয়া করলে কবুল হয় না। দোয়ার মধ্যে নিজের পক্ষ থেকে শর্ত ও বাধ্য-বাধকতা জুড়ে দিলেও কবুল হয় না, দোয়া প্রার্থনার সময় রহমতের সীমাকে সংকীর্ণ করে প্রার্থনা করলেও কবুল হয় না। সুতরাং দোয়ার মধ্যে কিছু আদব ও পদ্ধতি রয়েছে। সেই তরিকায় দোয়া করলে মিলবে। ভিক্ষুক কোনো শর্ত আরোপ করে না, সে শুধু উদ্দেশ্য পেশ করে। সে বলে আমাকে কিছু দিন, আপনার দরবার হতে কিছু একটা পেতে চাই।

প্রার্থনার পদ্ধতি

আমরা দোয়ার আদব পুরো করি না। কিন্তু যখন কবুলিয়াতের আলামতসমূহ প্রকাশ পায় না, তখন হাদীসের উপর প্রশ্ন তুলে অভিযোগ করি যে, সময় তো মাকবুলিয়াতের ছিল; কিন্তু আমাদের বেলায় তো কিছুই কবুল হল না।

প্রশ্ন হল, সময় তো মাকবুলিয়াতের ছিল; কিন্তু তুমি কি কবুল হওয়ার সঠিক পদ্ধতি গ্রহণ করেছ? তুমি কি কবুলিয়তের আদব গ্রহণ করেছ? মানুষের দৃষ্টি নিজের অসম্পূর্ণতার দিকে যায় না। সে আল্লাহর আহকাম এবং কানুনের উপর অপবাদ আরোপ করে। এটি ভ্রান্ত তরিকা। যদি কবুলিয়াতের আলামত প্রকাশ না পায়, তাহলে নিজের ভিতর চিন্তা করবে যে, আমি কোন কিছুতে ঘাটতি করিনি তো? কোন কিছু ভুল হয়ে যায়নি তো?

দ্রুততার সাথে কবুল হওয়া

আপনি যদি সব আদব পুরা করেন, সকল শর্ত একত্রিত করেন, তারপর দোয়া করেন, তাহলে ইনশাআল্লাহ অবশ্যই কবুল হবে। কিন্তু কবুলিয়াতের পদ্ধতি বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। কখনও এমন হয় যে, মুখে প্রার্থনা করার সঙ্গে-সঙ্গে হাতে এসে যায়। তখন মানুষ বলতে থাকে, ভাই! আশ্চর্যজনক কবুলিয়াতের সময় ছিল যে, যা চেয়েছি তা-ই পেয়েছি। হায় যদি তখন অমুক-অমুক জিনিস চাইতাম, তাহলে তাও পেয়ে যেতাম। অতএব কখনও মুখে চাওয়ার সাথে-সাথে হাতে মিলে যায়। আর মানুষ দোয়া করে সফল হয়।

প্রার্থনার অধিক কবুল হওয়া

কখনও-কখনও এমন হয় যে, যার জন্য দোয়া করল, তা পায়নি। কিন্তু তার চেয়ে বড় বস্তু পেয়ে যায়। তখন পরে খুশি হয় এবং বলে, যা চেয়েছিলাম তা না পেয়ে ভালই হল। আমার তো তার চেয়ে বড় ও উন্নত বস্তু হস্তগত হয়েছে। এমন জিনিস পেয়েছি, যা চেয়েছিলাম তা থেকে হাজার গুণ ভাল। তা দ্বারা প্রার্থনাকৃত বস্তু হাজার-হাজার এমনিতেই পেয়ে যাব। তখন মানুষ খুশি হয় যে, অনেক ভাল হয়েছে যা প্রার্থনা করেছিলাম তা না পেয়ে। তার থেকে অনেক বড় বস্তু পেয়ে গেছি।

কবুল দীর্ঘায়িত হওয়া

কখনও দোয়ার সঙ্গে-সঙ্গে মিলে যায়। কোন সময় কিছুটা দেরিতে মিলে। প্রার্থনাকারীর মধ্যে ভেজাল বা দোষ দেখা দেয়। তখন অপেক্ষা করা হয় যে, তার দোষ দূর হবে এবং উদ্দেশ্যে গ্রহণেযোগ্যতা সৃষ্টি হবে, তারপর তাকে দেওয়া হয়। তখন মানুষ ভাবে, দোয়া কবুল হয়নি। অথচ তার কল্যাণের কারণেই দেরিতে কবুল করা হয়।

দেরি করার কল্যাণ

দোয়া দেরিতে কবুল হওয়ার দৃষ্টান্ত এমন, যেমন আপনার সন্তান আছে। সন্তান থেকে কে প্রিয় হয়? সন্তান থেকে বেশি মহব্বতের হয়? বিষয়-সন্তান আল্লাহ আপনাকে সবকিছু দিয়েছেন। আপনি লাখপতি। তাকে যদি আপনি প্রতিদিন পকেটখরচ শত টাকা দেন, তাহলে তা কঠিন হবে না। আপনার প্রিয় ছেলে

আপনার নিকট একশত টাকা চাচ্ছে। তাহলে কখনও তো এমন হয় যে, আপনি চাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে পকেট থেকে একশত টাকার নোট বের করে দিয়ে দেন। তখন ছেলে অনেক খুশি হয় যে, বাবা আমাকে আদরও করেন এবং অনেক দয়াও দেখান। আমি যা চাই সঙ্গে-সঙ্গে দিয়ে দেন। তবে কখনও এমন হয় যে, ছেলে চাচ্ছে আমাকে বিশ টাকা বা দশ টাকা করে দৈনিক দিন আর আপনি দিচ্ছেন না।

এভাবে মাস অতিবাহিত হল এবং একে-একে ছয় মাস অতিক্রম করে চলেছে। এদিকে ছেলে মনে-মনে বলছে, মনে হয় আমার পিতার অন্তরে আমার মহব্বত অবশিষ্ট নেই। অন্যথায় তিনি তো একজন লাখপতি মানুষ। আমাকে যদি তিনি দুশো টাকা করে দৈনিক দেন, তাহলে তা তার নিকট কোন বোঝা মনে হবে না। আর আমি তো তার নিকট রোজ দশ টাকা করে পকেটখরচ চেয়েছিলাম। কিন্তু তিনি তাও দিলেন না, এখন সে শক্ত হতে লাগল। দীর্ঘ ছয় মাস পর দশ টাকা রোজ হিসাব করে তাকে কয়েক হাজার টাকার একটি থলে ন্যস্ত করে বললেন, হে প্রিয় বৎস! নাও টাকার থলেটি। আমি তোমাকে এত দিন এজন্যই দেইনি যে, তুমি অসুস্থ ছিলে, তোমার পাকস্থলি দুর্বল ছিল। কলিজা ও ফুসফুস খারাপ ছিল। তোমার চিকিৎসা চলছিল। যদি তোমাকে দৈনিক দশ টাকা করে দিতাম, তাহলে তুমি তা খেয়ে, পান করে এবং চেটে-চেটে উড়িয়ে দিতে। ফলে টাকা নষ্ট হত, স্বাস্থ নষ্ট হত। তাই আমি অপেক্ষা করেছি তোমার শারীরিক সুস্থতার, তোমার পাকস্থলি প্রতিটি খাবার হজম করার শক্তি ফিরে আসার। আমি তোমাকে তখনই দেব, যখন যা কিছু খাবে হজম হয়ে যাবে। এখন ডাক্তার বলেছেন, তুমি পুরোপুরি সুস্থ। এজন্য এখন তোমাকে টাকা দিলাম। এখন ছেলে অনেক-অনেক খুশি হবে, পিতার জন্য দোয়া করবে যে, তিনি আমাকে চাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে না দিয়ে ভালই করেছেন। যদি তিনি দিয়ে দিতেন, তাহলে আমি বর্জনীয় জিনিস ব্যবহার করতাম আর ধ্বংসের কাছাকাছি পৌঁছে যেতাম। সে খুশি হয় যে, ভালই হয়েছে প্রার্থনার সাথে-সাথে না পেয়ে।

দেরিতে কবুল হওয়ায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ

আবার কখনও এমন হয় যে, বছর অতিবাহিত হয়ে যায়। ছেলে প্রার্থনা করতে থাকে আর আপনি দেন না। তখন তার মনে খারাপ ধারণা সৃষ্টি হয় যে, বাবা অত্যন্ত বখিল মানুষ। তার অন্তরে স্নেহ-মততা বলতে কিছুই বাকি নেই। আপনার বিরুদ্ধে অন্যদের নিকট অভিযোগ করে। কিন্তু আপনি কোন প্রকার

ভ্রূক্ষেপ করেন না। এখন তার মনে বদ্ধমূল হয়ে গেছে যে, আর কিছু পাব না। এভাবে যখন দশ-পনের বছর চলে গেল, তখন আপনি ছেলে যা প্রার্থনা করেছিল, তা সব সঞ্চিত করে বিশ হাজার টাকার একটি ব্যাগ তাকে দিলেন এবং বললেন, তোমাকে যদি একশত টাকা করে দৈনিক দিতাম, তাহলে তুমি অহেতুক কাজে ব্যয় করে ফেলতে। আমি তোমার জন্য সঞ্চয় করেছি। আজ দিচ্ছি। তা দ্বারা তুমি বিভিন্ন সামগ্রী ক্রয় করবে। ফলে তুমি যে পরিমাণ আমার নিকট দৈনিক প্রার্থনা করতে, তার চেয়ে বেশি পেয়ে যাবে, যা তোমার কাজে আসবে। অন্যথায় এই বিশ হাজার টাকা বেহুদা খরচ হয়ে যেত। এখন এই টাকাগুলো শুধু তোমার নয় বরং তোমার পরবর্তী জেনারেশনেরও উপকারে আসবে। তখন ছেলে দোয়া করবে, আমার বাবা আমাকে না দিয়ে বাস্তবেই অনেক ভাল কাজ করেছেন এবং এমনভাবে দিয়েছেন, যা শুধু আমার নয় বরং আমার সন্তানদেরও উপকার হবে।

তো দেখুন, এখানেও অনেক দেরি হয়েছে। কিন্তু তারপরও প্রার্থনাকারী পরিশেষে খুশি হয়েছে এবং শুকরিয়া আদায় করছে। যখন তার সামনে আসল অবস্থা পরিষ্কার হয়েছে। আর যখন পরিষ্কার ছিল না, তখন অভিযোগ করত এবং বলে বেড়াত, বাবার মনে মহব্বত নেই।

ঠিক তেমনি অবস্থা দোয়ার বেলায়ও। বান্দা আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করে, হে আল্লাহ! আমাকে অমুক জিনিসটি দাও, আমাকে এত-এত টাকা দাও। তখন কখনও এমন হয়ে যে, মুখে প্রার্থনার সঙ্গে-সঙ্গে হাতে পৌঁছে যায়। তখন বান্দা অনেক খুশি প্রকাশ করে আর বলে, আল্লাহ আমাকে দোয়ার সাথে-সাথে দিয়ে দিয়েছেন। আমি তার চারগুণ বেশি প্রার্থনা করলেও তিনি দিয়ে দিতেন। দোয়ার সময়টি তো কবুল হওয়ার সময় ছিল। কিন্তু কখনও-কখনও এমন পরিস্থিতি হয় যে, আপনি প্রার্থনা করে চলছেন; কিন্তু পাচ্ছেন না। এভাবে কয়েক মাস বা বছর অতিবাহিত হয়ে গেল। তারপর আল্লাহ তায়ালা আপনার উদ্দেশ পুরা করলেন এবং অন্তরে ঢেলে দিলেন যে, আপনার ভিতর পাপ ও গুনাহের মাদ্দা বিদ্যমান ছিল। যদি আমি তোমাকে সেই সময় ধন-সম্পদ দিতাম, তাহলে তুমি তা দ্বারা সিনেমা দেখতে, খেলাধুলায় ব্যয় করতে।

কিন্তু তোমাকে আমি দেইনি। ফলে তোমার হাত একেবারে খালি। এতে তোমার পেরেশানি বৃদ্ধি পেয়েছে। পেরেশানির প্রভাবে তোমার চারিত্রিক অবস্থা উন্নত হতে শুরু করেছে। তোমার অন্তর শুধু খেলাখুলায় মত্ত থাকত, তা নিঃশেষ হয়েছে। এখন যখন অবস্থা ভাল হয়েছে আল্লাহ তায়ালা তোমার উদ্দেশ্য পূরণ করলেন, যাতে অহেতুক স্থানে টাকা ব্যয় না হয়। তোমার গোনাহ বৃদ্ধি না পায়

বরং নেকী ও তাকওয়া বৃদ্ধি পায়। তখন বান্দা আনন্দিত হয় এবং বলে, হে আল্লাহ! তোমার কৃতজ্ঞতা যে, তুমি আমাকে বছর পূর্বে ধন-সম্পদ দাওনি। দিলে আমি বাস্তবেই উড়িয়ে দিতাম। বছর পরে দিয়েছ যখন আমার অন্তর সহীহ হয়েছে এবং দিলের চাহিদা সম্পূর্ণ শুদ্ধ হয়েছে।

দোয়া আখেরাতের পুঁজি

আর কখনো এমন হয় যে, বান্দা আজীবন প্রার্থনা করছে তো করছে, এভাবে যিন্দেগী শেষ হয়ে যাচ্ছে; কিন্তু মৃত্যু পর্যন্ত কিছুই দেওয়া হয়নি। সে দারিদ্র্য ও পেরেশানিতে লিপ্ত হয়েছে আর মনে-মনে ভাবছে, আমার জানা নেই আমি এমন কি ভুল করেছি যে, কোনভাবেই আমার দোয়া কবুল হচ্ছে না। সারাজীবন দোয়া করেছি কিন্তু কবুল হয়নি, কিছুই পাইনি। এভাবে তার মৃত্যু এসে গেল, তার ইন্তিকাল হয়ে গেল। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, সেই বান্দা যখন হাশরের ময়দানে উপস্থিত হবে এবং নেকীর বিশাল বিশাল স্তূপ দেখবে, তখন বলবে, হে আল্লাহ! আমি তো এমন কোন আমল করিনি, যার প্রতিদান এত বিশাল হতে পারে, তাহলে এই নেয়ামত কোত্থেকে জমা হল?

আল্লাহ বলবেন, এগুলো তোমার দোয়া, যা তুমি দুনিয়াতে করেছিলে। আমি তোমাকে সেখানে না দিয়ে এখানে পুঁজি করেছি। তোমার নিকট আমলের কোন পুঁজি ছিল না। কিন্তু তুমি আমার নিকট প্রার্থনা করতে। আমি তোমার জন্য ওই দোয়াগুলোকে পুঁজি বানিয়েছি। তোমার সারা জীবনের দোয়া একত্রিত করে এত বিশাল নেয়ামত সঞ্চিত করেছি। এখন তুমি অনন্তকাল জান্নাতে আরাম কর। তখন বান্দা খুশি হবে এবং বলবে, হে আল্লাহ! তোমার শুকরিয়া যে, তুমি দুনিয়ায় আমার দোয়া কবুল করনি। এখন আমি কবুলিয়াতের পুঁজি পেয়েছি।

দোয়া আল্লাহর যিম্মায় ছেড়ে দেওয়া

আমার বলার উদ্দেশ্য হল, বান্দা দোয়া করবে; কিন্তু নিজের পক্ষ থেকে বিচার করবে না যে, আমি যেহেতু দোয়া করছি, তাহলে এমনটি হওয়া উচিত। বরং কবুল হওয়া না হওয়া মালিকের উপর ন্যস্ত করবে। আল্লাহর উপর ছেড়ে দিবে। কখনো সাথে-সাথে পাবে, কখনো দেরি হবে, কখনো মরণের আগ মুহূর্তে মিলবে, কখনো মরণের পরে পাবে। কিন্তু ব্যাকুল ও অস্থির হয়ে যে দোয়া করা হবে, তা অবশ্যই কবুল হবে।

দোয়া একটি ইবাদত

আমি বলি, অল্প সময়ের জন্য মেনে নিন যে, দোয়া কবুল হল না, দুনিয়াতেও না, পরকালেও না। কিন্তু দোয়া করা একটি ইবাদত। আপনি ইবাদতের তাওফিক পেয়েছেন এটাকে কি সামান্য মনে করেন? হাদীস শরীফে এসেছে–

الدعاء مخ العبادة

দোয়া ইবাদতের মগজ ও নির্যাস।

দোয়া হল ইবাদতের নির্যাস। কেননা ইবাদত অর্থ সর্বোচ্চ যিল্লতি ও অপমান প্রকাশ করা। সর্বোচ্চ যিল্লতি গ্রহণ করাই ইবাদতের হাকিকত। মানুষ সর্বোচ্চ পর্যায়ে বিনীত হবে এবং এমন বেইজ্জতি গ্রহণ করবে যে, তার পরে বেইজ্জতির আর কোনো স্তর নেই– এটাই ইবাদতের হাকিকত।

হাত প্রসারিত করে প্রার্থনা করার চেয়ে অধিক যিল্লতি আর কিছুতে নেই। বান্দা যখন আল্লাহর নিকট ভিক্ষা প্রার্থনা করবে, তখন উচিত সর্বোচ্চ পর্যায়ের যিল্লতি প্রকাশ করা। কেননা সর্বোচ্চ যিল্লত-অপমান ওই সত্তার সম্মুখে গ্রহণ করা যেতে পারে, যাঁর ইজ্জত সর্বোচ্চ। যাঁর ইজ্জতের পর ইজ্জতের আর কোনো স্তর নেই। সুতরাং আল্লাহর পবিত্র সত্তা যেহেতু সর্বোচ্চ ইজ্জতময়; তাই তাঁর সামনে সর্বোচ্চ যিল্লত পেশ করা উচিৎ। যে যিল্লতের পর আর কোনো যিল্লত নেই। আর দোয়ার মাঝেই সর্বোচ্চ যিল্লত নিহিত রয়েছে।

উদাহরণস্বরূপ, আপনি নামায পড়ার প্রাক্কালে কান পর্যন্ত হাত উত্তোলন করে হাত বাঁধেন। এটি যিল্লত প্রকাশের প্রাথমিক স্তর। চাকর ও গোলামের ন্যায় হাত বেঁধে দাঁড়ান। এটি সর্বোচ্চ যিল্লতি নয় বরং প্রাথমিক যিল্লতি। দ্বিতীয় পর্যায়ে আপনি রুকুতে মাথানত করেন। এটি দাঁড়ানো এবং হাত বাঁধা অপেক্ষা বেশি যিল্লতির কাজ। রুকুতে গর্দান ও মাথানত হয়; কিন্তু তাও সর্বোচ্চ যিল্লতি নয়। বরং মধ্যম পন্থার যিল্লতি। যখন আপনি সিজদায় যান এবং নাক ও ললাটকে মাটিতে ঘর্ষণ করেন, এটি সর্বোচ্চ যিল্লতি।

কিন্তু গভীর চিন্তা করলে দেখা যাবে, এটিই সর্বোচ্চ যিল্লত নয়, সর্বোচ্চ যিল্লতকে শেষে রাখা হয়েছে যে, সালাম ফিরিয়ে হাত উত্তোলন করে দোয়া কর। অথবা সালাম ফিরানোর পূর্বে শরীয়ত সমর্থিত দোয়াগুলো অধিক পরিমাণে পাঠ কর। অতএব দোয়া করা এবং ভিক্ষা করা হল সর্বোচ্চ যিল্লতি।

ভিক্ষা করা নিষেধ

ভিক্ষা নিষেধ করা হয়েছে। কিন্তু মানুষ যদি নিরুপায় হয়ে যায়, এমন সংকটময় মুহূর্তে সে যদি ভিক্ষা না করে, তাহলে প্রাণনাশের আশংকা রয়েছে। তখন ভিক্ষা করার অনুমতি আছে। স্বাভাবিক অবস্থায় ভিক্ষা করার অনুমতি নেই।

মহব্বতের চাওয়া

মহব্বত ও সম্পর্কের কারণে যে সাওয়াল হয়, তা ভিক্ষা নয়। যেমন সন্তান পিতার নিকট সাওয়াল করে, বন্ধু-বান্ধব পরস্পর গভীর সম্পর্কের কারণে সাওয়াল করে যে, আমাকে কিছু টাকা দাও অথবা খানা দাও। এগুলো ভিক্ষা নয়। এগুলো বন্ধুত্বের সাওয়াল। এগুলো যিল্লতের নয় বরং মহব্বত ও বন্ধুত্বের। এমন সাওয়ালের অনুমতি আছে। বরং কখনো-কখনো উৎসাহিত করেছেন যে, যাও তাদের নিকট গিয়ে চাও। চেয়ে-চেয়ে আহার কর; তাহলে সম্পর্ক মজবুত হবে, তাওয়াক্কুল বৃদ্ধি পাবে।

যেমন কুরআনুল কারীমে ইরশাদ হয়েছে–

لَيْسَ عَلَى الْاَعْمٰى حَرَجٌ وَّ لَا عَلَى الْاَعْرَجِ حَرَجٌ وَّ لَا عَلَى الْمَرِيْضِ حَرَجٌ وَّلَا عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ اَنْ تَاْكُلُوْا مِنْۢ بُيُوْتِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اٰبَآئِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اُمَّهٰتِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اِخْوَانِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اَخَوٰتِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اَعْمَامِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ عَمّٰتِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اَخْوَالِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ خٰلٰتِكُمْ اَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَّفَاتِحَهٗٓ اَوْ صَدِيْقِكُمْ ؕ

অন্ধের জন্য দোষ নেই, খোড়ার জন্য দোষ নেই, রোগীর জন্য দোষ নেই এবং তোমাদের নিজেদের জন্যেও দোষ নেই যে, তোমরা আহার করবে তোমাদের ঘরে অথবা তোমাদের পিতাদের ঘরে অথবা তোমাদের মায়েদের ঘরে অথবা তোমাদের ভ্রাতাদের ঘরে বা তোমাদের বোনদের ঘরে, তোমাদের চাচাদের ঘরে, অথবা তোমাদের ফুফুদের ঘরে অথবা তোমাদের মামাদের ঘরে, তোমাদের খালাদের ঘরে অথবা সেই ঘরে, যার চাবি আছে তোমাদের হাতে অথবা তোমাদের বন্ধুদের ঘরে। *[সূরা আননূর : ৬১]*

অর্থাৎ তোমাদের উপর কোন গুনাহ হবে না নিজেদের ঘরে চেয়ে খেলে। যদি কেউ নিজের স্ত্রীকে বলে, আমাকে অমুক জিনিসটি বের করে দাও, তাহলে তা

যিল্লতির চাওয়া হবে না বরং তার অধিকার আদায় হবে। এটি সম্পর্কের সাওয়াল। অতএব মানুষ তার নিজ গৃহে দাওয়াত ছাড়া খাবে এটা তার অধিকার এমনকি খাওয়া-ই উচিৎ। যদি কেউ নিজের ঘরে দাওয়াতের অপেক্ষা করে, তাহলে ক্ষুধার্ত থাকবে। কারণ, দৈনিক তাকে কে দাওয়াত দিবে।

তেমনিভাবে বলা হয়েছে, পিতার ঘর পৃথক, ছেলের ঘরও পৃথক। পিতার ঘরেও সাওয়াল করে আহার করা গুনাহ নেই। এতে ইঙ্গিত হল, বাপের ঘরে যাওয়া উচিৎ এবং সাওয়াল করে খাওয়া উচিৎ, যাতে সম্পর্ক বৃদ্ধি পায় এবং পিতা যাতে একথা না ভাবেন যে, আমার অপরিচিত হয়ে গেছে এবং পৃথক বাড়ি বানিয়ে নিয়েছে; ফলে সন্তানের শান বাকি নেই। এজন্য কখনো-কখনো পিতার সামনে নিজের সন্তান হওয়ার অবস্থা প্রকাশ করা এবং নিজের মুক্ষাপেক্ষীতা প্রকাশ করা। যাতে পিতার পিতৃত্ব ও বড়ত্ব প্রকাশ পায় এবং সন্তানের খাবার জাহির হয় এজন্য বলা হয়েছে, বাপের ঘরে গিয়ে খাও। অথবা মায়ের ঘর পৃথক স্থানে হলে তার ঘরে যাও এবং সাওয়াল করে খাও। অথবা ফুফু ও খালার ঘরে গিয়ে সাওয়াল করে-করে খাও। কেননা, ফুফু ও খালা মায়ের সমান এবং বাবার বোন।

অথবা বলেছেন, যাদের চাবি তোমাদের হাতে অর্থাৎ বান্দী বা গোলামের ঘর যারা তোমার খরিদ করা এবং তুমি তাদের মালিক। তারা তোমার সন্তানের ন্যায়। তাদের নিকট চাইলে যিল্লতির চাওয়া হবে না বরং সম্পর্ক বৃদ্ধি পাবে।

অথবা বন্ধু-বান্ধব বা মহব্বতের মানুষ। তাদের ঘরে গিয়ে বল, ভাই! আজ তোমার ঘরে আহার করব। এটি যিল্লতের কথা নয় বরং সম্পর্ক বাড়বে। তারা মনে করবে, সে আমাদের আপন মনে করে তাই এসে সাওয়াল করছে। মানুষ কোন অপরিচিতের নিকট সহজে চায় না।

নিজ থেকে ফরমায়েশ দেওয়া

একদা হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত বারীরাহ রা.-এর গৃহে তাশরিফ নিলেন। হযরত বারীরা রা. হযরত আয়শা রা.-এর দাসী ছিলেন। তিনি ছিলেন একজন দরিদ্র ও গরীব মানুষ। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, বারীরাহ! খাওয়ার কোন জিনিস আছে কি?

তিনি বললেন, আছে; তবে তা আপনার খাওয়ার উপযোগী নয়।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, কী আছে?

বারীরাহ আরয করলেন, কিছু গোস্ত আছে তবে তা সদকার গোস্ত।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন–

لَكِ صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ

তোমার জন্য সদকা; আমার জন্য হাদিয়া।

যখন তুমি আমাকে দিবে, তখন তা হাদিয়া হয়ে যাবে। তিনি তা আহার করলেন। নাউযুবিল্লাহ! এটি যিল্লতের সাওয়াল ছিল না বরং মহব্বত বৃদ্ধির সাওয়াল ছিল। সম্পর্ক বাড়ানোর জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ থেকে অর্ডার দিয়েছেন। অতএব তায়াল্লুক ও সম্পর্ক বৃদ্ধির জন্য মানুষ নিজ থেকে চায়, তখন অন্যরা মনে করে, তিনি আমাকে আপন মনে করেন।

লৌকিকতা পরিহার করা

আফগান সফরে তুর্কীদের একটি রেওয়াজ লক্ষ করেছি, যারা তুর্কিস্তান হতে হিজরত করে এসেছে। স্বয়ং আফগানিদের মধ্যেও দেখেছি। কাবুল শহরে একটি সাধারণ সামাজিকতা হল, হঠাৎ দশ-বিশজন বন্ধু-বান্ধব একত্রিত হতো। তারপর বলত, আজ অমুক বন্ধু বা ভাইয়ের বাড়িতে আহার করব। তখন দেখতাম, দশ-বিশজন একত্রে কারো বাড়িতে মেহমান হতে, বাড়িওয়ালা স্বাগতম জানাত এবং দোয়া করত। বলত, আস; খাবার তৈরি হয়ে যাবে। এমনভাবে আরো দশ-বিশজন জমা হয়ে কারো ঘরে যেত এবং বলত, আমরা তোমার ঘরে খেতে আসছি। তাদের সবার ঘরে সর্বদা দশ-বিশজনের খাবার জমা থাকত। এটি তাদের সাধারণ নীতি। বলা-কওয়া ছাড়া দাওয়াত ব্যতীত দশ-বিশজন লোক এসে যেত এবং বলত দোস্তের বাড়িতে যদি সামাজিকতা দেখিয়ে দাওয়াতের অপেক্ষায় থাকতে হয়, তাহলে বন্ধুত্ব কীসের? এতে অসামাজিকতার কী আছে? এটি তাদের সমাজে সাধারণ রেওয়াজ, যা দ্বারা তাদের মাঝে সম্পর্ক বৃদ্ধি পায় ও মজবুত হয়।

ইসলামী অন্তরঙ্গতাপূর্ণ সম্পর্ক

এক বুযুর্গের ঘটনা। তিনি খানা খাচ্ছেন। কোন ভদ্রলোক তার নিকট এলেন। মনে-মনে ভাবলেন, তিনি খাওয়ার জন্য অনুনয়-বিনয় করবেন, আতিথেয়তা করবেন। কিন্তু বুযুর্গ তাকে কোন রকম খাতির করলেন না। ফলে লোকটি মনে অনেক কষ্ট পেল। একজন আল্লাহওয়ালা বুযুর্গ মানুষ খানা খাচ্ছেন, এটি একটি চারিত্রিক কথা এবং মুসলমানের হকও বটে একথা বলা যে, ভাই! বস খাবার গ্রহণ কর। এমনকি কারো যদি খাওয়ানোর ইচ্ছা নাও থাকে, তাহলেও এতটুকু

বলবে যে, ভাই! আস; খানায় শরীক হও। আর দ্বিতীয়জন বলত, না; আমি খানা খেয়ে এসেছি। তাহলে মনে-মনে বলত, তুমি ভাল করেছ খেয়ে এসেছ। অতএব বুযুর্গ এতটুকু তো করতে পারতেন। লোকটির মনে-মনে খেয়াল করল, তিনি বাহ্যিকভাবে আতিথেয়তা দেখাতে পারতেন। আতিথেয়তা তো একটি ইসলামি আমল। তাই তিনি মনক্ষুণ্ন হলেন।

বুযুর্গ আহার থেকে অবসর গ্রহণের পর লোকটি অভিযোগ করে বসল, আমি ভেবেছিলাম আপনি একজন বুযুর্গ লোক এবং ইসলামপ্রিয় মানুষ। আর ইসলামি অন্তরঙ্গতার দাবি হল, আপনি একথা বলতেন যে, খানায় শরীক হও। তখন তিনি আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা; তুমি কি মুসলমান? লোকটি বলল, আলহামদুলিল্লাহ আমিও আপনার মতই একজন মুসলমান।

তিনি বললেন, ইসলামি অন্তরঙ্গতার অর্থ এমন যে, আপনি আমার বাড়িকে নিজের বাড়ি মনে করে খাবারে বসে যাবেন। এমন অপেক্ষা করা যে, কেউ আমাকে দাওয়াত দিবে, বিনয় দেখাবে, খাতির দেখাবে তারপর বসব; এতে বুঝা গেল, তোমার অন্তরে লৌকিকতা বিদ্যমান। অন্তরঙ্গতা নেই, পূর্ণ মহব্বত নেই। বুযুর্গ তার কথার উত্তর এভাবে দিলেন। হ্যাঁ; পরিস্থিতি তো সবস্থানে এমন হয় না, কখনো এমন হয় যে, অপেক্ষায় থাকে যদি খাতির দেখায় তাহলে বসব। এটি লৌকিকতা। অন্তরঙ্গতা হল এসে খাবারে বসে যাবে। যদি এমন হয় বাপ, ভাই একসাথে বসে খাচ্ছে বা উস্তাদ বা শায়েখ খাচ্ছেন, যাদের সঙ্গে অত্যন্ত অন্তরঙ্গতার সম্পর্ক, সেখানে যদি সে কোন প্রকার লৌকিকতা ছাড়া বসে পড়ে যে, আমার কিছু খেতে হবে; তাহলে তারা খুশি হবেন, শুকরিয়া জানাবেন। মনে-মনে বলবেন, অত্যন্ত লৌকিকতাহীন মানুষ।

মোটকথা, শরীয়তের তাকাজা হল, কিছু-কিছু স্থানে দাওয়াতের অপেক্ষা করো না, যাতে সম্পর্ক প্রকাশ পায়। যেমন– নিজের ঘর, মায়ের ঘর, বাপের ঘর, ফুফুর ঘর এগুলোতে মানুষ খাবার চাইবে এবং লৌকিকতা ছাড়া খাবারে বসে যাবে। তাহলে সম্পর্ক দৃঢ় হবে। এতে প্রতীয়মান হল, সাধারণভাবে খাদ্যবস্তু চাওয়া নিষেধ নয়।

অবমাননাকর সাওয়াল নিষেধ

ভিখারী বেশে চাওয়া নিষেধ। অপমানিত হয়ে চাওয়া নিষেধ। আর যে সাওয়াল ভিখারী ও অপমান হিসেবে হয় না বরং প্রিয়ভাজন হওয়া ও মহব্বত বৃদ্ধির জন্য হয় তা ভিন্ন।

আমি আলোচনা করছিলাম, সবচেয়ে বেশি যিল্লতি মানুষের জন্য সাওয়াল করার সময় প্রকাশ পায়। আর সাওয়ালকারী যখন সাওয়াল করে, তখন বাস্তবে তার মুখের উজ্জ্বলতা চলে যায়, তার মুখের মধ্যে এক ধরনের উজ্জ্বলতা থাকে তা খতম হয়ে যায়। সে নিজেই নিজেকে অপদস্ত মনে করে যে, আমি অনেক খারাপ কাজ করেছি। অতএব সবচেয়ে বেশি যিল্লতি কারো নিকট চাওয়ার সময় প্রকাশ পায়। এ কারণে হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে, কিয়ামত দিবসে ঐ সকল মানুষ যারা স্রেফ লোভ ও লালসাবশত সাওয়াল করত, ভিক্ষা করত এবং নিচু মনের হত, তাদের হাশর এমন অবস্থায় হবে যে, তাদের চেহারার গোস্ত উল্টানো থাকবে। কিছু গোস্ত এদিকে ঝুলে থাকবে, কিছু ওদিকে ঝুলে থাকবে, ফলে হাড় দেখা যাবে। অত্যন্ত অপমানকর চেহারা হবে।

এ তাদের আমলের বদলা। কেননা, যখন তারা ভিক্ষা চাইত, তখন চেহারার উজ্জ্বলতা চলে যেত। এহেন বিশ্রী অবস্থাকে সেদিন জাহির করবেন যে, গোস্ত এদিক-সেদিক ঝুলানো থাকবে, হাড় দেখা যাবে। অর্থাৎ তারা এমন চেহারা নিয়ে হাশর ময়দানে আসবে যে, দুনিয়াবাসী ঘৃণা করবে। আর যে বেইজ্জতি তার ভিতরে ছিল না, সেদিন প্রকাশ করা হবে। আর ওই যিল্লতি এমনভাবে প্রকাশ পাবে যে, চেহারায় ইজ্জতের কোন চিহ্নই বাকি থাকবে না এবং চেহারার ঔজ্জ্বল্য বিলীন হয়ে যাবে।

সুতরাং কিয়ামের মধ্যে মানুষ আল্লাহর সামনে যে যিল্লতি প্রকাশ করে তা প্রাথমিক পর্যায়ের যিল্লতি। রুকুতে আরেকটু বেশি, সিজদাতে আরো বেশি, দোয়াতে সবচেয়ে বেশি।

চাইলে আল্লাহ খুশি হন

এ কারণে প্রার্থনার দ্বারা আল্লাহ তায়ালা যত খুশি হন, এত খুশি অন্য কোন জিনিস দ্বারা হন না। তিনি বলেন, বান্দা যদি চায়, তাহলে আমি খুশি হই আর না চাইলে আমি তার প্রতি নারাজ ও অসন্তুষ্ট হই।

কিন্তু দুনিয়াবাসীদের মধ্যে তার উল্টো মনোভাব। আপনি যদি কারো নিকট চাইতে থাকেন, তাহলে সে খুশি হয় না; বরং নারাজ হয়। মহব্বত থাকলে ঘাটতি হয়। অপরদিকে আল্লাহ তায়ালার নিকট না চাইলে তিনি অসন্তুষ্ট হন, চাইলে খুশি হন। উভয়ের মধ্যে পার্থক্যের ভিত্তি হল, দুনিয়ায় যার নিকট আপনি প্রার্থনা করবেন, চাই সে কোটিপতি হোক কিন্তু তারপরও তার ধনভাণ্ডার সীমাবদ্ধ, আপনাকে যতটুকু দিবে তা থেকে ততটুকু কমবে। আর আল্লাহ

তায়ালার ধনভাণ্ডার অফুরন্ত; যদি সারা পৃথিবীও দান করে দেন, তারপরও সামান্যও কমবে না। এ কারণে অসন্তুষ্ট হওয়ার কোন কারণ নেই।

তবে এটি পরীক্ষা যে, কে ইবাদত ইখতিয়ার করে আসে আর কে বান্দা ও গোলাম হয়ে আসে। প্রকৃত বান্দা হল সেই ব্যক্তি, যে পুরোপুরি বন্দেগী জাহির করে। আর বন্দেগী অর্থ হল যিল্লতী প্রকাশ করা। এ কারণে আল্লাহর নিকট চাইতে কমতি করা উচিত নয়। অধিক চাইতে হবে, দোয়া করতে হবে। কিন্তু নিজের পক্ষ হতে নির্ধারণ করা উচিত নয় যে, এই এই জিনিস দিন। উদ্দেশ্য শুধু চাওয়া। কিন্তু শর্ত ও বাধ্য-বাধকতা আরোপ করা যে, যার নিকট আপনি প্রার্থনা করছেন, তাকে বললেন, এই-এই করতে হবে, এগুলো আল্লাহর শানে বেয়াদবি, গোস্তাখী ও তাহজিব বিরোধী। অতএব দোয়া করতে কমতি করবে না। কিন্তু নিজের পক্ষ হতে নির্ধারণ করে দিবে না। যত বেশি চাইবে তত বেশি তিনি খুশি হবেন এবং তত বেশি তায়াল্লুক হবে।

দোয়ার শিক্ষা

মক্কা মুয়াযযামার একটি ঘটনা স্মরণ হল। যাদের হজ্ব করার তাওফিক হয়েছে তারা দেখেছেন, হিজায এবং মক্কায় অনেক গরিব মানুষ রয়েছে। তারা নাছোড়বান্দা হয়ে ভিক্ষা করে। হেরেম শরীফে ভিক্ষা করায় সরকারি নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও হাজার-হাজার ভিক্ষুক প্রবেশ করে। প্রত্যেক মানুষের সামনে এক-দুজন কুরাইশী চাইত। তারা এভাবে চাইত যে, যদি কেউ দিত, তাহলে অল্পক্ষণ পর আবার তার নিকট আসত। আবার আসত। আর না দিলে দাঁড়িয়ে থাকত, যতক্ষণ অস্বীকার না করত বা মুখ অন্যদিকে ফিরাত বা মুখে বলে দিত। মোটকথা, মানুষ বিরক্ত হয়ে যেত। কিছু লোক বিরক্ত হয়ে আমার নিকট এল এবং বলল, হযরত! এগুলো তো দেখছি আশ্চর্যজনক বেকুফ ধরনের ভিক্ষুক। তারা আমাদের কুরআন তেলাওয়াত বন্ধ করে দিচ্ছে। নফল নামায পড়া বন্ধ করে দিচ্ছে। যেখানেই তেলাওয়াত করতে বসি তারা হাজির হয়ে যায়। তারপর যদি আপনি দেন, তাহলে চলে যায়। অন্যথায় যতক্ষণ না আপনি যবানে 'আল্লাহ কারীম' আগে যাও বলবেন, ততক্ষণ নড়বে না। এখন আমাদের তেলাওয়াত হাজার-হাজার টুকরো হচ্ছে। কয়েকটি আয়াত তেলাওয়াত করার পরপর আল্লাহ কারীম বলতে হয়। এভাবে একের পর এক আসতে থাকে। এখন আমরা অক্ষম ও পেরেশান। আপনি তো বলেন, ভিক্ষুকদের ধমক দিবে না। এখন যদি আমরা না বলি বা ধমক না দেই, তাহলে তারা তো আমাদের

অপারগ করে দিচ্ছে। এখন আমরা কী করব? মোটকথা, তারা অনেক রাগান্বিত ও বিরক্ত ছিল। তারা কয়েকজন ছিল।

আমি তাদের বললাম, আপনারা গভীরভাবে চিন্তা করেন না। এই ভিক্ষুকগুলো আপনাদের উস্তাদ, তারা আপনাদের শিক্ষা দিতে এসেছে।

তারা বলতে লাগল কিসের শিক্ষা?

বললাম, তারা আপনাদের কিভাবে আল্লাহর নিকট চাইতে হবে, তা শিক্ষা দিতে এসেছে যে, তোমরা এভাবে আল্লাহ নিকট নাছোড় হয়ে চাও যে, আমরা না নিয়ে যাব না। তারা একথা শুনে নীরব হল এবং অনেক খুশি হয়ে ফিরে গেল। তারপর তারা ভিক্ষুখদের ভাল-মন্দ বলেনি। তাদের ধমক দেওয়ার সুযোগ হয়নি। তারা বুঝে ফেলল, বাস্তবে এভাবেই চাইতে হয়। প্রার্থনা করার ঢং এমনই হয়। পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, তারা এতটুকু ভুল করা শুরু করছে যে, এভাবে চাওয়ার প্রয়োজন ছিল আল্লাহর নিকট; তা না করে মাখলুকের নিকট চাচ্ছে। আল্লাহর নিকট হাঁটু গেড়ে বসে বলবে, আমি না নিয়ে যাব না, আমি দয়ালু আল্লাহর দরবারে এসেছি; বঞ্চিত হয়ে ফিরে যাব এমন হতে পারে না। এমন দৃঢ়তার সাথে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করলে কখনো বঞ্চিত হবে না।

দোয়া কবুল হওয়ার আলামত

দোয়া কবুল হওয়ার আলামতগুলোর মধ্যে একটি আলামত হল এই যে, হাদীস শরীফে এসেছে, যখন কোন সাদা দাড়িওয়ালা বৃদ্ধ মানুষ আল্লাহর দরবারে হাত প্রসারিত করে, তখন আল্লাহ বলেন, আমার লজ্জাবোধ হয় সাদা চুলওয়ালাকে খালি হাতে ফেরত দিতে। আমি এমনিই দয়ালু, কিন্তু যখন কোন সাদা চুলওয়ালা, সাদা দাড়িওয়ালা আমার নিকট প্রার্থনা করতে থাকে, তখন আমার দয়া ও অনুগ্রহ আরো বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। ফলে বৃদ্ধকে বঞ্চিত করতে পারি না। তার চেহারা মুখমণ্ডলে ভয়ের চিহ্ন আছে এবং গাম্ভীর্য আছে। আমি তাকে বেইজ্জত করে ফিরিয়ে দেব! আল্লাহ একথা বলে থামেন এবং বলেন, আমি তাকে খালি হাতে ফেরত দেই না তার উদ্দেশ্য পূরণ করা ছাড়া।

মকবুল বান্দাদের সঙ্গে সাদৃশ্যের প্রভাব

কতক বুযুর্গ কৌতুক করতেন। হযরত ইয়াহইয়া ইবনে আকসাম রহ. নামক একজন বড় বুযুর্গ ছিলেন। তিনি বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন।

সম্ভবত ইলমে নাহু বা ইলমে সারফ-এর ইমাম ছিলেন। এক কথায় তিনি বড়দের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি ইন্তিকালের পূর্বে তাঁর এক বন্ধুকে ডেকে আনেন এবং ওয়াসিয়াত করেন যে, যখন মৃত্যুর পর আমাকে কবরে রাখা হবে, তখন আমার দাড়িতে আটা বা চুনা গুলে এমনভাবে লাগাবে, যাতে দাড়ি সাদা হয়ে যায়। কেন এমন করবে এই ব্যাপারে কোন কথা নেই। তিনি তার হুকুম পালনার্থে কাফন পরিধান করানোর সময় আটা বা চুনা এমনভাবে লাগালেন, যার ফলে সব দাড়ি একেবারেই সাদা হয়ে গেল। তা ঢেকে দিয়ে নামায পড়ে কবরস্থ করলেন। বুযুর্গ আল্লাহর দরবারে গেলেন এবং আবেদন করলেন, আমাকে ক্ষমা করে দিন। আল্লাহর বললেন, এসো বৃদ্ধ। তুমি কি অমুক কাজ করনি? অমুক গোনাহ করনি? তিনি বললেন, জ্বি, সবকিছুই করেছি। তারপরও তুমি ক্ষমা পাওয়ার উপযুক্ত? তোমার উদ্দেশ্য কী পুরো হবে?

বুযুর্গ বললেন, হে আল্লাহ! আমার দাড়ি সাদা আপনি দেখে নিন। আপনিই তো বলেছেন, আমি সাদা দাড়িওয়ালাদেরকে ফেরত দেই না। আমি সাদা দাড়ি রাখিনি; তবে সাদা দাড়িওয়ালাদের সাথে সদৃশ্য রাখার জন্য চুন লাগিয়ে দাড়িকে সাদা করেছি। তাই রং তো সাদা হয়েছে। চাই আসল সাদা হোক বা অস্থায়ী সাদা হোক। আপনি তো একথা বলেননি যে, সাদা বলতে আসল সাদা হতে হবে এবং সাদা অর্থ সাদা চুল। আর আমি সাদা চুল নিয়ে উপস্থিত হয়েছি। আপনি ওয়াদা অনুযায়ী ক্ষমা করে দিন। আল্লাহ বলেন, হে বৃদ্ধ! যাও আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম।

কিছু বুযুর্গ আল্লাহর নিকট গিয়েও কৌতুক করেন। কিন্তু এমন কৌতুক, যা শরীয়তের উসুল হতে চয়ন করা। আল্লাহ তায়ালা এমন কৌতুক গ্রহণ করেন। সুতরাং তিনি ইয়াহইয়া ইবনে আকসাম রহ.কে ক্ষমা করে দেন। যে ব্যক্তি তাকে স্বপ্নে দেখেছেন, তাকে তিনি উক্ত ঘটনা শুনিয়েছেন। তিনি বলেন, আমি আমার সাদা দাড়ি আল্লাহর সামনে পেশ করেছি এবং বলেছি, আপনিই তো ওয়াদা করেছেন, আমি সাদা দাড়িওয়ালাদের বঞ্চিত করি না। আর আমি এক সাদা দাড়িওয়ালা আপনার নিকট ক্ষমা যাচ্ছি।

মোটকথা, এতে প্রমাণিত হল যে, সাদা দাড়ি গাম্ভীর্য, নেকী ও তাকওয়ার আলামত। তার সাথে যে সাদৃশ্য গ্রহণ করবে, সেও বঞ্চিত থাকবে না। অতএব এজন্য সাদৃশ্য গ্রহণ করেন যে, আমার সঙ্গে এমন ব্যবহার করা হবে, যেমন ব্যবহার দাড়িওয়ালাদের সাথে করা হয়।

ইসলামি ইউনিফর্ম

কিতাবে এসেছে, কিয়ামতের দিন দাড়িকে নূর বানিয়ে দেওয়া হবে। দাড়ি আলোর আকার ধারণ করবে। অর্থাৎ উক্ত আলো দ্বারা মানুষ রাস্তা অতিক্রম করবে। এজন্য দাড়ি রেখে দিন যে, তা দ্বারা রাস্তা পার হতে পারব। এমন যাতে না হয় যে, আমার বাতি নিভে যায়; তাহলে অন্ধকারে কিভাবে পা ফেলব। তাই সেদিকে লক্ষ করে দাড়ি রেখে দিন। মুসলমানের আকৃতি দাড়ি দ্বারাই সুন্দর মানায়। বাস্তবতা হল, দাড়ি না থাকলে ভাল দেখায় না। আপনি চিন্তা করে দেখুন। একথা তো সত্য যে, কিছু মানুষ এমন রয়েছে, যাদের মধ্যে অনুতাপ রয়েছে, সামাজিকতা এবং পরিবেশের কারণে রাগ হয়ে দাড়ি কাটে। কথা ঠিক আছে, তবে এমন অপারগতার প্রতি নজর করতে হবে, যার কোন জবাব দেওয়া হবে না। আর তা হল কিয়ামতের দিনের অপারগতা। দুনিয়ার অপারগতা দূর করা যায়; কিন্তু পরকালে ধরা খেয়ে গেলে সংশোধন করা যাবে না। ওখানে সাজাও আছে। তাই সাজা হতে বাঁচার নিয়তে দাড়ি রেখে দিন।

মুহাম্মাদ নামের সঙ্গে সাদৃশ্যের পরিণাম

আর অন্য কিছুর প্রতি নজর না করে স্রেফ এই নিয়ত করে দাড়ি রাখতে পার যে, আমার সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তিত্ব আমার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তাঁর পবিত্র সুরত ছিল এমন অর্থাৎ দাড়িওয়ালা। তাই কমপক্ষে তার সঙ্গে সদৃশ্য ইখতিয়ার করি। সদৃশ্যর মধ্যে অনেক বরকত রয়েছে। যদি নাম রাখা হয় তাও বরকত রয়েছে। হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে, কিয়ামত দিবসে যখন মানুষ হাশরের ময়দানে একত্রিত হবে, তখন আল্লাহ তায়ালা আপন পয়গম্বরকে ইয়া মুহাম্মদ! বলে ডাক দিবেন। তখন যত মানুষের নাম মুহাম্মদ রাখা হয়েছে, তারা প্রত্যেকে মনে করবে, আমাকে ডাকা হচ্ছে। তাই লাখ-লাখ মানুষ দাঁড়িয়ে যাবে। আল্লাহ পাক বলবেন, আমি তো আমার পয়গম্বরকে ডেকেছিলাম, যাকে আমি জান্নাতে পাঠাব। কিন্তু যেহেতু তোমরাও দাঁড়িয়ে গেছ, তাহলে তোমরাও তার সাথে যাও। এখন আমি তোমাদের বসাতে চাচ্ছি না। তাদের মুহাম্মদ নামের বরকতে মুক্তি মিলবে। অতএব যে সত্তার নামে নাম রাখলে এমন বরকত হয়, তাঁর সুরত গ্রহণ করলে কত বরকত প্রকাশ পাবে!

মোটকথা, ইত্তেবায়ে সুন্নাতের মধ্যে শুধু ভাল আর ভাল, কল্যাণ আর কল্যাণ। কোন প্রকার অকল্যাণ নেই। আর সুন্নাত পরিত্যাগের ভিতর শুধু খারাবি আর খারাবি। এগুলো আজ প্রকাশ না হোক পরকালে প্রকাশ হবে। অথবা কবরে

প্রকাশ হবে অথবা হাশরে হবে। আমি এতটুকুও বলি, যদি হুজুরদের লম্বা দাড়ি না রাখতে পার, তাহলে তাদের চেয়ে কম করে হলেও রাখ, তাও তো মুসলমান মনে হবে। তাহলে দাড়ি ইনশাআল্লাহ নূর হবে। অযথা হবে না। ইত্তেবায়ে সুন্নাতের জন্য এক পা অগ্রসর হলে এক পায়ের প্রতিদান মিলবে। দুপা হলে দু-পায়ের প্রতিদান পাওয়া যাবে। দৌড়ে চললে দৌড়ের প্রতিদান মিলবে। তাই আপনি যতটুকু এগুবেন, কল্যাণের দিকেই এগুবেন। আর কল্যাণ দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জগতে প্রকাশ পাবে ইনশাআল্লাহ। বরকত প্রকাশ পাবে।

সাদৃশ্যর সামাজিক উপকার

মিসরে একটি ঘটনা শুনেছিলাম। তা থেকে বাস্তবে উপদেশ পেয়েছি। ওখানকার মানুষ সাধারণত দাড়ি রাখে না। যারা রাখত, তাদের ইহুদী বলে গ্রেফতার করত। তাদের বিভিন্ন ধরনের অপবাদ দিত। কিন্তু যাদের দাড়ি আছে তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হল, তোমরা কি ফায়দা অনুভব করেছ? অর্থাৎ শরয়ী বিধান তো আছেই; এছাড়া সামাজিকভাবে কি বুঝে তোমরা দাড়ি রেখেছ? এখানে এমন উত্তর দেওয়া তো সঠিক যে, সুন্নাতের অনুসরণ করছি আর নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে সদৃশ্য অবশ্যই বরকতের বিষয়। কিন্তু তোমাদের উপর যে অভিশাপ পড়ে তার মুকাবেলার জন্য দাড়ি রাখা সামাজিকভাবে কি উপকারিতা বুঝেছ? তারা বলল, একটা বড় মাসলেহাত হল এই যে, মিসরে পর্দা বলতে কিছু নেই। যুবতী মহিলারা অবাধে ঘোরাফেরা করে; তারা পুরোপুরি স্বাধীন। কিন্তু দাড়িওয়ালা মানুষ তাদের নজরে পড়লে তারা মুখ ঘুরিয়ে অন্যদিকে চলে যায়। কখনো তাদের দিকে মনোনিবেশ করে না। তাই আমরা অনুভব করলাম, আমাদের তাকওয়ার রাস্তা পরিষ্কার। যদিও আমরা বাঁচতে না চাই; কিন্তু তারা আমাদের থেকে বেঁচে থাকে। ফলে আমরা খারাপ কাজে লিপ্ত হতে পারি না।

আমি বললাম, আলহাম্দুলিল্লাহ। দুনিয়াতে কম করে হলেও এই উপকারিতা তো প্রকাশ পেয়েছে যে, দাড়িওয়ালাদের প্রতি স্বাধীন এবং কমিনা প্রকৃতির মহিলারা তাকায় না। তাকালে নিজের স্থায়ীই তাকায়। তাদের দ্বারা হালাল কর্ম প্রকাশ পায়, হারাম পায় না। এ তো অনেক বড় ফায়দা। আর আপনি যদি হুজুরদের ন্যায় দাড়ি রাখেন, তাহলে কি আপনার কখনো দুঃসাহস হবে সিনেমা হলে বসার? তাহলে লোকেরা বলবে, বেকুফ হুজুরের লেবাস পড়ে এখানে এসেছ? তাহলে দুনিয়াবাসী দোষারোপ করবে।

অতএব দাড়ির কারণে মানুষ অনেক মসিবত ও খারাবি থেকে বাঁচতে পারে। সুতরাং এমন বস্তু ভালোবাসার উপযুক্ত, যা দ্বারা অনেক খারাবি থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। এদিকে সুন্নাতের ইত্তেবা, যা অনেক বড় বস্তু, অপরদিকে দুনিয়াতে অনেক উপকার ও বরকত।

সুন্নতের অনুসরণ মহব্বতের পূর্ণতার প্রকাশ

ইত্তেবায়ে সুন্নাত না করার মূল হেতু হল মহব্বতের কমতি। যদি রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি পূর্ণ মহব্বত থাকে, তাহলে কোনো প্রকারের ওজর-আপত্তি উত্থাপিত হতে পারে না। অসম্পূর্ণ মহব্বত ও ইশকের স্বল্পতার কারণে এমন হতে পারে যে, ভর্ৎসনাকারীরা এরূপ ভর্ৎসনা করবে, আমি তাদের কী বলব। অমুক দোষ ধরবে আমি কী বলব। যখন অন্তরে মহব্বত ও প্রেম প্রবল থাকে, তখন ভর্ৎসনাকারীদের পরোয়া করে না। কে কী বলবে তা দেখে না। বরং চোখ বুঝে অনুসরণ করে।

ইরান বিজয়ের পর হযরত হুযায়ফা ইবনে ইয়ামান রা. বাগদাদে গেলেন। তিনি একদিন খানা খাচ্ছিলেন। তখন একজন পারস্য গোলাম দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে খানা খাচ্ছিল। হযরত হুযায়ফা রা.-এর হাত থেকে এক টুকরা খাবার মাটিতে পড়ে গেল। তিনি ততক্ষণাৎ নুয়ে খাবারটুকু তুলে নিলেন। তিনি মাটি ইত্যাদি ফুঁ দিয়ে পরিষ্কার করে খেয়ে ফেলনেন। তখন গোলাম তাকে বলল, আপনি এ কী করলেন? এখানে বিশাল সমাজ, বড় সামাজিকতার দেশ, বড় সম্মানিত মানুষদের বসবাস, মাটিতে পড়া খাবার তুলে খাওয়াকে এখানে অসামাজিকতা ও অভদ্রতা জ্ঞান করা হয়। আপনাকে মানুষ অপবাদ দিবে যে, লোকটি তো অনেক লোভাতুর, মাটিতে পড়ে যাওয়া খাবার উঠিয়ে খেয়ে ফেলে।

এহেন কাজকে তারা বেইজ্জতি মনে করে। আপনার ইজ্জত-সম্মান বজায় রাখার খাতিরে এহেন কর্মকাণ্ড পরিহার করতে হবে। হযরত তার কথার কী উত্তর দিয়েছিলেন?

তিনি বললেন–

أَأَتْرُكُ سُنَّةَ حَبِيْبِيْ لِهٰؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ

এই আহমক ও বেকুফদের কারণে আমি কি আমার হাবীবের সুন্নাত ছেড়ে দেব?

তারা কী ভর্ৎসনা করবে তাদের ভর্ৎসনা আমার উপর কোন প্রভাব ফেলবে? সুন্নাতের উপকারিতা আমার নিকট সুস্পষ্ট। আর এই ভর্ৎসনার কোন ক্ষতি দুনিয়া ও আখেরাতে আমার নিকট পৌঁছতে পারবে না।

তাই যে জিনিসের কোন ক্ষতি পৌঁছতে পারবে না, সেই জিনিসের কারণে আমি এমন কর্ম গ্রহণ করব, যা আমার জন্য দুনিয়া ও আখেরাতে উভয় জগতে ক্ষতিকর? তাই তিনি দীপ্ত কণ্ঠে বলে দিলেন, ওই ভর্ৎসনাকারীদের ভর্ৎসনার কারণে সুন্নাতে হাবিবকে ছেড়ে দিতে পারি না।

হযরত হুযায়ফা রা.-এর আমলে রুটির আদব রক্ষা হয়েছে, সুন্নাতের ইত্তেবা হয়েছে, সুন্নাতের সম্মান হয়েছে এবং সুন্নতের বিপরীতে কোন ভর্ৎসনাকারীর ভর্ৎসনাকে পরোয়া করা হয়নি। সর্বোপরি এর দ্বারা তাঁর পূর্ণ মহব্বত এবং পরিপূর্ণ ঈমান প্রকাশ পায়।

আল্লাহর দানকৃত নেয়ামতের সম্মান

শরীয়তের দৃষ্টিতে রুটির ইজ্জত ও কদর করা ওয়াজিব। হাদীস শরীফে সুস্পষ্টভাবে বলা করেছেন–

أَكْرِمُوا الْخُبْزَ

রুটির সম্মান কর।

কারণ, রুটি আল্লাহ পাকের তাবাররুক। তা ইজ্জতের সঙ্গে বসে আহার কর। তাকে এমন ব্যবহারিক সামগ্রী মনে কর না যে, ব্যবহার করার পর যা বেঁচে যাবে, তা ফেলে দিবে। যেমনটি অনেক সময় রেলগাড়িতে দেখা যায়। আলহাম্দুলিল্লাহ! পাকিস্তানে এমন নেই। কিন্তু আমাদের এলাকায় রয়েছে। রুটি খাওয়ার পর যা অবশিষ্ট থাকে, তা দ্বারা মুখ পরিষ্কার করে টিস্যুর ন্যায় বাহিরে নিক্ষেপ করে। এটি অত্যন্ত জঘন্য কাজ। আমি অনেককে ভর্ৎসনা করেছি। তারা ছিল অমুসলিম, তাদের বললাম এটি কেমন নিয়ম? তারা বলল, এগুলোর আর প্রয়োজন নেই, এগুলোর কাজ শেষ। আমি তাদেরকে বললাম, এ জামা-পায়জামা ময়লাযুক্ত হয়ে গেছে, এগুলোকে শরীর থেকে খুলে বেইজ্জতির সঙ্গে ফেলে দাও। এগুলো ময়লাযুক্ত হয়ে পড়েছে, এগুলোর প্রয়োজন নেই। এখন তোমাদের খানার প্রয়োজন নেই; কিন্তু সন্ধ্যাবেলা তো প্রয়োজন হবে। তোমাদের না হোক গরিবদের তো কাজে আসবে। এগুলো তো আল্লাহর দেওয়া রিজিক। এগুলোকে তুচ্ছ ভেবে ফেলে দেওয়ার ফলাফল এমন হতে পারে যে, রুটি থেকে তোমাদের বঞ্চিত করা হবে। শরীয়ত রুটির আদব শিক্ষা দিয়েছে।

এগুলোর সঙ্গে বেয়াদবি বৈধ নয়। এগুলোর সম্মান দেওয়া ওয়াজিব। তেমনিভাবে কোন খাদ্যদানা জমিনে পতিত হলে তা তুলে নেওয়া উচিত। তাকে পায়ে পিষে ফেলা উচিত নয়। এগুলো আল্লাহর দান এবং তাঁর তাবাররুক।

রিজিকের সম্মান

আমাদের উস্তাদ মরহুম হযরত মাওলানা মিয়া আসগর হুসাইন সাহেব রহ. যিনি দারুল উলুম দেওবন্দের মুহাদ্দিস ছিলেন, তিনি উচ্চ পর্যায়ের বুযুর্গ এবং সাহেবে হাল বুযুর্গদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তাঁর একটি আশ্চর্যজনক নিয়ম ছিল। যখন কোন মেহমান আসত এবং তারা যখন আহার হতে ফারেগ হতেন, তখন কিছু রুটির বড়-বড় টুকরা বেঁচে যেত, কিছু ছোট-ছোট টুকরা বেঁচে যেত, কিছু আবার কণার ন্যায় বিন্দু-বিন্দু হয়ে যেত, যা দস্তরখানায় পড়ে থাকত। এগুলোর ব্যাপারে হযরতের আশ্চর্যজনক তরিকা ছিল যে, রুটির বড়-বড় টুকরোগুলো অনেক সতর্কতার সাথে একত্রিত করে ঘরে পাঠাতেন আর বলতেন, এগুলো মেহমানদের তাবাররুক। এগুলো ঘরওয়ালাদের খাওয়া উচিত। আর ছোট-ছোট টুকরোগুলো যা পাশে পড়ে থাকত, যেগুলোকে একত্রিত করে আরো ছোট-ছোট টুকরো বানিয়ে বলতেন, এগুলো ছাদে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রেখে দাও, এগুলো চড়ুই ও কাকের খাবার, তাদের হক, আমাদের রিজিকে আল্লাহ তায়ালা তাদেরও অংশ রেখেছেন। আর বিন্দুর ন্যায় টুকরোগুলোকে একত্রিত করে পিঁপড়ার বাসার সামনে রেখে দিতেন আর বলতেন, এগুলো পিঁপড়ার হক, তাদের খাবার, আমাদের রিজিকে আল্লাহ তায়ালা তাদেরও অংশ রেখেছেন।

সুতরাং হযরতের কাজে খাবারের আদব রক্ষা হয়েছে এবং খাবারের ঠিকানাও জানা গেল। রিজিক এমন বস্তু যে, আগেকার বুযুর্গগণ তার অনেক সম্মান করতেন এবং বলা হত– 'যারা রুটির সাথে বেয়াদবি করবে, রিজিকের সঙ্গে গোস্তাখী করবে, সে রিজিক হতে বঞ্চিত হবে।'

এ কারণে ইসলাম রুটির আদব শিখিয়েছে যে, রুটির যত্ন কর, তাকে ময়লা স্থানে ফেল না, তাকে মাটিতে ফেল না, তাকে মুখ মোছার রুমাল বানিয়ো না, বরং যা বেঁচে যাবে, সেগুলো আদব ও সম্মানের সাথে রেখে দাও। স্বয়ং তোমাদের কাজে আসবে, তোমাদের কাজে না এলে গরিবদের কাজে আসবে।

পৃথিবীতে লাখ-লাখ বনী আদম রয়েছে, যাদের রুটির প্রয়োজন, তাদের সামান্য খাবার জোটে না আর তোমরা হাজার-হাজার রুটির টুকরো ফেলে দিচ্ছ। এগুলো বেয়াদবি এবং দুনিয়াকে রিজিক থেকে বঞ্চিত করা। যারা দুনিয়াকে

রিজিক থেকে বঞ্চিত করবে, কখনো তাদের উপর এমন প্রভাব পড়তে পারে যে, আল্লাহ তাদের রিজিক হতে বঞ্চিত করে দিবেন। কারণ, রিজিকের পরিবর্তন হয়। মোটকথা, রিজিকের মর্যাদাকে ওয়াজিব করা হয়েছে, তার ইকরামকে ওয়াজিব করা হয়েছে। সামান্য-সামান্য জিনিসে আদব শিখানো হয়েছে।

পোশাকের সম্মান

তেমনি আদব রয়েছে কাপড় পরিধান করার মধ্যে। উদাহরণস্বরূপ মানুষ রাতে শয়নকালে কাপড়, আচকান, জামা প্রভৃতি খুলে লুঙ্গি পরিধান করে। বলা হয়েছে, কাপড় খুলে জমিনে ফেলে রেখ না, বিছানায় এলোমেলোভাবে রেখ না। অর্থাৎ বেয়াদবি ও বেইজ্জতিভাবে এলোমেলো ফেলে রেখ না।

প্রথমত এ কাজ আদবের বিপরীত আর দ্বিতীয়ত এগুলো আল্লাহর দান। অতএব আল্লাহর নেয়ামতের সম্মান করে ভাঁজ করে রেখে দাও বা কোন খুঁটির সঙ্গে ঝুলিয়ে রেখে দাও। জমিনে ফেলে রেখ না। এলোমেলো রাখলে তাতে জাগতিক ক্ষতি রয়েছে। হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে–

إِطْوُوْا ثِيَابَكُمْ تَرِدْ إِلَيْهَا أَرْوَاحُهَا

> কাপড় ভাঁজ করে সতর্কতার সঙ্গে রাখ। এলোমেলোভাবে ছেড়ে দিলে সম্ভাবনা রয়েছে, তাতে পিঁপড়া ঢুবে যাবে, পরে পরিধানের সময় কষ্ট পাবে অথবা কোন বিচ্ছু প্রবেশ করবে, ফলে কষ্ট পৌঁছবে।

অতএব কাপড় ফেলে রেখ না। এতে বেয়াদবিও হয় এবং জাগতিক ক্ষতিও আছে। বরং তা ভাঁজ করে বা খুঁটিতে রেখে দাও। শরীয়ত প্রতিটি জিনিসে আদব ও শিষ্টাচার শিখিয়েছে। খাবারের আদব বলে দিয়েছে, পোশাক পরিধান ও পরিত্যাগের আদব বলেছে, পরিধানের নিয়ম বলে দিয়েছে, পরিধানের ঢংয়েও বেয়াদবি করো না। কেননা, এগুলো আল্লাহ দান।

সম্মান প্রদর্শনের পদ্ধতি

কোন বাদশাহ যদি কাউকে কোন কিছু দান করেন আর সে যদি অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বাম হাতে তা নিতে চায়, তাহলে তাকে বাদশাহর দান হতে বঞ্চিত করা হবে। বলা হবে, সে বাদশাহর দানকে সম্মান দেখায়নি। তার উচিত ছিল, উভয় হাতে দান গ্রহণ করা অথবা ডান হাতে গ্রহণ করা এবং শাহী দান আদবের সাথে

গ্রহণ করা। তেমনিভাবে বলা হয়েছে, যখন আহার করতে বসবে তো ডান হাতে খাও। ডান হাতে পান কর। কেমন যেন আল্লাহ তায়ালা তোমাকে প্রতিটি লুকমা পৌছাচ্ছেন। প্রতিটি মিনিটে তোমাকে নেয়ামত দিচ্ছেন আর তোমরা নিচ্ছ। অতএব বাম হাতে গ্রহণ করা যাবে না। এমনটি নিছক বেয়াদবি।

মাথানত করে খাও, উঁচু করে অহংকারীর ন্যায় খেও না। চারজানু হয়ে খেও না। এমনটি অহংকারীদের বসার তরিকা। তবে কেউ যদি মাজুর ও অপারগ হয়, যেমন অনেক মোটা মানুষ পা উঠিয়ে বসতে পারে না, এক পা খাড়া করেও বসতে পারে না, সে শুধু চারজানু হয়েই বসতে পারে, তাহলে সে মাজুর; তার কথা ভিন্ন। কিন্তু আসল হুকুম হল চারজানু হয়ে খাওয়া মাকরূহ, শুয়ে আহার করা মাকরূহ। কেননা, তা বেয়াদবি ও গোস্তাখী এবং স্বাস্থ্যনীতিরও বিরোধী। অতএব শরীয়ত এগুলোতে আদব শিখিয়েছে, যাতে দুনিয়াতে উপকার হয়, আখেরাতে উপকার হয় এবং পাশাপাশি আল্লাহর রেজামন্দি লাভ হয়।

শরয়ী বিধানে ইহকাল ও পরকালের ফায়দা

শরীয়তের প্রতিটি বিধানে যেখানে পরকালীন উপকারিতা রয়েছে, সেখানে ইহকালীন উপকারিতাও রয়েছে।

হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে–

اَلسِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ وَمَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ

মিসওয়াক করার মধ্যে মুখের পবিত্রতা ও সুগন্ধি রয়েছে এবং পরকালে সাওয়াব এবং আল্লাহর রেজামন্দি রয়েছে।

অতএব মিসওয়াক করার ভিতর উভয় ফায়দা রয়েছে– আল্লাহর সন্তুষ্টি ও মুখের পবিত্রতা। মুখ পরিষ্কার থাকলে শারীরিক সুস্থতার উপর ভাল প্রভাব পড়ে। দাঁত পরিষ্কার থাকলে পাইওরিয়া হয় না, পাকস্থলি ভাল থাকে। আর পাকস্থলি ভাল থাকলে শরীর সুস্থ থাকে। মোটকথা, শারীরিক সুস্থতা অর্জন হবে, রূহানি সুস্থতা অর্জন হবে, আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন হবে। তো একই বস্তু ও একই বিধান; কিন্তু তাতে পরকালীন উপকার আছে এবং ইহকালীন উপকারও আছে।

হাদীসে একটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত উমর ফারুক রা. যখন আহত হলেন এবং মৃত্যুরোগে আক্রান্ত ছিলেন, তখন একজন নওজোয়ান কুশল জিজ্ঞাসার জন্য এল। সে কুশলবিনিময় ও কথাবার্তা বলে চলে গেল। কিছু দূর চলে যাওয়ার পর তিনি গোলামকে বললেন, ওই নওজোয়ানকে ডেকে আন। সে

এল। তার পরনে ছিল লুঙ্গি, যা টাকনুর নিচে মাটির সঙ্গে ঘষতে-ঘষতে যাচ্ছিল। হযরত ওমর রা. অত্যন্ত মহব্বতের সাথে বললেন, হে নওজোয়ান!

إِرْفَعْ إِزَارَكَ فَإِنَّهُ أَتْقَى لِثَوْبِكَ وَأَتْقَى لِرَبِّكَ

তোমার কাপড় উপরে উঠাও, তাতে তোমার জন্য দুটো উপকার। প্রথমত তোমার কাপড় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকবে। জমিনে হয়তো কোথাও নাপাকি আছে। তখন কাপড় অগ্রহণযোগ্য হয়ে যায়, কাপড়টি নামায ও ইবাদতের যোগ্য থাকে না। অতএব জাগতিক উপকার হলো কাপড় পবিত্র ও পরিষ্কার থাকবে। আর আল্লাহ তায়ালার বিধানের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে দেখা যাবে, তা তোমার মধ্যে তাকওয়া ও আল্লাহর ভয় পয়দা করবে। কেননা, কাপড় জমিনে ঘষতে-ঘষতে চললে অন্তরে অহংকার সৃষ্টি হয় আর টাখনুর উপর থাকলে বিনয়ের অবস্থা পয়দা হয়।

পোশাকের প্রভাব-প্রতিক্রিয়া

আপনি রাজা-বাদশাদের পোশাক দেখেছেন। তাঁদের পোশাকে তিন-তিন গজ কাপড় এদিক ওদিক ঝুলে থাকে। কাঁধে থাকে আলখেল্লা, যার দুই-দুই গজ এদিক-সেদিক এলোমেলো পড়ে থাকে। এটা অত্যন্ত অহংকার, গর্ব ও অহমিকার প্রমাণ। শরীয়ত এগুলোকে নাজায়েয ও নিষেধ করেছে। বলেছে, বান্দার শান ও কাজ নয় যে, সে আল্লাহর বন্দেগী ছেড়ে দিয়ে বন্দেগীবিরোধী কাজে লিপ্ত হবে। পোশাক জমিনে ছড়িয়ে পড়া অহংকারের আলামত। আর কাপড় টাখনুর উপরে পরা বিনয়ের আলামত। এতে সাজসজ্জা কম হয় আর তাতে সাজসজ্জা বেশি হয়। যত সৌন্দর্য ও সাসসজ্জা বৃদ্ধি পাবে, ততই অহংকার, গর্ব ও আত্মগর্ব সৃষ্টি হবে এবং গরিমা ও বড়ত্বের ভাব সৃষ্টি হবে। অহংকার ও গর্বের রাস্তা পরিষ্কার হবে।

আর যদি সাজসজ্জা কম হয় অর্থাৎ জামাল থাকবে কিন্তু যিনাত তথা সাজসজ্জা থাকবে না। জামাল অর্থ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা। মোটা কাপড় পরিধান করে মানুষ যদি তাতে অঙ্গসজ্জায় লিপ্ত হয়, তাতেই নফসে অহংকার পয়দা হবে। নারীরা যেহেতু সৌন্দর্যের আধার, সেজন্য তাদের মধ্যে অহংকার বেশি হয়। আর পুরুষরা যেহেতু সৌন্দর্যপ্রিয় হয় না, সেজন্য তারা নারীদের তুলনায় অহংকারী কম হয়। তারা বেশি বিনয়ী হয়। সুতরাং মহিলাদের মধ্যে রসিকতা ও প্রেমের ছলনা এবং গর্ব ও অহংকার বেশি থাকে। কারণ, তারা সৌন্দর্যের ঠিকানা। আর

পুরুষ হল বীরত্ব ও হিম্মতের ঠিকানা। যদি পুরুষরাও সাজসজ্জায় লিপ্ত হয়ে যায়, তাহলে নারী-পুরুষের মাঝে পার্থক্য থাকে না।

পুরুষরা যদি নারীদের ন্যায় অঙ্গসজ্জায় লেগে যায়, তাহলে তাদের নফসে অহংকার পয়দা হবে। মানুষ যতটুকু অঙ্গসজ্জা পরিহার করে জামাল তথা পাক-পবিত্রতা, পরিচ্ছন্নতা গ্রহণ করবে, ততই বিনয় ও নম্রতা সৃষ্টি হবে। যিনাত অঙ্গসজ্জাকে বলে আর জামাল পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার ঢং ও তরিকাকে বলে। সুতরাং শরীয়ত জামালের হুকুম দিয়েছে অর্থাৎ মোটা কাপড় পরলেও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র হবে এবং সুন্দর হবে। আর যিনাত অর্থাৎ অঙ্গসজ্জা করা এগুলো নারীদের জন্য খাস করা হয়েছে। এ কারণে মহিলাগণ অধিক অহংকারিণী হয়। তাদের চিকিৎসা অন্য পদ্ধতিতে করেছেন। মহিলাদের অঙ্গসজ্জা করতে নিষেধ করা হয়নি; বরং হুকুম করা হয়েছে। কেননা, যিনাতের সঙ্গে মহব্বত ও ভালবাসার সম্পর্ক। উদ্দেশ্য হল, মহিলাগণ স্বামীর মাহবুব ও প্রিয়ভাজন হবে। তার সঙ্গে ভালোবাসার সম্পর্ক রাখবে। যদি স্বামীর সাথে খারাপ সম্পর্ক সৃষ্টি হয়, তাহলে ঘরোয়া ও সামাজিক পরিবেশ ধ্বংস হয়ে যাবে। এজন্যই নারীকে পুরুষের প্রেমিকা বানানো এবং পুরুষকে নারীর প্রেমিক বানানো উদ্দেশ্য। এই কারণেই মহিলাদের অঙ্গসজ্জা গ্রহণের হুকুম করা হয়েছে। এ জন্য ফুকাহায়ে কেরাম বলেছেন, শুধু সাদা কাপড় পরিধান নারীদের জন্য মাকরূহ তথা অপছন্দনীয়। কোন রঙিন কাপড় হওয়া চাই, যাতে সৌন্দর্যের শান তার মধ্যে ফুটে ওঠে।

শেষ কথা

প্রথমে বলেছিলাম, কোন সাজানো-গুছানো কথা হবে না বরং অগোছালো ও বিক্ষিপ্ত কথা হবে। কিন্তু বলতে-বলতে বিভিন্ন মাসায়েল এসে গেছে। এখন সময়ই শেষ হয়ে আসছে। জুমুয়ার নামাযের সময় হয়ে গেছে। জুমুয়া সম্পর্কে কথা চলছিল যে, জুমুয়া হল একত্রিত করার দিন। জুমুয়ার কথা ছেড়ে এদিকে কিভাবে চলে এলাম বলতে পারছি না। ব্যস আল্লাহর হুকুম ছিল তাই এদিকে চলে এলাম। জুমুয়া সম্পর্কে যা বলতে চেয়েছিলাম, তা রয়ে গেল। পুনরায় কখনো এলে জুমুয়া সম্পর্ক ইনশাআল্লাহ আলোচনা করব।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

বয়ান : ৮

ইলহামি ইদারা ও তার ছাত্রদের সংগঠন

ইলমে দীন বাকি থাকলে দীন বাকি থাকবে। যদি ইলমে দীন বাকি না থাকে, তাহলে মুসলিম জাতির শান-শওকত ও ক্ষমতা বাকি থাকলেও তা গ্রহণযোগ্য নয়। সময়ের সকল আল্লাহওয়ালার অন্তরসমূহে ইলহাম হল যে, এমন একটি ইদারা বা প্রতিষ্ঠান হওয়া জরুরি। কোন এক মজলিসে হযরত কাসেম নানুতুবী রহ., হযরত গাঙ্গুহী রহ.সহ আরো কয়েকজন সমবেত হলেন। সবাই দীনের সাহায্য-সহযোগিতা নিয়ে চিন্তা-ফিকির করছিলেন। তখন কেউ বললেন, আমার অন্তরে ইলহাম হয়েছে মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করার, কেউ বললেন, আমার কাশ্‌ফ হয়েছে মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করা উচিৎ। মোটকথা, সকল অলি একমত হলেন ইদারা কায়েম হোক।

অতএব ইদারা প্রতিষ্ঠায় কোন প্রথাগত সিদ্ধান্ত ছিল না বরং গায়েবী ও বাতেনী সিদ্ধান্ত ছিল, ইলহামী ও কাশ্‌ফের সিদ্ধান্ত ছিল। সুতরাং ইলহামে খোদাওয়ান্দের মাধ্যমে উক্ত ইদারা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ ধারণ করেছে।

– হযরত হাকীমুল ইসলাম রহ.



ইলহামি ইদারা ও তার ছাত্রদের সংগঠন

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ، وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ، وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُهٗ، اَرْسَلَهُ اللّٰهُ اِلٰى كَآفَّةٍ لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّ نَذِيْرًا وَدَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَ سِرَاجًا مُّنِيْرًا•

اَمَّا بَعْدُ:

দারুল উলুম দেওবন্দ প্রতিষ্ঠা : কারণ ও প্রেক্ষাপট

বুযুর্গানে মুহতারাম!

দারুল উলুম দেওবন্দ, যার নাম গতকাল থেকে বারবার শুনে আসছেন। আর এই সকল আকাবির, যাদের এই মুহূর্তে দারুল উলুম হাক্কানিয়া পেশোয়ারের বার্ষিক মাহফিলে দাওয়াত দিয়ে একত্রিত করেছেন, তাঁরাই দারুল উলুম দেওবন্দের অংশবিশেষ এবং তার সদস্য ও রূহানি সন্তান। এদেরই ইজতেমা ও সম্মিলিত নাম দারুল উলুম দেওবন্দ। চাই তাঁরা দেওবন্দে বসবাস করুন বা তার বাইরে থাকুন।

দারুল উলুম দেওবন্দ সাধারণ সামাজিক ও প্রথাগতভাবে প্রতিষ্ঠা হয়নি যে, শহরের কিছু দায়িত্বশীল, যিম্মাদার সাথী একত্রিত হল আর তারা পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নিয়ে মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করে ফেলল। এমন প্রক্রিয়ায় হয়নি। বরং তার পটভূমি ও প্রক্রিয়া ছিল এমন যে, ইংরেজ বেনিয়ারা ভারত উপমহাদেশের

রাষ্ট্রক্ষমতায় আসে। দীনের অনিশ্চিত দুরবস্থা সবার সামনে সুস্পষ্ট, সবার ভিতর সন্দেহ ইসলাম বাকি থাকবে কিনা। এহেন সোচনীয় মুহূর্তে যত আকাবির এবং আউলিয়া কেরাম ছিলেন তাদের সবার অন্তরে আল্লাহর পক্ষ হতে ইলহাম হল, দীনের কোন ইদারা প্রতিষ্ঠা করা আবশ্যক, যার মাধ্যমে দীন ও দ্বীনি ইলম যিন্দা থাকবে। দীনের হেফাজত হবে। দীন বাকি থাকলে ইসলাম ও মুসলমানদের সকল বস্তু বাকি থাকবে। আল্লাহ না করুন যদি দীন ও দ্বীনি ইলম বাকি না থাকে, তাহলে মুসলমান আর মুসলমান থাকতে পারবে না।

ইলমে দীন বাকি থাকলে দীন বাকি থাকবে। যদি ইলমে দীন বাকি না থাকে, তাহলে মুসলিম জাতির শান-শওকত ও ক্ষমতা বাকি থাকলেও তা গ্রহণযোগ্য নয়। সময়ের সকল আল্লাহওয়ালার অন্তরসমূহে ইলহাম হল যে, এমন একটি ইদারা বা প্রতিষ্ঠান হওয়া জরুরি। কোন এক মজলিসে হযরত কাসেম নানুতুবী রহ., হযরত গাঙ্গুহী রহ.সহ আরো কয়েকজন সমবেত হলেন। সবাই দীনের সাহায্য-সহযোগিতা নিয়ে চিন্তা-ফিকির করছিলেন। তখন কেউ বললেন, আমার অন্তরে ইলহাম হয়েছে মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করার, কেউ বললেন, আমার কাশ্‌ফ হয়েছে মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করা উচিৎ। মোটকথা, সকল অলি একমত হলেন ইদারা কায়েম হোক।

অতএব ইদারা প্রতিষ্ঠায় কোন প্রথাগত সিদ্ধান্ত ছিল না বরং গায়েবী ও বাতেনী সিদ্ধান্ত ছিল, ইলহামী ও কাশ্‌ফের সিদ্ধান্ত ছিল। সুতরাং ইলহামে খোদাওয়ান্দের মাধ্যমে উক্ত ইদারা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ ধারণ করেছে।

হযরত মাওলানা ইয়াছিন সাহেব দেওয়ানজী রহ. যিনি কাসেমুল উলুম রহ.-এর বিশেষ খাদেম এবং নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি ছিলেন, তিনি যখন হজ্বে গেলেন এবং হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ সাহেব রহ.-এর খেদমতে হাজির হলেন। তিনি সকল মাশায়েখদের শায়েখ এবং ত্বরীকতের মুর্শিদ ছিলেন। দেওয়ানজী রহ. বিদায়কালে আরয করলেন, হযরত! আমাদের মাদরাসার জন্যও দোয়া করুন। হযরত হাজী সাহেব রহ. একথা শুনে অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে উত্তর দিলেন, হ্যাঁ খুব ভাল, বছরের পর বছর কপাল ঘর্ষণ করেছি আমি, রাতভর সিজদা করেছি আমি। তাই দোয়া চাইলে আমি চাইব। এখন যখন মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হল, তো তোমাদের হয়ে গেছে। তারপর তিনি বলেন, আমার ধারণা ও অভিমত ছিল মাদরাসাটি থানাভবনে বা নানুতায় প্রতিষ্ঠা করা। আমার জানা ছিল না, এই গনিমত দেওবন্দওয়ালা পেয়ে যাবে।

সুতরাং মাদরাসা প্রতিষ্ঠা গোলযোগপূর্ণ অবস্থা ও মশাওয়ারার মাধ্যমে হয়নি; বরং আকাবিরদের গর্দান ঝুঁকানো ছিল। তাঁরা সিজদায় পড়ে ছিলেন। রাতে

উঠে দোয়া করে চোখের পানি ফেলতেন। আল্লাহ তায়ালা তাদের এ সকল কর্ম কবুল করলেন। এতে প্রতীয়মান হল, গায়েবী ইলহাম দ্বারাই মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

প্রথম ইট

উক্ত ইদারার ইমারতের প্রথম ইট রাখেন হযরত মাওলানা আসগর হুসাইন সাহেব এর নানা মিয়াজী মুন্নী শাহ সাহেব রহ.। তাঁর নাম ছিল মুহাম্মদ হুসাইন রহ.। মিয়াজী সাহেব রহ. সম্পর্কে হযরত নানুতুবী রহ. বলেছেন, আমি আজ সর্বপ্রথম ইট এমন একজন ব্যক্তিত্ব দ্বারা রাখাব, যিনি জীবনে কোন দিন সগিরা গুনাহেরও কল্পনা করেননি। এমন একজন ব্যক্তি ভিত্তি স্থাপন করবেন। আল্লাহরপ্রেমে বিলীন হওয়ার হালত এমন ছিল যে, নিজের সন্তানদের পর্যন্ত চিনতেন না। তার একজন জামাতা ছিল 'আল্লাহর বান্দা' নামে, তিনি যখন তাঁর খেদমতে আসতেন, তখন জিজ্ঞেস করতেন তুমি কে? জামাতা উত্তর দিতেন 'আল্লাহর বান্দা'। তিনি আবার জিজ্ঞেস করতেন, কোন আল্লাহর বান্দা? উত্তর দিতেন, আপনার জামাতা। দশ মিনিট পর আবার ডুবে যেতেন। প্রস্থানকালে যখন শ্বশুরের নিকট আসতেন, তখন তিনি আবার একই প্রশ্ন করতেন। তাঁর এমন অবস্থা সর্বদা জারী থাকত। তিনি অত্যন্ত পবিত্র প্রকৃতির বুযুর্গ ছিলেন। তাঁর ইন্তেকালের পর যখন গোসল দেওয়ার জন্য কাঠে শোওয়ানো হল, তখন চোখে দেখা একটি ঘটনা মাওলানা ইয়াসীন সাহেব রহ. শুনালেন। তিনি আমার ফার্সীর উস্তাদ ছিলেন এবং আপনাদের পাকিস্তানের মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী সাহেব রহ.-এর সম্মানিত পিতা ছিলেন। তিনি নিজে শুনিয়েছেন, কাঠে রাখার সাথে-সাথে মিয়াজী রহ. খিলখিল করে হাসতে লাগলেন। তখন লোকমুখে সাড়া পড়ে গেল। লোকেরা দৌড়ে এল। যখন মানুষ অনেক একত্রিত হল, তখন হাসি বন্ধ হয়ে গেল। তিনি এমন প্রকৃতির মানুষ ছিলেন, যিনি দারুল উলুমের ভিত্তি রাখেন, প্রথম ইট রাখেন।

তারপর হযরত গাঙ্গুহী রহ., তারপর হযরত নানুতুবী রহ., কাজী মুহাম্মদ ইসমাঈল সাহেব মঙ্গলুরী রহ. ও অন্যান্য আকাবিরগণ তাঁর পরে ইট রাখেন। একথা দিবালোকের ন্যায় উজ্জ্বল যে, যে প্রতিষ্ঠানের ইট স্থাপনকারীগণ এমন আল্লাহওয়ালা এবং আধ্যাত্মিকতায় ডুবন্ত এমন মহাপুরুষ রয়েছেন, সেই প্রতিষ্ঠানের বুনিয়াদ কত মজবুত হবে। আজ উক্ত ইদারা প্রায় একশত বছর অতিক্রম করেছে। হাজারো ঝড়-ঝাপ্টা ও বিপদ এসে শেষ হয়েছে। আর

মাদরাসা দিন-দিন উন্নতির দিকে ধাবিত হচ্ছে এবং এখন পর্যন্ত পুরো সতেজতার সাথে দাঁড়িয়ে আছে। এটি নিতান্তই প্রথাগত কথা যে, অমুক ব্যক্তি সেখানকার মুহতামিম ও দায়িত্বশীল, অমুক সেখানকার উস্তাদ তাই উন্নত হচ্ছে। এমনটি একেবারেই ভুল ধারণা এবং স্রেফ একটি অপবাদ। উন্নতি প্রদানকারী হলেন অদৃশ্য শক্তি। সবকিছুই আল্লাহ তায়ালা করেন।

রূহানী মারকাজ

হযরত মাওলানা হাবীবুর রহমান সাহেব উসমানী রহ. থেকে শুনেছি, তিনি বলেন, দারুল উলুম মানুষ তৈরি করে, মানুষ দারুল উলুম তৈরি করেনি। দেওবন্দ একটি কষ্টিপাথর, মানদণ্ড। এখানে দেওবন্দের হাজার-হাজার ফুযালা রয়েছে। তারা মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেছেন। আমি বার্মা গিয়েছি, যেখানে দারুল উলুমের ফয়েজপ্রাপ্ত লোকদের পেয়েছি। আফগানিস্তানে হাজার-হাজার আলেম রয়েছে এবং প্রদেশকে প্রদেশ বহু মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ওখানকার অনেক আলেম অত্যন্ত উৎসাহ ও পরিশ্রমের সাথে দ্বীনি কাজগুলো আঞ্জাম দিচ্ছেন। তাদের সকলের মনোযোগ দারুর উলুমের দিকে। ওখানকার পরিবেশের প্রভাবে, ওখানকার সবার সম্পর্ক ও যোগাযোগ মারকাজের সাথে তথা দেওবন্দের সাথে। ওখানকার ফুযালারা বলেন, আমরা যখন দারুল উলুম থেকে বিদায় হই, তখন আমাদের মনে হয়, আমরা যেন মায়ের কোল থেকে পৃথক হচ্ছি। কেমন যেন একটা আকর্ষণ সৃষ্টি হয় এবং আধ্যাত্মিক সম্পর্ক সৃষ্টি হয় আর দারুল উলুম হল আধ্যাত্মিক মারকাজ।

দারুল উলুম মুজাদ্দিদের ভূমিকায়

হযরত মাওলানা হাবীবুল্লাহ সাহেব রহ. বলেছেন, হাদীস শরীফে এসেছে–

إِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا

আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক শতাব্দিতে এই উম্মতের জন্য কোন না কোন মুজাদ্দিদ বা সংস্কারক প্রেরণ করবেন, যিনি দীনকে পরিচ্ছন্ন ও সংস্কার করবে।

আকাঈদ, আমল ও পূর্ণাঙ্গ দীনের মধ্যে মানুষদের স্বরচিত খারাবি ও অবৈধ সংযোজনকে সংস্কার করবেন। তাঁরা প্রতি শতাব্দিতে এসে দুধকে পানি থেকে, পানিকে দুধ থেকে পৃথক করবেন। অর্থাৎ দীনকে ভেজালমুক্ত করবেন।

তিনি বলেছেন, প্রত্যেক শতাব্দিতে একজন মুজাদ্দিদ হবেন তা শর্ত নয়; বরং এক জামাতও হতে পারে। তিনি আরো বলেন, দেওবন্দের প্রতিষ্ঠাতাগণ– হযরত নানুতুবী রহ. হযরত গাঙ্গুহী রহ., হযরত হাজী সাহেব রহ.– তারা প্রত্যেকেই মুজাদ্দিদতুল্য ছিলেন। আর তাদের পূর্ণাঙ্গ বহিঃপ্রকাশ হল দারুল উলুম দেওবন্দ। কেমন যেন দারুল উলুম দেওবন্দই মুজাদ্দিদের ন্যায়। এ প্রতিষ্ঠান সুন্নাত ও বিদআতকে পৃথক-পৃথক করেছে, দীন ও ইসলামকে জগাখিচুড়ি, ময়লা-আবর্জনা থেকে পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন করেছে। যেগুলো লোকেরা করেছিল, সেগুলোকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে পাক ও পবিত্র করে রেখেছে। এই হল দারুল উলুমের অবস্থান।

একতার মারকাজ

মাদ্দি তথা প্রাকৃতিক বস্তুসমূহে পরিবর্তন ও বিক্ষিপ্ততা হয়ে থাকে। কিন্তু রূহানিয়াত তথা আধ্যাত্মিকতায় কুদরতিভাবে একথা থাকে। আর দারুল উলুমের ভিত্তি রূহানিয়াতের উপর। বস্তুর বৈশিষ্ট্য হল পরিবর্তন হওয়া। কিন্তু রূহানিয়াতের বৈশিষ্ট্য পরিবর্তন নয়। একই শায়েখের মুরিদ এবং একই উস্তাদের ছাত্র কুদরতিভাবে ঐক্যবদ্ধ থাকে। পরস্পর সম্পর্কযুক্ত থাকে। তেমনিভাবে দারুল উলুমের ফুযালাদের অন্তর একই মারকাজের সঙ্গে জড়িত এবং হাকিকীভাবে জড়িত ও সম্পর্কিত।

দেওবন্দ একটি ইত্তেহাদী একতার মারকাজ। তাই কুদরতিভাবে এদের মধ্যে পরস্পর ইত্তেহাদ কায়েম থাকে, অটুট থাকে। হযরত হাবীবুর রহমান সাহেব রহ.-এর নিকট থেকে শুনেছি, হযরত নানুতুবী রহ. যত দিন জীবিত ছিলেন, ততদিন তিনি দেওবন্দের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তো দারুল উলুমের অবস্থা ছিল এমন আর আমাদের অবস্থা ছিল এমন যে, কারো মধ্যে মতানৈক্যের কল্পনাও ছিল না। আমাদের অন্তরে ইখতেলাফের ধ্যান-খেয়াল উদয় হত না। আর যখন হযরতের ইন্তিকাল হল এবং হযরত গাঙ্গুহি রহ. পৃষ্ঠপোষক হলেন, তখন যদিও কোন ইখতেলাফ মাথাচাড়া দিয়ে উঁকি মারত; কিন্তু গাঙ্গুহি রহ.-এর রূহানিয়াতের কারণে নিঃশেষ হয়ে যেত। তার আধ্যাত্মিক শক্তি সেগুলোকে থামিয়ে দিত এবং শক্তি ঐক্যবদ্ধ থাকত।

সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা

খলিফাদের যুগে প্রত্যেকের মারকাজ তথা খানকা পৃথক হয়ে যায়। কিন্তু সকল শক্তি ঐক্যবদ্ধ ছিল। মুরিদ ও শাগরেদগণ একতাবদ্ধ ছিল। তখন সর্বত্র প্রশ্ন উঠল, মারকাজ ভিন্ন-ভিন্ন হওয়ার কারণে নীতিগতভাবে একটি তানজিম বা সংগঠন হওয়া প্রয়োজন, যাতে নীতিগতভাবে সবার মধ্যে একতা সৃষ্টি হয়। তখন একটি নীতিমালা এবং সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি হয়, যেন একই মারকাজে সবাই ঐক্যবদ্ধ থাকে। অন্যথায় মাশায়েখদের মারকাজ পৃথক-পৃথক হওয়ার কারণে পরস্পর ইখতেলাফ, ভিন্নতা ও প্রকাশ্য দ্বিধা-দ্বন্দ্ব প্রকাশ পেয়ে যায়, যদিও তা বাস্তবে নিন্দনীয় নয়। তখন বুযুর্গদের অন্তরে ইলহাম হল, তানজিমটির নাম হবে 'তানজিমে আবনায়ে দারুল উলুম দেওবন্দ' তথা দেওবন্দের সন্তানদের সংস্থা বা জামাত।

এই তানজিমে আবনায়ে কাদীম আজকের নয়। তবে তানজিম শক্তিশালী হয়েছে মাত্র কয়েক বছর পূর্বে। অন্যথায় হযরত মাওলানা হাবীবুর রহমান সাহেব রহ. আমার পিতাজী হযরত মাওলানা হাফেজ মুহাম্মদ আহমাদ সাহেবের যুগে যখন দারুল উলুম তাঁর হাতে পরিচালিত হচ্ছিল, তিনি তানজিমের প্রয়োজন অনুভব করেন। ওই তানজিমকে শক্তিশালীকরণ এখন আরো প্রয়োজন অনুভব হল। এই তানজিম কোন রাজনৈতিক তানজিম নয়, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের সঙ্গে সম্পর্কিত নয়।

তানজিমের উদ্দেশ্য

বরং তানজিমের লক্ষ্য হল, যে সকল ফুযালা যোগ্যতার সঙ্গে দীনি ইলমের মহান কাজ আঞ্জাম দিচ্ছেন, তাদেরকে সুশৃঙ্খল করা, যাতে অধিক ক্রিয়াশীল ও লাভবান হতে পারে। আজ হাজার-হাজার সংখ্যায় দারুল উলুমের ফুযালা রয়েছে, যারা দেওবন্দের ফয়েজ ও বরকতপ্রাপ্ত। যারা দীনের সেবা করছেন। বিভিন্ন দেশে তারা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছেন।

কোন প্রদেশ এমন নেই, যেখানে মাদরাসা গড়ে ওঠেনি। দারুল উলুম দেওবন্দ এই শত বছরে যে সকল খেদমত আঞ্জাম দিয়েছে, তার কোন নজির নেই, তুলনা নেই। রচনাবলি দেখা যাক, হাজার-হাজার রচনা-গ্রন্থ এই জামাতের মধ্যে রয়েছে, যা বিভিন্ন বিষয়ের উপর লিখিত। একজন ব্যক্তিত্ব হযরত থানুভী রহ.-এর প্রতি লক্ষ করলে দেখা যাবে যে, তিনি এক হাজারের ঊর্ধ্বে গ্রন্থ রেখে গেছেন। প্রতিটি ভাষায়, প্রতিটি ইলম ও বিষয়ে তার রচিত গ্রন্থ রয়েছে। গদ্য-

গল্প এবং পদ্য-কবিতা সংক্রান্ত কিতাবও রয়েছে। এছাড়া প্রায় হাজারসংখ্যক ওয়াজ লিখিত আকারে রেখে গেছেন। কিছু প্রকাশিত হয়েছে কিছু এখনো প্রকাশ পায়নি। অর্থাৎ তারা একেকজন ব্যক্তি একেকটি জাতির সমতুল্য কাজ আঞ্জাম দিয়েছেন। হযরত শায়খুল হিন্দ রহ.-এর হাজার-হাজার মুরিদ ও মুতাওয়াসসিল রয়েছে। তেমনিভাবে শায়খুল ইসলাম মাওলানা হুসাইন আহমাদ মাদানী রহ.-এর হাজার-হাজার শাগরেদ, মুরিদ ও মুতাওয়াসসিল দেশের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে আছে। অপরদিকে হযরত থানুভী রহ.-এর হাজার-হাজার ও লাখ-লাখ মুরিদ তো ছড়িয়ে আছেই। সবাই নিজস্ব রঙে দীনের সেবা করে যাচ্ছেন। হাদীস, তাফসীর, ফিকহ, ফতোয়া, আমলি জিহাদ তথা প্রত্যেক ময়দানে দেওবন্দি জামাতের লোকদের দেখা যায়।

মোটকথা, তারা লাখ-লাখ মানবের ঈমানকে সামলে রেখেছেন। তারা খেদমত ও সেবার ময়দানে সবচেয়ে অগ্রগামিতা লাভ করেছেন। প্রত্যেক গ্রামে কোন না কোন দেওবন্দের ফয়েযপ্রাপ্ত আলেম রয়েছে। তাদের তেমন প্রসিদ্ধি নেই। তাদের নাম পত্রিকা ও বই পুস্তকে নেই। কিন্তু হাজার-হাজার মানুষের ঈমান হেফাজত করছেন এবং নিজেকে হেফাজত রেখেছেন।

এখন আপনাদের 'আখুড়া খটকে' হযরত মাওলানা আবদুল হক সাহেব রহ. একক ব্যক্তিত্ব, যিনি দারুল উলুম হাক্কানিয়া প্রতিষ্ঠা করেছেন। এখানে হাজার-হাজার উলামা ও মাশায়েখ দেখা যাচ্ছে। এরা বরং দারুল উলুম দেওবন্দের খেদমতের ফসল। একজন ব্যক্তিত্বের সাথে হাজারো মানুষের দীন সম্পৃক্ত। কিন্তু কেউ যদি প্রশ্ন করে, দারুল উলুম দেওবন্দ কী-কী খেদমত আঞ্জাম দিয়েছে? তার ফারেগীনরা কী-কী কাজ করে যাচ্ছে? তাহলে যেহেতু সবাই বিক্ষিপ্ত ও শৃঙ্খলিত নয় তাই সঠিক সেবাগুলো আপনি বলতে পারবেন না। যদি তারা বেশুমার খেদমত করে যাচ্ছেন যার সংখ্যা আপনি সংক্ষিপ্তভাবে বিশ হাজার বলতে পারেন। কিন্তু একথা জানতে পরবেন না যে, এই বিশ হাজার উলামা-ফুযালা কাজ করে দেখিয়েছেন। ইতিহাসবিদরাও সংক্ষিপ্ত বলে দিবে। কিন্তু বিস্তারিত কিছুই জানতে পারবেন না। আর জগদ্বাসী সংক্ষিপ্তও জানতে পারবে না।

খেদমতের তানজিম

সুতরাং উক্ত উদ্দেশ্যে শুবায়ে তানজিমে আবনায়ে কাদীম দারুল উলুম নামের সংগঠনের ভিত্তি স্থাপন করা হয়, যাতে দেওবন্দের রূহানি সন্তানদের আমল বা

কার্যাবলি সম্পৃক্ত হতে পারে। উদ্দেশ্য হল, সেবাগুলোকে শৃঙ্খলিত করা– ব্যক্তিকে নয়। তার জন্য একটি ফরম তৈরি করা হয়েছে, যার শিরোনামগুলো আমি নিজেই লিখেছি। প্রত্যেকে ফরমটি পূরণ করে পাঠিয়ে দিবে। ফরমের মধ্যে লেখা হয়েছে, কোন্ সনে ফারেগ হয়েছে, কোথায় খেদমতে নিয়োজিত, লেখালেখি ও রচনার কাজ করে কিনা, কী-কী করেছে, জন্মভূমি কোথায়, কোথাও বাইয়াত হয়েছে কিনা ইত্যাদি প্রশ্ন লেখা হয়েছে। আলহাম্দুলিল্লাহ্ বলেন। এখন পর্যন্ত সাড়ে তিন হাজার ফরম পূরণ হয়ে চলে এসেছে। তাদের খেদমতের কারগুজারি যদি পুস্তকাকারে প্রকাশ হয়, তাহলে বুঝা যাবে, তারা দুনিয়াকে দীন ও ঈমান দ্বারা ভরপুর করে দিচ্ছেন। তারপর তাদের ওয়াজ-নসিহত, তালিম ও তাবলীগ দ্বারা হাজার-হাজার বক্তা, খতীব, পীর, ওয়ায়েজ ও মুবাল্লিগ তৈরি হচ্ছেন। এখন এ উদ্দেশ্যে এই ইদারা প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে যে, দারুল উলুমের মাসিক পত্রিকার চার পৃষ্ঠা শুধু এই উদ্দেশ্যে নির্ধারিত করা যে, তাতে দারুল উলুমের ফুযালাদের আলোচনা থাকবে। তাতে তাদের বার্ষিক অবস্থা এবং কারগুজারি বর্ণনা করবে। ভবিষ্যতে এটি দীন ও ইলমে দীনের বিশাল একটি ইতিহাস রচিত হবে।

দারুল উলুমের বিস্তৃতি

চার দেওয়ালের নাম দারুল উলুম নয়– বরং সকল নেযাম, আন্দোলন, পদ্ধতি ও সর্ব প্রকার খেদমতের নাম দারুল উলুম, যার পরিধি হিন্দুস্তানসহ বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত। আমার মনে পড়ে, একবার হযরত মাওলানা হাবীবুর রহমান সাহেব রহ.কে বলেছিলাম, হযরত! বেরলীতে একজন উস্তাদ রয়েছেন, যিনি দারুল উলুমের ফারেগ ছাত্র; তাকে দারুল উলুম নিয়ে নিন। তখন তিনি চুপ রইলেন। আমি উক্ত কথা তিনবার পেশ করলাম। তারপর বললাম, আপনি তাকে উস্তাদ হিসেবে রাখতে বাধা দিচ্ছেন কেন? তিনি উত্তর দিলেন, তাকে ডেকে আনা ভুল। কারণ, যে যেখানে বসে গেছে, সেখানেই দারুল উলুম দেওবন্দ প্রতিষ্ঠিত। তেমনিভাবে প্রতিটি শহর ও প্রদেশে দারুল উলুম দেওবন্দ প্রতিষ্ঠিত। এমনই দারুল উলুম দেওবন্দের প্রশস্ততা ও পরিধি। আপনি কি ওই ফাযেলকে ডেকে এনে দেওবন্দের পরিধিকে সংকীর্ণ করতে চাচ্ছেন। আমি তা চাই না। এ রূহানী সন্তানেরা দেওবন্দেরই সন্তান। কারো একজন বা দুজন সন্তান থাকে। দেওবন্দের লক্ষ-লক্ষ সন্তান আছে। অগণিত সন্তান এবং বৈধ সন্তান। তারা দারুল উলুমের মিরাসী সম্পদের উত্তরাধিকারী। তার এই মিরাস

হল আখলাক, আমল, উলুম ও মারেফাত বা নবীদের ত্যাজ্য সম্পদ। সেই সম্পদে প্রত্যেকেই পাত্রভেদে অংশ লাভ করে থাকে।

মুহতামিম হওয়ার মাপকাঠি

হযরত মাওলানা রফিউদ্দিন সাহেব রহ. দেওবন্দের মুহতামিম ছিলেন। তিনি একেবারে উম্মি ও আনপড় ছিলেন। কিন্তু মাখলুকত্যাগী, কাশফ্ ও কারামাতওয়ালা বুযুর্গ ছিলেন। হযরত নানুতুবী রহ. ডেকে এনে মুহতামিম হওয়ার জন্য চাপ দিলেন। তখন তিনি বলেছিলেন, আমি একজন গণ্ডমূর্খ– না লিখতে জানি, না পড়তে জানি। নানুতুবী রহ. বললেন, পরিচালনার সম্পর্ক লেখা-পড়ার সঙ্গে নয় বরং তার সম্পর্ক অন্তরের সঙ্গে। সুতরাং তিনি পরিচালনার জন্যে বসে গেলেন। যা কিছু লেখাতে চাইতেন তা অন্য কেউ লিখে দিতেন। পরে তাতে মাওলানার সীল-মহর লাগিয়ে দিতেন। তিনি হযরত নানুতুবীকে বলতেন, ইদারা অনেক বড়, আমি এত বড় যিম্মাদারী কিভাবে সামাল দেব, কিভাবে বহন করব?

ছাত্রদের মাপকাঠি

এ ঘটনার পূর্বে আরেকটি ঘটনা শুনে নিন। হযরত মাওলানা রফিউদ্দিন সাহেব মুহতামিম থাকাকালে দেওবন্দে পঞ্চাশ-ষাটজন ছাত্র ছিল। তন্মধ্যে ২৪/২৫ জন ছাত্র বোর্ডিং-এ থেকে খানা খেত। এমন ছিল দেওবন্দের হালত। একদিন তিনি মৌলসুরী এলাকায় দাঁড়িয়ে আছেন। তখন এক ছাত্র ঝোলের বাটি নিয়ে রাগান্বিত হয়ে হযরতের সামনে ফেলে দিল এবং বলল, এটি তরকারী, না পানি? এমন খানা কি খাওয়া যায়? ছেলেটি বেয়াদবি শব্দও ব্যবহার করে যে, এ কি আপনার পরিচালনার দায়িত্ব? তিনি ছেলেটিকে আপাদমস্তক তিনবার দেখলেন এবং বললেন, ছেলেটি মাদরাসার ছাত্র নয়। অন্যরা বলল, হযরত! ছেলেটি মাদরাসার ছাত্র, সে মাদরাসায় থাকে, বোর্ডিং-এ থেকে খানা খায়। তিনি বললেন, যত কিছুই হোক, সে মাদরাসার ছাত্র নয়। ছাত্রটি চুপ রইল। দু-তিনদিন যাচাই করে দেখা গেল, সে বাস্তবেই মাদরাসার ছাত্র ছিল না। ছাত্র নাম করে ধোঁকা দিয়ে মাদরাসা থেকে খানা খেত। মাদরাসাওয়ালারা হযরতকে জিজ্ঞেস করলেন, হযরত! আপনি কিভাবে বুঝলেন, ছেলেটি মাদরাসার ছাত্র নয়? তিনি বললেন, আমি মুহতামিম হওয়ার পর পেরেশান ছিলাম যে, কিভাবে এ দায়িত্ব আঞ্জাম দেব। সেই অবস্থায় রাতে স্বপ্ন দেখলাম। তিনি অন্তরওয়ালা

আরেফ বিল্লাহ ছিলেন। আর এমন ব্যক্তিদের স্বপ্ন অর্ধেক স্বপ্ন হয় আর অর্ধেক কাশ্‌ফ হয়।

তিনি বললেন, আমি মৌনসুরীর কূপকে দুধে ভরপুর দেখলাম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার পাড়ে বসে দুধ বণ্টন করছেন। কাউকে বদনা ভরে দিচ্ছেন আবার কেউ পেয়ালা ভরে পান করছে। যাদের হাতে পাত্র নেই, তারা হাতে চুল্লি দিয়ে পান করে চলে যাচ্ছে। এভাবে নিজেদের পাত্র অনুযায়ী দুধ নিয়ে-নিয়ে চলে যাচ্ছে। তারা সংখ্যায় হাজার-হাজার। চোখ খোলার পর মোরাকাবা করলাম। ফলে আমার নিকট কাশফ্ হল, উক্ত কূপ হল ইলমের প্রতিচ্ছবি আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হলেন কাসেমুল উলুম বা ইলম বণ্টনকারী, যা বণ্টন করছেন তা হল ইলম আর গ্রহণকারীরা হল দেওবন্দের ছাত্র। তারা তাদের পাত্র অনুযায়ী গ্রহণ করেছে। এখন সবচেয়ে আশ্চর্যজনক ঘটনা হল, তারপর বলেন শাওয়াল মাসে যখন ছাত্ররা ভর্তি হয়, তখন আমি সাথে-সাথে চিনতে পারি, এই ছাত্রটি ওই মজলিসে উপস্থিত ছিল। এখন যখন এই ছাত্রটি এল, তখন আমি তার মাথা থেকে পা পর্যন্ত দেখলাম। মনে হল তাকে উক্ত মজলিসে দেখিনি।

এতে প্রতীয়মান হয়, দারুল উলুমের ছাত্ররা আল্লাহর পক্ষ হতে নির্বাচিত। তারা যেখানেই কাজ করে, বিজয় লাভ করে।

এ সম্পর্কে একটি ঘটনা স্মরণ হল। হযরত থানুভী রহ. বলেছেন, আমাদের লেখা-পড়াকালে দাওরায়ে হাদীস ক্লাসে চৌদ্দজন ছাত্র ছিলাম। আমাদের দাস্তারবন্দির দিন ধার্য হল। সেটি দারুল উলুমের দ্বিতীয় বার্ষিক জলসা ছিল। আমাকেও পাগড়ি পরানোর সিদ্ধান্ত হল। ওই চৌদ্দজন ছাত্র পরামর্শ করল, জলসা বন্ধ করানোর চেষ্টা করতে হবে। কারণ, আমাদের মত উম্মি-অশিক্ষিতদের দস্তারবন্দী হবে, আমরা তার উপযুক্ত নই। আমাদের দ্বারা মাদরাসার বদনাম হবে।

সবাই মিলে হযরত থানুভী রহ.কে প্রতিনিধি বানিয়ে পাঠালেন যে, আপনি হযরত ইয়াকুব নানুতুবী সাহেব রহ.-এর নিকট জলসা বন্ধের আবেদন পেশ করবেন। হযরত ইয়াকুব সাহেব দেওবন্দের প্রথম সদরুল মুদাররিস বা প্রধান শিক্ষক ছিলেন। হযরত থানুভী রহ. যখন তাঁর নিকট পৌঁছলেন, তখন তিনি কিতাব অধ্যয়নে ব্যস্ত ছিলেন। হযরত থানুভী রহ. হযরতের মুতালাআর অবস্থা বর্ণনা করলেন। আমি যখন কামরায় পৌঁছলাম, তখন তিনি ডেস্কে কিতাব রেখে হেলান দিয়ে অধ্যয়ন করছিলেন। তিনি অনেক গভীর নজরে কিতাব মুতালায়ায় মগ্ন ছিলেন। তিনি নজর উঠালেন। তাঁর এত প্রভাব ছিল, যা অনেকেই সহ্য

করতে পারতেন না। তিনি বললেন, ওহ তুমি কেন এসেছ? হযরত থানুভী রহ. বলেন, আমি দরখাস্ত পেশ করলাম, দেওবন্দে দস্তারবন্দী জলসা হতে যাচ্ছে। তা যদি জনাবের হুকুম হয়, তাহলে আমলে নিতে অস্বীকার করি না। আর যদি কিছু বলার সুযোগ থাকে, তাহলে আমাদের আবেদন হল, আমরা তার উপযুক্ত নই। আমরা নালায়েক। এতে আসাতিযাদের দুর্নাম হবে। অতএব জলসা বন্ধ করে দেওয়া হোক। আমাদের মত অনুপযুক্তদের থেকে সুনজর সরিয়ে নেবেন না। আমরা চাচ্ছি আমাদের দোষ-ত্রুটিতে পর্দা পড়ে থাকুক।

একথা শ্রবণের পর হযরত ইয়াকুব সাহেব রহ.-এর ভিতর জোশ চলে এল। তিনি বললেন, এটাই তোমাদের উপযুক্ত হওয়ার নিদর্শন। তোমরা বড় ভাগ্যবান। যখন মানুষের মধ্যে নিজের অনুপযুক্ততার অনুভূতি আসে, তা তার জন্য কামাল ও ফযল এবং ভাগ্যবান হওয়ার আলামত। আর আমরা যে জলসা করতে যাচ্ছি, তাতে ঘোষণা করে দেব, আমাদের মাঝে এবং আল্লাহর মাঝে ফয়সালা করেছি, এই ছাত্রগুলো আমাদের নিকট উপযুক্ত। আপনাদের যার যাকে পছন্দ হয়, তাকে যে কোন বিষয়ে পরীক্ষা করতে পারেন। হযরত থানুভী রহ. বলেন, আমরা আরো ভয় পেয়ে গেলাম যে, এসেছিলাম জলসা বন্ধ করানোর জন্য; কিন্তু এখন শুনে গেলাম পরীক্ষা দিতে হবে।

তারপর আমরা সেখান থেকে চলে এলাম। যাওয়ার কালে হযরত ইয়াকুব সাহেব রহ. আরেকটি বাক্য ব্যক্ত করলেন যে, দুনিয়াটা গাধায় ভরে গেছে তোমরা যেখানেই যাবে, সেখানেই তোমাদের বিজয় হবে। হযরত থানুভী রহ. বলেন, আমি পরীক্ষা করলাম। আমরা যেখানেই যাই, সেখানে আমরাই থাকি। সবখানে আমরাই জয়ী হই। কেননা, হক সর্বত্র জয়ী হয়ে থাকে।

اَلْحَقُّ يَعْلُوْ وَلَا يُعْلٰى

হক সর্বদা বিজয়ী হয়, পরাজয়ের জন্য আছে বাতিল।

সুতরাং ফুযালায়ে দেওবন্দের তানজিম মূলত তাদের কর্মের তানজিম।

তানজিমের উপকারিতা

তাতে দ্বিতীয় লাভ হল, কিছু খেদমত মারকাজ থেকে হয় আর কিছু ফুযালারা করেন। উভয়ে খেদমত করেন। তাই এ কারণে তানজিম আবশ্যক যে, মারকাজ যাতে ফুযালাদের খেদমত সম্পর্কে অবগত থাকে এবং তারাও মারকাজের খেদমত সম্পর্কে জানতে পারে। যদি ফুযালাদের কোন সাহায্যের

প্রয়োজন হয়, তাহলে মারকাজ যেন জানতে পারে এবং সাহায্যের চিন্তা-ভাবনা করতে পারে এবং মারকাজের প্রয়োজনাদি সম্পর্কে ফুযালাদের জানা থাকে।

মোটকথা উভয় পক্ষ থেকে একটি সম্পর্ক কায়েম হয়। হিন্দুস্তানে দেখা যায়, বিভিন্ন ফেতনার আবির্ভাব হয়– ইলমি ফেতনা, আমলি ফেতনা। ফুযালায়ে দেওবন্দ স্থানীয়ভাবে সেগুলোর মোকাবেলা করেন এবং ফেতনাগুলোকে পরাস্ত করেন। মারকাজ একেবারেই জানে না, ফুযালাগণ কী-কী খেদমত আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছেন আর ফুযালারা এমন অভিযোগ করেন যে, আমরা অনেক বড়-বড় কাজ করে যাচ্ছি; মারকাজ আমাদের সংবাদ নেয়নি। আমাদের প্রশংসা করে না, শাবাশি দেয় না। এ কারণে তানজিম প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। প্রয়োজন হলে পরস্পর ঐক্যবদ্ধভাবে আওয়াজ ধ্বনিত হবে, তাদের সাহায্যে আওয়াজ উঠবে অথবা তাদের সাহায্যের জন্য মারকাজ থেকে কাউকে পাঠাবে। ফলে দলবদ্ধ স্লোগানের প্রভাব ও শক্তি বাড়বে। দীনের উপকার হবে।

অতএব তানজিম গঠিত হয়েছে সেবার জন্য– ব্যক্তির জন্য নয়। এতে খেদমত হামেশা জিন্দা থাকবে। শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়ে জাতিকে সার্বিকভাবে উপকার করবে। তাদের পরস্পর সাহায্য চালু থাকবে এবং খেদমত নিয়ন্ত্রণ করা যাবে যে, কোথায় খেদমত করতে হবে এবং কী-কী খেদমত করা যাবে। তানজিমের প্রয়োজন এ কারণেও রয়েছে যে, বিভিন্ন ছোট জামাত; দাবি করে অনেক বড়-বড়; কিন্তু কাজ করে একেবারেই স্বল্প অথবা করেই না। সামান্য করে দেখায় অনেক। আর আমাদের কাজ বেশি; কিন্তু সংবাদপত্রে এগুলো আসে না। প্রচারও হয় না। অথচ তারা দাবি করে, আমরা হিন্দুস্তানকে সামলে রেখেছি। আমাদের আকাবিরগণ কাজ করেছেন– নাম করেননি। মানুষ ছোট-খাট কাজ করে সংবাদপত্রে আসে। আমি চিন্তা করি, দারুল উলুমে দৈনিক জলসা হয়; কিন্তু মানুষ জানে না।

প্লানকৃত বিজ্ঞাপনের প্রোগ্রামের পর যত মানুষ একত্রিত হয়, দারুল উলুমে প্রচার ও বিজ্ঞাপন ব্যতীত দৈনিক তত মানুষ একত্রিত হয়। জামাত ছোট-ছোট; কিন্তু প্রচার-প্রসার অনেক; কাজের বেলায় ঠনঠন। অল্প মানুষও জানে না দারুল উলুম কী-কী মহান খেদমত আঞ্জাম দিচ্ছে। এ কারণে তানজিমের এও একটি ফায়দা যে, মারকাজও সন্তুষ্ট থাকবে এবং ফুযালাদের অন্তরও আনন্দিত হবে। উভয়ের খেদমত জনসম্মুখে প্রকাশ পাবে। এছাড়া আরো অনেক উপকারিতা রয়েছে, যা সামনে এলে তানজিমের প্রয়োজন পড়বে। এজন্য কিছু কানুন ও বিধিবিধান প্রণয়ন করা হয়েছে। তানজিমকে প্রাদেশিক ও জেলাওয়ারী ভাগ করা হয়েছে, যাতে ফুযালায়ে দারুল উলুম এলাকাভিত্তিক একত্রিত হয়ে একজনকে

দায়িত্বশীল বানিয়ে, প্রধান বানিয়ে, সেক্রেটারী নির্বাচন করে নিবে। এমন সিস্টেম এজন্য করা হয়েছে যে, এমনটি আকাবিরগণ চেয়েছিলেন।

শতবর্ষ জলসার আয়োজন

প্রায় পঞ্চাশ বছর পর একটি দস্তারবন্দি জলসা হল। ১৩২৮ হিজরী থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত রেজিস্টার খাতায় ছয় হাজার ফুযালার নাম লেখা রয়েছে। এই ছয় হাজার ফারেগীনের দস্তারবন্দি করানো হবে। এজন্য বিজ্ঞাপনও জারী হয়। পৃথক একটি অফিস প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে এই তানজিমকে শৃঙ্খলা, বন্দোবস্ত ও বিন্যাস করার জন্য। জলসার ঘোষণা হওয়ার পর দেশে ধুমধাম ও শোরগোল শুরু হচ্ছে। দেশের সবাই তার প্রতীক্ষায় আছে। কারণ, ফুযালাদের মধ্যে হিজাযবাসী, এশিয়া, আফ্রিকা, মালেশিয়া, চীন, তুর্কিস্তান, আফগানিস্তানের বাসিন্দারাও রয়েছে। তাঁরা সংখ্যায় হাজার-হাজার। অতএব হাজার-হাজার লোকের জলসা হলে সরকারের নিকট ভিসার জন্য আবেদন করতে হবে এবং ভিসা সম্পর্কিত মন্ত্রণালয়ের অনুমতি নিতে হবে। তার পাশাপাশি ব্যয়ের পরিমাণ ও আয়ের পরিমাণ নিরীক্ষণ ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ, উপস্থিতির সংখ্যা দেড়-দুলাখের কম হবে না। সারাদেশ অপেক্ষায় আছে। আমরা এখন এহেন পেরেশানীতে লিপ্ত যে, দেওবন্দের ধারণক্ষমতা হল ত্রিশ হাজার মাত্র। সেখানে দেড়-দুইলক্ষ মানুষ একত্রিত হলে সামাল দিব কিভাবে? কোথায় বসবে? আবার প্রত্যেক ফুযালাকে পাগড়ি বাঁধতে হবে। প্রতিটি পাগড়ির মূল্য যদি দশ রুপি হয়, তাহলেও পঞ্চাশ-ষাট হাজার রুপি শুধু পাগড়ি ক্রয়ে ব্যয় হবে। তাও যদি কোনভাবে সহজ হয়ে যায়, তাহলে তা বাধার মাসআলা সামনে আসবে। গতকাল এখানে ৩০-৩৫ জনছাত্রের পাগড়ি প্রদান করা হয়েছিল। এতেই বৃদ্ধ বুযুর্গ ক্লান্ত হয়ে পড়েন, হাত ক্লান্ত হয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু শেষ হচ্ছিল না। অতএব ওখানে আনুমানিক পাঁচ হাজার পাগড়ি বাঁধতে হবে। তা কোন সহজ কাজ নয়। গত দস্তারবন্দির সময় আমাদের মাওলানা আব্দুল হান্নান সাহেব রহ. একটি সুন্দর বাক্য প্রয়োগ করেছেন যে, একি পাগড়ি বাধা না স্যুট বাধা। আমি বললাম, পাগড়িগুলো কলপযুক্ত এবং বাঁধনেওয়ালাও কলপযুক্ত আর পাগড়িতে তো কলপ লাগানো থাকে। এমন হতে পারে যে, এখানে মোচড়ানো হবে না পূর্ব থেকে বেঁধে রাখবে। হযরত উক্ত বাক্য কৌতুকসুলভ বলেছিলেন। এ কারণে জলসাকে কিছু সময় পিছানো হচ্ছে। মজলিসে শুরায় এই আলোচনাও উঠে এসেছে যে, দারুল উলুমের শত বছর পুরো হতে আর একবছর বাকি আছে। তাই পূর্ণ হওয়ার পর শতবর্ষ পূর্তি অনুষ্ঠান করতে হবে।

মোটকথা, আলোচনা হয়েছে, সিদ্ধান্ত হয়েছে বাকি আল্লাহ তায়ালার তাওফিক এবং সাহায্যের উপর নির্ভর। আয়োজন চলছে। দেশ-বিদেশের দু-আড়াই লক্ষ মানুষ একত্রিত হতে পারে। এগুলোই তানজিমের উদ্দেশ্যে।

তানজিম সম্পর্কে এ কয়েকটি কথা পেশ করলাম। এই অঞ্চলের ফুযালাগণ একত্রিত হয়েছেন তানজিমের উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানতে। আমি তাদের দেখে আনন্দিত হয়েছি। এখন মারকাজওয়ালাদেরও এবং আপনাদেরও উভয়ের কাজ করতে হবে।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

বয়ান : ৯

বিজ্ঞান ও ইসলাম

এই বস্তুগত কার্যকলাপ– যেগুলো থেকে মুখাপেক্ষিতা ও নফসের লাঞ্ছনার ফল সৃষ্টি হয়, তা-ই সাইন্সের আলোচ্য বিষয় এবং এই রূহানী কার্যকলাপ অর্থাৎ সদকা ও মুজাহাদা– যেগুলো থেকে স্বনির্ভরতা ও নফসের ইজ্জত ফল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে, তা-ই ইসলামের আলোচ্য বিষয়। আলোচনায় নির্দ্বিধায় এই ফলাফল বেরিয়ে এল যে, পরিণতিতে সাইন্স মানুষকে আত্মলাঞ্ছনা ও ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায় আর ইসলাম পরিণামে গিয়ে তাকে ইজ্জত ও উভয়কালের সাফল্যের দিকে অগ্রসর করে।

প্রথম সুরত অর্থাৎ বস্তুজগতের প্রাধান্য এবং সাইন্সের প্রবৃদ্ধি রূহের অপদস্থতা ও বস্তুর আধিক্যের– যার দ্বারা সম্মানিত হয় অপদস্থ এবং অপদস্থ হয় সম্মানিত। যা একটি বিপরীতধর্মী বিষয় এবং উভয়ের জন্য ধ্বংসাত্মক। আর দ্বিতীয় সুরত অর্থাৎ রূহানিয়াত বা আধ্যাত্মিকতার কর্মকাণ্ড এবং রূহ-উন্মোচক ইসলামের শিরোত্থান ও বস্তুজগতের শাসিত হওয়ার। যাতে সম্মানিত তার সম্মানের মসনদে এবং অপদস্থ তার অপদস্থতা ও অবদমিতার চৌহদ্দিতে সীমিত থাকে। যা প্রকৃত ন্যায় বিচার এবং উভয়ের জন্য ইহপারলৌকিক কল্যাণ, উন্নতি ও সাফল্যের কারণ। এই হল সাইন্স ও ইসলামের সংক্ষিপ্ত মৌলিক চিত্র।

– হযরত হাকীমুল ইসলাম রহ.

আশ্চর্য হল এবং বলতে লাগল– 'প্রভু হে! তোমার সৃষ্টির ভিতর পাহাড়-পর্বতের চেয়েও কি শক্ত কোনকিছু আছে?' তিনি বললেন– 'হ্যাঁ আছে; লোহা।' এরপর ফেরেশতারা জিজ্ঞেস করল– 'তোমার সৃষ্টির মধ্যে লোহার চেয়েও কি শক্ত কোনকিছু আছে?' তিনি বললেন– 'হ্যাঁ আছে; আগুন।' তাঁরা আবার বলতে লাগল– 'প্রভু হে! তোমার সৃষ্টির মধ্যে কি আগুনের চেয়ে কোনকিছু শক্ত আছে?' তিনি বললেন– 'হ্যাঁ আছে; পানি।' তারপর তাঁরা আবার জিজ্ঞেস করল– 'প্রভু হে! তোমার সৃষ্টির মধ্যে কি পানির চেয়ে কোনকিছু শক্ত আছে?' তিনি বললেন– 'হ্যাঁ আছে; বাতাস।' তারপর তাঁরা আবার জিজ্ঞেস করল– 'প্রভু হে! তোমার সৃষ্টির মধ্যে কি বাতাসের চেয়েও শক্ত কোনকিছু আছে?' তিনি বললেন– 'হ্যাঁ আছে; ওই আদম সন্তান, যিনি ডান হাত দ্বারা এমনভাবে দান করেন যে, তাঁর বাম হাত টেরও পায় না।' [হাদীসটি ইমাম তিরমিযী রেওয়ায়েত করেছেন।]

প্রারম্ভিক কথা

মুহতারাম সভাপতি, সুধীবৃন্দ এবং প্রিয় ছাত্র ভাইয়েরা!

এই মুহূর্তে আমাকে যেই বিষয়ের উপর আলোচনা করার নির্দেশ করা হয়েছে, তার শিরোনাম 'সাইন্স ও ইসলাম'। আমি যেমন আশ্চর্য-বোধ করছি যে, এমন গুরুত্বপূর্ণ সমাবেশে– যাতে একটি কেন্দ্রীয় জায়গায় নির্বাচিত ব্যক্তিবর্গ বিভিন্ন জ্ঞান-বিজ্ঞান ও বিভিন্ন বিষয়ে পারদর্শী এবং বিশেষ পণ্ডিতবর্গ উপস্থিত আছেন, সেখানে আলোচনা করার জন্য আমার মত পুঁজিহীন, শিক্ষাহীন ও ইলম-আমলে অসম্পূর্ণ ব্যক্তিকে নির্বাচন করা হয়েছে। তেমনইভাবে বরং তার চেয়েও অনেকগুণ বেশি আশ্চর্যবোধ করছি যে, আলোচনার বিষয়সমূহ থেকে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং সর্বাধিক জটিল বিষয়টি আমার মত অযোগ্যের মাথায় অর্পণ করা হয়েছে।

উল্লিখিত শিরোনামটি প্রকৃতপক্ষে একটি অসাধারণ শিরোনাম। যার জন্য সাধারণ যোগ্যতা যথেষ্ট হতে পারে না। কেননা, এই 'সাইন্স ও ইসলাম' শিরোনামটি শাব্দিকভাবে যতখানি সহজ ও সংক্ষিপ্ত, ভিতরগতভাবে এবং যুগচাহিদা অনুসারে ঠিক ততখানি দীর্ঘ ও জটিল। তার কারণ স্পষ্ট যে, এই শিরোনামটি তিনটি বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে– ১. সাইন্স, ২. ইসলাম ও ৩. এতদোভয়ের মধ্যবর্তী সম্পর্ক।

এই জন্য কুদরতীভাবে এখানে তিনটি বিষয়ের ব্যাখ্যা আলোচকের জিম্মায় বর্তায়– ১. সাইন্সের অর্থ এবং তার প্রকৃতি, ২. ইসলামের অর্থ এবং তার

প্রকৃতি, ৩. এতদোভয়ের পারস্পরিক সম্পর্ক এবং উভয় পক্ষের সেতুবন্ধন। এরপর একটি চতুর্থ বিষয়, এই তিনটি থেকে নির্দ্বিধায় বেরিয়ে আসবে এবং তা হল এ তিনটি বিষয়ের দাবি। অর্থাৎ সাইন্স ও ইসলাম এবং এতদোভয়ের মধ্যবর্তী সম্পর্ক স্পষ্ট হয়ে গেলে একটি ঘটনা আত্মপ্রকাশ করবে। কিন্তু সব ঘটনা একটি কাহিনী হিসেবে একটি উপাখ্যানের চেয়ে বেশি গুরুত্ব রাখে না, যতক্ষণ না তা থেকে কোন কাজ, কোন নির্দেশ অথবা কোন আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি হয়। এজন্য চতুর্থ উদ্দেশ্য হবে এই যে, এই তিনটি প্রতিষ্ঠিত সত্যের কী দাবি আছে আমাদের উপর এবং এই ঘটনা আমাদের কাছে কী কামনা করে? কাজেই এই আলোচনার বিষয় থেকে তিনটি উদ্দেশ্য জন্ম নিবে। যেগুলোর উপর আলোচ্য বিষয়টির বুনিয়াদ স্থপিত হবে– সাইন্স ও ইসলামের প্রকৃতি, সাইন্স ও ইসলামের মধ্যবর্তী সম্পর্ক এবং ইসলাম ও সাইন্স থেকে জন্ম নেওয়া উপদেশ। স্পষ্ট যে, এই তিনটি বিষয় যেমনই গুরুত্বপূর্ণ তেমনই আমার জন্য তা জটিল ও কঠিন। কেননা, প্রথমত ইসলামী তত্ত্ব ও তথ্যের উপরই পরিপূর্ণ আলোকপাত করা একজন পুঁজিশূন্য তালেবে ইলমের জন্য নিশ্চয়ই জটিল। এই দিক বিবেচনা করে যে, উলামায়ে কেরামের একটি কেন্দ্রীয় জামায়াত (উলামায়ে দারুল উলুম দেওবন্দ)-এর জুতোসমূহের পাশে থাকার সৌভাগ্য আমার হয়েছে এবং আমি اَلْقَوْمُ لَايَشْقٰى جَلِيْسُهُمْ [কওমের কাছে আনাগোনাকারী বঞ্চিত হয় না]-এর কায়দা অনুসারে যদি এক-আধ জুমলা ইসলামের তথ্য সম্পর্কে বলেও দিই, তবুও সাইন্স বিষয়টি আমার জন্য যেকোন দিক থেকে নতুন ও অপরিচিত। আমি তার মূলনীতি সম্পর্কে অবগত নই; অবগত নই তার খুঁটিনাটি বিষয় সম্পর্কেও।

তা ছাড়া বিষয়বস্তু হিসেবেও তার প্রাথমিক ও মৌলিক উদ্দেশ্য সম্পর্কে কোন ধারণা নেই আমার। আর সবারই জানা আছে যে, জুমলার নানাদিক থেকে কোন একদিক নিয়ে সামান্য কুলকিনারা করতে পারলেও উভয় দিকের মধ্যবর্তী সম্পর্কের উপর আলোকপাত করা কতই না জটিল? যা হোক, যখন আমাকে একটি মুহতারাম জামায়াতের পক্ষ থেকে নির্দেশ করা হয়েছে, কাজেই আমি মনে করছি যে, এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি প্রত্যাদেশ। এজন্য গায়েবী সাহায্যের আশা করে দুঃসাহস করছি যে, পেশকৃত বিষয়বস্তুর উপর নিজের সাধ্যমত কিছু কথা বলব। শ্রোতাবৃন্দের নিকট আমার ভুলভ্রান্তির বিষয়ে ক্ষমা ও মার্জনার আবেদন করে সুদৃষ্টি কামনা করছি।

সম্মানিত সুধী! এই সময় আমি যে হাদীসখানা তেলাওয়াত করেছি, তা উল্লেখিত শিরোনামের তিনটি দিকই সম্পূর্ণরূপে অন্তর্ভুক্ত করে আছে। আমার জ্ঞান-বুদ্ধি

বলে, তাতে বিজ্ঞানের বস্তুগত অস্তিত্বের উপর এমনইভাবে আলোকপাত করা হয়েছে যে, কেমন যেন তার মূল এবং প্রকৃত রহস্য স্পষ্ট করে সামনে রাখা হয়েছে। তারপর ইসলামের মৌলিকতা প্রকাশ করা হয়েছে। অতঃপর এই দু'বস্তুর পারস্পারিক সম্পর্ক এমন আঙ্গিকে বয়ান করা হয়েছে, যা থেকে একথাও স্পষ্ট হয়ে যায় যে, এগুলোর মধ্যে মৌলিক উদ্দেশ্য হওয়ার বৈশিষ্ট্য আছে কার এবং শুধু অর্জনের মাধ্যম হওয়ার বৈশিষ্ট্য রয়েছে কার? তারপর এই মাধ্যমের সহায়তায় উক্ত উদ্দেশ্য হাসিল করার পদ্ধতিই বা কী? আর উদ্দেশ্য হাসিলের পর তার সাথে এমন কি ফলাফল যুক্ত হবে, যার আশায় উদ্দেশ্য হাসিল [বিজ্ঞান শিক্ষা] করার চেষ্টা করা যাবে।

তবে হাদীসের রহস্য খুলে বলার আগে সমীচীন মনে হচ্ছে যে, আমি বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়টি নির্দিষ্ট করে দিই। যাতে করে তা নিয়ে সুদৃঢ়ভাবে আলোচনা করা যেতে পারে। কিন্তু সাথে সাথে একথাও আরয করছি যে, বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় নির্দিষ্ট করা এজন্য আমার সামর্থ্যের মধ্যে নয় যে, আমি এই বিষয়ের শিক্ষা লাভ করিনি। তবে এর প্রসিদ্ধ ও লোকালোচিত বৈশিষ্ট্যসমূহ সামনে রেখে নিজের মেধা অনুযায়ী সাইন্সের যা কিছু আলোচ্য বিষয় নির্ণয় করতে পারি, তাই আরয করব। আমি আশাবাদী, যদি আমি এতে ভুল করি তবে এ কেন্দ্রের পণ্ডিতবর্গ এবং বিজ্ঞানী উস্তাদগণ আমাকে আমার ভুলের উপর স্থির থাকতে দিবেন না।

বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়

সুধীবৃন্দ!

উন্নয়নের এই যুগে যখন সাংস্কৃতিক উদ্ভাবন এবং বস্তুগত নতুন নতুন আবিষ্কারের চর্চা হয়, তখন পরিশিষ্ট হিসেবে সাথে সাথেই বিজ্ঞানের কথা উল্লেখ করা হয়। যখন একথা বলা হয় যে, বর্তমান যুগ তার আবিষ্কারের দিক থেকে দুনিয়াকে দেওয়ানা বানিয়ে দিয়েছে। যেমন, সংবাদ প্রচারের মাধ্যম হিসেবে টেলিফোন ও টেলিগ্রাফ দুনিয়াকে অস্থিরতার মধ্যে ফেলে দিয়েছে, বেতারযন্ত্র এবং অন্যান্য বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি বিশ্বকে হতভম্ব করে দিয়েছে, তখন সাথে সাথে সাইন্সের আলোচনা হয় যে, এসব কিছু তারই সোনালি অবদান। অথবা উদাহরণ হিসেবে যখন রেল, মোটর, উড়োজাহাজ এবং অন্যান্য হাওয়ানির্ভর বাহনের কথা আলোচনা করা হয়, তখন সাথে সাথে সাইন্সের নামও নেওয়া হয় যে, এসব কিছু তারই মধ্যস্থতায় হয়েছে। অথবা যেমন, শিল্পকারখানা হিসেবে

লোহা-লক্করের সুন্দর আশ্চর্যজনক এবং বিস্ময়কর আসবাব, দালানকোঠার নতুন নতুন ডিজাইন এবং নমুনা, সিমেন্ট ও তার ঢালাইয়ের নতুন নতুন সংমিশ্রণ এবং ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের নতুন নতুন উদ্ভাবন যখন সামনে আসে, তখন সাইন্সের মনোহর চেহারা সামনে পেশ করা হয় যে, এগুলো সব তারই সৌন্দর্যের প্রকাশ। এমনিভাবে যখন উৎপাদন প্রসঙ্গে কৃষি উন্নতি, ফলফুল উৎপাদনের নয়া পদ্ধতি এবং উৎপাদনের নতুন নতুন প্রাপ্তি ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অগ্রগতির কথা বলা হয়, তখন ওই সাইন্সের নামও পুরা সম্মানের সাথে জবানে এসে পড়ে।

এমনিভাবে জীব-জীবন প্রবাহে বিভিন্ন উন্নত মাধ্যম এবং অপারেশনের আশ্চর্যজনক, বিস্ময়কর ও চাঞ্চল্যকর বিভিন্ন সিস্টেম; রাসায়নিক পদ্ধতিতে চিকিৎসায় অভূতপূর্ব উন্নতি; কাঁটাছেড়ার মাধ্যমে বিস্ময়কর আরোগ্যবিধান এবং বিদ্যুতের সাহায্যে চিকিৎসার নানা পন্থার কথা যখন মুখে আসে, তখনই নেহাত দৃঢ়তার সাথে মুখে আসে যে, এগুলো সবই তার দীপ্তিময় ফলাফল। এ থেকে আমার অসম্পূর্ণ জ্ঞান আমাকে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছে দেয় যে, আলোচ্য বিষয়টি 'মাওয়ালিদে সালাসা' তথা জড়, উদ্ভিদ এবং জীব- এর বাইরে নয়।

অতঃপর যেহেতু এই মাওয়ালিদে সালাসার গঠন 'আনাসিরে আরবায়া' [চার উপকরণ] তথা আগুন, পানি, বাতাস ও মাটি থেকে হয়ে থাকে- যা প্রায় সর্বস্বীকৃত বিষয়। আর এজন্য এর উপর কোন যুক্তি প্রতিষ্ঠা করার প্রয়োজন নেই। কাজেই প্রকৃত বিবেচনায় সাইন্সের আলোচ্য বিষয় হিসেবে 'আনাসিরে আরবায়া' স্থির হয়। যেগুলোর বৈশিষ্ট্য ও ফলাফল শাস্ত্র হিসেবে অনুধাবন করা এবং প্রায়োগিক পদ্ধতিতে ওগুলো বিচ্ছিন্নকরণ ও সংমিশ্রণের পরীক্ষার মাধ্যমে প্রকৃতিতে নতুন নতুন জিনিস বাস্তবতায় প্রকাশ করতে থাকা সাইন্সের শিক্ষা-দীক্ষার বিশেষ বৃত্ত হয়ে থাকে। কাজেই সাইন্সের সমস্ত রঙবেরঙের স্থাপনা মূলত এই চার খুঁটি (আনাসিরে আরবায়া)-এর উপরই প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে।

এরপর বিস্তারিত তথ্যকে যদি সংক্ষিপ্ত শিরোনামে সংকোচিত করা হয়, তাহলে বলা যেতে পারে, সাইন্সের আলোচ্য বিষয় 'বস্তু ও তার প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য' নিয়ে অনুশীলন করা। অতঃপর বস্তুর মধ্যে যত বেশি সম্ভব নিমগ্ন থেকে যে ব্যক্তি তার বৈশিষ্ট্য ও ফলাফল থেকে কাজ উদ্ধারকারী সাব্যস্ত হবে, সে-ই সবচে' বড় বিজ্ঞানী এবং বিজ্ঞান নিয়ে খেলার উৎকৃষ্ট খেলোয়াড় স্থির হবে।

আলোচ্য বিষয় নির্ধারিত হওয়ার পর এখন সাইন্সের সেই চার উপকরণ- আগুন, পানি, বাতাস, মাটি; শিরোনামের হাদীসের মধ্যে যার একটি সুবিন্যস্ত তালিকা পেশ করা হয়েছে, তা নিয়ে একটু চিন্তা করলে অনুভব হবে যে-

আনাসিরের শক্তির পারস্পরিক ব্যবধান ও তার মাপকাঠি

এই চার উপাদানের বৈশিষ্ট্য, ফলাফল এবং প্রাকৃতিক স্বভাব এক রকম নয়; বরং তারতম্যপূর্ণ। এগুলোর কোনটার উপাদান দুর্বল, কোনটা শক্তিশালী এবং সর্বোচ্চ শক্তিধর। আবার এই শক্তি ও দুর্বলতার ব্যবধানও ভিত্তিহীন বা আকস্মিক নয়; বরং পরিমিত। সে পরিমাণ হচ্ছে এই যে, এই উপাদানগুলোর মধ্য থেকে যার ভিতর সূক্ষ্মতা বেড়েছে, তারই পরিমাণমত শক্তি বেড়েছে। তারপর শক্তি অনুসারে তার মধ্যে প্রভাব-প্রতিপত্তি এবং শ্রেষ্ঠত্বের শান প্রতিষ্ঠিত হতে রয়েছে এবং যে পরিমাণ সূক্ষ্মতা কমিয়ে স্থূলতার জন্য জায়গা খালি করে দেওয়া হয়েছে, সে পরিমাণই তার মধ্যে দুর্বলতা এসে পড়েছে। তারপর দুর্বলতা অনুসারে তার মধ্যে অসহায়ত্ব, পরাজয়, লাঞ্ছনা এবং নিম্নগামিতাও দেখা যায়।

এর রহস্য এই বুঝা যায় যে, সূক্ষ্মতা একটি পূর্ণতাজ্ঞাপক গুণ, যা স্থূলতার বিপরীত এবং প্রত্যেক ইতিবাচক পূর্ণতার ভাণ্ডার হল হযরত ওয়াজিবুল উজুদ [আল্লাহ তায়ালা]-এর পুণ্যময় সত্তা। এজন্য সমস্ত সূক্ষ্মতার উৎস তিনিই। এবং এই কায়দা অনুসারে সূক্ষ্মতার কারণে সমস্ত শক্তির উৎসও তিনি। সুতরাং তার অসীম সূক্ষ্মতার ভুবন হচ্ছে এই যে, সমস্ত চোখের আড়াল, অনুমান ও ধারণার সীমার ঊর্ধ্বে এবং [লোকজ] উপলব্ধি ও স্পষ্টতার সীমারেখা থেকে অনেক দূরে। তারপর তার অসীম শক্তির কারিশমা হচ্ছে এই যে, তিনি সারা বিশ্বের উপর নিজ এবং শুধুই নিজের রাজত্বের শৃঙ্খলাবিধান করে রেখেছেন। এজন্য যে বস্তুর মধ্যেই সূক্ষ্মতার কোন কারিশমা থাকে, তা মূলত তারই সত্তা ও গুণাবলির কোন প্রতিবিম্ব, যার ক্রিয়া সে তার সামর্থ্য অনুসারে গ্রহণ করেছে। যখন ক্রিয়া গ্রহণ কোন সম্পর্ক ছাড়া হয়ে উঠতে পারে না, এজন্য একথা বলা যুক্তি বহির্ভূত নয় যে, সূক্ষ্মতা অনুসারে প্রত্যেক সূক্ষ্ম বস্তুরই আল্লাহ তায়ালার সাথে সম্পর্ক রয়েছে। আর একথা স্পষ্ট যে, যেই সীমা পর্যন্ত কোন বস্তুর সাথে পুণ্যময় সত্তার সাথে নৈকট্য ও সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হবে, তা সেই পরিমাণই শক্তিশালী, প্রভাবশালী ও ক্ষমতাধর হতে থাকবে। অন্যদিকে ওই সত্তা থেকে স্থূলতার সীমাহীন দূরত্ব ও একাকীত্ব রয়েছে। কেননা, সেখানে স্থূলতার চিহ্নমাত্র নেই। এজন্য যে কোন বস্তু স্থূলতা অনুসারে ওই লতিফ ও খবির সত্তা থেকে দূরে পড়ে থাকে। এ কারণেই সে হীন, প্রভাবিত ও তুচ্ছ হতে থাকবে এবং তার মধ্য থেকে প্রভাব ও সম্মানের বৈশিষ্ট্য নির্গত হতে থাকবে।

যেমন কোন বস্তু পানির নিকটবর্তী হলে তার মধ্যে পানির বৈশিষ্ট্যসমূহ- শৈত্য ও তরলতা ইত্যাদি অনুপ্রবেশ করতে থাকবে, আগুনের নিকটবর্তী হলে তাপ ও উষ্ণতার বৈশিষ্ট্য তাকে পরিবেষ্টন করে ফেলবে, মাটির কাছাকাছি হলে তার মধ্যে শুষ্কতা ও রুক্ষতার প্রতিক্রিয়া ঘিরে ফেলবে। অনুরূপভাবে যে বস্তু কোন গুণের মাধ্যমে পুণ্যময় সত্তা আল্লাহ তায়ালার সাথে নৈকট্য ও সম্পর্ক সৃষ্টি করে ফেলবে, তা সামর্থ্য অনুসারে ওই পরিমাণই ঐশ্বরিক শক্তি বৈশিষ্ট্যসমূহ এবং পরিপূর্ণ গুণাবলির কেন্দ্র ও মূলদণ্ড হতে থাকবে এবং অবশ্যই তার মধ্যে প্রভাব ও নির্ভিকতা প্রকাশ পাবে আর সে মহশক্তিশালী, মহাপ্রভাবশালী ও সুউচ্চ হতে থাকবে। পার্থক্য যদি থাকে, তা হলো এই যে, অনুভবের জগতে নৈকট্যও আনুভূতিক হয় এবং অনুভবের পন্থায় নৈকট্যের নিদর্শন প্রতিভাত হয়। কিন্তু তার সুউচ্চ আঙিনায় যার পৌঁছবার উপায় নেই, তার জন্য সেই নৈকট্য অনুভবপূর্ণ না হয়ে গুণগত হয়ে দাঁড়ায়। অর্থাৎ চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য অনুপাতে যে বস্তু নৈকট্য ও সম্পর্কের স্তর অর্জন করবে, ওই বস্তুই তার পূর্ণতাসমূহ থেকে সামর্থ্য অনুযায়ী অংশ পেতে থাকবে। আর এ পর্যন্তই প্রভাব, প্রাধান্য এবং নির্ভীকতা ও শ্রেষ্ঠত্ব তার অংশে আসতে থাকবে।

মাটি

এই মাপকাঠি অনুযায়ী যখন আমরা 'আনাসিরে আরবায়া'র মধ্য থেকে মাটির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করি, তখন সবচে' বেশি স্থূল উপাদান হিসেবে মাটিকে দেখতে পাই। যার উৎস হল এই জমিন। মাটির এই স্তূপ শুধু স্থূলই নয়; বরং স্থূলতা আরও আছে। যেকোন জিনিসের মধ্যে যদি স্থূলতা ও ঘনত্ব আসে, তাহলে এই মাটির বদৌলতেই আসে। আগুন আজও পর্যন্ত কোন বস্তুকে গান্দা ও ঘন করেনি। একথা আলাদা যে, আগুন দিয়ে পাকালে কোন বস্তুর মধ্যে ঘনত্ব এসে যায়। কেননা, এই ঘনত্ব আগুনের ভিতর থেকে আসে না। বরং আগুন বস্তুটির সূক্ষ্ম পদার্থ শুষে নেয়, ফলে তার আসল স্থূল উপাদানটি বাকি থেকে চোখে ধরা পড়ে এবং বস্তুটিকে স্থূল বলে অনুভূত হয়।

আগুন তার ভিতরে কোনকিছু ঢেলে দেয় না; বরং তা থেকে কিছু শুষে নেয়। কাজেই এই ঘনত্ব আগুনের মধ্য থেকে বেরোয় না; বরং স্বয়ং ওই বস্তুর মধ্য থেকেই আত্মপ্রকাশ করে, যখন আগুন তার সূক্ষ্ম পদার্থটি শুষে ফেলে। অনুরূপ পানি কোন বস্তুকে নোংরা ও ঘন করে না; বরং তার সাহায্যে ক্লেদ ও ময়লাসমূহ সাফ করা হয়। কেননা, তার মৌলিকতা হচ্ছে পবিত্রতা ও পবিত্রতা সাধন।

অনুরূপ বাতাসও কোন বস্তুকে নোংরা ও ক্লেদযুক্ত করতে পারে না। একথা ভিন্ন যে, বাতাসের মধ্যে অকল্পনীয়ভাবে মাটির অণুসমূহ মিলে গেল এবং কোন ঘনত্ব সৃষ্টি হল। সে ঘনত্বও কিন্তু জমিনের ক্রিয়াকর্ম; বাতাসের নয়। এজন্য শেষফলে সমস্ত স্থূলতার মূল ধুলো-মাটি হয়ে থাকে। যার সূক্ষ্মতার সাথে দূরবর্তী কোন সম্পর্কও নেই। এ কারণেই সাধারণ উপকরণগুলোর মধ্যে এর কোন প্রভাব নেই। আপনি পুরো জমিনের এই দৈর্ঘ্য-প্রস্থের বৃত্তটাই ধরুন, এর মধ্যে পদদলন, হীনতা ও অসহায়ত্ব ছাড়া আর কোন কৃতিত্ব দেখা যাবে না। দিনরাত এই জমিনকে পদদলিত করা হয়; কিন্তু এর হীনতা ও নীচুতার জগৎ এমনই যে, একটু রা-ও করতে পারে না সে। তার মধ্যে বুঝ নেই; অনুভূতি নেই; প্রভাব নেই; আধিপত্য নেই। প্রভাব যদি থেকে থাকে, তবে অন্য উপকরণগুলোরই রয়েছে তার উপর। যেন সমস্ত উপকরণগুলোর পদচারণা এর মাথার উপরে এবং এ মাটি প্রত্যেক উপকরণের খেলনামাত্র। বাতাস তাকে উড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়। পানি তাকে প্রবাহিত করে চলে। আগুন তাকে ঝলসে দেয়। কিন্তু ও একটু জোরও দেখাতে পারে না। জোর থাকলে তো দেখাবে। এর সমস্ত শক্তি তো নিরেট স্থূলতা খর্ব করে রেখেছে। জোর আসবে কোত্থেকে?

আবার সূক্ষ্মতা বঞ্চিত হওয়ার জগৎটাও এমন যে, তার প্রকৃতিও স্থূল এবং আকৃতিও স্থূল। তাকে যতই ঘষামাজা করুন না কেন, তার উপরিভাগ কিরকিরেই থেকে যাবে। না মসৃণতা গ্রহণ করবে; না দীপ্তি আসবে। এটি শুধু মৌলিক ও আকৃতিগতভাবেই স্থূল নয়; বরং স্বভাবের দিক থেকেও স্থূল। একটা মাটির ঢেলাকে কত জোরেই বা উপরের দিকে ছুঁড়ে দিবেন, যতক্ষণ নিক্ষেপকারীর অস্থায়ী শক্তি তার সাথে থাকবে, সে উপরের দিকে যেতে থাকবে; কিন্তু যখনই তার মৌলিক অবস্থা ও প্রকৃত স্বভাব ফিরে আসবে, তখনই সে নিচে নেমে আসবে। সুতরাং যেহেতু জমিনের আকৃতি ও স্বভাবের মূলে কোন প্রকারেই সূক্ষ্মতা নেই, কাজেই যেন মহাপবিত্র সত্তার সাথে এই ব্যাপারে তার পরিপূর্ণ দূরত্ব রয়েছে। তাই সম্পূর্ণ দুর্বলতা এবং পরিপূর্ণ হীনতা এই উপকরণের ভাগে আসাই সঙ্গত ছিল। এজন্য কুরআন মাজিদ জমিনকে শুধু হীন (ذَلِيْل) নয়; বরং হীনতর (ذَلُوْل) বলেছে। ذَلُوْل শব্দটি ذِلَّةٌ -এর ব্যাপকতাসূচক রূপ। আল্লাহ তায়ালার ইরশাদ–

هُوَ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ ذَلُوْلاً، فَامْشُوْا فِىْ مَنَاكِبِهَا.

তিনি তোমাদের জন্য জমিনকে অপদস্থ করে দিয়েছেন; কাজেই তোমরা তার পিঠের উপর হেঁটে বেড়াও। *[সূরা মুলক ৬৭ : ১৫]*

তবে এই জমিনেরই একটি অংশ পাহাড়। যার মাটি অর্থাৎ বালি ধুলো অপেক্ষা কিছুটা সূক্ষ্মতা ও পরিচ্ছন্নতা গ্রহণ করে কর্দমাক্ততা ও স্থূলতা থেকে কিছুটা দূরত্ব অর্জন করেছে। তাই তার মর্যাদা মাটির চেয়ে পরিমাণমত বৃদ্ধিও পেয়েছে। এখন শুষ্ক বালিকে ঝাড়ু দিলে ছড়িয়ে পড়ে। পানি ঢেলে দিলে কর্দমা হয় না। তার কণাগুলো দেখুন, তার মধ্যে চমকও সৃষ্টি হয়। তার উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করুন, দেখবেন মাটির চেয়ে নজরকাড়াও বটে। এমন কি কোন কোন সময় তার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন অবয়ব এবং ঝলক দেখে পানি ও সাগর বলেও সন্দেহ হয়। মোট কথা তার মধ্যে যে পরিমাণ সূক্ষ্মতা ও পরিচ্ছন্নতা এসেছে, সে পরিমাণই সে প্রিয়পাত্র হয়েছে; সে পরিমাণই তার মূল্য বেড়েছে। অতঃপর তার সমন্বয়ে যদি পাথর এবং বহু পাথরের সমন্বয়ে পাহাড় গড়ে উঠেছে, তবে তার মান-মর্যাদা এবং দাম ও মূল্য সমতল জমিনের চেয়ে বেশ দ্বিগুণ হয়েছে। কাজেই মাটির তুলনায় পাথরের শক্তির ভুবনটি এমন যে, মাটির বড় বড় ঢেলা বরং মাটির পরিপক্ব ইটকে একটি পাথর দিয়ে চুরমার করে দেওয়া হয়। কিন্তু মাটির স্তূপ পাথরের কিছুই করতে পারে না। যদি পাহাড়ের কোন খণ্ড জমিনের উপর পতিত হয়, তাহলে জমিন ধসে যায়; দেবে যায় এবং তার মধ্যে গর্ত তৈরি হয়। কিন্তু এর উল্টো মাটির বিশাল স্তূপ যদি কোন পাহাড়ের শিলাখণ্ডের উপর এসে পতিত হয়, তাহলে তাকে নাড়াতেও পারে না; তাকে ধ্বংস করে দেওয়া তো দূরের কথা, সে নড়েও না; তার মধ্যে গর্তও সৃষ্টি হয় না।

আবার এই পাথরগুলোর মধ্যে যতই স্বচ্ছতা, পরিচ্ছন্নতা ও দীপ্তি বাড়তে থাকবে, ততই তার মূল্য ও সুপ্ত শক্তিও উন্নত হতে থাকবে। খোঁদাইযোগ্য শিলা সাধারণ পাথরের চেয়ে মূল্যবান। মর্মর তার চেয়েও দামি। জহরত এবং লা'ল ও ইয়াকুত তার চেয়েও দামি। হীরা তার চেয়েও মূল্যবান। তফাত থাকলে তা ওই সূক্ষ্মতা-স্থূলতা এবং কর্দমাক্ততা-পরিচ্ছন্নতার উপর ভর করেই। জমিনের সমতল ভাগ তো এমন স্থূল ছিল যে, তা যতই ঘষামাজা দেন না কেন; করস্পর্শে পরিপূর্ণ কোমলতা কখনও অনুভূত হবে না। কিন্তু পাথরসমূহের মধ্যে মৌলিক সূক্ষ্মতার কারণে এই উপযুক্ততা অবশ্যই আছে যে, যদি সেগুলোকে ঘষামাজা দেন, তাহলে মাখনের মত মোলায়েম ও কোমল হয়ে যায়। কোনটার মধ্যে চমক সৃষ্টি হয় এবং কোনটা আয়নার মত প্রতিচ্ছবিও দেখাতে শুরু করে। সুতরাং পাথর যে পরিমাণ পরিচ্ছন্নতা সংগ্রহ করেছে, সেই পরিমাণই তার মধ্যে শক্তি ও বল সৃষ্টি হয়েছে।

যা হোক, পাহাড় ও তার মূল উপাদান মাটি এবং ধুলোর তুলনায় সূক্ষ্ম, এজন্য শক্তিশালীও। এবং জমিনের চেয়ে বেশি শক্তি, সামর্থ্য ও বলের অধিকারী। আর

তাই শক্তি ও বলের মাপকাঠি হিসেবে ওই সূক্ষ্মতা ও পরিচ্ছন্নতাই বেরিয়ে এল। কিন্তু এই পাহাড় এবং তার শক্তিধর পাথর– যেগুলোর সামনে জমিনের কোন জোরই খাটে না এবং পদদলিত করার বস্তুমাত্র– ওই সময় পর্যন্তই শক্তিশালী, যে পর্যন্ত জমিনের ধুলো-মাটির সাথে ওগুলোর মোকাবিলা হবে। যদি কখনও পাহাড়ের এই শক্তিশালী ও দীর্ঘ প্রস্তরমালার মোকাবিলা লোহার সাথে হয়, তাহলে ওগুলোর এসব পাষণ্ডতা হাওয়ায় মিলে যায়। আধহাত লোহার একটি কোদাল কয়েক মিনিটের মধ্যে বড় বড় প্রস্তর-মালার ফয়সালা করে দেয়। ভারি ভারি পাথরের চুরমার হতে সময়ের প্রয়োজন হয় না। রেলগাড়ির পায়ের দুইধারের এই লক্ষ লক্ষ মণ পাথরের স্তূপ ওই পাহাড়গুলোর কলজের টুকরো। যেগুলোকে ছোট ছোট কোদালের বরকতে মাটি ও লাইন সংরক্ষণের জন্য খেদমতে লাগিয়ে রাখা হয়েছে। ওগুলো অসীম উচ্চতা থেকে নামিয়ে নিঃসীম নিম্নতায় স্থাপিত হয়েছে। এই পাথরগুলোর উপর লোহার কোদাল এমনভাবে পড়ে, যেমন কোন হাতপা বাঁধা কয়েদির মাথায় দোররা ও বেত্রাঘাত পড়ে, অথচ সে কিছুই করতে পারে না। এ থেকে স্পষ্ট হয় যে, লোহা পাথরের চেয়ে বেশি শক্তিধর ও বলিয়ান। কেন? এর রহস্যও সেই সূক্ষ্মতা। লোহার কণা সৃষ্টিগতভাবে পাথরের কণার চেয়ে বেশি স্বচ্ছতা ও পরিচ্ছন্নতা কবুল করেছে। আর তার মধ্যে মাটি তো দূরে থাক, বালির মতও স্থূলতা নেই। লোহার চূর্ণ উড়ে উড়ে নানা বস্তুকে নোংরা করে না। বালি যদি পানিতে পড়ে, তবে শেষ পর্যন্ত কিছুটা হলেও তাকে ক্লেদযুক্ত করে, কারণ আর না হোক মাটিই তো। কিন্তু লোহার টুকরোকে চূর্ণ করেও যদি পানিতে ফেলা হয়, তবুও তার দীপ্তি এবং তারল্য ও প্রবাহে কোন তফাত সৃষ্টি হয় না। যদি লোহাকে পালিশ করা হয়, তাহলে রূপোর মত দীপ্তিময় হয়ে ওঠে। বরং শান দিলে তা আয়না হয়ে যায়– যা সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্ম লোমকূপেরও পর্যন্ত প্রতিচ্ছবি দেখাতে শুরু করে। কিন্তু পাথরের মধ্যে এমন পালিশ গ্রহণ করারও উপযুক্ততাও নেই; এরকমভাবে স্বচ্ছ হওয়ারও সামর্থ্য তার মধ্যে নেই। সুতরাং পাষাণ পাথর যদি বস্তুসত্তার আপদমস্তক দেখাতে পারে; তবে লোহা সেই আপদমস্তকের সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্ম সৌন্দর্যও দেখাতে পারে। কাজেই লোহার সূক্ষ্মতা পাথরের চেয়ে অনেক বেশি প্রমাণিত হল। যা হোক, এই সূক্ষ্মতার উপর ভর করেই লোহা পাথরের চেয়ে বলিয়ান ও শক্তিশালী। আর পাথর স্থূলতার কারণে তার সামনে হীন ও তুচ্ছ। তাই বড় থেকে বড় পাহাড় তার দেখার মত দেহ ও প্রভাব থাকা সত্ত্বেও সামান্য লোহার সামনে নিজের অপারগতা লুকাতে পারে না।

আগুন

কিন্তু এই শক্তিশালী লোহা, যার ছোট ছোট টুকরো বড় বড় পাহাড়কে হার মানিয়ে রেখেছে– সে ততক্ষণ পর্যন্ত শক্তিশালী যতক্ষণ পাথরের মাথার উপর থাকবে। কিন্তু যদি এই লোহাকে কখনও আগুন স্পর্শ করে বা লোহার বড় থেকে বড় টুকরো কোন কর্মকারের চুল্লির ভিতর পৌঁছে, তাহলে রঙ-রূপ পরিবর্তন এবং চেহারা ফিকে হয়ে যায়। সে তার শ্রেণীগত আকৃতি এবং স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য পর্যন্ত ধরে রাখতে পারে না। আগুন তার কলজে পর্যন্ত প্রবেশ করে তাকে স্ববর্ণের আগুন বানিয়ে ফেলে। তারপর সেই অসহায় লোহাকে যদি কিছুক্ষণের মধ্যে আগুনের ভিতর থেকে বের না করা হয়, তাহলে আগুন তাকে গলিয়ে পানির মত প্রবাহিত করে দেয়। তার শক্তি ও রুক্ষতার কিছুই সামনে এগোয় না। এখন তাকে কেউ বলুক যে, পাহাড়ের ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্র কোন টুকরোর মাথা চূর্ণ করে দাও!

এ থেকে অনুমান করা যায় যে, আগুন লোহার চেয়েও শক্ত ও শক্তিশালী। চিন্তা করে দেখুন, তার রহস্যও সেই যুক্তিসঙ্গত এবং স্বভাবগত মূলনীতিটি যে, আগুনের মধ্যে লোহার চেয়ে বেশি সূক্ষ্মতা বিদ্যমান এবং লোহা তার মোকাবিলায় স্থূল। লোহার মধ্যে যদিও এতখানি সূক্ষ্মতা ছিল যে, সে পাথরের মত মৌলিকভাবে স্থূল হওয়া সত্ত্বেও আনুষঙ্গিক বিষয়াদির কারণে কোমলতা ও মসৃণতা কবুল করেছিল, কিন্তু আগুন সত্তাগতভাবে কোন ঠাসা দেহ রাখে না, যার মধ্যে কোনকিছু প্রবেশ করতে বাধগ্রস্ত হবে। একদিকে প্রত্যেক বস্তু আগুনের কলজের মধ্যে প্রবেশ করতে পারে; অন্যদিকে আগুনও প্রত্যেক বস্তুর কলজে পর্যন্ত ছড়াতে পারে। যেই উপযুক্ততা লোহার মধ্যে নেই। আবার লোহা যদি কখনও ঝলকে উঠে বাইরের নূরানী রশ্মি কবুল করে নেয়; তবে আগুনের সূক্ষ্মতার জগৎটি এমন যে, তার মধ্যে আপনাআপনি রশ্মি ফেপে ওঠে। অর্থাৎ লোহা অন্যদের থেকে রশ্মি গ্রহণ করে; আর আগুন নিজের রশ্মি অন্যদের উপর ঢেলে দেয় এবং অন্যসব অন্ধকার বস্তুকে আলোকিত করতে পারে। পরিচ্ছন্ন লোহা– যাকে আয়না বলে, তার আকৃতির সূক্ষ্মতা সত্ত্বেও সে এতখানি মোটা ও স্থূলদেহী যে, যদি তার উপর হাত মারেন, তবে হাত টক্কর খেয়ে ফিরে আসে। কিন্তু আগুনের শারীরিক সূক্ষ্মতার দুনিয়াটি এমন যে, তার শরীরের ভিতর দিয়ে হাত এপাশ ওপাশ হয়ে বের হয়ে যায়; অথচ তার শরীর ভাঙে না। আবার পরিচ্ছন্ন লোহা শুধু প্রতিচ্ছবিই গ্রহণ করে; কিন্তু আগুন প্রকৃত শরীরটিকেই গ্রহণ করে এবং তারপরও তার শরীরে ফাটল পাওয়া যায় না। আর সে কোন দেহের অনুপ্রবেশের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকও হয় না। এজন্য সে লোহার চেয়ে শক্ত এবং

অধিক শক্তিশালী; বরং সে ওই সূক্ষ্মতার সীমা অনুসারেই নিজের কার্যক্ষমতার বৃত্তেও অন্যান্য স্থূল বস্তুর তুলনায় প্রশস্ততার অধিকারী হয়ে আছে। পাথর ও লোহা যেখানে স্থাপিত, অতখানি জায়গা-ই তা দিয়ে পূর্ণ হয়; কিন্তু আগুন যেখানে থাকে তার বাইরে পর্যন্ত তার নূরানী বিম্ব ও শুষ্কতা পৌঁছে যায়। যদি আগুন ও তার স্থান দৃষ্টির বাইরেও থাকে, তবুও তার বিচ্ছুরিত বিম্বের সমাহার তার অস্তিত্বের খবর দূর দূরান্ত পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। এজন্য আগুন লোহার উপর প্রভাবশালী এবং তাকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারে।

পানি

কিন্তু এই দগদগে আগুন ও তার আড়ম্বর তখন পর্যন্তই বিদ্যমান থাকে, যখন তার আশে-পাশে কোথাও পানির চিহ্ন না থাকে। যদি পানির কয়েকটি ফোঁটা তার উপর এসে পড়ে, তাহলে আগুনের চাকচিক্য ও ধুমধাম শুধু মাথা নীচুই করে না; বরং সব খতম হয়ে যায়। পানি তার অস্তিত্বকেই টিকে থাকতে দেয় না, কিছুটা ফেঁপে উঠবে তো দূরের কথা। বরং যে লাকড়িটার একটু পরে আগুন থেকে জান বাঁচানো দায় ছিল, সে পানির চাদর পরিধান করল তো সে সিক্তই হয়ে গেল। আগুন ঝলকানি মারতে থাকবে; কিন্তু ভিজে লাকড়ির উপর তার কোন কর্তৃত্ব চলবে না।

কাজেই যেথায় পানি মজুদ থাকে, সেথায় আগুনের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। চাই পানি আগুনের উপর ছিটিয়ে দিন, অথবা আগুন পানির মধ্যে ছেড়ে দিন। এমতাবস্থায় আগুনের যথার্থতা থাকে না। অনেক বড় অঙ্গার পানির মধ্যে ছেড়ে দিন, দেখবেন তা পড়তে পড়তেই পানি এদিক ওদিক থেকে সটকে পড়বে এবং কিছুক্ষণের মধ্যে চারদিক থেকে ঘিরে ধরে ওই অঙ্গারকে পরাস্ত করবে। তখন সে অসহায় কালো হয়ে থমকে যাবে। মোট কথা, এ তার সামনে আসুক বা সে এর সামনে পড়ুক, সর্বাবস্থায় পানির শক্তির সামনে আগুনের আলোক বিচ্ছুরণ কোন প্রকার কার্যকর নয়। যার কারণে আগুনের উপর পানির রুদ্রতা ও শক্তি প্রমাণিত হয়। কিন্তু এই জয়-পরাজয়ের প্রাণ এখানেও ওই মূল নীতিটিই, যেটি আমরা একটু আগে উল্লেখ করে এসেছি। আগুন তার শারীরিক সূক্ষ্মতার কারণে কোন বস্তুকে নিজের ভিতর লুকিয়ে ফেলতে পারত; কিন্তু তার চেহারা এতটা স্বচ্ছ ছিল না যে, কোন জিনিসের প্রতিচ্ছবি সে গ্রহণ করতে পারে। তবে পানি প্রতিচ্ছবি ও মূল, উভয়টিকেই নিজের মধ্যে গ্রহণ করতে পারে। কেননা, সে কেবল মৌলিকভাবেই সূক্ষ্ম নয়; বরং আকৃতিগতভাবেও

সূক্ষ্ম। অর্থাৎ যা-ই আপনি তার মধ্যে ফেলে দিবেন, তা-ই তার কলজে এবং গভীরে গিয়ে আশ্রয় নিবে। আবার স্বচ্ছতা ও তরলতা সত্ত্বেও তার চেহারা বা উপরিভাগ এমন পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন যে, আয়নার মত প্রতিচ্ছবিও দেখাতে পারে। পানির এই বৈশিষ্ট্য যে, প্রত্যেক বস্তু তাকে ভেদ করতে পারে– যদিও আগুনের মধ্যেও পাওয়া যায়; কিন্তু পানির সূক্ষ্মতার পূর্ণতা এই যে, তাকে দৃষ্টি পর্যন্তও ভেদ করতে পারে, যা আগুনের মধ্যে সম্ভব নয়। সুতরাং পানি লোহার প্রতিবিম্বায়ণ এবং আগুনের ছেদগ্রহণ, উভয় সূক্ষ্মতার সমন্বয়ক। এজন্য তার শক্তিও আগুন ও লোহার শক্তির চেয়ে বেশি। এটাই কারণ যে, সে আগুন ও লোহা– উভয়কে খতম করে দিতে পারে; কিন্তু এ দু'টি তার উপর প্রভাব ফেলতে পারে না। আর এ কারণেই পানির কার্যকারিতার বৃত্তও আগুনের চেয়ে বেশি প্রশস্ত।

যদি আগুনকে কোন আবদ্ধ এবং সীমিত জায়গায় জ্বালানো হয়, তাহলে তার কার্যকারিতা সেই জায়গার চার দেয়ালের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। কিন্তু পানি যেখানে আবদ্ধ, তার বাইরে দূর দূরান্ত পর্যন্ত আর্দ্রতা ও সিক্ততার প্রভাব ছড়িয়ে থাকে। শহরের পাশে কোথাও যদি দীঘি বা নদী থাকে, তাহলে শুধু বাতাসই নয়; বরং মানুষের মেজাজ পর্যন্ত আর্দ্র হয়ে থাকে। আর একথা স্পষ্ট যে, এগুলো তার সূক্ষ্মতা ও দ্রুত অনুপ্রবেশের কারিশমামাত্র। লোহা এবং আগুন লোমকূপের মধ্যে প্রবেশ করে না; কিন্তু পানি বিশেষ সূক্ষ্মতার কারণে মিহি থেকে মিহি ক্ষেত্রকেও ঘিরে ফেলে। আর যেহেতু প্রভাব ও শক্তি সূক্ষ্মতার পরিমাণের উপর নির্ভরশীল, সেহেতু পানির শক্তিও নিঃসন্দেহে আগুনের চেয়ে অনেক গুণ বেড়েই থাকবে।

বাতাস

এখন সামনে চলুন। এই পানি, যে আগুনের কোন রকম তোয়াজ-তোয়াক্কা করে না– বাতাসের সামনে সে অপারগ, অসহায় এবং মিসকীন। সে তার সামনে যেতেও সাহস করে না। চলন্ত বাতাসের মধ্যে যদি সে নীরব থাকতে চায়; তাহলে তা পারে না। বাতাসে বেগ থাকলে শুধু দীঘি ও ঝিলগুলোই নয়; বরং বড় বড় সাগর পর্যন্ত ওলট-পালট হতে থাকে। পানির ঊর্মিমালা– অর্থাৎ ঝাঁকের পর ঝাঁক একটা অন্যটার উপর আছাড় খেতে থাকে। সাগরের সুমহান ভুবন তার বিশালতা ও দাপট সত্ত্বেও স্থির হতে পারে না। আবদ্ধ পানি হলে বাতাস তাকে শুকিয়ে ফেলে এবং উড়িয়ে দেয়। যদি পানির কোন নির্ঝর এবং উৎস না

থাকে– যা তাকে সাহায্য করবে, তাহলে পানির অস্তিত্বই টিকে থাকতে দেয় না। এ থেকে বুঝা গেল যে, বাতাস পানির উপরে প্রভাবশালী এবং নিয়ন্ত্রক। মূলনীতি ওই একটিই, তা হল বাতাস সমস্ত উপাদান থেকে সর্বাধিক সূক্ষ্ম ও পরিচ্ছন্ন। কেননা, তার সূক্ষ্মতার ভুবনটি এমন যে, দৃষ্টির মত সূক্ষ্ম বস্তুও তার সূক্ষ্মতার সামনে স্থূল। দৃষ্টি তার উপর স্থির হতে পারে না এবং বাতাসকে দেখতে সক্ষম হয় না। শরীরে লেগে যদিও বাতাস অনুভূত হয়– যার কারণে তার দেহ থাকার বিষয়টি অস্বীকার করা যায় না; কিন্তু অন্যকোন সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয় এমনকি দৃষ্টির সূত্র– যা সর্বাধিক সূক্ষ্ম দেহ– তাও তার মধ্যে স্থির হতে পারে না; পারে না তাকে বুঝে নিতেও। এমনইভাবে বাতাস তার কঠিন সূক্ষ্মতার কারণে রঙ-রূপও কবুল করে না। কেননা, এসব বস্তু আর না হোক, দৃষ্টি ও নজরের সাথেই সম্পৃক্ত; আর সে তো দৃষ্টিকে গ্রহণই করে না। তাহলে দৃষ্টির সাহায্যে অনুভূত বস্তুর কথা আসতে পারে কিভাবে? তবে আওয়াজ ও ঘ্রাণের মত সূক্ষ্ম বস্তুসমূহ– যেগুলোর অনুভবযোগ্য কোন আকার-আকৃতি নেই, সেগুলো বাতাসের সাথে সমঝোতা করে নেয় এবং নিজেদের সূক্ষ্মতার সূত্র ধরে বাতাসের মধ্যে অনুপ্রবেশ করে। সেগুলোকে বাতাস কবুল করে এদিক ওদিক স্থানান্তরিত করে দেয়।

বাতাসের কার্যকারিতার ভুবনটি এমন যে, সে উপর-নিচের প্রতিটি রন্ধ্রে রন্ধ্রে এবং একেকটি কোণে কোণে উপস্থিত। যেখানে আগুনের আলো এবং পানির আর্দ্রতা পৌঁছতে পারে না, সেখানে বাতাস উপস্থিত এবং সে উপস্থিতি চিরন্তন। কোথাও সামান্য ফাঁকা সৃষ্টি হলে, সেখানে বাতাস পৌঁছতে সময় লাগে না। পানি নিতে হলে নালা বানাতে হয়; পাগাড় তৈরি করতে হয়। তারপরও পানির গমনাগমন সময়সাপেক্ষ। কিন্তু বাতাসের জন্য আগাড়-পাগাড়ের প্রয়োজন নেই; জায়গা পেলেই সে একেবারে এসে হাজির। কেমন যেন সে আগে থেকেই মজুদ ছিল। মোট কথা, বাতাস সূক্ষ্মতর এবং অধিক শক্তিশালী ও প্রভাবশালী। যে কিনা সমস্ত উপাদানের নিয়ন্ত্রক; সবার উর্ধ্বে এবং সবগুলোর মধ্যে বিরাজমান।

সমস্ত উপাদানের আধার মানুষ ও তার শক্তি

কিন্তু যদি এই সমস্ত উপাদান [আনাসির] এবং এগুলোর ত্রিমাত্রিক উৎপাদন [মাওয়ালিদে সালাসা] এবং সেগুলোরও সীমাহীন শাখা-প্রশাখাকে একদিকে রেখে শুধু ইনসানকে একদিকে রাখা যায়, তাহলে দেখা যায় যে, ইনসান ওই সবগুলো থেকেই অধিক শক্তিশালী এবং ওগুলোর উপর প্রভাবের অধিকারী ও কর্তৃত্বকারী। এসব উপাদান নিজেদের কার্যকারিতার ক্ষেত্রে তার মুখাপেক্ষী এবং

তার কাছে পরাজিত। কিন্তু সে ওগুলোর কোনটির কর্তৃত্বাধীন নয় এবং কারও কাছে প্রভাবিত নয়। কেননা, প্রথমত উপাদানসমূহের পারস্পরিক ও তুলনামূলক শক্তি– যা একটি অন্যটির মোকাবিলায় আসার কারণে উম্মোচিত হয়– তা নিজের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র প্রকাশের ক্ষেত্রে মানুষের কাছে মুখাপেক্ষী। লোহা নিজে নিজে পাথরকে চূর্ণ করতে পারে না। আগুন যেখানে সেখানে নিজে থেকে লোহাকে গরম ও গলিয়ে বেড়ায় না। পানি স্বেচ্ছায় আগুনকে নিভাতে যায় না। বাতাসের এই সব ছোট-ছোট সংঘাতময় নড়াচড়া নিজ থেকে হয় না; বরং মানুষের কারণে হয়। সে-ই কোদাল বানায় এবং পাথর চূর্ণ করে। সে-ই চুল্লি বানায় এবং লোহাকে গরম করে। সে-ই মশক ও পাত্রের মধ্যে পানি তোলে এবং চুলো ঠাণ্ডা করে। অতএব, মূল উপাদানসমূহের আধিপত্যভিত্তিক কার্যকারিতা বহুদূর পর্যন্ত মনুষ্য হস্তক্ষেপের অধীন। মানুষ যদি সেগুলোর মধ্যে হস্তক্ষেপ না করে, তাহলে [আনাসিরে আরবায়া] মূল উপাদান চতুষ্টয় নিজ নিজ ভাণ্ডারে ইচ্ছেমত পড়ে থাকতে পারবে; কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বের ময়দানে পৌঁছে ওইসব ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কার্যাবলির মধ্যে নিজের আধিপত্য দেখাতে পারবে না। কাজেই যার উপর কোন প্রভাবশালীর প্রভাব রুদ্ধ এবং যার উপর কোন শক্ত বিজয় ও সহযোগিতা নির্ভরশীল, স্পষ্ট কথা যে, সে ওই সবের উপর প্রতাপশালী হবে এবং এই নির্ভরশীলতাই হবে তার প্রতাপাধিক্যের সবচে' বড় দলিল।

আনাসিরে আরবায়ার উপর মনুষ্য হস্তক্ষেপ

দ্বিতীয়ত, শুধু এ-ই নয় যে, মানুষ ওগুলোর পারস্পরিক সম্পর্ক উন্মোচনের একটি মাধ্যমমাত্র; বরং ওগুলোর এসব শক্তিও তার হস্তক্ষেপ ও বশক্ষমতার মধ্যে বন্দী। সে জমিনের হৃদয় ও কলজে বিদীর্ণ করে দিয়েছে। কুয়ো বানিয়েছে। রাস্তা বানিয়েছে। বাংকার তৈরি করেছে। ভূগর্ভস্থ খনিজসম্পদ– সুরমা, হড়তাল, সোনা, রূপা এবং পিতল ইত্যাদির ভাণ্ডার তার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছে। পাহাড়-পর্বত কেটে কেটে ভাঁজে ভাঁজে ঘরবাড়ি বানিয়েছে। পাহাড়-পর্বতের শীতল ও হিমেল চূড়ায়– যেখানে হিংস্র প্রাণীরও আশ্রয় ছিল না, সেখানে নিজের বসতঘর বানিয়ে রাস্তা বের করেছে। ওগুলো ফুটো করে সেখানে সুরঙ্গ বানিয়েছে। সেখানে নিজেদের যানবাহন পর্যন্ত দৌড়িয়েছে।

وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا

এবং তোমরা তো পাহাড়-পর্বত কেটে ঘর-বাড়ি বানিয়ে থাকো। *[সূরা আরাফ ৭ : ৭৪]*

জমিনের ভাণ্ডার ও গুপ্তধনসমূহের ভেদ ফাঁস করে জমিনের সুপ্ত রহস্যগুলোকে দৃশ্য জগতে এনে ছেড়েছে। জমিন ও তার নানা অংশ থেকে সে চাকর ও গোলামের মত খেদমত গ্রহণ করছে। পানির কথাই ধরুন, তাকে জমিনের ভাঁজ থেকে টেনে বের করেছে। কুয়ো খুড়ে বালতি ও রশীর জালে তাকে আটক করেছে। নল লাগিয়ে হাজার হাজার ফুট নিচে থেকে উপরে টেনে তুলেছে। সাগরের ঊর্মিমালাকে টুকরো টুকরো করে দিয়েছে। নদ-নদী ও খালবিলের ভিতরে প্রবাহিত করে খেত-সিঞ্চন করেছে; ঘরবাড়ি ঠাণ্ডা করেছে। পান করে কলজে শীতল করেছে। যমুনা এবং গঙ্গা এখানে-সেখানে দাপট নিয়ে চলাচল করে, ওদেরকে ওয়াটার কেইসের সাহায্যে ঘাটে ঘাটে অপমান করেছে। ওরা ছিল মায়ের মত; কিন্তু যেখানে সেখানে ওদের এই [মনুষ্য] সন্তানরা ওদের দিয়ে মলমূত্র ধুইয়ে ছেড়েছে। পানির মত স্বাধীন উপাদান টাঙ্কির মধ্যে বন্দী, নলের মধ্যে আবদ্ধ এবং বের হওয়ার জন্য চাবি নাড়ার প্রতি মুখাপেক্ষী– এগুলো সব মানুষের বশকরণের ফল। অসহায় পানি নিজের স্বভাব অনুযায়ী নিচের দিকে নামে, আর এ তাকে বিশ-পঁচিশ তলা ভবনের উপরে নিয়ে যায়। আবার সেখান থেকে ফোঁটা ফোঁটা করে ছাড়ে। সে কখনও তাকে বরফ বানিয়ে জমিয়ে দিয়েছে। কখনও বাষ্প বানিয়ে উড়িয়ে দিয়েছে। কখনও আগুন জ্বেলে গরম করেছে। মোট কথা, ওই পানি যা থেকে আগুনের মত শক্ত উপাদানও আশ্রয় খুঁজছিল, মানুষের সামনে সে এমনই অসহায় এবং নিস্ব ও মিত্রহীন যে, তার লুকোবার সুযোগটি পর্যন্ত নেই।

পানির সবচে' বড় উৎস এবং পানির জনক বিশাল সমুদ্র, যার আশ্রয়হীন বড়ত্বের কাছে পৃথিবীর স্থলভাগ যেন এককোণে পতিত এবং যার পাহাড়সম বিরামহীন ঢেউয়ের পরম্পরা স্থলের কূলে এভাবে আছড়ে পড়তে দেখা যায় যে, মনে হয় এখনই জমিনের খণ্ডটিকে গিলে ফেলবে। এরকম প্রভাব ও বড়ত্ব থাকা সত্ত্বেও মানুষের হস্তক্ষেপ থেকে সে বাঁচতে পারেনি। মানুষ সাগরের বুক চিরে ফেলেছে; তার ভিতর জাহাজ চালিয়েছে। ডুবো জাহাজের সাহায্যে তার গভীর পর্যন্ত কব্জা করেছে। তার গুপ্ত রত্নভাণ্ডার বের করেছে। তার ভাঁজের ভিতরের সুপ্ত বস্তুগুলো বাজারে বাজারে অপদস্থ হচ্ছে। এমনকি সাগরের লোনা পানিকেও দুরস্ত করে ফেলেছে; তার লবণ আলাদা করেছে, আলাদা করেছে তার আর্দ্রতাকে। কেমন যেন সে পানির রক্ত পর্যন্ত পান করেছে। এবং তারপর তার সমস্ত পদার্থকে আলাদা করে ফেলেছে। মোট কথা, এই শক্তিধর পানি জমিনের তলদেশে গিয়ে লুকায়, তবুও তার আশ্রয় নেই। পাহাড়ের আঁচলে আশ্রয় নেয়, তবুও তার রেহাই নেই। সে অপারগ এবং বন্দীও। আবার নীচু থেকে নীচু খেদমতসমূহ

তার কাছ থেকে নেওয়া হচ্ছে। বর্জ্য ধৌত করা, বাসনকোসন সাফ করা, নোংরা কাপড় পরিচ্ছন্ন করা ইত্যাদি তার মাথায় অর্পিত। এ থেকে অনুমান করা যায় যে, মনুষ্য শক্তি এই সূক্ষ্ম উপাদানকে কোন্ পর্যন্ত নিজের গোলাম এবং অনুগত কয়েদি বানিয়েছে।

আগুনের মত রক্তচোষা উপাদানকে দেখুন, সে মানুষের সামনে একজন অসহায় গোলামের মত অপারগ। সে লোহা ও পাথরের মধ্যে গিয়ে লুকিয়ে থাকে, তবুও মানুষ লোহা ও পাথরকে ঘষা দিয়ে আগুনের লুকানো স্ফুলিঙ্গ বের করে ফেলে। সে সূর্যের মধ্যে গিয়ে লুকিয়েছে; মানুষ তাকে আতশি কাচের সাহায্যে ধরে এনেছে। আবার যখন সে নিজে তাকে গোপন ও বন্দী করতে শিখেছে, তখন একটি তুচ্ছ দিয়াশলাইয়ের আগায় এক রতি পরিমাণ বারুদের মধ্যে বন্দী করে ফেলেছে। যখন ইচ্ছে হল দিয়াশলাইয়ের আগা ঘষা দিল এবং সেই কয়েদিকে বের করে আনল। কেমন যেন ওই আগুন, যে মাথাই নত করতে চাচ্ছিল না, মানুষের সামনে এসে সে খড়কুটো খুঁজতে লাগল এবং তার ঊর্ধ্বমুখিতা ও শ্রেষ্ঠত্ব মাটিতে মিশে গেল। কোথাও চুলার মধ্যে সে মানুষের সেবা করছে, কোথাও সে আগুনদানীর মধ্যে বন্দী, কোথাও মানুষ তার আত্মশুদ্ধি করেছে; আগুনের গ্যাস বানিয়েছে– ফলে তার ধোঁয়া-ভাপ সব চলে গেছে। মোট কথা, আগুনের উপাদানও মানুষের হাতের খেলনা। যখন সে চেয়েছে, যেভাবে চেয়েছে তাকে ওলট-পালট করে দিয়েছে। কোন অবস্থায়ই তার নিরাপত্তা নেই।

বাতাস ছিল খুব বেশি সূক্ষ্ম এবং সুপ্ত, যার উপর মানুষের দৃষ্টি পর্যন্ত সফল হচ্ছিল না। কিন্তু তার এই আবরণ তাকে মানুষের হাত থেকে বাঁচাতে পারেনি এবং এই উড়ন্ত পাখিকেও মানুষের হাতের খেলনা হতে হয়েছে। বাতাসের শূন্যতার মধ্যে মানব-জাতির জাহাজ উড়ছে এবং বাতাস নিজের কাঁধে তাদেরকে বহন করে বেড়াচ্ছে। বাতাস কী? মানুষের একটি হাওয়াই ঘোড়ামাত্র, যার উপর সে লাগামহীনভাবে যানবাহন চাপিয়ে দিচ্ছে। মানুষের খবর পৌঁছানোর জন্য সে স্বতন্ত্রভাবে বাধ্য। পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত মানুষের নানা সংলাপ বিরাজমান, আর বাতাস তার সুপ্ত শক্তির মাধ্যমে সেগুলোকে বয়ে বেড়াচ্ছে। যেন সে মানুষের একটি ডাকব্যবস্থা, যা বিনা মজুরিতে গোলামি করছে। অন্যদিকে বৈদ্যুতিক পাখাগুলোকে নাড়াবার জন্য আলাদাভাবে সে নৃত্য করছে, যাতে মানুষের ঘাম শুকানোর খেদমত আঞ্জাম দেয়। সার কথা, সেবাদানের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে সে চাকরের মত ব্যবহৃত হয় এবং কোন প্রতিবাদও করতে পারে না। এরপর মানুষ তাকে বন্দী করার জন্য মাঠে নেমেছে। সে এখন মটরের ইঞ্জিনের মধ্যে বন্দী, সাইকেলের টায়ারের মধ্যে বন্দী, বাসন-কোসনের

মধ্যে আবদ্ধ এবং রাবারের বেষ্টনীর ভিতর আটক। মোট কথা, এই না-দেখা শক্তি, যে নাকি সাগর-মহাসাগরকে ওলট-পালট করে রেখেছিল, সে ফেঁসে গেল। এমনই ফেঁসে গেল যে, মানুষের হাতে এসে নিছক এক কয়েদিতে পরিণত হল। যার কুশল জানারও কেউ নেই।

মূল উপাদানে মানুষের উদ্ভাবন

তৃতীয়ত, এই জালেম মানুষ এতটুকুতে সন্তুষ্ট হল না যে, মূল উপাদানগুলোকে যথাস্থানে রেখেই ওগুলো থেকে কাজ নিতে থাকবে; বরং নিজ উদ্ভাবন-প্রেমের জযবায় ওগুলোকে ধ্বংস করে এবং ওগুলোকে পরস্পর মুখোমুখি করে নতুন নতুন বস্তু বাস্তব জগতে আনতে লাগল। যাতে দুনিয়ার অন্যান্য গুপ্ত ভাণ্ডার থেকেও নিজের গোলামি করাতে পারে। আগুন আর পানির মাঝখানে লোহার পর্দা ফেলে দিয়ে আগুন জ্বালিয়ে দিল। আগুন তো উত্তেজনার ভিতর পানিকে উড়িয়ে দিতে চায়, আর পানি পর্দা খুলে আগুনকে ঠাণ্ডা করে দিতে চায়, উভয়ে নিজ নিজ স্থানে রাগ-গোস্বায় মরে, আর মানুষ ওদের উত্তেজানাকে পুঁজি করে স্টিমের শক্তি সৃষ্টি করে ইঞ্জিন ও মেশিন পরিচালনা করছে। লাখ লাখ টন লোহা এই তাপের সুপ্তশক্তির উপর নৃত্য করছে। কল চলছে; মেশিন ঘুরছে। ইঞ্জিনের মধ্যে কয়লার খনি পুড়ছে; মেশিনের মধ্যে শষ্য ও জমিনের উদ্ভিদ জমছে। যেন সমস্ত সৃষ্টি মোথিত হচ্ছে; গলাকাটা দিচ্ছে; বিলীন হচ্ছে, কিন্তু উহ পর্যন্ত করতে পারছে না। একটা মানুষের বাচ্চা মেশিনের কল চালিয়ে রেখেছে, যার একটি আঙুলের নাড়াচাড়ায় আনাসিরে আরবায়া এবং মাওয়ালিদে সালাসার উপর এই তুফান বয়ে যাচ্ছে।

আবার পানিকে পানির মুখোমুখি করেছে এবং বিদ্যুৎ উৎপাদন করেছে। কেমন যেন পানির মধ্যে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। অতঃপর সেই বিদ্যুৎ, যা কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে দেশ-দেশান্তরের খবর সংগ্রহ করে এবং আসমান-জমিনকে এক করে ফেলে, তাকে তামা এবং পিতলের একটি পাতলা তারের মধ্যে এমনভাবে আবদ্ধ করে রেখেছে যে, সে এত শক্তিধর হওয়া সত্ত্বেও ওই বন্ধনীর বাইরে যেতে পারে না। একটি ছোট্ট ঘুণ্টি, যাকে সুইচ বলা হয়, সে হচ্ছে তার তালা। তাকে নিচে নামিয়ে দিন, তাহলে বিদ্যুৎ হাজির এবং উপরে উঠিয়ে দিন, তাহলে গায়েব। কেমন যেন বিদ্যুৎব্যবস্থার এক বিশাল ফৌজ হালকা-পাতলা এক সিপাহির হাতে বন্দী। আর সেই পুরো ফৌজ তার কিছুই ক্ষতি করতে পারছে না। আবার শুধু এই কৃত্রিম বিদ্যুৎ নয়; আসমানী বিদ্যুৎকেও গ্রেফতার

করার জন্য মানুষ হাতকড়া ও বেড়ি নিয়ে প্রস্তুত। বড় বড় বিল্ডিংয়ের উপর সূক্ষ্ম তার বিছানো আছে। যদি এই ভয়ানক বিদ্যুৎ কখনো বিল্ডিংয়ের উপর এসে পড়ে তাহলে এই সাধারণ তার তাকে প্রতিরোধ করে এবং সে বিল্ডিংকে সামান্য চোখের কোণাও দেখাতে পারে না; বরং ঐ তারের মধ্যে দুমড়ে মুচড়ে যায়। এমনিভাবে মানুষ পেট্রোলের মত তরল ও প্রবাহিত বস্তুর মধ্যে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। আগুন এবং তেল নড়ছে, যা থেকে গ্যাস সৃষ্টি হচ্ছে এবং হযরত ইনসানের মোটর চলছে; হাওয়ায়ী জাহাজ উড়ছে। মোট কথা, সমস্ত সৃষ্টির নাকে ছিপি আঁটা। একমুঠি হাড্ডির কাছে সমস্ত সৃষ্টির প্রতিটি রতিকণা অপারগ। উপাদানগুলো তাদের অসীম শক্তি থাকতেও কি এমন চমক দেখাতে পেরেছিল, যা এই উপাদানের সমষ্টি তথা মানুষ করে দেখাল? সাগর ও পৃথিবী এবং স্থল ও জলের সমস্ত সৃষ্টি এই জালেম ইনসানের কারণে এক মসিবতের মধ্যে আটকে আছে; তার কোনো শান্তি নেই। আর মানুষ এমনই যে, বিরামহীনভাবে রাত-দিন এই উপাদানগুলোকে ওলট-পালট করে চলছে। যার কারণে সমস্ত সৃষ্টির দম বন্ধ। এবং সমস্ত জড়-জীব দাসত্ব ও গোলামির জালে বন্দী।

উদাহরণ প্রসিদ্ধ আছে যে, একটি বাঘ তার দুধের বাচ্চাকে উপদেশ দিয়েছিল যে, 'মানুষ থেকে বেঁচে থেকো বাবা। এ বড় ভয়ানক জিনিস।' বাচ্চাটা মানুষ দেখার আগ্রহে ছিল। কিছুটা জ্ঞান হওয়ার পর, মানুষের সন্ধানে বের হল এই বলে যে, আমি দেখবো এটা কেমন বালা-মসিবত, যার থেকে মরু-প্রান্তরের আমীর-উমারা নিজেদের রাজধানীতে বসে কাঁপতে থাকে। চলার পথে ঘোড়ার উপর নজর পড়ল। তার স্বাস্থ্য এবং তেজ ও চালাকী দেখে তার সন্দেহ হল যে, হয়তো এ-ই মানুষ হবে। জিজ্ঞেস করলে ঘোড়া বলল, 'আমার মত অসহায়ের কি সাহস আছে যে, আমি মানুষের সামনে থামতে পারি? চব্বিশ ঘণ্টা গলার ভিতর রশি বয়ে বেড়াই। আমি বেড়ি এবং আস্তাবলের কয়েদি। যখন হযরত ইনসানের মন চায়, তখনই আমার পিঠে সওয়ার, মুখে লাগাম এবং উপর থেকে পরপর বেতের বাড়ি আমার পিঠে কিভাবে পড়ে, তা আমিই জানি।'

বাঘের বাচ্চা থমকে গেল যে, হে আল্লাহ! মানুষ এ কেমন বালা? কেননা শুধু মূল উপাদানই নয়; বরং উৎপাদন পর্যন্ত এই বালার কাছে ধরা। সামনে গিয়ে উটের উপর নজর পড়ল, যা ঘোড়ার চেয়ে দ্বিগুণ বড় এবং আশ্চর্য আকৃতির ছিল। তার বিশ্বাস হয়ে গেল যে, হোক আর না হোক এটাই ইনসান। কেননা, এ ঘোড়ার চেয়ে চার হাত উঁচু। একে জিজ্ঞেস করেও মানুষের দোহাই দিতে শুনল। সে বলল যে, 'আমার এই দেহের দিকে লক্ষ্য করো না। এরকম বিশাল

দেহ থাকা সত্ত্বেও মানুষ আমার স্বাধীনতা কেড়ে নিয়েছে। শুধু আমি কেন, আমার মত অসংখ্য ভাই-বন্ধু শুধু একরশিতেই বন্দী এবং একটি দুধের শিশু আমাদেরকে জঙ্গল থেকে জঙ্গলে ঘুরিয়ে বেড়ায়। মণ মণ বোঝা আমাদের কোমরের উপর। আমরা ছটফট করি; কিন্তু শোনার কেউ নেই। মানুষের জন্য আমাদের গর্দান এক প্রকার সিঁড়ি। সে যখন ইচ্ছে করে, কোমরের উপর ডাণ্ডা পড়ে। তারপর একজন দু'জন নয়; তিনজন তিনজন করে মানুষ চড়ে বসে। আবার শুধু নিজেরাই চড়ে না; বরং আমাদের কোমরের উপর বড় বড় পালং চাপিয়ে তার ভিতরে ভ্রমণ করে। আমরা চুপচাপ কান বন্ধ করে মঞ্জিলের পর মঞ্জিল অতিক্রম করতে থাকি। রাতের বেলায় চলি এবং দিনে ছটফট করি; কিন্তু মুক্তির কোন উপায় নেই।

মোট কথা, আমাদের এই সমস্ত মসিবত ও গোলামি শুধু এই মানুষের কারণে। আমরা মানুষ হব কি ছাই! আমরা মানুষের নামও তো নির্ভয়ে মুখে আনতে পারি না।'

বাঘের বাচ্চার আগ্রহ আরও বেড়ে গেল যে, আল্লাহ জানে– মানুষ কেমন আকৃতির বস্তু হবে? যা থেকে এই বিশাল দেহের জানোয়ারও আশ্রয় কামনা করছে। সামনে গিয়ে হঠাৎ করে হাতির উপর তার নজর পড়ল। সামনের দিকে আসতে থাকা বিশাল এক বিল্ডিং-এর মত দেখাচ্ছে তাকে। যেই বিল্ডিংটা চারটা বড় বড় থাম্বার উপর খাড়া করা হয়েছে। তার দৃঢ় বিশ্বাস হয়ে গেল যে, এটা অবশ্যই মানুষ হবে এবং এ-ই সেই হস্তি, যে উট ও ঘোড়াদের উপর প্রভাব রাখতে পারে। সে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল– 'হয়তো জনাবেরই পবিত্র নাম 'ইনসান' হবে?'

হাতি অত্যন্ত পেরেশান হয়ে বাঘের বাচ্চাটিকে দেখল এবং বলল– 'বেটা, তুমি অবুঝ। কত বড় বিপদের নাম মুখে আনছ! আমার মতো এই বিশাল বপুকে ওই জালেম মানুষ এমনই হীনতায় পর্যবশিত করেছে যে, খোদা যেন দুশমনকেও তা না দেখায়। ঘোড়ার মুখে লাগাম দেয়; উটের নাকে রশি পরায়, কিন্তু আমার উপরে বাগডোর ছাড়াই সওয়ার হয় সে। লাগাম আমার নেই; রশি আমার নেই, কিন্তু তারপরও আমি এমন বন্দী এবং এমন নিছক অপারগ যে, এই জালেমের সামনে শব্দটি পর্যন্ত করতে পারি না। সব সময় আমার ঘাড়ের উপর চড়ে আছে এবং তার হাতে আংটা আছে। টু শব্দটি করলে মাথার উপর এমনভাবে পড়তে থাকে যে, খানাপিনা ভুলে যাই। আমার কি সাহস আছে যে, মানুষের সামনে উহ্ শব্দটি করতে পারি। আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি, তুমি তোমার বাবার নির্দেশের উপর আমল করতে থাকো এবং জঙ্গলের রাজত্বের মর্যাদা অটুট

রাখো। এই মানুষের ধারে কাছেও যেয়ো না। অন্যথায় তোমার এই রাজপুত্তুরগিরি ধুলোয় মিশে যাবে এবং কোন ফরিয়াদও শোনা হবে না।'

বাঘের বাচ্চা হয়রান ছিল যে, অবশেষে মানুষের শরীর-স্বাস্থ্য না জানি কেমন হবে, দুনিয়ার চারদিকে যার প্রভাব-প্রতিপত্তির এত সুনাম-সুখ্যাতি? শেষ পর্যন্ত সে নিরাশ হয়ে ঘরে ফেরার ইচ্ছে করল। ফিরতি পথে একটি বনের মধ্যে এক কাঠুরিয়ার ছেলেকে দেখল যে, সে একটি বড় কাঠখ-কে করাত দিয়ে চিরছে এবং যেটুকু চেরা হয়েছে, তার মধ্যে কাঠি ঢুকিয়ে রেখেছে। বাঘের বাচ্চা বুঝতেও পারেনি যে, এ-ই মানুষ। কিন্তু অনুসন্ধানের জন্য তাকে জিজ্ঞেস করল– জনাব, মানুষ সম্পর্কে বলতে পারেন?

সে বলল– তাকে দিয়ে তোমার কী কাজ?

সে বলল– আমি তাকে দেখতে চাই।

সে বলল– আমার নামই তো মানুষ বলা হয়।

বাঘ তাকে তাজ্জব হয়ে তুচ্ছতার নজরে দেখে বলল– 'আরে তুমিই কি সেই মানুষ, যাকে বাঘ, ঘোড়া, উট সবাই ভয় করে?'

সে বলল– 'জি, ঘটনা তো এমনই।'

বাঘের বাচ্চা বলল– 'এসো দুশমন! দেখি তুমি কেমন মাল? তোমার জীবন আমি এখনই একটি থাপ্পড় দিয়ে শেষ করে দিচ্ছি। আমার বাপ-দাদারা বড়ই বেকুব ছিল, যারা তোমাকে দেখে কাঁপছিল এবং বড় আহাম্মক তারা, যারা আমাকে রাস্তায় তোমার ব্যাপারে খামাখা ভয় দেখিয়েছে।' লম্ফঝম্ফ করে বাঘের বাচ্চা সামনে এগিয়ে এল শক্তি পরীক্ষা করার জন্য।

কাঠুরিয়ার ছেলে বুঝে ফেলল যে, সময় তো বেগতিক; এখন বুদ্ধি খাটিয়ে কাজ করা প্রয়োজন। সে বলল– 'আসলেই তুমি বড় বাহাদুর; আমি বেচারা তেমন আর কী? তোমার যা ইচ্ছে, তা-ই করো। তবে এখন আমার একটি কাজ সামনে আছে, যেটা আমার দুর্বলতার কারণে আমি করতে পারছি না; খোদা তোমার মত শক্তিধর বাহাদুর পাঠিয়ে দিয়েছেন। আগে কাজটি করে দাও। তারপর আমার সাথে যা ইচ্ছে হয়, করবে। কাজটি হল, আমি এই কাঠখ-ের ভিতর থেকে কাঠিটি বের করতে চাই। তুমি একটু তোমার হাত এই গাছটির ফাঁকে ঢুকিয়ে ধরে রাখো, যাতে আমি কাঠিটি সরিয়ে দিতে পারি।'

বাঘ সাহেব নিজের প্রশংসা শুনে হতভম্ব হয়ে নির্দ্বিধায় এগিয়ে এল এবং একটি নয়; উভয় হাত ফাঁকের মধ্যে ঢুকিয়ে দিল। কাঠুরিয়ার ছেলে কাঠিটি বের করে ফেলল। কাঠি বের করতেই গাছটির দুই পাট মিলে গেল এবং বাঘ সাহেবের

উভয় হাত ফেঁসে গেল। এবার বাঘের বাচ্চা বাঁচাও বাঁচাও বলতে শুরু করল এবং কাঠুরিয়ার ছেলে হাসতে হাসতে বলল– 'বল দেখি, মানুষ দেখেছ তো?'

তখন বাঘ লজ্জিত হয়ে বলল– আসলেই অভিজ্ঞ এবং বড়দের উপদেশ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার পরিণতি খারাপ হয়। কিন্তু পরক্ষণেই সে ভাবতে লাগল, দেখতে এই মানুষ তো বড়ই দুর্বল এবং ক্ষুদ্র। তার শরীর তো শক্তিশালী মনে হয় না। তবে অবশ্যই কোন ভিতরগত শক্তি আছে, যার সাহায্যে সে আমাকে এখন নিরূপায় করে দিল এবং সমস্ত সৃষ্টিকে পরাজিত করে রেখেছে।

এই গল্পটি শিক্ষা এবং মনুষ্য শক্তি ব্যক্ত করার জন্য যথেষ্ট। এসব তথ্য-উপাত্তের আলোকে একথা মানতে হয় যে, মানুষের মধ্যে এসব মূল উপাদানের চেয়ে অনেক বেশি শক্তি আছে। যার কারণে তা একটি সামান্য দেহের মধ্যে থাকা সত্ত্বেও উপাদানসমূহের ভাণ্ডার এবং সেগুলোর মাওয়ালিদের রুদ্রতার উপরে বিজয়ী হয়ে আছে। আর ওগুলোর প্রভাব সত্ত্বেও সব ধরনের বিবর্তন-পরিবর্তন এবং হেকমতপূর্ণ কাজকর্ম করতে সে কারও কাছে পরাজিত নয়। আর যখন এই কথা মেনে নেওয়া হবে, তখন এও স্বীকার করতে হবে যে, এর মধ্যে মূল উপাদানগুলোর চেয়েও বেশি সূক্ষ্মতা রয়েছে। কেননা, এই মূলনীতি আগেই সাব্যস্ত হয়েছে যে, শক্তি মূলত সূক্ষ্মতার মধ্যেই নিহিত। আর স্থূলতার মধ্যে দুর্বলতা ও অসহায়ত্ব ছাড়া অন্য কিছু নেই।

সুতরাং মানুষের মধ্যে যেহেতু সর্বাধিক সূক্ষ্ম উপাদান বাতাসের চেয়ে বেশি শক্তি আছে, তাহলে একথা আবশ্যক যে, তার মধ্যে বাতাসের চেয়ে বেশি সূক্ষ্মতাও নিহিত রয়েছে, যাতে সে তার শক্তিপূর্ণ রাজত্ব বহাল রাখতে পারে।

মনুষ্য শক্তি ও বশক্ষমতা কোথায় সুপ্ত

কিন্তু একথা স্পষ্ট যে, মানুষ বাহ্যিকভাবে কোন সূক্ষ্ম বস্তু বলে অনুভূত হয় না। পরিচ্ছন্ন আয়না বা পরিষ্কার পানির মত চমকও তার নেই, যার মধ্যে চেহারা দেখা যেতে পারে। সে নিজেও এমন আলোকিত বস্তু নয় যে, শূন্যের মধ্যে তার শিখা ছড়িয়ে পড়বে। তা থেকে আলোও বেরোয় না। বাতাসের মত সে অদৃশ্য বস্তুও নয়। তাহলে তার মধ্যে এসব সূক্ষ্ম বস্তুকে পরাস্ত করার রহস্য কোথায় সুপ্ত? স্পষ্ট কথা যে, এই শক্তি ও সূক্ষ্মতা তার শরীরের মধ্যে নিহিত নয়। কারণ, শরীর তো সেই আগুন-পানি-মাটি-বাতাসের সমষ্টি। যদি এই শরীরের মধ্যে কোন শক্তি থাকেও, তবুও সেই বেচারার এই সামান্য আগুন-পানি সারা দুনিয়ার আগুন-পানির বিপক্ষে কী প্রভাব রাখতে পারে? এই দেহস্থিত আগুন-

পানি তো বিশ্ব আগুন-পানি থেকেই গৃহীত সামান্য একটি অংশমাত্র। আর সামান্য একটি অংশ কিভাবে গোটা বস্তুটার উপর বিজয়ী হতে পারে? একটি জলবিন্দু সাগরকে কী করে পরাস্ত করবে? একটি স্ফুলিঙ্গ বিশ্বঅগ্নির বিরুদ্ধে কতটুকু প্রাধান্য বিস্তার করতে পারবে? একটি কণা আন্তঃভূখণ্ডের উপর কী শাসন চালাতে পারবে? বরং এ পর্যায়ে ঘটনা উল্টো হওয়ার কথা ছিল যে, এই বস্তুজগৎ স্বয়ং মানুষের উপর সব দিক দিয়ে জয়ী থাকবে এবং সে মানুষকে জিম্মি করে রাখবে। এই একমুঠো মাটির কাছে সমস্ত সৃষ্টির পানি ও ফুল অনুগত হওয়া এবং এই দুর্বলভিত মানুষের কাছে খোদ তারই দম বন্ধ হওয়া তো থাক দূরের কথা। অতএব, এই বশক্ষমতা অবশ্যই তার দেহ এবং দেহস্থিত আগুন-পানি বা পাবনিক সূক্ষ্মতার কাজ হতে পারে না। বরং মানুষের প্রাধান্য বিস্তারকারী শক্তি নিঃসন্দেহে এমন হওয়া প্রয়োজন, যা অগ্নি-জল আর কী, বাতাসের চেয়েও সূক্ষ্ম হবে। কেননা, বাতাসের মত অদৃশ্য বস্তুর সংঘর্ষ তো মানুষের অনুভূত হয়। তার সূক্ষ্মতা এমন যে, তা মানুষের রগরেশার মধ্যে সুরক্ষিত হলেও কখনও তার ধাক্কা পর্যন্ত মানুষের গায়ে লাগেনি। বরং তার স্পর্শ পর্যন্ত কখনও সে টের পায়নি। তা এমনই যুক্ত যে, তার সাথে সম্মিলন ব্যতীত মানুষ তার অস্তিত্বই টিকিয়ে রাখতে পারে না। আর তা এমনই বিযুক্ত যে, মানুষের কোন ইন্দ্রিয় সে পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না। আবার তাকে কোন শীতগ্রীষ্মও ছুঁতে পারে না। এজন্য সে শুধু আপন দেহের উপরই নয়; বরং বিশ্বের মূল উপাদান চতুষ্টয়ের উপর প্রাধান্য বিস্তার করে থাকে। প্রকাশ থাকে যে, দেহ বাদে মানুষের মধ্যে রূহ ছাড়া এমন কী আছে, যার ভিতরে এসব গুণাবলি থাকতে পারে? অথচ মানুষ তো এ দু'টি বস্তুর সমন্বয়েই সৃষ্ট।

মানব-রূহের সূক্ষ্মতা ও ইন্দ্রিয়ানুভূত দীপ্তিময়তা

তার মানে, এই শক্তি মানবদেহে নিহিত নয়; এই কারিশমা থাকলে দ্বিতীয় বস্তুটির মধ্যেই আছে। সুতরাং সার কথা এই বের হল যে, রূহ শুধু উপাদান চতুষ্টয়ই নয়; বরং সমস্ত বস্তুজগৎ থেকেও অধিকতর সূক্ষ্ম বস্তু। আবার রূহের এই সূক্ষ্মতা শুধু অলৌকিক ও অদৃশ্যই নয়; বরং অনুভব্য পথেও তার সূক্ষ্মতাসমূহ জগৎসংসারে ধরা দেয় না। মৌলিক উপাদানগুলোর মধ্যে যেসব সূক্ষ্মতা বিদ্যমান ছিল, যদি চিন্তা করে দেখেন, তাহলে সেগুলো সবই রূহের মধ্যে সন্নিবেশিত আছে। যদি পরিচ্ছিন্ন আয়না অথবা পরিষ্কার পানি আকৃতির প্রতিবিম্ব গ্রহণ করে থাকে, তবে রূহ মানুষের চক্ষুকে এমন দীপ্তি দান করেছে

যে, যেদিকে সে পতিত হয়, সেদিকের সমস্ত নক্‌শা, ফটো এবং সিনারি নিজের ভিতর সংগ্রহ করে ফেলে। আয়নার ফটো তো পুরোপুরি ভিত্তিহীন। কেননা, আয়নার পিছনটা সম্পূর্ণ খালিই থাকে। কিন্তু চোখের ফটো ভিত্তিহীন নয়। কেননা, তার পশ্চাতে যৌগিক অনুভবে তার পরিপূর্ণ চিত্র ইলমে বর্তমান রয়েছে।

যদি আগুন থেকে স্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়, তবে চোখ থেকেও দৃষ্টিশিখা ছড়ায়, যা অগ্নিস্ফুলিঙ্গ থেকে কোন অংশে কম নয়। কেননা, অগ্নিস্ফুলিঙ্গ থেকে তো বস্তু শুধু চোখের সামনেই আলোকিত হয়। কিন্তু দৃষ্টিশিখার মাধ্যমে এসব বস্তু দিলের সামনে আলোকিত হয় এবং দিল তার হাকিকত নিয়ে ভাবতে পারে।

যদি পানি তার চূড়ান্ত সূক্ষ্মতার কারণে বিভিন্ন দেহের মধ্যে সংক্রমিত হয় এবং শক্ত থেকে শক্ত দেহও যখন পানির নিকটবর্তী হয় তখন তার সংক্রমণ থেকে রক্ষা পায় না; তবে রূহও দেহের রগরেশায় সমাহিত থাকে, এমন কি কঠিন থেকে কঠিন হাড়ও তা থেকে সজীবতা সংগ্রহ করে থাকে। আর পানি তো তার সংক্রমণের মাধ্যমে কেবল স্থানটি ঠাণ্ডা করে থাকে; কিন্তু রূহ তার চলমানতার মাধ্যমে নিজ মহলকে জীবিত করে রাখে।

যদি বাতাস চূড়ান্ত সূক্ষ্মতার কারণে দেখা দিতে পারে না [বলা হয়]; তাহলে রূহও তার সীমাহীন সূক্ষ্মতার কারণে আজ পর্যন্ত অদৃশ্য। আবার রঙ-গন্ধ যেমন বাতাসের অনুভবের বাইরের বস্তু; তেমনই রূহও এসব বৈশিষ্ট্যাবলি থেকে পবিত্র।

মোট কথা, মূল উপাদানগুলোর মধ্যে সূক্ষ্মতার যেসব বৈশিষ্ট্য এবং সূক্ষ্মতার যেসব স্তর বিদ্যমান ছিল, সেগুলো রূহের মধ্যে বিদ্যমান আছে। এজন্য যদি মূল উপাদানগুলোর হক তায়ালার সাথে আংশিক সম্পর্ক থেকে থাকে এবং তার উপর নির্ভর করে ওগুলো শক্তিশালী হয়ে থাকে, তাহলে রূহের তো সার্বিকভাবে তার সাথে সম্পর্ক বর্তমান আছে। এ কারণে তার উপাদানগুলোর চেয়ে বেশি শক্তিশালী হওয়ার কথা এবং যেসব কাজ উপাদানগুলো করতে পারে, সেগুলো তার মাধ্যমে নির্দ্বিধায় বাস্তবায়িত হওয়া উচিত। তারপর কোন কারণ নেই যে, উপাদানগুলোকে তো সেগুলোর শক্তি বিচার করে একটির উপর আরেকটিকে শক্তিশালী বলা হয়; কিন্তু রূহকে সর্বাধিক শক্তিশালী বলা হবে না। কেননা, উপাদানগত এবং বস্তুগত শক্তিসমূহের উপর রূহানী শক্তিগুলোর প্রাধান্য অর্জনের নিমিত্তে এই একটি কারণই যথেষ্ট যে, উপাদানগুলো আংশিক সূক্ষ্মতা রাখে এবং রূহ ওগুলোর সমস্ত সূক্ষ্মতার সমন্বয়কারী। বরকতময় সত্তার সাথে ওগুলোর সম্পর্ক আংশিক, আর রূহের সম্পর্ক সামগ্রিক।

মানব-রূহের অভ্যন্তরীণ শক্তি ও সূক্ষ্মতা

যদি আরও চিন্তা করেন, তাহলে হক তায়ালার সাথে রূহের শুধু মূল উপাদানগুলোর মতই সম্পর্ক নয়– বা অন্য কথায় শুধু সম্পর্কই নয়; বরং একটি দিক বিবেচনা করলে এমন সাদৃশ্যও রয়েছে যে, তাকে হক তায়ালার বিশেষ বৈশিষ্ট্যাবলি ও পূর্ণতার জন্য উপমা হিসেবে পেশ করা যায়। অথচ মৌলিক উপাদানগুলো তার ধারে কাছেও থাকতে পারে না। কেননা, ওগুলো প্রথম থেকেই এসব বৈশিষ্টাবলি থেকে খালি ও বঞ্চিত। উদাহরণত হক তায়ালা যেমন অদৃশ্য পথে সমস্ত জগতের নিয়ন্ত্রক ও তত্ত্বাবধায়ক, তেমনই রূহও একই নিয়মে শরীর-জগতের নিয়ন্ত্রক ও তত্ত্বাবধায়ক। সে একটু মনোযোগ সরিয়ে নিলে শরীর-জগৎ লণ্ডভণ্ড হয়ে পড়ে। যেরকম মৃত্যুর সময় হয়ে থাকে।

হক তায়ালার নূরসমূহ যেমন সৃষ্টিজগতের প্রতিটি অণু-পরমাণুর মধ্যে দীপ্তি ছড়িয়ে রেখেছে এবং প্রতিটি বিভাগ ও তার প্রতিটি কোষ থেকে উপযুক্ত কাজ গ্রহণ করছে এবং তার পূর্ণ প্রকাশ সত্ত্বেও আজও পর্যন্ত কোন চোখ তাকে দেখতে পেল না। অনুরূপ রূহের নূরসমূহ শরীরজগতের মধ্যে এমনইভাবে ছড়িয়ে আছে যে, সে প্রতিটি অঙ্গ থেকে উপযুক্ত কাজ গ্রহণ করছে এবং শরীরের রগরেশার মধ্যে রূহের প্রকাশ সত্ত্বেও– চোখের উজ্জ্বলতার মধ্যে, কপোলের লালিমার মধ্যে, চুলের কৃষ্ণতার মধ্যে, দাঁতের শুভ্রতার মধ্যে, শরীরে সজীবতার মধ্যে তারই বহিঃপ্রকাশ। রূহ না হলে এগুলোর কর্মতৎপরতা এক মুহূর্তের মধ্যে খতম হয়ে যাবে। কিন্তু এই পরিপূর্ণ প্রকাশ সত্ত্বেও আজও পর্যন্ত এমনই অদৃশ্য যে, নিজের নফসটিও তার দিদার থেকে মাহরুম থেকে গেল।

بے حجاب یہ کہ ہر ذرہ سے جلوہ آشکار

اس پہ گھونگھٹ یہ کہ صورت آج تک نادیدہ ہے

যাক, তিনি যেমন যাহেরও এবং বাতেনও, তেমনই রূহও যাহের এবং বাতেন। আবার যেমনইভাবে এই সমস্ত সৃষ্টির জীবন এবং জীবনের প্রতিটি নড়াচড়া থেকে পবিত্র সত্তা আগে এবং পূর্বে। কেননা, তিনি অস্তিত্ব দান করেছেন, আর অস্তিত্বের পূর্বে কোন প্রকার অগ্রগামিতা সম্ভব নয়। আপনি সৃষ্টির এমন কোন অগ্রগামিতা দেখাতে পারবেন না যে, সে হয়ে যাবে, আর হক তায়ালার সত্তা তার পরে আসবেন। তিনি ছাড়া তো সৃষ্টির জীবনই হতে পারে না এবং জীবন ছাড়া তার নড়াচড়াও সম্ভব নয়। কাজেই স্রষ্টার পূর্বে সৃষ্টি কিভাবে হতে পারে? আবশ্যক হচ্ছে যে, প্রতিটি সৃষ্টি এবং সৃষ্টির প্রতিটি ক্রিয়াকর্মের আগে স্রষ্টার

সত্তা পূর্ববর্তী। আবার অনুরূপভাবে সৃষ্টির প্রতিটি নড়াচড়ার সমাপ্তিও তাঁর সত্তা। আপনি সৃষ্টির এমন কোন অগ্রবর্তিতা দেখাতে পারবেন না যে, সে মহাসত্তাকে অতিক্রম করে এসে পড়বে এবং মহাসত্তাকে পিছনে ফেলে আসবে। কেননা, যখন মহাসত্তার সাথেই এই সৃষ্টিসমূহের জীবন অধিষ্ঠিত, তাহলে এই কথা দাবি করা হবে যে, সৃষ্টিরা নিজেদের কাজ করতে করতে জীবনের সীমা পার করে ফেলবে, তবুও তাদের কাজ চলমান থাকবে। এমন দাবি যৌক্তিকভাবে অসম্ভব। কাজেই সৃষ্টির প্রতিটি নড়াচড়া এবং নীরবতার সমাপ্তিও তাঁর সত্তা প্রমাণিত হয়। তাঁর আগে এবং পরে কোনকিছু নেই। তিনি প্রত্যেক বস্তুর সূচনাও এবং সমাপ্তিও। যেমন তিনিই যাহের ছিলেন এবং ছিলেন বাতেনও। ঠিক অনুরূপভাবে শরীরজগতের প্রতিটি নড়াচড়া বরং স্বয়ং তার অস্তিত্বটা থেকেও রূহ পূর্ববর্তী এবং পরবর্তীও। কেননা, যখন রূহটাই শরীরের জন্য অস্তিত্ব ও বেঁচে থাকার কারণ, কাজেই কোন জীবিতের অগ্রবর্তিতা জীবনের পূর্বে কিভাবে সম্ভব হতে পারে? সুতরাং প্রতিটি কাজ– মানে শরীরের প্রতিটি কাজের আগে রূহই আসে। এবং অনুরূপভাবে যখন রূহই শরীরের জন্য বেঁচে থাকার কারণ, তাই শরীরজগতের কোন ক্রিয়াও জীবনের চেয়ে পরবর্তী হতে পারে না। বরং শেষ ও সমাপ্তি বলতে জীবনই থেকে যাবে। সুতরাং রূহ-ই এই দেহজগতের জন্য পূর্ব ও পরবর্তী বস্তু। যেমন সে যাহেরও এবং বাতেনও। আবার যেরকম মহাসত্তা বিশ্বের সাথে এমনই যুক্ত যে–

اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ

তিনি মানুষের শাহ্‌রগের চেয়েও বেশি নিকটবর্তী। *[সূরা কফ ৫০ : ১৬]*

আর

وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَمَا كُنْتُمْ

তোমরা যেথায়ই থাকো, তিনি তোমাদের সাথে আছেন।

আবার তিনি এমনই বিযুক্ত যে, [তিনি শুধু ধরাছোঁয়ার পশ্চাতে নয়;] আরও পশ্চাতে, আরও পশ্চাতে...। মাখলুক নিছক অন্ধকার, আর তিনি নিরেট দীপ্তি।

اے برتر از خیال و قیاس و گمان و وہم

ঠিক অমনইভাবে রূহও শরীরের সাথে এতই সংযুক্ত যে, জীবিত শরীরের কোন রগের লক্ষ ভাগের একভাগও তা থেকে আলাদা নয়। অন্যথায় তো জীবিতই থাকবে না। কিন্তু দূরও এমন যে, তার পবিত্রতা দেহের সাথে কোন ছোঁয়াও রাখে না। সূক্ষ্ম ও স্থূলের মধ্যে আবার কীসের সম্পর্ক, কীসের আত্মীয়তা?

কোথায় একমুঠি মাটি, কোথায় জহরত খাঁটি? নিভানো লণ্ঠন কোথায়, কোথায় প্রভাকর?

রূহের বৈশিষ্ট্যাবলি থেকে প্রভুত্ববাদের প্রামাণ

এই উদাহরণগুলোর মাধ্যমে আমরা উপমা দিতে গিয়ে যেমন ওদিক থেকে এদিকে এলাম; এদিক থেকে ওদিকেও যেতে পারি। অর্থাৎ নিজের রূহানী জগতের মধ্যস্থতায় হক তায়ালার সত্তা ও গুণাবলির একাত্মতা ও অদ্বিতীয়তার উপর প্রমাণ পেশ করতে পারি। এবং বলতে পারি যে, যেরকম আমাদের দেহজগৎ এই অদৃশ্য পরিচালক অর্থাৎ রূহ ছাড়া টিকতে এবং বাকি থাকতে পারে না, অনুরূপ বিশ্বমণ্ডলের এ সমস্ত সৃষ্টি কোন পরিচালকবিহীন টিকতে ও অবশিষ্ট থাকতে পারে না। কাজেই রূহের ব-দৌলতে স্রষ্টার অস্তিত্বের উপর আমাদের ভিতর থেকেই দলিল বেরিয়ে এল। আবার যেমনইভাবে দেহের মধ্যে একটি রূহ-ই পরিচালনার কাজ করতে পারে; যদি দু'টো হয়, তবে শরীরজগৎ ধ্বংস হয়ে যাবে। কেননা, একটি কোষের মধ্যে দু'টি তলোয়ার এবং একটি আচকানের মধ্যে দু'জন মানুষ সমাহিত হতে পারে না। অনুরূপভাবে বিশ্ব সৃষ্টির মধ্যেও একজনই তত্ত্বাবধায়ক, প্রজ্ঞাবান এবং পরিচালকের কার্যক্রম বাস্তবায়িত হতে পারে; অন্যথায়–

لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللهُ لَفَسَدَتَا.

যদি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের মধ্যে আল্লাহ ছাড়া একাধিক প্রভু থাকত, তবে ওগুলো ধ্বংস হয়ে যেত। *[সূরা আম্বিয়া : ২১ : ২২]*

-এর বহিঃপ্রকাশ ঘটে যাবে। সুতরাং রূহের মধ্যস্থতায় আমাদেরই ব্যক্তিসত্তার ভিতর স্রষ্টার একত্ববাদের দলিল জন্ম নিল।

আবার দেহের গভীরে প্রবেশ করার জন্য রূহের যেরকম কোন আকার-আকৃতি, কোন রঙঢং এবং কোন দিকসিক দেখা যায় না; অনুরূপ ওই বরকতময় সত্তাও অনুপম, অদ্বিতীয়, দিকসিক থেকে নির্ভীক এবং রঙঢং থেকে পবিত্র। কেননা, রঙঢং-এর প্রদর্শনী তো তাঁর থেকেই হয়; কিন্তু তিনি সব রঙ থেকে পূতপবিত্র। যা হোক, রূহের বদৌলতে তার পূতপবিত্রতার শানও আমাদের ভিতর থেকেই সৃষ্টি হল।

তারপর যেমনইভাবে রূহ দেহের প্রতিটি অনুপরমানুর মধ্যে বর্তমান এবং দেহের প্রতিটি শিরা উপশিরার সাথে তার সম্পর্ক স্থিত; কিন্তু সম্পর্কের এই কাঠিন্য এবং তরলতার ব্যবধানও অস্বীকার করার উপায় নেই যে, যেসম্পর্ক হৃদযন্ত্রের

সাথে আছে, তা দেমাগের সাথে নেই। যা দেমাগের সাথে আছে, তা কলজে ও পাকস্থলীর সাথে নেই এবং এই সব অঙ্গের সাথে যেসম্পর্ক আছে, তা দেহের সাধারণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাথে নেই। এ-কারণেই হৃদয় ও দেমাগে সামান্য আঘাত বা অপমানের দ্বারা রূহের মধ্যে গোস্বা ও আবেগ সৃষ্টি হয় এবং এই প্রধান অঙ্গসমূহে সামান্য প্রহার পড়লেও রূহ জীবনসহকারে প্রত্যাবর্তন করে। সাধারণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কিন্তু এমন নয়। কেননা, যদি হাতপা কেটেও ফেলা হয় তাহলে হয়তো জীবনের পূর্ণতা ক্ষুণ্ন হবে; কিন্তু সরাসরি জীবন নিঃশেষ হয় না। অনুরূপভাবে বরকতময় মহাসত্তার প্রকাশ বিশ্বমণ্ডলের শিরা-উপশিরায় সংবরিত হলেও স্থানের ব্যবধানের কারণে সম্পর্কের কঠোরতা-তরলতার মধ্যেও ব্যবধান আছে। কেননা, তাঁর সত্তার সাথে যে সম্পর্ক আরশে আযীমের সাথে আছে, তা অন্যান্য স্থানের সাথে নেই। কেননা, ওটা মহাসত্তার উপবেশনকেন্দ্র। আবার যে সম্পর্ক বায়তুল মা'মুরের সাথে আছে, তা অন্যান্য উর্ধ্বজগতের সাথে নেই। কেননা, ওটা ফেরেশতাদের কেবলা। আবার যে সম্পর্ক বায়তুল্লাহ, মসজিদে আকসা অথবা হরমে নববীর সাথে আছে, তা অন্যান্য স্থানের সাথে নেই। তারপর যে সম্পর্ক সাধারণ মসজিদ ও ইবাদতখানার সাথে আছে, তা অন্যান্য জায়গার সাথে নেই। এজন্য ওগুলোর উপর যদি কোন অপমানজনক কাজ বা আক্রমণাত্মক পদক্ষেপ অগ্রসর হয়, তাহলে রূহে আ'যমের গোস্বা ভরকে ওঠে; দুনিয়ার মধ্যে কম্পন শুরু হয়ে যায় এবং দুনিয়া শঙ্কার মধ্যে পড়ে যায়। এমন কি বায়তুল্লাহর ইট খসে গেলেও এই জগৎ-সংসারের জীবন শুষে নেওয়া হবে। অতএব, রূহের ব-দৌলতে আমাদের কাছে আল্লাহ তায়ালার সম্পর্কেরও রকমফের স্পষ্ট হল।

আবার যেমনইভাবে প্রত্যেক ব্যক্তি নিজরূহের আবেদন ও হাক্কানী দাওয়াত দিলের কান দিয়ে অকৃত্রিমভাবে শুনে থাকে এবং তার উপদেশবাণীগুলোকে কলবের মধ্যস্থতায় উপলব্ধি করে থাকে; কিন্তু তারপরও তার কথার মধ্যে শব্দ নেই, আওয়াজ নেই। এমনই অবস্থা হক তায়ালার কালামের। কেননা, তা কালাম বটে; তাতে বাস্তবতাও আছে; তাতে শুনা ও শুনানোও আছে এবং বনী আদমের বিশেষ অংশ– আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম– যারা মানবজাতির জন্য কলবের সমতুল্য, তাঁরা তা শুনতে পান। তার মধ্যে শব্দমালার সীমাবদ্ধতা নেই; নেই আওয়াজ ও উচ্চারণের শিকল। কেমন যেন তা প্রকাশিত হওয়ার পর মাখলুকের দুয়ারে পৌঁছতে পৌঁছতে এসব সীমাবদ্ধতা দেখা দেয়। যাক, রূহের বদৌলতে আমরা মহাসত্তার মৌলিক কালাম এবং উচ্চারণগত কালাম মোটামুটি বুঝতে পারলাম।

যদি আমরা চোখ বন্ধ করে ফেলি, তবুও রূহের দেখা বন্ধ হয় না এবং কান বন্ধ করে ফেলি, তাহলে তার শুনবার ক্ষেত্রে কোন তফাত পড়ে না। বরং চোখকান বন্ধ করে কল্পনার অসীম জগতে এই রূহ দেখার বস্তুগুলো আরও বেশি অকৃত্রিমভাবে দেখতে থাকে এবং শুনবার বস্তুগুলোকে আরও বেশি নির্ঝঞ্ঝাটভাবে শুনতে থাকে। অথচ কোন আওয়াজ রূহের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে আসে না এবং কোন সুরতের রঙঢংও দেহ ও তার আশেপাশে অন্তরায় হতে পারে না। ঠিক অনুরূপভাবে সেই অনুপম অদ্বিতীয় সত্তা প্রত্যেক বস্তু শুনেন এবং দেখেন; কিন্তু সেখানে রঙরূপ এবং বস্তুবাদিতার নিকটবর্তিতা নসিব হয় না। আর আওয়াজসমূহের গুঞ্জরণও তাঁর শ্রবণের পথে বাঁধা হয় না। সুতরাং নিজেরই রূহের বদৌলতে আল্লাহর শ্রবণ ও দর্শনের নিরাকারতা এবং অনুপমত্বেরও আমাদের বেশ ধারণা হল।

এমনিভাবে যখন আমরা এ কথার উপর নজর দেব যে, শরীরের হায়াত তো রূহের জীবনের সাথে অধিষ্ঠিত; কিন্তু রূহের জন্য আর কোন রূহের প্রয়োজন নেই। সে নিজেরই হায়াতভাণ্ডারের একটি ঢেউমাত্র। তাহলে আমাদের ধারণা হচ্ছে যে, বিশ্বের জীবন তো বরকতময় সত্তার হায়াতের সাথে অধিষ্ঠিত এবং স্বয়ং তাঁর হায়াতের জন্য অন্য কোন সত্তার প্রয়োজন নেই। বরং তিনি নিজের সত্তাগত হায়াতেই জীবিত, যার মধ্যে কোন ফারাক আসতে পারে না। আর এভাবেই আমাদের কাছে আল্লাহর হায়াত-গুণের সত্তাগত এবং চিরন্তন হওয়ার ধারণাটিও আমাদের ভিতর থেকেই পাওয়া গেল।

মোট কথা, রূহের সাথে বরকতময় সত্তার সাথে শুধু সম্পর্কই নয়; বরং অনেক ক্ষেত্রে সাদৃশ্যও আছে। যা থেকে হক তায়ালার সীমাহীন পূর্ণতার উপমা আমাদের প্রাণমধ্যে পৌঁছে গেছে। আর আমরা নিজেদের ভিতরই সবকিছু বাস্তবে দেখতে সক্ষম হয়েছি। এজন্য 'রূহ'-এর তারচে' পরিপূর্ণ সংজ্ঞা আর কোনকিছু হতে পারে না, যা কুরআনে করীম বলেছে–

قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّیْ وَمَا اُوْتِیْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِیْلاً.

বলুন, 'রূহ' হচ্ছে আমার প্রভুর নির্দেশমাত্র। আর তোমাদের তো দেওয়া হয়েছে সামান্য ইলম। *[সূরা ইসরা ১৭ : ৮৫]*

যা হোক, এসব আলোচনা থেকে রূহ একটি খোদায়ী সূক্ষ্ম বস্তু, তা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। আর দেহ হচ্ছে শুধু একটি স্থূল আঁধারমাত্র। কিন্তু যখন এই দেহস্থিত উপাদান– যা বস্তুজগতের অন্তর্ভুক্ত, রূহের সাথে সামান্য সম্পর্ক এবং বাধ্যবাধকতা ধরনের সহবাস সৃষ্টি করে এমন শক্তিশালী হতে পারে যে, সারা

দুনিয়া তার শক্তির উপর নাচতে থাকে। তাহলে সরাসরি রূহ, যা নির্দেশ-জগতের বস্তু এবং তার সম্পর্ক আল্লাহর সাথে– মানে সাদৃশ্যের গভীরতার যেখানে কোন সীমাই নেই, সে কি মহান আল্লাহ তায়ালার সাথে ওই শক্ত সম্পর্ক ও সাদৃশ্যের বদৌলতে কিছুই শক্তিশালী ও প্রভাবশালী হবে না। যদি যথাযথভাবে তার শক্তিসমূহকে ব্যবহার করা হয়, তা কি বিশ্বসৃষ্টি তা সহ্য করতে পারবে?

বাঘের বাচ্চার কথামত যদি মানুষ পানি এবং মাটির চেয়ে কিছু বেশি শক্তিশালী হয়ে থাকে, তাহলে তা শরীরের কারণে নয়। কেননা, শরীর তো সেই আগুন-পানির একটি ক্ষুদ্র সমষ্টিমাত্র। এই বেচারা সামান্য তুচ্ছ শরীর তার বিরাট ও বিশাল ভাণ্ডারের উপর কতটা বিজয়ী হতে পারে? বরং মানুষের এই অসাধারণ শক্তি এবং শক্তির অসাধারণ কারিশমা প্রদর্শনী মূলত রূহের বদৌলতেই হয়ে চলছে। কেননা, রূহের সূক্ষ্মতার কোন সীমা নেই এবং সে ঊর্ধ্ব ও অধ্বের নানাবিধ সূক্ষ্মতার সমষ্টি। কেননা, রূহ সমস্ত বস্তুজগৎ এবং সমস্ত উপাদান থেকে শক্ত ও শক্তিধর। কাজেই যেখানে বরকতময় সত্তা হক তায়ালা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে নিজের সমূহ উপমা স্থাপন করে রেখেছিলেন– যেন তাঁর চরম উৎকর্ষ স্পষ্ট নিদর্শনাবলির ভিতর দিয়ে কোন এক পর্যায়ে উপলব্ধি ও অনভূত হতে পারে। অনুরূপভাবে বরং তারচে' অনেক বেশি উপমা আমাদের মধ্যে ব্যক্তিসত্তার ভিতরে রেখেছেন, যেন আমরা ভিতরগত বৈশিষ্ট্য এবং সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্ম উৎকর্ষ পর্যন্ত সম্ভবমত কিছুদূর পৌঁছতে পারি।

سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ

আমি অতিসত্বর তাদেরকে তাদের আলামতসমূহ আশপাশে এবং তাদের ব্যক্তিসত্তার ভিতর দেখিয়ে দিব। যেন তারা বুঝতে পারে যে, ওগুলো যথার্থ। আপনার রবের জন্য কি এ-কথা যথেষ্ট নয় যে, তিনি সবকিছুর প্রত্যক্ষদর্শী। *[সূরা ফুসসিলাত : ৪১ : ৫৩]*

মোট কথা, সাইন্সের এই কারিশমাবাজি, যেদিকে আমি ভূমিকায় ইঙ্গিত করেছিলাম– দেখতে যদিও দেহ এবং দেহস্থিত উপাদানের বলে মনে হয়; কিন্তু বাস্তবে এগুলো সবই রূহের অবদান। যার সুপ্ত শক্তিসমূহ চাররঙা বস্তুকে নাচাতে থাকে এবং শ্রমিকের মত তাকে স্বস্তিতে বসতে দেয় না।

রূহানী শক্তির অপব্যবহার

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে এই যে, রূহ তার এই সব সুপ্ত পরাকাষ্ঠা ব্যয় করার ক্ষেত্রে অনেক চেষ্টাতদবির করেছে এবং যুক্ত ও বিযুক্ত করার মাধ্যমে আগুন-পানি-বাতাস-মাটিকে ত্রিমাত্রিক উৎপাদন [মাওয়ালিদে সালাসা]-এর ভিতরে নানা বিস্ময়ের কতই না প্রকাশ করেছে; কিন্তু তাতে খোদ রূহের কী লাভ হয়েছে? এবং রূহ 'রূহ' বিবেচনায় এই চেষ্টাতদবির থেকে তার কী মর্যাদা লাভ হয়েছে?

স্পষ্ট কথা যে, এই সব বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের উপকার রূহের নিকট কিছুই পৌঁছেনি; শুধু দেহের কাছেই পৌঁছেছে। দেহের প্রশান্তি এবং দৈহিক আরাম-আয়েশের মধ্যেই বৃদ্ধি ঘটেছে। শীতের ভিতর আগুনের তাপ, গ্রীস্মে পানির আর্দ্রতা, বর্ষায় বাতাসের হিল্লোল শরীরের জন্যই। রূহ গরমের মুখাপেক্ষী নয়, নয় শীতেরও। কেননা, উষ্ণতা ও আর্দ্রতা রূহের কোন বৈশিষ্ট্যই নয়। অনুরূপ মহাশূন্যে উড়োজাহাজ যা উড়িয়েছে, তা দেহই। অন্যথায় রূহের মত সূক্ষ্ম বস্তুকে উড়ানোর জন্য এমন ভারী এবং স্থূল বিমানের প্রয়োজন ছিল না। মুত্যুর পর আল্লাহ মালুম, রূহ কত জায়গায় উড়ে বেড়ায়, তখন তার জন্য কোন্ উড়োজাহাজ যায়? আরও ভাবুন, খোদ বাতাস উড়বার জন্য কোন্ উড়োজাহাজের প্রয়োজন হয়? বাতাস নিজেই তো বিমানকে উড়ায়। তাহলে যেই রূহ বাতাস থেকেও অধিক সূক্ষ্ম এবং যে নিজেই বাতাসকে অনুগত ও বন্দী করে রেখেছে; বরং বাতাসের স্বভাবের বিরুদ্ধে তাকে জায়গায় জায়গায় উড়িয়ে রেখেছে, সে নিজের উড়ার ক্ষেত্রে তার কতটা মুখাপেক্ষী হতে পারে? আর যখন রূহ তারই মুহতাজ নয়; তাহলে তার মুখাপেক্ষীদের অর্থাৎ বিমানদের মুহতাজ কিভাবে হতে পারে?

তদ্রূপ রেল ও মটরগুলো দিয়ে রূহের কোন ফায়দাটা? রেল ও মটর নিজের অস্তিত্ব ও আত্মপ্রকাশের ক্ষেত্রে তারাই তো রূহের মুহতাজ। তাহলে রূহের জন্য ওগুলোর কী প্রয়োজনটা হতে পারে? এ কারণে এই সমস্ত বস্তুগত কারিশমাবাজি এবং বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের যদি কোন ফায়দা হতে পারে, তাহলে তা শুধু দেহের জন্য; রূহের জন্য নয়। রেল ও মটর হাজার হাজার মাইল অতিক্রম করে দিতে পারে, তবে দেহকেই। বিদ্যুৎ ও গ্যাস যদি আলো ছড়াতে পারে, তবে দেহের উপরই; রূহের উপর নয়। রূহের নূর দিয়ে তো ওগুলোই বাস্তবতায় এসেছে। গ্রামোফোন, টেলিফোন, টেলিগ্রাফ এবং বেতার ইত্যাদি যদি উপকার দিতে পারে, তবে দেহকে। অন্যথায় রূহ তার প্রকৃত শক্তিবিচারে এসব পর্দার জন্য কী বা মুখাপেক্ষী হতে পারে? কাজেই এই সমস্ত আরাম-উপকরণের আরামদান দেহ পর্যন্তই সীমাবদ্ধ প্রমাণিত হল। আর দেহ কী? সেই উপাদান

চতুষ্টয়ের সমষ্টি এবং আগুন-পানি-বাতাস-মাটির খামিরা। তাহলে বলুন যে, আপনি এই আগুন-পানির আবিষ্কারের মাধ্যমে আগুন-পানিরই উপকার সাধন করলেন। অন্য কথায়, আপনি বাইরের আগুন-পানি গ্রহণ করলেন এবং ভিতরের আগুন-পানি পর্যন্ত তা পৌঁছে দিলেন। আর এখন রূহের কাজ থাকল এই যে, সে তার ইলম ও উপলব্ধির পুঁজি বৈশ্বিক আগুন-পানির পিছনে খরচ করতে থাকবে এবং এই বাইরের আগুন-পানি দেহের আগুন-পানিকে দিতে থাকবে। অর্থাৎ দেহের খেদমতে সদাসর্বদা নিয়োজিত থাকবে। এর পরিষ্কার অর্থ এই বের হয় যে, আপনি রূহকে– যে কিনা ওই উপাদানগুলো থেকে অধিক সূক্ষ্ম ও অধিক উৎকৃষ্ট ছিল এবং যে কিনা ওগুলোর উপর রাজত্ব করছিল– আপনি ধোঁকা দিয়ে তাকে দেহের মত স্থূল বস্তুর– বা অন্য নামে মৌলিক উপাদানগুলোর গোলাম বানিয়ে দিলেন। অন্য ভাষায়, আপনি সূক্ষ্ম রূহকে স্বয়ং তার সূক্ষ্মতা নিঃশেষ করার জন্য ব্যবহার করলেন, যা বস্তুর উল্টো ব্যবহার। এখন এই মিসকীন রূহের উদাহরণ এমন হয়ে গেল যেমন, একজন আলেম-ফাজেল বাদশাহ– যাঁকে দিয়ে দেশ ও জাতির বড় বড় উপকারের আশা আছে এবং যাঁর সুন্দর রাজনীতি ও সুষ্ঠু পরিচালনা থেকে দেশের উন্নতি ও কল্যাণের শতসহস্র বাসনা যুক্ত। তার এই ইলম ও আদর্শ সত্ত্বেও তার মানসিকতার মধ্যে একজন চালাক ও কপট গোলাম প্রবেশ করে নিজের অবস্থান সুদৃঢ় করে নিল এবং নিজের ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য ও স্বার্থসিদ্ধিতে বাদশাকে ব্যবহার করতে লাগল। সে দেশের পেট কেটে শুধু নিজের উদর ভরার চিন্তায় লেগে থাকল। ওদিকে বাদশাহ গোলামের তেলমারা কথার তালে পড়ে তার কথাই বলতে লাগলেন। মন্ত্রীরা তাকে লক্ষ বুঝবুদ্ধি দিলেন এবং অনেক কাকুতি-মিনতি করে বাদশাহকে সঠিক পথে আনতে চেষ্টা করলেন; কিন্তু কপট গোলাম কারও চেষ্টাই সফল হতে দিল না। বরং উল্টো মন্ত্রীদের ব্যাপারে কু-ধারণা তৈরি করে দিল। বাদশাহর বিভিন্ন পথ ও উপলব্ধির নানা মাধ্যমগুলো চারদিক থেকে বন্ধ করে শুধু নিজের সুবিধামত বানিয়ে নিল। যেন রাজত্বের বাগডোর বাহ্যত বাদশাহর হাতেই আছে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বাদশাহর আড়ালে এই কপট গোলামই রাজত্ব চালিয়ে যাচ্ছে। স্পষ্ট যে, এমতাবস্থায় রাজত্বের চরিত্রটি পুরো বদলে যায়। যে শাসক ছিল সে প্রজা হয়ে গেল এবং যে প্রজা ছিল সে শাসক হয়ে গেল।

সবাই জানে যে, এমন শাসনব্যবস্থা– যাতে কপটরা ক্ষমতার মূলে অবস্থান করে এবং ভদ্রসমাজ ধোঁকা খেতে থাকে, তা বেশি দিন স্থায়ী হয় না। বরং এমন দেশের ধ্বংসের আলামতগুলো খুব দ্রুত সামনে আসতে থাকবে এবং ফল এই দাঁড়াবে যে, এই বাদশাহকে ক্ষমতাচ্যুত করে দেওয়া হবে; তার প্রাসাদ ও

রাজত্ব ছিনিয়ে নেওয়া হবে। অন্যদিকে আপনি নিজেই বুঝে নিন যে, রাষ্ট্রীয় বিপ্লবের পর ওই কপট কর্মচারীর কী দশা হবে? তার সেই কাজের মাধ্যম ও ব্যবস্থাপকরা– যারা তার স্বার্থসিদ্ধিতে সাথী ও সাহায্যকারী ছিল, খোদ তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে এবং নিজেদের ধ্বংস দেখে প্রথমে তাকেই ধ্বংস করার চেষ্টা করবে। ফলে সর্বাবস্থায় সবার আগে এই কপট গর্দান উড়িয়ে দেওয়ারই সিদ্ধান্ত হবে। আর তার জন্য দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলেও একটু ঠাঁই হবে না।

ঠিক অনুরূপভাবে বুঝে নিন যে, রূহ একটি আলেম ফাজেল শাসক। যার মধ্যে ইন্দ্রিয়ানুভূত যুক্তিলব্ধ এবং আবেগ-উদ্দীপনার নানা পবিত্র বিষয় গচ্ছিত আছে। যা শুধু দেহজগতের উপরই নয়; বরং তার মধ্যস্থতায় বিশ্ব-সৃষ্টির উপর রাজত্ব করার যোগ্যতা রাখে। আকল তার প্রধান উজির এবং নকল[২] তার নীতিমালা। কিন্তু সাথে সাথে তার একজন কপট এবং বজ্জাত চাকরও আছে– যার মাধ্যমে রাষ্ট্রের শাহী নির্দেশ জারি হয়– যেন উজির ও অফিসারগণ তা বাস্তবায়িত করতে পারে। ওই কপট চাকরটি হল এই দেহ, যা উপাদান-চতুষ্টয়ের সমষ্টি। সে কপট এজন্য যে, তার গঠনপ্রক্রিয়ার যে অংশগুলি আছে, সবই নির্বোধ, অজাত মূর্খ ও বেতমিয। ওগুলোর মধ্যে ভালমন্দের কোন তফাত নেই। কপটতার এমন হাল যে, যে ওকে নিয়ে বেশি পরিশ্রম করে; ওর নৈকট্য অর্জন করে, ওর কারণেই সে সবচে' বড় দুশমন এবং হন্তা বনে যায়।

একজন মানুষ মাটির মুরতি এবং পাথরের পাষাণ ভূতের সামনে যত দীর্ঘ কালই সিজদায় পড়ে থাক; কিন্তু যদি ভারি মূর্তিটি উপর থেকে ধসে পড়ে, তাহলে সর্ব প্রথম সে নিজের এই একনিষ্ঠ পূজারীর মাথাটিই চূর্ণ করবে। তার কখনই এই খেয়াল হবে না যে, এ তো আমার ভালবাসিয়ে এবং ইবাদতগুজার বান্দা, আমার পক্ষে তার মাথা চূর্ণ করা উচিত নয়। বরং আমার এই কাজটি ওইসব লোকের সাথে হওয়া উচিত, যারা আমা হতে অনেক দূরে এবং আমার উপাস্য মর্যাদা স্বীকার করে না। অনুরূপভাবে একব্যক্তি যদি শতসহস্র বছরও কোন সাগরের পানির সামনে কপাল ঠুকে, নাক ঘষে এবং দাসত্বমূলক আবেদন-নিবেদন করতে থাকে, তবুও যখন জলোচ্ছাসের উত্থান হবে তখন প্রথমে তাকেই ডুবিয়ে দেবে। যে তার সাথে সবচে' বেশি নৈকট্য হাসিল করে থাকবে, তার ব্যাপারে সাগরের কোন আপন-পর ভাবনাও থাকবে না। একজন অগ্নিপূজক যদি অগ্নিকুণ্ডের সামনে বছরের পর বছর সিজদাবনত হয়ে পড়ে থাকে, তবুও আগুন

---

[২] শরীয়তের বর্ণনাসমষ্টি।

তাকে সাহায্য করতে পারে না। বরং তার প্রথম হামলা তার এই নিকটবর্তীকেই আগে ভস্ম করবে। বাতাসের পূজারীরা যতই বাতাসের আলোচনায় মগ্ন থাক, কিন্তু খোদ বাতাসের ঝঞ্ঝা প্রথমে তার পূজারীকেই গারত করে দিবে। অন্যদের পালা তো পরে আসবে। আপনি শিল্প-সভ্যতাতেই দেখে থাকবেন যে, যারা মাত্রার অধিক বস্তুপ্রিয়, তারা বস্তুর হাতেই বেশির ভাগ ক্ষয় ও ধ্বংস হয়। মেশিনের প্যাচের মধ্যে তারাই বেশিরভাগ ধরা পড়ে, যারা রাতদিন মেশিনারি কাজের মধ্যেই ব্যস্ত থাকে। উড়োজাহাজের মধ্যে তারাই বেশি ধ্বংস হয়, যারা ওগুলোর সাথে নিবিড়তা এবং সখ্যতা রাখে।

ড্রেডনাট এবং ভারি সমরাস্ত্র দিয়ে তারাই বেশির ভাগ যখম হয়, যারা ওই যন্ত্রগুলোর সামনে মাথানত করে। গ্যাস এবং বিষাক্ত ট্যাংক, রাইফেল ও রিভালবারের গোলা-বারুদ দিয়ে তাদেরই সমাপ্তি বেশি ঘটে, যারা ওগুলোর প্রেমে জানবাজি রাখে। কখনও বস্তুজগতের এই আলোকিত প্রতিবিম্বগুলোর এদিকে নজর পড়ে না যে, যারা আমাদের আবিষ্কারক এবং অসহায় গোলাম এবং যারা নিজেদের জানই শুধু নয়; বরং ঈমানকেও আমাদের জন্য উৎসর্গ করেছে, কম্পক্ষে তাদেরকে আমাদের লক্ষবস্তু না-বানানো চাই। আমরা তাদেরকে ধ্বংস করে দিব যারা দূরে দূরে থাকে; আমাদের সাথে কোন সখ্যতা গড়ে না।

যা হোক, বস্তুজগতের এরচে' বেশি আর কি কপটতা এবং নীচুতা হতে পারে যে, তার কাছে শত্রুমিত্রের কোন ফরাক নেই। শুধু তা-ই নয়; বরং যে তার বেশি দোস্ত, তারই সে বড় দুশমন। নীচুতার এখানেই শেষ নয়; এরচে' বেশি এই যে, যারা তার দুশমন, উল্টো তাদের পায়ে পড়ে বন্ধুত্বের দাবি করে। কাজেই এই আনুগত্যপ্রকাশ ইলম ও অনুভূতি থেকে নয়। ভদ্রতাসুলভ চরিত্রের কারণে নয়। বরং জুতোর জোরে। আর স্পষ্ট কথা যে, চরিত্রের জগতে জোরপূর্বক আদায়কৃত আনুগত্যকে আনুগত্য বলে না। সুতরাং যেসব উপাদানের নীচুতার এই অবস্থা, ওগুলোর মাধ্যমে গঠিত দেহ থেকে কল্যাণের আশা আর কখন হতে পারে। এমন দেহের জন্য যদি 'কপট' উপাধি নির্বাচন করা যায়, তাহলে আর অসুবিধা কী?

রূহানী শক্তির অপব্যবহারের ফলাফল

যাই হোক, এই নালায়েক ও কপট গোলাম (দেহ) একান্ত নিজের আরামের জন্য রূহকে তার পক্ষে ঢোল পিটাতে লাগিয়ে দিয়েছে। আকলকে গভীর চিন্তা থেকে ফেরারি বানিয়েছে। শরীয়তের বিধানাবলিকে বিস্মরণের থেকে ছুঁড়ে দিয়েছে। নফসের বাসনা পূরণ এবং নগদ ফায়দা লুটার সবুজ কানন দেখিয়ে রূহকে তার মূল প্রাপ্য ও স্থায়ী ফায়দা থেকে উদাসীন করে দিয়েছে। আর এই আলস্যগ্রস্ত রূহ নিজের সমস্ত শৈল্পিক শক্তি ব্যয় করে ওই ফায়দাগুলো হাসিল করা শুরু করেছে– যার সমস্ত কল্যাণ এই চতুর বস্তু বা কপট গোলামের কাছেই পৌঁছুতে পারে। ফল এই দাঁড়াল যে, দেহ তো কিছু পেয়ে গেল বটে; কিন্তু রূহ থেকে গেল শূন্যহস্ত। বরং যা কিছু সে অর্জন করার সংকল্প করছিল, সেগুলোতেও সে খোদ এই গোলামেরই মুখাপেক্ষী হয়ে গেছে। সেই রূহ, যে ঐশ্বরিক গুণাবলির নমুনা হওয়ার কারণে শ্রেষ্ঠতম মর্যাদার অধিকারী ছিল এবং কারও মুখাপেক্ষী ছিল না– সে তার এই নির্বোধ দেহের মুহতাজ হয়ে গেল, অথচ সে-ই প্রতিটি ক্ষেত্রে রূহের মুহতাজ ছিল। সেই নির্ভীক রূহ, যার সাথে সমস্ত কর্ম-ব্যবস্থা সংশ্লিষ্ট ছিল– সে-ই তার প্রত্যেক কাজে এইসব কর্মব্যবস্থার হাত দেখতে শুরু করেছে এবং সেই রূহ, যে কখনও ফেরেশতাদের মাসজুদ ছিল, আজ আসবাবের গোলাম হয়ে নিজের দাস-দাসিকে সেজদা করতে বসেছে। সে উপকরণের এমনই গোলাম হয়ে গেছে যে, যদি বস্তুব্যবস্থা তার হাতে না থাকে, তাহলে সে বেকার ও বিকলাঙ্গ। এমতাবস্থায় এই রূহ নিজের ইলমি শক্তির মাধ্যমে বস্তুগত ফায়দার একটি সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠিত করেছে বটে; কিন্তু নিজের ওইসব নিপুণ পরাকাষ্ঠা খোয়ানোর পর, যা তার প্রাণের অংশ হয়ে থাকত এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে তাকে সঙ্গ দিত। সে শহরে হোক অথবা জঙ্গলে; শতব্যবস্থার ভিড়ের মধ্যে হোক অথবা ব্যবস্থাশূন্য– প্রতিটি জায়গায় সে নিজের নৈপুণ্য দেখাতে পারত। কিন্তু এই গোলাম এবং গোলামিপ্রিয় রূহ মুখাপেক্ষিতার এমন পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে যে, যদি সে শহরে থাকে এবং শহরও এমন, যেখানে বিদ্যুৎব্যবস্থা এবং বাষ্পীয় শক্তি প্রস্তুত আছে তাহলে সে স্বয়ংসম্পূর্ণ। রেডিও দিয়ে খবর দিতে পারে, টেলিফোন করতে পারে, টেলিগ্রাফের মাধ্যমে আওয়াজও পৌঁছে দিতে পারে; ক্যামেরা থাকলে ছবিও তুলে নিতে পারে। কিন্তু সে যদি গ্রামাঞ্চলে থাকে, যেখানে বস্তুগত অবলম্বন বর্তমান নয় অথবা শহরেই থাকল; কিন্তু যদি বিদ্যুৎ ফেইল হয়ে যায় বা দুশমন এগিয়ে এসে বৈদ্যুতিক তারসমূহকে কেটে ফেলে তাহলে এই রূহ তখন বিকলাঙ্গ এবং বেকার।

এর সারসংক্ষেপ তো এ ছাড়া আর কী বের হবে যে, এই রূহ নিজের আসল

এবং প্রকৃত পরাকাষ্ঠা লোহা-পিতলের কাছে অর্পণ করে নিজে অন্ধ হয়ে বসেছে। যা মুখাপেক্ষিতা এবং গোলামির নিকৃষ্টতম উপমা। অথচ রূহ তো ছিল সে, যে ঐশ্বরিক মর্যাদার সমন্বয়ক ছিল। সে ইলম ও মারেফাতের এক বিরাট অংশ নিয়ে এসেছিল। সে সূক্ষ্মতা ও শক্তির ভাণ্ডার ছিল। তার নির্ভীকতা এবং আত্মমর্যাদাবোধের পূর্ণতা থাকা দরকার ছিল। [উচিত ছিল], সে তার কোন একটি কাজের ক্ষেত্রেও নিজের দাস-দাসি এবং এইসব নির্বোধ ও বিকলাঙ্গ বস্তুগুলোর মুহতাজ হবে না। সে যদি গ্রামে বসে– যেখানে বৈদ্যুতিক ফোন নেই, গ্যাসের ভাণ্ডার নেই– আওয়াজ দিত, তাহলে পূর্ব প্রান্ত থেকে পশ্চিম প্রান্তে গিয়ে পৌঁছত। যদি এমন জায়গা থেকে তার ভ্রমণ ও স্থানান্তরিত হওয়ার প্রয়োজন হত, যেখানে না রেলগাড়ি আছে, না মটর ও বিমান আছে, তবুও কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে শতসহস্র মাইলের সফর সে সমাপ্ত করে নিতে পারত। যদি তার দেখার প্রয়োজন হত তাহলে সংকীর্ণ অন্ধকার এক কোণে বসেই শুধু সারা দুনিয়া নয়; আরশে আযীম পর্যন্ত সমগ্র সৃষ্টি অবলোকন করে নিতে পারত। জমিন তার জন্য সঙ্কুচিত হয়ে যেত। বাতাস তার অনুগত হয়ে থাকত। সময় তার জন্য স্থির হয়ে যেত। সে বর্ষা ও বন্যার মধ্যে সাগর-মহাসাগরের দয়া-অনুগ্রহের মুখাপেক্ষী হত না; বরং খোদ সাগরই নিজের ক্ষিপ্রতা ও উন্মত্ততার মধ্যে তার ইশারা অনুসরণ করত। সে যুদ্ধ-বিগ্রহের ভিতর লোহা ও সমরাস্ত্রের মুখাপেক্ষী হত না; বরং যে বস্তু সে হাতে নিত, তা-ই তার জন্য অস্ত্রে পরিণত হয়ে যেত। আর এসবকিছু এজন্য হত যে, এই বস্তুগত এবং উপাদানগত যন্ত্রগুলো যখন সেই মৌলিক সূক্ষ্মতার কারণে এমন শক্তির কাজ করতে পারছে, তাহলে রূহ তো শুধু ওইসব সূক্ষ্মতার সমন্বয়কই ছিল না; বরং ওগুলোর চেয়ে হাজার হাজার গুণ অগ্রসর হয়ে সূক্ষ্মতার এক গভীর খাজানা ছিল। আর ওইসব সূক্ষ্মতার কারণে সে রাজাধিরাজের মহাপবিত্র সত্তার সাথে পরিপূর্ণ সম্পর্ক রাখছিল– যিনি নিজের কোন কাজের ক্ষেত্রে কোন মাধ্যমের মুখাপেক্ষী নন; বরং মাধ্যমগুলোই নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার ক্ষেত্রে তাঁর কাছে মুহতাজ। কাজেই আবশ্যক ছিল যে, রূহে রব্বানীরও মান এমন থাকবে যে, সে নিজের কোন কাজকারবারে এক মুহূর্তের জন্যও এসব বস্তুগত উপায়-অবলম্বনের মুহতাজ হবে না। সবশেষে এর কী কারণ হতে পারে যে, বিদ্যুৎ নিমিষে মহাশূন্যে উঠে যেতে পারে; আর যেই রূহ বিদ্যুতকে নিয়ন্ত্রণ করার শক্তি রাখে, সে বিদ্যুতের সহায়তা ছাড়া জমিনের এক ইঞ্চি উপরেও উঠতে পারে না!

কী কারণ আছে যে, একটি ইঞ্জিন তার আগুন-পানির ভিতরগত শক্তির সাহায্যে পূর্ব ও পশ্চিমকে এক করে ফেলবে; আর যে মানুষ নিজে ইঞ্জিনগুলোর মধ্যে

শক্তি সঞ্চার করার সামর্থ্য রাখে সে এরকম দ্রুত গতির নড়াচড়ার ক্ষেত্রে একটি কদমও উঠাতে পারবে না! আবার কী কারণ আছে যে, তার ও টেলিফোনের বৈদ্যুতিক শক্তি শতসহস্র মাইলের নানা খবর কয়েক মিনিটের মধ্যে এনে দিবে; আর সেই মানুষ, যে মেশিনারিজের মধ্যে বৈদ্যুতিক প্রাণ সঞ্চার করে সে নিজের পক্ষ থেকে তার আওয়াজ এক মাইল দূরেও পৌঁছাতে পারবে না! মোট কথা, যদি বস্তুজগৎ থেকে রূহেরই কারিশমায় এমন আশ্চর্য আশ্চর্য বিষয় প্রকাশ পেতে পারে, তাহলে খোদ রূহ এবং রূহানিয়াত থেকে তো এমন নয়; বরং এরচে' অনেক অনেক গুণ এগিয়ে আশ্চর্য বিষয়সমূহের কারখানা খুলে যাওয়া উচিত ছিল। যাতে এই নির্ভীক রূহের অমুখাপেক্ষিতা ও আত্মসম্মান পুরাপুরি প্রকাশ পেতে পারে। অন্যথায় এ কেমন উল্টো কথা যে, চাকর তো শক্তিশালী বটে; কিন্তু মালিক দুর্বল; বেচারা গোলাম তো শাসক বটে; কিন্তু বাদশাহ অপারগ ও অসহায়।

রূহানী শক্তির বিস্ময়কর কৃতিত্ব

আপনি একে শুধু খেয়ালী কোন বক্তব্য বা ইলমি কোন মতবাদ মনে করবেন না। বরং প্রকৃতপক্ষে যখনই রূহ আপন স্বভাবের উপর চলেছে, তখনই আসবাবের কোন প্রকার মধ্যস্থতা ছাড়া এমনিতেই বিভিন্ন আশ্চর্য বিষয় প্রকাশ পেয়েছে। আর সে বস্তুজগতকে নিজের গোলামি করিয়ে আপন রূহানিয়াতের বলে মৃৎপাত্রে খুব নাচিয়েছে।

ফারুকে আজম রাদিয়াল্লাহু আনহু মিম্বারে নববীর উপর খুতবা প্রদান করতে গিয়ে হঠাৎ 'ইয়া সারিয়াতাল জাবালা' ধ্বনি মদীনা থেকে ইরাকের নাহাদান পর্বতমালা পর্যন্ত পৌঁছে দেন। অথচ সে সময় বেতারের স্বপ্নও কারও ভিতরে আসেনি। ইবরাহীম আলাইহিস সালাম মাকামে ইবরাহীমে দাঁড়িয়ে হজের ঘোষণা দেন, কাজেই তা শুধু দুনিয়ার কোণে কোণে নয়; বরং মায়েদের পেটে লুকানো শিশুদের কানে গিয়েও পৌঁছে। অথচ তা কোন আওয়াজ বৃদ্ধিকারী যন্ত্রের সাহায্যে দেওয়া হয়নি। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আসমানের একটি দরজা খোলার আওয়াজ জমিনে বসে বসেই শুনেছিলেন। যা নিঃসন্দেহে কোন বৈদ্যুতিক যন্ত্রের সাহায্যে শোনা যায়নি।

হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জাহান্নামের গভীরে একটি পাথর পড়ার শব্দ দুনিয়া থেকেই শুনেছিলেন। সত্তর বছর ধরে তার তলায় পৌঁছছিল। বস্তুত এখানেও কোন ইন্দ্রিয় এবং বস্তুগত শব্দযন্ত্র ব্যবহার করা হয়নি। হুজুর সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লাম হারেস ইবনে আবু খিরারের ফিদয়ার উট ও দাসীর কথা সংখ্যাসহ তার বর্ণনা করার আগেই বলে দিয়েছিলেন। অথচ ওয়ার্লেসের সাহায্যে দূরের সংবাদ প্রদানের কোন পদ্ধতি সেসময় আবিষ্কার হয়নি।

হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওহীর মাধ্যমে বলে দিয়েছেন, মানুষের মুখ থেকে এমন কোন কথা বের হয় না, যা সংরক্ষিত হয় না– مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ। অথচ তখন রেডিওর বৈদ্যুতিক তরঙ্গের সাহায্যে মহাশূন্যের আওয়াজ সংগ্রহ এবং তার কোন উদাহরণের চিহ্নটাও দুনিয়াতে ছিল না।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুতার যুদ্ধের পুরা নকশা মসজিদে নববী থেকে পরিদর্শন করে উপস্থিত শ্রোতামণ্ডলিকে বলে দিয়েছিলেন। অথচ আজকের সংবাদ সঞ্চালনপদ্ধতির অস্তিত্ব এবং উপমাও ছিল না। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কার হেরেমে বসে মসজিদে আকসার মেহরাব ও থাক দেখে দেখে গুনে দিয়েছিলেন। অথচ দূরবীণ আবিষ্কারের কথা তখন কারও খেয়ালের মধ্যেও স্থান পায়নি। এরচেয়েও বড় কথা সালাতুল খাওফ পড়তে গিয়ে ওই আরবের অলিগলিতে হযরত জান্নাত ও জাহান্নাম পরিদর্শন করেছেন।

তিনি আরাফাতের ময়দানে শয়তানের দুর্ভোগ ও দুর্গতি দেখেছেন। বদরের দিনে অবতীর্ণ সারি সারি ফেরেশতা সৈনিক পরিদর্শন করেছেন এবং এক আঁধার রাতে অদৃশ্য রহস্যাবলি অর্থাৎ নানান ফেতনা ও গযবের অবতরণ পর্যন্ত দেখে নিয়েছেন। অথচ সেখানে বস্তুগত শীশার কোন দূরবীণ মাঝখানে ছিল না। হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম সুলাইমানী সিংহাসনে বসে মহাশূন্যে ভ্রমণ করেছেন এবং বাতাস তাঁর ইঙ্গিতে চলেছে। অথচ সেসময় আজকের উড়োজাহাজের খসড়ার ধারণাও কারও মাথায় আসেনি।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শুধু আসমানী মহাশূন্যেই নয়; বরং সমস্ত আসমানের ভ্রমণ কয়েক মুহূর্তে সমাপ্ত করেছেন। অথচ সেখানে পেট্রোলচালিত কোন বিমানের মধ্যস্থতা এই সফরে ছিল না। কেননা, বিমানের ধারণাও [তখন] কারও মাথায় ছিল না। আর বিমান থাকলেই তার আসমানী ভ্রমণের সাথে কী-ই-বা সম্পর্ক থাকত? এরকম হাজার হাজার ঘটনা ইতিহাসের পেটে সংরক্ষিত আছে। যা থেকে এই ধারণা হয় যে, রূহানী শক্তির মালিক কখনও বস্তুজগতের গোলাম হয়নি।

সার কথা হচ্ছে এই যে, রূহের প্রকৃত অবস্থান হচ্ছে নির্ভীকতা। সে তার

অস্তিত্বের উৎস মহাসত্তার সাথে সম্পৃক্ত থেকে এবং তাঁরই সাথে সম্পর্ক ও সাদৃশ্য বজায় রেখে নিজের কোন কাজে ওইসব বস্তু– যেগুলো তারচে' অনেক গুণে নিম্নমানের– সেগুলোর মুহতাজ হবে না। যেমনটি তার প্রাকৃতিক সূক্ষ্মতার দাবি। যার অনেকগুলো উদাহরণ আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম-এর মোজেযা এবং আল্লাহর অলিদের কারামাত ও আজব কার্যাবলি থেকে পেশ করা হল। যেগুলোতে মুহূর্তের জন্যও বস্তুজগৎ থেকে সামান্যতম সহযোগিতাও নেওয়া হয়নি। বরং ওগুলো কেবলমাত্র রূহানী কার্যক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ, যাতে রূহানিয়াতের সামনে বস্তুজগতের মাথানত করতে হয়।

বস্তুগত রূপান্তর প্রকৃত কোন পরাকাষ্ঠা নয়

সুতরাং রূহানী ক্ষমতার এসব প্রতিষ্ঠিত নমুনা এবং অলৌকিক সত্য উদাহরণ থেকে একথা স্পষ্ট হয় যে, একটি পরাকাষ্ঠাসম্পন্ন রূহের প্রকৃত পূর্ণতা বস্তুজগৎ থেকে বে-পরওয়া হওয়া এবং বস্তুগত উপকরণের ধড়পাকড় থেকে স্বাধীন থাকার মধ্যে নিহিত। অন্যথায় জড় পদার্থের মধ্যে বস্তুগত উপকরণের মাধ্যমে রূহের কোন প্রকার হস্তক্ষেপ শুধু রূহের কোন বিশেষত্ব ও উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব নয়। কেননা, একটি বস্তুও তো আরেকটি বস্তুর ভিতরে রূহের মধ্যস্থতা ছাড়া নানা হস্তক্ষেপ করতে পারে।

কোথাও মাটি ও ধুলো উড়ে উড়েও কয়েক শতাব্দিতে সাগরকে শুষ্ক করে দেয়। চলন্ত পানি নিম্নাঞ্চলে নতুন নতুন নালা বের করে স্থলকে সাগর এবং সাগরকে স্থলভাগে পরিণত করে। পাহাড়ী আগ্নেয়গিরি ফেঁপে উঠে শীতল প্রাঙ্গণকে অগ্নিকুণ্ড বানিয়ে দেয়। বাতাস বয়ে বয়ে পুকুর ও ঝিলসমূহকে শুষ্ক করে দেয়। কাজেই জড়বস্তুর মধ্যে পরিবর্তন সাধন যদি কোন নৈপুণ্যের ব্যাপার হয়, তাহলে এই নৈপুণ্য তো খোদ জড় শক্তিগুলোও দেখাতে পারে, যেখানে রূহের কোন হস্তক্ষেপ থাকে না। অতএব, যদি মানুষের মানবতা এসব উপকরণ থেকে বহুগুণে শ্রেষ্ঠ হয়ে থাকে; আর তা অবশ্যই এবং যদি সে মৌলিক উপাদানের ত্রিমাত্রিক উৎপাদন [মাওয়ালিদে সালাসা]-এর মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও সর্বোন্নত হয়ে থাকে; আর তা অবশ্যই বটে, তাহলে তার জন্য গৌরব করার মত বা শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের মত পরাকাষ্ঠা ওই বস্তু হতে পারে না, যা তারচে' নিম্নস্তর থেকেও উৎসারিত হতে পারে। বিশেষ করে যখন রূহের এইসব বিবর্তনও ওই জড়বস্তুগুলোর সহায়তায়ই হয়। কেমন যেন রূহ যেহেতু এসব বস্তু ছাড়া বিবর্তনে সক্ষমও নয়, তাই রূহ শুধু পরাকাষ্ঠাহীনই নয়; বরং এ হচ্ছে তার জন্য

স্পষ্ট দোষ। কেননা, সে নিজের চেয়ে নিম্নস্তরের বস্তুর কাছে মুহতাজ হচ্ছে এবং নিজের উৎকর্ষ ওগুলোর কাছে তালাশ করছে। তার কারণ, কোন কামেল সত্তার জন্য অন্যের কাছে পূর্ণতা সন্ধান করাটাই মারাত্মক দোষ। বিশেষ করে যখন সে 'অন্য'টা তারচে' অনুন্নত এবং নিম্নস্তরের হয়। তবে হ্যাঁ, নিজের চেয়ে শ্রেষ্ঠের কাছে পূর্ণতা সন্ধান করা দোষের পরিবর্তে একটি ভাল গুণ। কেননা, অন্যের কাছে পূর্ণতা সন্ধান না করে নিজে নিজেই পরিপূর্ণ হওয়া কেবলমাত্র বরকতময় সত্তা হক [তায়ালা]-র শান হতে পারে। যিনি প্রত্যেক দোষ থেকে পবিত্র এবং প্রতিটি পূর্ণতার উৎস ও কেন্দ্র। মাখলুক কোন অবস্থাতেই একেবারে নির্দোষ হতে পারে না। আর কিছু না হলেও মাখলুক হওয়ার দোষ দূর হতে পারে না– যার মূল বের হয় অস্তিত্বহীনতা। আর যেহেতু মাখলুক সত্তাগতভাবে অস্তিত্বহীন বেরুল, কাজেই সত্তাগতভাবে সে উৎকর্ষমুক্তও হওয়ার কথা। কেননা, অস্তিত্বহীনতাই সমস্ত ত্রুটি ও দোষের উৎস। আর স্পষ্ট কথা যে, অতঃপর এই দোষীর উৎকর্ষমণ্ডিত হওয়ার জন্য এ ছাড়া আর কোন পথ নেই যে, সে ওই অস্তিত্বের উৎস হক তায়ালার মহাসত্তার দিকে প্রত্যাবর্তন করে পূর্ণতা হাসিল করবে– যিনি পূর্ণতার ভাণ্ডার এবং সকল দোষ থেকে পবিত্র। এ নয় যে, পূর্ণতা অর্জন করার জন্য তারচে' নিম্নস্তরের বস্তু জড়ের কাছে ধর্ণা দেবে। কেননা, বস্তু মানুষের জন্য শ্রেষ্ঠত্ব হাসিলের মাধ্যম নয়; নয় গৌরবের কিছুও। কারণ, তার বস্তুসত্তা তো ওইটাই যেটা গাধার আছে এবং গরুর আছে। এজন্য স্পষ্ট যে, যদি সে পূর্ণতা হাসিল করার লক্ষ্যে নিজের দেহ বা বস্তুসত্তা– যা উপাদানসমূহের সম্মিলিত রূপ– তার দিকে প্রত্যাবর্তন করে, অর্থাৎ আগুন-পানি-বাতাস-মাটি থেকে সে পূর্ণতা অন্বেষী হয়, তাহলে তা পরাকাষ্ঠার পূর্ণতা নয়; বরং তা হল পরাকাষ্ঠা খোয়ানো এবং ত্রুটি সঞ্চয় করা। কারণ, এতে আছে নিজের চেয়ে নিকৃষ্টের কাছে মুখাপেক্ষিতা এবং গোলামি। আর কেমন যেন রাজা-বাদশাহ কর্তৃক চাকর-বাকরের হুকুম পালন করা– যা একটি অত্যন্ত নীচু এবং লজ্জাষ্কর দোষ। সুতরাং যদি সাইন্সের মূল কথা এই হয় যে, মানুষ বস্তুর সাহায্যে বস্তুর মধ্যে বিবর্তনের উপর সক্ষম হবে, তাহলে এ অবস্থায় মানুষ আগুন-পানির খেলাঘর থেকে বের হতে পারবে না, যাতে তাকে মানবতার বাহক বলা যেতে পারে। বরং এক অসম্পূর্ণ ত্রুটিপূর্ণ মানুষ সাব্যস্ত হবে সে। যার দোষও সীমা পেরিয়ে লজ্জাষ্কর পর্যায়ের। আর না হোক, এমন নৈপুণ্য তো কেউ দেখাতে পারবে না, যাতে মানবতার কোন বিশেষ মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়!

মানুষের মুখাপেক্ষিতার মূল কারণ

তবে হ্যাঁ, যদি মূলে সামান্যও নির্ভীকতার ব্যাপার থাকত, তবুও সম্ভব ছিল যে, তার গোলামি থেকে কিছুটা অমুখাপেক্ষিতা লাভ হবে। কিন্তু যখন তার মূল এবং সত্তাগত বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে মুখাপেক্ষিতা ও বন্দিত্ব এবং কেমন যেন অপারগতাই তার উল্লেখ করার মত গুণ। কাজেই তার গোলামি করে কীবা নির্ভীকতা অর্জিত হতে পারে? যদি কিছুটা নির্ভীকতা অর্জিত হয়ও, তবে তাও নিঃশেষ হয়ে যাবে এবং অপারগতার উপর অপারগতা সৃষ্টি হয়ে যাবে, যা সমস্ত অপদস্থতার মূল। সুতরাং রূহের মত নির্ভীক জহরতের জড়বস্তুর মত অপারগ ও মুহতাজ উপাদানের চৌকাঠে মাথানত করা প্রকৃতপক্ষেই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মর্যাদা ধ্বংস করার শামিল।

মৌলিক উপাদান চতুষ্টয়ের চরিত্র

হ্যাঁ, এখন এই ধাঁধাঁর একটা ব্যাখ্যা চাই যে, তাহলে এই চৌরঙ্গা বস্তুটার মধ্যে এমন সত্তাগত মুখাপেক্ষিতা কিভাবে এল এবং কোত্থেকে এল? স্পষ্ট কথা যে, প্রত্যেক জিনিসের ভালমন্দ তার স্বভাবচরিত্র থেকে প্রকাশ পায়। এই চৌরঙ্গা বস্তুর জন্মগত এবং প্রকৃতিগত চরিত্রই আপাদমস্তক মুখাপেক্ষিতা ও গোলামি। এজন্য মানবপ্রাণ যে পরিমাণ বস্তু ও বস্তুসত্তার সাথে ব্যস্ততা কায়েম রাখবে, সে পরিমাণই মুখাপেক্ষিতা ও গোলামি অর্জন করতে থাকবে। কেননা, নফসে আম্মারার লালন-পালন ও চরিত্রগঠন মৌলিক উপাদান চতুষ্টয় থেকেই হয়ে থাকে। এজন্য সে মানুষকে নীচুতা, হীনতা ও মুখাপেক্ষিতার দিকে নিয়ে যায়– যা প্রকৃতপক্ষে মূল উপাদানগুলোর স্বভাবজাত এবং নীরব দিকনির্দেশনা। যদি এই মনুষ্যত্বের উপর রূহানিয়াতের নূর বিস্তার লাভ না করে বা সে যদি রূহানিয়াতের আশ্রয়ে না আসে তাহলে এই চৌরঙ্গা বস্তু ও তার জন্মগত স্বভাব এক মুহূর্তের জন্যও মুখাপেক্ষিতা এবং অসহায়ত্বের কর্দমা থেকে তাকে বের হতে দেবে না। কেননা, বস্তুজগতের স্বভাব-চরিত্রই হচ্ছে অসহায়ত্ব ও মুখাপেক্ষিতা।

মাটি ও তার চরিত্র

যা হোক, প্রথমে মাটির কথাই ধরুন এবং চিন্তা করুন যে, তার স্বভাবসুলভ ও মৌলিক বৈশিষ্ট্য কী? স্পষ্ট যে, তার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে নীচুতা ও

পশ্চাতগামিতা। আর অতীন্দ্রিয় বা চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য হচ্ছে দখল ও কৃপণতা। কাজেই যে জিনিসটাই জমিনের উপর রাখা যাক না কেন, সে তা লুকিয়ে ফেলবেই। এবং যতক্ষণে আপনি তার কলজে চিরে বের না করবেন, দেবে না। আল্লাহ মালুম, আদম-সন্তানের কী পরিমাণ মজুদ ও কত লাশ তার লোভ-লালসার গুদামে সে লুকিয়ে রেখেছে। তার পেট চিরে বের করে নিন, তাহলে ভাল। অন্যথায় নিজ থেকে সে অবহিত করবে না; জিনিসও দেবে না। আপনি কি জমিনের কৃষিজাতদেরকে খেয়াল করেননি যে, জমিন কত দানশীলা। সে এককে শ' করে দেয় এবং খেতের মাধ্যমে তার উদারতা ও দানশীলতার গল্প শুনায়। অথচ বীজ আপনার; যার মধ্যে জমিনের কোন দখলদারিত্ব নেই। যদি বীজ জমিন থেকে উৎপন্ন হয়ও, তবে সেও কারও না কারও ছিটানো বীজের মাধ্যমেই। জমিন নিজে দানা-বীজও উৎপন্ন করেছে, এমনটি নয়। এ থেকে স্পষ্ট হয় যে, সর্বপ্রথম এবং সূচনার বীজ অবশ্যই অন্যত্র থেকে এনে জমিনে ফেলা হয়েছিল; জমিন নিজ থেকে উৎপাদন শুরু করেনি। কাজেই বীজ নিঃসন্দেহে আপনার; জমিনের নয়। এজন্য বদান্যতার সূচনা জমিন থেকে নয়; বরং মানুষ থেকে। আবার বীজ ফেলার পর তা হেফাজত করা, বৃদ্ধি করা এবং সংগ্রহ করার আসবাবপত্রও আপনারই। যদি পানি দেওয়া না হয়, তাহলে জমিন আসল বীজটাও শুকিয়ে ফেলে; তা সংরক্ষণ করা তো দূরের কথা। কাজেই পানি দেওয়ার অর্থই হল বীজ সংরক্ষণ করা, বৃদ্ধি করা এবং বৃদ্ধি করে তার ভিতর থেকে নতুন বীজ বের করা। কেমন যেন পানি এই বীজকে বড় করে বের করে আনার একটি যন্ত্র। এ কারণে 'জমিন তাকে বৃদ্ধি করেনি' শুধু এই কথাই নয়; বরং পানির লশ্‌কর পাঠিয়ে আপনি জবরদস্তিমূলক তার কাছ থেকে মূলধনটা সুদে-আসলে বুঝে নিয়েছেন। এজন্য জমিনের মৌলিক স্বভাব দখলদারিত্ব ও কৃপণতা আপন অবস্থায়ই বহাল রয়েছে।

এখন যেহেতু এই দখলদার এবং কৃপণ বস্তুই মানবদেহের বিরাট অংশ এবং তাকে 'মাটির মুষ্টি' বলা হয়; কাজেই স্বভাবগতভাবে তার হৃদয়ে প্রথম চরিত্র হিসেবে এই সংকীর্ণতা ও কৃপণতাই প্রবেশ করে। কাজেই নবজাতক শিশুরও একটু হুঁশ এলেই সে দখল এবং কৃপণতা অর্থাৎ নেওয়া এবং হজম করার জন্য চেঁচাতে থাকে; দেওয়া এবং ছাড়ার জন্য নয়। আপনি যে কোন বস্তু শিশুর সামনে রেখে দিবেন, সে তা হাতে নিবে এবং স্বভাব অনুযায়ী মুখের দিকে নিয়ে যাবে তা দখল করে হজম করার জন্য। তাকে দিতে থাকবেন, সে খুশি [হতে] থাকবে; বন্ধ করে দিবেন, সে চিল্লানো শুরু করবে। স্বভাবগতভাবে তার মন বদান্যতা এবং ত্যাগের দিকে এগোয় না; [এগোয়] দখল আর কিপটেমির

দিকে। কারণ, মেটে উপাদানের প্রধান চরিত্রই এই দখল ও কৃপণতা। আর স্পষ্ট কথা যে, দখল ও কৃপণতা– যে দু'টির উৎপত্তি লোভ-লালসা থেকে– মুখাপেক্ষিতা এবং পরাধীনতা সৃষ্টি করে। স্বকীয়তা এবং নির্ভীকতার সাথে ওগুলোর কোন সম্পর্ক নেই। কারণ, বখিল প্রথমত ওই বস্তুর মুহতাজ হয়েছে, যার মধ্যে কৃপণতা প্রকাশ পেয়েছে। তারপর ওই ব্যক্তির মুহতাজ হয়েছে, যে বস্তুটার মালিক। অতঃপর মালিকের দানের মুহতাজ হয়েছে, যাতে বস্তুটা তার কাছে আসে। যদি দাতা, দান এবং প্রদত্ত বস্তু না হয়, তাহলে বখিল এ পর্যায়ের মুহতাজ যে নিজের কৃপণতাটাও পুরো মাত্রায় প্রকাশ করতে পারে না। এজন্য কোন বখিল একটি বস্তুকে নেওয়ার আগে থাকে দাতার মুহতাজ এবং নেওয়ার পরে হয়ে যায় প্রদত্ত বস্তুটির মুহতাজ। কেননা, নিজের দেহ-মনকে তা থেকে পৃথক করে নেওয়ার শক্তি সে রাখে না। এ কারণে বখিলের শুরু থেকে শেষ অবধি মুখাপেক্ষিতা এবং গোলামিই বের হয়। আর যেহেতু জমিনের এই গুণটাই একটি বিশেষ গুণ, এজন্য তার মুখাপেক্ষিতা ও নীচুতাও অন্যান্য উপাদান থেকে বেশি। কাজেই এই মেটে মানুষ মেটে অবস্থায় থেকেই স্বভাবগতভাবে কৃপণতার জালে ফেঁসে থাকে– যা কিনা আপদমস্তক মুখাপেক্ষিতার আড়ালে অপমান আর অপমান।

আর দখল ও কৃপণতার পরিবর্তে বদান্যতা এবং ত্যাগ পেশা বনে গেলে, তার ফল দাঁড়ায় নির্ভীকতা। যা কিনা আপদমস্তক ইজ্জত আর সম্মান। তাতে অন্যের কোন মুখাপেক্ষিতা ও গোলামি নেই; বরং [তাতে থাকে] অন্যকে দিয়ে নিজের গোলামি করানো।

আগুন ও তার চরিত্র

অনুরূপ আগুনের ব্যাপারটি দেখুন। তার স্বভাব ও চরিত্র হল ঊর্ধ্বগতি। সে মাথা নীচু করে না। কোন আবশ্যক প্রয়োজনেও মাথানত করে না। কেমন যেন আগুন মাটির বিপরীত। কেননা, ওটি আপাদমস্তক নীচুতা, আর এটির আপাদমস্তক ঊর্ধ্বগামিতা। আগ্নিক শয়তান একথা বলেই আদমের সামনে মাথানত করতে অস্বীকার করেছিল– خَلَقْتَنِيْ مِنْ نَّارٍ وَّ خَلَقْتَهٗ مِنْ طِيْنٍ স্পষ্ট কথা যে, মানুষের মধ্যে আগুনেরও একটি অংশ রাখা হয়েছে। তার শারীরিক তাপ এবং কিছু কিছু সময়ে জ্বরের উষ্ণতা এ কথার দলিল হিসেবে যথেষ্ট। এজন্য হুঁশ থাকতেও তার ভিতর স্বভাবগতভাবে ওই ঊর্ধ্বগামিতা দর্প বড়ত্ব এবং আমিত্বের জযবা উথলে ওঠে। যা মৌলিকভাবে ওই আগ্নিক ক্রিয়ামাত্র। সুতরাং

দর্প ও বড়ত্বের কাছে প্রভাবিত হয়ে যখন মানুষের মধ্যে জোশ, রাগ এবং গোস্বার লহর খেলে যায়, তার রগ ফুলে ওঠে এবং চেহারার উপর আগুনের লালিমা এসে পড়ে, তখন লোকসমাজে বলা হয়– 'অমুকে অগ্নিমূর্তি ধারণ করেছে; অমুকের মধ্যে আগুন উথলে উঠেছে।' একথা বলা হয় না যে, 'অমুকের মধ্যে গোস্বার পানি বয়ে গেছে।' বা 'গোস্বার মাটি চিরে যাচ্ছে।' বরং মাটি হয়ে যাওয়া তার ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়ার আলামত মনে করা হয়। কেননা, মাটি প্রকৃতপক্ষে আগুনের উল্টো। কাজেই মানুষের এই দর্প বড়ত্ব এবং আমিত্ব মূলত ওই আগ্নিক স্বভাব থেকেই। এখন এই স্বভাব নিয়ে চিন্তা করুন, তাহলে এর ভিতরেও আপাদমস্তক মুখাপেক্ষিতা এবং হীনতা নজরে আসবে। কেননা, ঊর্ধ্বগামিতা ও উচ্চতার সারসংক্ষেপ হল অন্যের চেয়ে বড় হওয়া এবং নিজেকে নিজে অন্যের দৃষ্টিতে বড় দেখানো বা অন্যের ধারণায় নিজেকে বড় বুঝানোর চেষ্ট করা। সুতরাং ঊর্ধ্বগামিতার ভিত্তি মূলত অন্যের উপর এবং তাও আবার অন্যদের ধারণার উপর বলে প্রমাণিত হয়। যার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, যদি 'অন্য'ই না থাকে বা অন্যদের ধারণা তার বড়ত্বের দিকে ধাবিত না হয় অথবা [তাদের] ধারণা বদলে যায়, তাহলে তার বড়ত্বের ইমারত চুরমার হয়ে যাবে। স্পষ্ট যে, এরচে' বেশি মুখাপেক্ষিতা আর কী হতে পারে, সম্মান আমাদের বটে; কিন্তু অন্যদের দখলে। মর্যাদা আমাদের; কিন্তু অন্যদের ধারণার স্রোতে প্রবাহমান। অন্যদের কাছেও তার স্বস্তি এবং স্থিরতা মেলেনি।

এই সূত্র হিসেবে ঊর্ধ্বগামিতা ও উচ্চতার জন্য মানুষের উপর নির্ভরতা এবং চাটুকারিতাও আবশ্যক। যাতে তাদের ধারণা বদলে না যায় এবং এই ঊর্ধ্বগামিতার ঠোস তাদের নজরে চুপসে না যায়। অতএব, যে স্বভাব একজন মানুষকে শতসহস্র মানুষের দ্বারস্থ করে, তারচে' হীনকর এবং মুখাপেক্ষিতাপূর্ণ স্বভাব আর কী হতে পারে? হ্যাঁ, তার বিপরীত স্বভাব হল বিনয়। যার হাকিকত হল কোন প্রকার অপারগতা এবং বাধ্যবাধকতা ছাড়া কেবল নিজের ইচ্ছায় অন্য কারও সামনে নত হওয়া। তার মতলব হচ্ছে এই যে, আমরা আপনার এ ধারণার মুখাপেক্ষী নই যে, আপনি আমাদের কী মনে করেন? আপনি আমাদের যা মনে করার করুন; কিন্তু আমরা আমাদের মূলের উপর আছি। যা আপনার বুঝা না বুঝার কারণে কোন পরিবর্তন হতে পারে না। কাজেই বিনয়ের সার নির্ভীকতা এবং ঊর্ধ্বগামিতার সার মুখাপেক্ষিতা ও গোলামি প্রমাণিত হল। তা ছাড়া বিনয়ের পন্থায় উঁচু এবং সম্মানী হওয়া সত্ত্বেও স্বেচ্ছায় ও সাগ্রহে নত হওয়া স্বনির্ভরতার দলিল। কেননা, এ বিষয়ের উপর নিজের নিয়ন্ত্রণ আছে যে, সে নিজের আগ্নিকতার কারণে উঁচু হতে চাচ্ছিল; অথচ আমরা তাকে বিজ্ঞতার

সাথে নত করে দিয়েছি। আর স্পষ্ট যে, নফসের উপর কুদরত ও নিয়ন্ত্রণ প্রভুত্বের দলিল। যা মুখাপেক্ষিতার পরিপন্থী। কেননা, মুখাপেক্ষিতা সবসময় দাসত্বের মধ্যে থাকে; প্রভুত্বের মধ্যে নয়। অন্যদিকে বড়ত্বের মধ্যে মানুষের নিজের উপর কর্তৃত্ব থাকে না– মুখাপেক্ষিতা ও অপারগতা যাকে বলে। যা হোক, বিনয় থেকে নির্ভীকতা এবং অহংকার ও বড়ত্ব থেকে মুখাপেক্ষিতা ও গোলামি জন্ম নেয়। এ দৃষ্টিকোণ থেকে এটা বিনয়।

মোট কথা, যতক্ষণ মানুষ এই আগ্নিকতার জাল থেকে মুক্ত না হয়, এই আগ্নিক স্বভাব তাকে অপদস্থ করতেই থাকে। কেননা, মুখাপেক্ষিতার বৈশিষ্ট্যই হল লাঞ্ছনা ও দারিদ্র্য। সার এই বের হয় যে, আগুনও তার চরিত্র অনুযায়ী মুখাপেক্ষিতার ফল দান করে; নির্ভীকতার নয়।

বাতাসের স্বভাব

অনুরূপ বাতাসের কথা ধরুন। তার ভিতর বিস্তৃতি ও ছড়িয়ে পড়ার খাসলত বিদ্যমান। কেননা, সে চায় সবখানে উপস্থিত থাকতে; সবখানে প্রবেশ করতে; সবখানে ভরে থাকতে; প্রতিটি কোণে কোণে অবস্থান করতে। যাতে সবাই তার অবস্থান টের পায়। মানুষের মধ্যে বাতাসের অংশও আছে। যেমন পায়ু পথের বায়ু এবং নিঃশ্বাস ইত্যাদি থেকে বুঝা যায়। কাজেই সেও চায় যে, আমি সবখানে উপস্থিত থাকব; সবখানে প্রবেশ করব; প্রতিটি স্থান-কালের মধ্যে আমার উপস্থিতি থাকবে। কিন্তু যেহেতু তার ব্যক্তিসত্তার এত বিস্তৃতি নেই যে, সে সবখানে উপস্থিত থাকবে। এজন্য সে হাওয়াবেগে বিস্তৃতি এবং প্রসিদ্ধি কামনা করে যে, মানুষ আমার চর্চা করুক; আমার আলোচনা ছড়িয়ে যাক; আমার আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে আমি সবখানে উপস্থিত থাকি। সুতরাং মানুষের প্রসিদ্ধির হাওয়া [খাহেশ] দেহস্থিত হাওয়ায়ী অংশেরই আসর। চিন্তা করলে দেখবেন যে, এই প্রসিদ্ধিপ্রেম স্বভাবের মূলও সেই মুখাপেক্ষিতা। কেননা, মানুষের এই খাহেশও তা ছাড়া পুরো হতে পারে না। কেননা, প্রথমে দ্বিতীয় কেউ হতে হবে। তারপর সে তাকে চিনবে। অতঃপর সে তার কল্যাণ কামনা করবে; তার প্রপাগান্ডা করবে, তার চর্চাও করবে এবং তাকে উড়াতে থাকবে। কাজেই এই স্বভাবেরও সার কথা সেই অন্যের মুখাপেক্ষিতা বেরিয়ে এল। এজন্য প্রসিদ্ধিপ্রেমও কোন মানসম্পন্ন চরিত্র নয়; বরং একটি অপমানকর দক্ষতা। যা নিজের উদ্দেশ্যগুলোকে অন্যের উপর ছেড়ে দেয়। এর উল্টো হল প্রসিদ্ধিপ্রেমেরও বিপরীতটা। যাকে আত্মগোপন ও লুকানো বলে। কেননা, তার

হাকিকত হল নিজেকে নিয়ে মগ্ন থাকা এবং অন্যদের থেকে সম্পূর্ণরূপে নির্ভীক বে-পরওয়া হয়ে যাওয়া। এমতাবস্থায় এই নির্ভীকতার উপর যে কুদরতী প্রসিদ্ধির ফল যুক্ত হয়, তা ওই কৃত্রিম ও রেডিমেড প্রসিদ্ধির চেয়ে বহু গুণে ভাল। যা হোক, বাতাসের স্বভাবের সারাংশও সেই মুখাপেক্ষিতা এবং জায়গায় জায়গায় মার খেয়ে খেয়ে ফিরে আসা– এ কথায় প্রমাণিত হল।

পানির চরিত্র

এমনিভাবে যদি পানির কথা বলেন, তবে তার স্বভাব হল দমনমুক্ততা এবং নিয়ন্ত্রণহীনতা। অর্থাৎ পানির মধ্যে স্বনির্ভরতার কোন আলামত নেই। সে নিজেকে নিজে রোধ করতে পারে না। চারদিক থেকে আপনি রোধ করুন, তাহলে সে থেমে যাবে। যেখানে বাঁধ ভেঙে যাবে, পাত্র ফুটো হয়ে যাবে, সেখানেই পানি অবাধে সোজা চলা শুরু করবে এবং যেখানে একটু নীচু জায়গা পাবে, সেখানেই প্রবাহিত হবে। কোথাও একটু মাটি খোঁড়া হলে পানি আপন বাসস্থান ছেড়ে সেখানে চলে আসবে। মানুষের মধ্যে যেহেতু এই পানিরও অংশ মজুদ আছে– যেমন, থুথু শ্লেষ্মা কফ প্রস্রাব ইত্যাদি থেকে স্পষ্ট হয়– এজন্য তার মধ্যে জন্মগতভাবে আত্মনিয়ন্ত্রণের কোন আলামত থাকে না। একটু ভাল জিনিস দেখলেই সেদিকে ঝুঁকে পড়বে। কোন মেয়ে নজরে পড়লে তার পিছু নেবে। মনোহর কোন বস্তু নজরে এলে তার পিছে পিছে চলতে থাকবে। কোন সুন্দর ইমারত দেখে ফেললে সেদিকেই অপলক তাকিয়ে থাকবে এবং ভাববে– ইস! যদি এই বিল্ডিং আমার হত?

মোট কথা, সামান্য নীচু স্থান সামনে এলেই ঢলে পড়ার স্বভাব মানুষের মধ্যে জলজ অংশ থেকে এসেছে। কিন্তু তারও সারসঞ্চয় সেই মুখাপেক্ষিতা এবং অসহায়ত্ব। কেননা, অন্যকে দেখে নিয়ন্ত্রণে থাকতে না পারা এবং নিজের নফসকে দমন করতে না পারা শক্তিহীনতা ও অপারগতার দলিল। আর অপারগতা হল মুখাপেক্ষিতার মূল। হ্যাঁ, আত্মনিয়ন্ত্রণ এবং ভাল ভাল বস্তু দেখেও তা থেকে বে-পরওয়া থাকা, নিজেকে কন্ট্রোল করা এবং পতিত হওয়া থেকে বাঁচিয়ে রাখা শক্তির দলিল। যার সারসঞ্চয় সেই নির্ভীকতা বের হয়। সুতরাং পানির স্বভাবগত বৈশিষ্ট্যও সেই মুখাপেক্ষিতা এবং গোলামি প্রমাণিত হল।

আত্মিক হীনতার মূলনীতি চারটি

কাজেই বস্তুগত চরিত্রের চারটি মূল নীতি বেরিয়ে আসে– ১. সংকীর্ণতা ও কৃপণতা, ২. ঊর্ধ্বগামিতা, দর্প, প্রসিদ্ধিপ্রীতি, ৩. আত্মপ্রচার ও ৪. আত্মনিয়ন্ত্রণ শূন্যতা অর্থাৎ লোভ-লালসা। এগুলো মানুষকে আপদমস্তক মুখাপেক্ষী ও গোলাম বানিয়ে দেয়।

আত্মিক সৌন্দর্যের মূলনীতি চারটি

হ্যাঁ, আবার এই নির্ভীকতা ও আত্মসম্মানবোধের মূলনীতির উপর আলোকপাত করলে ওই স্বভাবচতুষ্টয়ের বিপরীতও হতে পারে। যেমন– সংকীর্ণতা ও কৃপণতার বিপরীত হল বদান্যতা ও ত্যাগ। বড়ত্ব ও অহংবোধের বিপরীত হল বিনয় ও নম্রতা। খ্যাতি ও প্রসিদ্ধিপ্রেমের বিপরীত হল লুক্কায়ন ও আত্মগোপন। লোভ-লালসা ও আকাঙ্ক্ষায় লিপ্ত হওয়ার বিপরীত হল আত্মনিয়ন্ত্রণ ও অল্পে তুষ্টি। আর এই বিপরীত চতুষ্টয় চারটি বস্তুচরিত্রের উল্টো। তাই নিঃসন্দেহে এগুলোকে বস্তুচরিত্র বলা যেতে পারে না। বরং (এগুলোকে) সেই রূহের অতিবাস্তব চরিত্র হিসেব করতে হবে, যেগুলো বস্তুর বিপরীত। আর এভাবেই যদি বস্তুবাদিতা থেকে আত্মিক হীনতার চারটি মূলনীতি বের হয়ে থাকে, তবে রূহের অতি- বাস্তবতা থেকেও আত্মিক সৌন্দর্যের চারটি মূলনীতি বেরিয়ে আসবে– ত্যাগ, বিনয়, আত্মলুক্কায়ণ, অল্পে তুষ্টি।

আমল বিনে আখলাকের প্রকাশ অসম্ভব

কিন্তু এ কথাও একটি বাস্তব সত্য যে, আখলাকের মৌলিক আসর কাজের মাধ্যমেই প্রকাশ পায়। যদি আখলাকের মুনাসিব কাজকর্ম বাস্তবায়িত না হয়, তাহলে আখলাকের স্বভাবগত আসরসমূহ প্রকাশ লাভ করতে পারে না। যেমন- উদাহরণস্বরূপ বীরত্বের আসরসমূহ যুদ্ধবিগ্রহের কাজ ছাড়া প্রকাশিত হতে পারে না। বদান্যতা চরিত্রের বহিঃপ্রকাশ কখনও দান-দক্ষিণা ছাড়া হতে পারে না। বিনয় চরিত্রের স্বরূপ অক্ষমতার নমনীয়তা ছাড়া সামনে আসতে পারে না। এমনই অবস্থা অন্যান্য সব আখলাকের। এজন্য দরকার বস্তুচরিত্রের মুখাপেক্ষিতার আসরসমূহ এবং রূহানী চরিত্রের আসরসমূহ প্রকাশকারী কার্যাবলি কোনগুলো, তা জানা।

বস্তুচরিত্র প্রকাশক কাজ

বস্তুচরিত্রের আসরসমূহ : যতটুকু গবেষণা করা হয়েছে, তার সারাংশ স্বার্থপরতা এবং স্বার্থান্ধতা ছাড়া আর কিছু বের হয় না। কৃপণতা বা লোভ, প্রসিদ্ধিপ্রেম বা নেতৃত্ব– সবগুলোর বুনিয়াদ নফসের এই খাহেশের উপর যে, সম্পদ ও সম্মানের সবটা দুনিয়ার সব জায়গা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে শুধু তারই কামনার চাদরে জমা হয়ে আসুক। কেমন যেন প্রত্যেকটা বস্তু অন্যদের থেকে ছিনিয়ে নিয়ে নিজের জন্য নির্ধারণ করে নেওয়া এই বস্তুচরিত্রের দাবি। কাজেই দখল ও কৃপণতার মধ্যে নিজের অধিকারের বস্তু অন্যদের থেকে ফিরিয়ে রাখা হয়। লোভ-লালসার মধ্যে অন্যদের অধিকারের বস্তু তাদের কাছ থেকে ফিরিয়ে নিজের জন্য পছন্দ করা হয়। বড়ত্ব ও মাদবরির মধ্যে সব ধরনের পরাকাষ্ঠাকে অন্যদের থেকে অস্বীকার করে নিজের জন্য প্রকাশ করা হয়।

প্রসিদ্ধিপ্রেম ও নামডাক সৃষ্টির মধ্যে অন্যদের উন্নতি বাধাগ্রস্ত করে নিজের নাম কামনা করা হয়। সুতরাং এই চরিত্রগুলোর মধ্যে কোন না কোনভাবে অন্যদের থেকে ফিরিয়ে রাখা এবং নিজের জন্য বরাদ্দ করার অনুভূতি ক্রিয়াশীল থাকে।

এজন্য স্পষ্ট হয় যে, বস্তুচরিত্রের স্বভাবগত আসরগুলোকে যেই শব্দটি সামগ্রিকভাবে প্রকাশ করে, তা হচ্ছে 'সংকীর্ণতাবোধ'। কৃপণতা ও লোভের ক্ষেত্রে এই সংকীর্ণতাবোধ সম্পদবিষয়ক। শ্রেষ্ঠত্ব ও খ্যাতি অর্জনের ক্ষেত্রে সম্মানবিষয়ক। কিন্তু সম্মানের কামনাই হোক বা সম্পদের বাসনাই হোক, উভয়টির আত্মপ্রকাশ এই সংকীর্ণতাবোধ থেকেই হয়। অর্থাৎ এই বস্তুচরিত্রের স্বভাবগত আসর– স্বার্থান্ধতা ও মুখাপেক্ষিতা সংকীর্ণতাবোধ ছাড়া আত্মপ্রকাশ করতে পারে না।

রূহানী চরিত্র প্রকাশক কাজ

অন্যদিকে রূহানী চরিত্র যেহেতু সবদিক থেকে বস্তুচরিত্রের উল্টো, এজন্য ওগুলোর স্বভাবগত আসরসমূহ প্রকাশকারী কাজকর্মও উল্লিখিত কাজের উল্টো হওয়া স্বাভাবিক। এজন্য এটা একটা খোলামেলা সত্য যে, যেমন বস্তুচরিত্রের আসর স্বার্থান্ধতা ছিল; (তেমনই) রূহানী চরিত্রের আসর নিঃস্বার্থপরতা। সুতরাং ত্যাগ ও বিনয় হোক অথবা আত্মলুক্কায়ণ ও অল্পে তুষ্টি হোক– এগুলোর মধ্য থেকে কোন একটির ভিত্তিও নফসের স্বার্থান্ধতার উপর নয় যে, সবকিছু শুধু তার লাভ হবে। বরং তার ভিত্তি এ কথার উপর যে, 'নিজের আবশ্যক স্বার্থও অন্যের জন্য ছেড়ে দিতে হবে।'

কাজেই বদান্যতার মধ্যে নিজের বস্তু অন্যকে দেওয়া হয়। অল্পে তুষ্টির মধ্যে অন্যদের জিনিস তাদের জন্যই ছেড়ে দেওয়া হয়। বিনয়ের মধ্যে নিজের ইজ্জত অন্যের জন্য কুরবানী করা হয়। আর আত্মলুক্কায়ণের মধ্যে অন্যদের সম্মানের জন্য পুরো ময়দান ছেড়ে দেওয়া হয়।

মোট কথা, এসব চরিত্রের বুনিয়াদ অন্যের কাছ থেকে ফিরানো এবং ছিনিয়ে নেওয়ার উপর নয়; বরং অন্যকে দেওয়া, প্রদান করা এবং অনুগ্রহ করার উপর। এজন্য স্পষ্ট হয় যে, যেসব ক্রিয়াকর্ম এসব রূহানী চরিত্রের স্বভাবগত আসরসমূহ প্রকাশ করে, সেটা সংকীর্ণতাবোধ নয়; বরং তার বিপরীত বদান্যতা হতে পারে। দানশীলতা এবং অল্পে তুষ্টির মধ্যে এই বদান্যতা হয়ে থাকে মালবিষয়ক; আর বিনয় ও আত্মলুক্কায়ণের মধ্যে হয়ে সম্মানবিষয়ক। কিন্তু নির্ভীকতা মালবিষয়ক হোক বা হোক সম্মানবিষয়ক– বদান্যতা ছাড়া আত্মপ্রকাশ করতে পারে না। এটি একটি বাস্তব পরীক্ষিত বিষয় যে, সম্পদ ও সম্মানের ব্যাপারে এরকম নির্লিপ্ততা একদিকে অন্যদের থেকে নির্ভীক করে দেয় এবং অন্যদিকে নিঃস্বার্থপরতা সুদৃঢ় করে দেয়। যার ফলে মন ও হৃদয়ের প্রশস্ততা সৃষ্টি হওয়া একটি অলৌকিক বিষয়। এজন্য এসব রূহানী আখলাকের আসর সাহসের প্রশস্ততা, নির্ভীকতা, প্রভাব, আত্মনির্ভরতা এবং অমুখাপেক্ষিতা হিসাবে প্রতীয়মান হয়। যার আত্মপ্রকাশের মাধ্যম হল বদান্যতা। শরীয়তের পরিভাষায় এই বদান্যতার নামই হল সদকা– যার অর্থ জান-মাল-ইজ্জত এবং কথা ও কাজ মালিকুল মুলক-এর জন্য দিয়ে দেওয়া ও ব্যয় করা। আবার সদকা করার ক্ষেত্রে যেহেতু নফসের প্রিয় এবং মজার বিষয়গুলোকে বর্জন করতে হয়– যা স্বভাবগতভাবে নফসের জন্য পীড়াদায়ক, এজন্য তার অপর নাম মুজাহাদা। কাজেই সারসংক্ষেপ এই বের হয় যে, স্বভাবগত সংকীর্ণতার কারণে মানুষের মধ্যে যেই মুখাপেক্ষিতা ও সংকট কায়েম হয়, তা দূর করা এবং তার পরিবর্তে নির্ভীকতা ও আত্মনির্ভরতার সম্পদ স্থলাভিষিক্ত করার একমাত্র মাধ্যম হচ্ছে সদকা, মুজাহাদা এবং ইনফাক[৩] ফি সাবিলিল্লাহ। তার মানে ইনফাকের যে পর্যায়টিই সংকীর্ণতাবোধের মুকাবেলায় অর্জিত হতে থাকবে, সে পর্যায়েই মানবমনে মুখাপেক্ষিতা ও গোলামি দূরীভূত হয়ে নির্ভীকতার বিভিন্ন স্তর কায়েম হতে থাকবে। কেননা, সদকা দ্বারা ওইসব বস্তুচরিত্র ধ্বংস ও দুর্বল হতে থাকবে, যেগুলোর মাধ্যমে সংকীর্ণতার কর্মকাণ্ড আত্মপ্রকাশ করে।

---

[৩]. ইনফাক ফি সাবীলিল্লাহ– অর্থ আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করা।

সদকা ও নির্ভীকতা

কাজেই যখন সদকাদাতা নিজের প্রিয় মাল ও সম্পদ ব্যয় করে দেন, তখন স্পষ্ট যে, তিনি সংকীর্ণতা ও কৃপণতার শেকড় কেটে দেন- যা কিনা ছিল মৃৎ চরিত্র। অন্যথায় কৃপণতার আধিক্য হতে হতে এই সম্পদকে কখনই কি পৃথক করা যেত। স্পষ্ট যে, যে পরিমাণই মুখাপেক্ষিতার মূল- সংকীর্ণতা ও কৃপণতার নীচুতা অলস হয়ে পড়বে, সে পরিমাণই বদান্যতা ও ত্যাগের পূর্ণতা সুদৃঢ় হতে থাকবে- যা নির্ভীকতা হাসিলের মাধ্যম। আর এভাবেই নিঃশঙ্কতার একটি বিরাট পর্যায় অর্জিত হয়ে যাবে। তারপর যখন কোন সদকাদাতার দান-খয়রাতের স্বাদ অনুভব হতে থাকবে, তখন একথা স্পষ্ট যে, তিনি অন্যের জিনিসের উপর নজর দিতে পারবেন না। কোন বস্তু দেখে তিনি বিহ্বল হতে পারবেন না। বরং তার দান-সদকার অর্থই হচ্ছে এই যে, তিনি কমপক্ষে নিজের নফসকে বিরত রাখার ব্যাপারে আশাবাদী হবেন- যাকে কানায়াত[৪] বলে। কাজেই এই সদকা ও ইনফাকের মাধ্যমে লোভের সমাপ্তি ঘটবে- যা ছিল জলজ চরিত্র। আর এভাবেই নির্ভীকতার দ্বিতীয় পর্যায় লাভ হয়ে যাবে।

পার্থক্য থাকলে শুধু এইটুকু আছে যে, প্রথম পর্যায়ে পৌছে নিজের জিনিসের মহব্বত দূর হয়েছিল- যার সাথে কৃপণতা জুড়ে ছিল এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে পৌছে অন্যের জিনিসের মহব্বত দূর হয়ে যাচ্ছে- যার সাথে লোভ জুড়ে ছিল। আর এভাবেই একজন মানুষ সম্পদ প্রসঙ্গে না নিজের গোলাম হয়ে থাকবে; না অন্যের। তারপর যখন এই সদকা গোপনীয়তার সাথে করা হবে- যাতে লৌকিকতার কোন খাহেশ থাকতে পারবে না, অন্যথায় গোপন করার কী প্রয়োজন- তাই এর মাধ্যমে প্রসিদ্ধি-প্রেম এবং সুখ্যাতি সৃষ্টির শিকড় কেটে যাবে- যা ছিল পাবনিক স্বভাব। এই বিরাট মুখাপেক্ষিতার শিকড় কেটে যাওয়ায়- যার বিবরণ এসে পড়েছে- নির্ভীকতার আরও একটি পর্যায় সহজলভ্য হয়ে যাবে।

আবার একথাও স্পষ্ট যে, সদকাদাতা তখনই তার সদকা গোপন করার চেষ্টা করতে পারে, যখন তার কাছে এই আমলটি অন্যদের আমল অপেক্ষা তুচ্ছ মনে হবে এবং সে অন্যদের আমলের তুলনায় নিজের আমলের কোন বড়ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব নিজের দৃষ্টিতে অনুভব না করবে। তা না হলে সে গোপন করার পরিবর্তে অন্যদের আমল অপেক্ষা নিজের আমলকে উন্নত ও শ্রেষ্ঠ বলে প্রকাশ করা এবং

---

৪. অল্প পেয়েই সন্তুষ্ট থাকা।

যেখানে সেখানে তার আলোচনা করতে পছন্দ করত। কিন্তু যখন সে অন্যের সদকার সাথে নিজের সদকার তুলনা করা থেকেও বিরত থেকেছে, তখন একথা পরিষ্কার হয় যে, সে নিজের আমলের শ্রেষ্ঠত্ব ও বড়ত্বের ধারণা থেকেও দূরে সরে গিয়েছে। আর এভাবেই সে অন্যদের তুলনায় নিজের বড়ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব থেকেও নির্ভীক হয়েছে। স্পষ্ট কথা যে, সদকার এই গোপনীকরণের মাধ্যমে শ্রেষ্ঠত্ব ও বড়ত্ববোধের শিকড়ও কেটে গেছে– যা ছিল আগ্নেয় চরিত্র। আর এভাবেই নির্ভীকতার চতুর্থ এক পর্যায় সহজলভ্য হল।

আবার একথাও স্পষ্ট যে, নিজের নেককাজ গোপন করার ক্ষেত্রে অতিশয়োক্তি এবং তা-ও এ পর্যন্ত, যেন নিজের বাঁ হাতটিও টের না পায় যে, ডান হাত কী দিল এবং কাকে দিল। কেমন যেন নিজের নফসটি থেকেও লুকিয়ে রাখা। তার মানে এই যে, এই নেককাজের জন্য নিজের মনের মধ্যেও তার কোন গর্ব ও তৃপ্তি অনুভূত হবে না। এ কাজ সেই করতে পারে, যার দিলের মধ্যেও এই নেককাজের জন্য অন্যের তো বটেই নিজের কাজ হিসেবে বিন্দু পরিমাণ মর্যাদা ও মহত্ত্ববোধ না থাকবে। বরং সে তা কেবলমাত্র ফরয বলে করবে; হক আদায় বলে নয়। মনে রাখতে হবে, সদকার এমন পরিপূর্ণ গোপনীয়তার মাধ্যমে আত্মতৃপ্তি ও চমৎকারিত্ববোধের শিকড় কেটে যাবে। যার দ্বারা নির্ভীকতার একটি বিরাট ও গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় সহজতর হয়ে যায়।

নির্ভীকতার এই শেষোক্ত তিনটি পর্যায় মর্যাদাবোধ প্রসঙ্গের মুখাপেক্ষিতা থেকে নিস্কৃতি দান করে। যেমন প্রথম দু'টি পর্যায় সম্পদ প্রসঙ্গের মুখাপেক্ষিতা থেকে রক্ষা করেছিল। এই তিনটি পর্যায়ের মধ্যে পারস্পরিক তফাত ও দূরত্ব আছে। তা হচ্ছে এই যে, প্রথম স্তরে পৌঁছলে সদকাদাতা অন্যের কাছে সম্মানভিখারি থাকে না। দ্বিতীয় স্তরে পৌঁছলে নিজের আমলের মাধ্যমে সম্মান উপার্জনকারী থাকে না এবং তৃতীয় স্তরে পৌঁছলে নিজের নফস থেকেও ধারণার বালুচরে সম্মানপ্রাপ্তির পক্ষপাতি থাকে না। আর এভাবেই এই পঞ্চপর্যায়ের মাধ্যমে সম্পদ ও সম্মান– উভয় ক্ষেত্রের মুখাপেক্ষিতা ও পশ্চাৎপদতা থেকে আযাদ হয়ে, যে তাকে অপমান ও হীনতার গভীরে নিমজ্জিত করে রেখেছিল সেই 'অন্য' থেকে নির্ভীক হয়ে পড়ে এবং নির্ভীক হয়ে পড়ে খোদ 'আপনত্ববোধ' থেকেও।

বস্তুজগৎ থেকে নির্ভীকতা তায়াল্লুক মায়াল্লাহর ভিত্তি

মোট কথা, এই বস্তুপূজারী ও বস্তুগত নফসের দু'টি হীন স্বভাব কৃপণতা এবং লোভ তো সদকা দ্বারাই নিঃশেষ হয়েছে। আর অবশিষ্ট তিনটি হীন স্বভাব–

সুখ্যাতি কামনা, আপনত্ববোধ ও প্রসিদ্ধিপ্রীতি সদকার শর্তাবলি দ্বারা নিঃশেষ হয়েছে। আর স্পষ্ট কথা যে, যখন কোন মানুষ বখিল থাকল না; দানশীল হয়ে গেল– তার মানে এই যে, তার সম্পদেরও পরওয়া খতম হয়ে গেল। লোভী থাকল না; বরং অল্পে তুষ্ট হয়ে গেল– তার মানে এই যে, পরের সম্পদের পরওয়াও তার শেষ হয়ে গেল। প্রসিদ্ধিপ্রেমিক থাকল না; বরং নির্জনতাপ্রেমিক হয়ে গেল। তার মানে এই যে, মানুষের ধন্যবাদ ও নিন্দাবাদের তোয়াক্কা তার নেই। তার মধ্যে আত্মপূজা ও দাম্ভিকতা থাকল না; বরং সে আত্মনিয়ন্ত্রক হয়ে গেল। তার মানে এই যে, নিজের নফসের পরওয়াও তার নেই। তাহলে এর পরিষ্কার ফল দাঁড়ায় এই, এসব রূহানী আখলাক– যেগুলো সে সদকার মাধ্যমে অর্জন করেছে, তার বদৌলতে সে দুনিয়াতে কারও গোলাম থাকল না এবং সবকিছু থেকে তার মুক্তি ও স্বাধীনতা লাভ হল। আর একথা সবাই জানে যে, সমগ্র সৃষ্টি থেকে নির্ভীক হয়ে সে এখন কারও সাথে সম্পর্ক জুড়লে তা কেবল ওই বিশ্বস্রষ্টার সাথেই হতে পারে, যাঁর খাতিরে সে নিজের মাল, নিজের সম্মান এবং নিজের নফসসহ সবকিছু ত্যাগ করে দিয়েছিল এবং যাঁর স্বভাব অবলম্বনে সে এমন সভ্য হয়েছে। এমতাবস্থায় কারও সাথে তার সম্পর্ক হলে, তা সেই বিশ্বমণ্ডল থেকে নির্ভীক মহাসত্তার সাথেই। আর ভালবাসা সৃষ্টি হলে, তা-ও শুধু সেই বে-পরওয়া মহাসত্তার সাথেই– যিনি নিজের কার্যকলাপে কারও কাছে মুখাপেক্ষী নন। বরং সমস্ত সৃষ্টি নিজের অস্তিত্ব ও প্রকাশের ক্ষেত্রে তাঁর কর্তৃত্বাধীন।

'তায়াল্লুক মায়াল্লাহ'র শক্তিই সব রূহানী বিস্ময়তার ভিত্তি

এমতাবস্থায় জরুরি হচ্ছে যে, এই সদকাদাতা ব্যক্তি ও মুজাহিদ বান্দা বা আল্লাহ বাদে সবকিছু বর্জনকারী, যিনি অনন্য অমুখাপেক্ষী সত্তার সাথে সম্পর্ক কায়েম করেছে– তার থেকে পরিপূর্ণ নির্ভীকতা প্রকাশ পাবে এবং সেও নিজের কোন কাজে এসব সৃষ্টি বিষয়ক ব্যবস্থাপনা- অর্থাৎ বস্তুগত উপকরণের মুখাপেক্ষী থাকবে না। বরং খোদ এই উপকরণগুলোই তার দৃষ্টি ও লক্ষ্য অনুসরণ করবে। তার উপকরণবিহীন তৎপরতা শুধু পৃথিবীতে নয়; বরং আকাশসমূহেও পৌঁছতে থাকবে। সে উপরে উঠতে চাইলে বিমানের প্রয়োজন হবে না এবং স্থলের দূরত্ব অতিক্রম করতে চাইলে রেল ও মোটরের দরকার হবে না। সে দুনিয়ার প্রান্তে নিজের স্লোগান পৌঁছাতে চাইলে বাতাস ও বিদ্যুতের অধীন হবে না এবং দুনিয়ার স্লোগান শুনতে চাইলে রেডিও ও টেলিফোনের মুখাপেক্ষী হবে না।

সার কথা, তার হাতে ওইসব বস্তু প্রকাশ লাভ করবে, যেগুলো দুনিয়ার সমস্ত ফিলোসফার ও বিজ্ঞানীরা মিলেও প্রকাশ করতে পারেনি। অন্যথায় কমপক্ষে নির্ভীকতার এ স্তর তো তার অবশ্যই অর্জিত হবে যে, ইলম ও এতেকাদের ক্ষেত্রে ওই উপকরণগুলোকে প্রকৃত কর্মবিধায়ক মনে করবে না। আর আমলের ক্ষেত্রে তার এসব আসবাব ও উপকরণের সাথে কোন আসক্তি থাকবে না। বরং অভ্যাসগতভাবে কেবল জীবন-কৌশল হিসেবে এবং তা-ও আবার ঐশী নির্দেশ মনে করে ওগুলো ব্যবহার করতে থাকবে। যা হোক, প্রথম স্তর হল তাওয়াক্কুল ও নির্ভীকতার উচ্চ মাকাম– যার মধ্যে আসবাব বর্জনের পূর্ণ শক্তি অনুভূত হতে থাকবে। আর দ্বিতীয় স্তর হল মধ্যবর্তী– যার ভিতরে যদিও এমন শক্তি থাকে না; কিন্তু মারেফত বিশুদ্ধ হবে এবং আসবাব অবলম্বনের ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘন ও নিবিষ্টতা বাকী থাকবে না।

অতএব, এখন পুরোপুরিভাবে খোলাসা হল যে, বস্তুজগতের মধ্যে মুখাপেক্ষিতা ও আত্মলাঞ্ছনা সৃষ্টি ছাড়া অন্য কোন কারিশমা নেই। কেননা, তার স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্যই হল মুখাপেক্ষিতা ও গোলামি– যার প্রকাশ ঘটে আত্মীকরণ নামক কাজের মাধ্যমে। আর রূহের ভিতরে নফসের ইজ্জত সৃষ্টি ছাড়া আর কোন জযবা নেই। কেননা, তার প্রাকৃতিক স্বভাবের বৈশিষ্ট্যই হল নির্ভীকতা ও অমুখাপেক্ষিতা– যা ইজ্জত ও সম্মানের উৎস। যার প্রকাশ বদান্যতার মাধ্যমে হয়; যাকে সদকা বলে।

এ থেকে আপনি অনুমান করে থাকবেন যে, বস্তুগত ও রূহানী চরিত্রের সৌন্দর্য ও বৈশিষ্ট্য এবং কার্যকারিতার মধ্যে সম্পর্ক বৈপরীত্যের। কেননা, খোদ রূহ ও বস্তুর মধ্যেও তো বৈপরীত্যের সম্পর্ক।

রূহ একটি ঐশী লতীফা; আর দেহ একটি আঁধারখণ্ড। তার গতি উপরের দিকে; এর গতি নিচের দিকে। ও মানুষকে আরশী[৫] বানায়; এ মানুষকে ফারশী[৬] করে তোলে। ও তাকে উঁচু-শির করে; এ করে নতশির। কেমন যেন এদু'টির উপমা দাড়ির দুটি পাল্লার ন্যায়– একটিকে যত নামাবে; আরেকটি তত উপরে উঠবে। এজন্য এই বস্তুউপকরণগুলোর মাধ্যমে আপনি বস্তুচরিত্রকে যতখানি শক্তি ও দৃঢ়তা দিবেন, রূহানী চরিত্র ততখানি দুর্বল হতে থাকবে এবং ততখানিই নফসের নির্ভীকতা বিলুপ্ত হয়ে নফসের লাঞ্ছনা ও মুখাপেক্ষিতার জিঞ্জির মজবুত

---

[৫]. অর্থাৎ আরশে আজীমের সাথে সম্পর্কযুক্ত করে তোলে।

[৬]. ফারশ– জমিন, মাটি।

হতে থাকবে। যাকে অন্য কথায় এভাবে বুঝতে পারেন যে, রূহের মত সম্মানিত বাদশাহ দেহের মত কপট ও নির্বোধের যে পরিমাণ প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে চলতে থাকবে, সে পরিমাণই তার সমস্ত আনুগত্যের ইজ্জত ও দাপট বরবাদ হতে থাকবে। আর পরিণাম ফলে ধ্বংস ও অনিষ্ট উভয়কে ঘিরে ফেলবে।

কিন্তু যদি সদকা ও মুজাহাদা অর্থাৎ বস্তুজগৎ ও বস্তুতৃপ্তি থেকে নির্ভীকতার মাধ্যমে এই রূহানী আখলাককে শক্তি ও দৃঢ়তা প্রদান করতে থাকেন, তাহলে মুখাপেক্ষিতা ও গোলামি নিশ্চিহ্ন হয়ে পরিমাণমত অমুখাপেক্ষিতা ও পূর্ণতার শিকড় মজবুত হতে থাকবে। যার মধ্যস্থতায় দেহজগতের উপর রূহের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে এবং দেহের গোলাম প্রতিটি মুহূর্তে তার সামনে হাত বাঁধা অবস্থায় উপস্থিত থেকে হুকুমের তাবেদারী করবে। ফলে প্রত্যেকে নিজের অর্পিত কাজে লেগে থাকবে। উভয়ের সম্মানও পরিমিত পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত থাকবে এবং প্রাণসংসারের ন্যায়নীতিও স্বাভাবিক থাকবে।

শুধু বিজ্ঞান কখনও এই নির্ভীকতা সৃষ্টি করতে পারে না

আর পূর্বে এ কথা প্রমাণিত হয়েছে যে, এই বস্তুগত কার্যকলাপ– যেগুলো থেকে মুখাপেক্ষিতা ও নফসের লাঞ্ছনার ফল সৃষ্টি হয়, তা-ই সাইন্সের আলোচ্য বিষয় এবং এই রূহানী কার্যকলাপ অর্থাৎ সদকা ও মুজাহাদা– যেগুলো থেকে স্বনির্ভরতা ও নফসের ইজ্জত ফল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে, তা-ই ইসলামের আলোচ্য বিষয়। উক্ত আলোচনা দ্বারা নির্দ্বিধায় এই ফলাফল বেরিয়ে এল যে, পরিণতিতে সাইন্স মানুষকে আত্মলাঞ্ছনা ও ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায় আর ইসলাম পরিণামে গিয়ে তাকে ইজ্জত ও উভয়কালের সাফল্যের দিকে অগ্রসর করে।

প্রথম সুরত অর্থাৎ বস্তুজগতের প্রাধান্য এবং সাইন্সের প্রবৃদ্ধি রূহের অপদস্থতা ও বস্তুর আধিক্যের– যার দ্বারা সম্মানিত হয় অপদস্থ এবং অপদস্থ হয় সম্মানিত। যা একটি বিপরীতধর্মী বিষয় এবং উভয়ের জন্য ধ্বংসাত্মক। আর দ্বিতীয় সুরত অর্থাৎ রূহানিয়াত বা আধ্যাত্মিকতার কর্মকাণ্ড এবং রূহ-উন্মোচক ইসলামের শিরোত্থান ও বস্তুজগতের শাসিত হওয়ার। যাতে সম্মানিত তার সম্মানের মসনদে এবং অপদস্থ তার অপদস্থতা ও অবদমিতার চৌহদ্দিতে সীমিত থাকে। যা প্রকৃত ন্যায় বিচার এবং উভয়ের জন্য ইহপারলৌকিক কল্যাণ, উন্নতি ও সাফল্যের কারণ। এই হল সাইন্স

ও ইসলামের সংক্ষিপ্ত মৌলিক চিত্র– যা নিজের জ্ঞানের সাধ্যমত আপনাদের সামনে পেশ করা হল। আর এ-ই বর্তমান আলোচনার তিন মাকসাদ থেকে প্রথম মাকসাদ ছিল– যা আলহামদু লিল্লাহ্ সমাপ্তিতে পৌঁছল।

সাইন্স ও ইসলামের মধ্যে 'লক্ষ্য' ও 'উপলক্ষ্যে'র সম্পর্ক

এখন এর উপর চিন্তা করুন যে, এ হচ্ছে চৌরঙ্গা বস্তু এবং তা থেকে প্রস্তুত দেহ একটি কাঠামো– যার জীবন রূহের সাথে সংশ্লিষ্ট। রূহ তাকে জীবিত রেখে নিজের জ্ঞানবিজ্ঞান ও পূর্ণতা তার মাধ্যমে প্রকাশ করে। কাজেই শরীর হল রূহানী পূর্ণতা প্রকাশের একটি অবলম্বন ও যন্ত্র। সুতরাং রূহ তার নির্ধারিত কাজ থেকে ফারেগ হয়ে যখন ওই নির্দিষ্ট স্থানে চলে যায়– যা তার জন্য অনাদি কালে ফায়সালা করে রাখা হয়েছে, তখনই এই কাঠামো এবং অবলম্বন থেকে তাকে আলাদা করে দেওয়া হয়। কাজেই দেহ প্রকৃতপক্ষে কর্মসম্পাদক নয়; বরং কবুলকারী মাত্র। আর মূলও নয়; অবলম্বন মাত্র।

যদি এই দেহকে পরিপূর্ণ ঔদ্দেশ্যিতার আসন দেওয়া হয়, তাহলে প্রকৃতপক্ষে তা হয় কোন অবস্তুকে উদ্দেশ্য বানানো– যার পরিণতি পঁচা গলা এবং দেমাগকে নোংরা করা ছাড়া আর কিছু নয়। আর যখন নাকি সাইন্সের আলোচ্য বিষয় শুধু এই দৈহিকতা এবং চিজবস্তুগুলো। অথচ চিজবস্তু অবকাঠামো এবং অবলম্বন হওয়ার চেয়ে বড় কোন অবস্থান রাখে না। তাই অটোমেটিক সমাধান বেরিয়ে এল যে, সাইন্সের সমস্ত কারিশমা নীতিগতভাবে উপলক্ষ্যের চেয়ে বেশি মর্যাদা রাখে না। আর যেহেতু ইসলামের বিষয়বস্তু মৌলিকভাবে রূহানিয়াত ও রূহানী কর্মকাণ্ড এবং রূহ হল আসল। কাজেই একথা নিজে নিজেই স্পষ্ট হয় যে, ইসলামের সমস্ত বিষয় ঔদ্দেশ্যিতার স্তর থেকে কোনভাবেই নামতে পারে না। এই উভয় চিত্রকে মিলালে পরিষ্কার এই ফলাফল বেরিয়ে আসে যে, যে রকম দেহ রূহের জন্য কাজের মাধ্যম, তেমনই সাইন্স মৌলিকভাবে ইসলামী কর্মকাণ্ডের জন্য একটি উসিলা অবলম্বন এবং কাঠামো– যার জীবন ও রূহ হবে ইসলামী আখলাক ও চিন্তাচেতনা এবং ইসলামী কথাবার্তা ও কার্যকলাপ। যদি এই রূহ ওই কাঠামোর ভিতরে না থাকে, তাহলে এই পরিপূর্ণ সাইন্স এবং তার সমস্ত রূপচিত্র একটি শবদেহে পরিণত হবে। যার পরিণাম ফুলে ফেটে এবং পঁচে গলে সহীহ দেমাগসমূহ ও প্রকৃত হৃদয়সমূহকে নোংরা করা এবং পরিচ্ছন্ন পরিবেশকে কলুষিত করা ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না।

সুতরাং এমন সাইন্স, যার প্রাপ্তি শুধু বেঁচে থাকা এবং উপকরণ চতুষ্টয়কে দীনী

রূহ ব্যতীত ব্যবহার করা- যাকে পরিভাষায় ইহলৌকিক জিন্দেগী বলা হয়, তা কুরআনের ভাষায় শবদেহ নিস্প্রাণ এবং কয়েকদিনের অন্তঃসারশূন্য চাকচিক্য ও খেলা দেখিয়ে ছাইয়ের স্তুপে পরিণত হয়ে যাওয়া এক লাশ। যার উপর কেবল উদাসীন লোকেরাই ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে।

মহান আল্লাহ তায়ালার ইরশাদ-

اِعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا

তোমরা খুব ভাল করে জেনে নাও যে, দুনিয়ার জীবন হল খেলাধুলা এবং রঙ-তামাশা ও একজন আরেকজনের উপর বড়াই করা। আর সম্পদ ও সন্তানাদি নিয়ে নিজের গল্প করা। যেমন বৃষ্টি কৃষি উৎপাদনকারীদের কাছে ভাল লাগে, আবার তা শুকিয়ে যায়। তখন তুমি তাকে হলদে দেখতে পাও। এরপর তা চুরা চুরা হয়ে যায়। *[সূরা আল-হাদিদ : ৫৭ : ২০]*

এমন অনর্থক বৃত্তি বা শুধুই জীবন ধারণ এবং ব্যবস্থা কুড়ানোর নাম ইসলামের ভাষায় 'দুনিয়া'। যার অনুসন্ধানকারীকে আহম্মক এবং বেকুব বলা হয়।

ইরশাদে নববী-

اَلدُّنْيَا دَارٌ مِنَ الْاَدْيَارِ لَهُ وَلَهَا يَجْمَعُ مَنْ لَا عَقْلَ لَهُ.

দুনিয়া বালুচরের একটি ঘর। তা জমা করার পিছনে যে পড়ে, তার আক্কল-জ্ঞান বলতে কিছু নেই।

যা হোক, অনুভব যুক্তি ও ভাষ্যগতভাবে একথা স্পষ্ট হয়েছে যে, যেমনিভাবে দেহ রূহের জন্য কাজের অবলম্বন; স্বয়ং মূল উদ্দেশ্য নয়, তেমনইভাবে বস্তুগত বিবর্তনাদি- যার নাম সাইন্স, তা রূহানী কার্যকলাপ- যার নাম ইসলাম, তার জন্য কেবল উসিলা ও অবলম্বন হওয়ার মর্যাদা পেতে পারে। স্বয়ং উদ্দেশ্য হওয়ার অবস্থা কখনই সৃষ্টি করতে পারবে না।

আর এটা তো স্পষ্ট বিষয় যে, সাইন্স যখন জীবন অবলম্বনের তালিকাভুক্তই হল, তবে এটি একটি যৌক্তিক নীতি যে, উদ্দেশ্য হাসিলের প্রয়োজনে উসিলা অবলম্বন করা হয় এবং তা ওই পর্যন্তই সীমিত থাকে, যে পর্যন্ত সে উদ্দেশ্যের

জন্য সহায়ক হবে, অর্থাৎ প্রয়োজন মাফিক। অন্যথায় মৌলিকভাবে তার মধ্যে নিমগ্ন হওয়া, তার মধ্যে ঔদ্দেশ্যিতার অবস্থান কায়েম করা– যা বিপরীত স্থাপন এবং যুক্তিবিরোধী। এজন্য যুক্তিগতভাবে এ কথাও স্পষ্ট হল যে, মূল উদ্দেশ্য অর্থাৎ দীন হতে আলাদা থেকে কেবল সাইন্সের মধ্যে মনোযোগ সৃষ্টি করা কোন বুদ্ধিসম্পন্ন কাজ হতে পারে না। বরং তাকে অবলম্বন পর্যন্ত এবং প্রয়োজন অনুযায়ী গ্রহণ করাটা হবে বুদ্ধিমত্তা। এ কারণেই সাইন্সের দুনিয়া এবং উপকরণ চতুষ্টয়ের মাহফিলের বিবর্তনাদি থেকে ওই পর্যন্তই সংগ্রহ করার অনুমতি নববী জবানে দেওয়া হয়েছে, যে পর্যন্ত ধর্মীয় উদ্দেশ্যাবলির ক্ষেত্রে ওগুলোর প্রয়োজন হবে। ইরশাদে নববী–

اِعْمَلْ لِلدُّنْيَا بِمِقْدَارِ بَقَائِكَ فِيْهَا وَاعْمَلْ لِلْاٰخِرَةِ بِمِقْدَارِ بَقَائِكَ فِيْهَا.

দুনিয়ার জন্য ওই পরিমাণ পরিশ্রম করো, যে পরিমাণ দুনিয়াতে থাকতে হবে এবং আখেরাতের জন্য ওই পরিমাণ পরিশ্রম করো, যে পরিমাণ সেখানে থাকতে হবে।

মোট কথা, সাইন্সের স্তর উপলক্ষ্যের সীমা থেকে এগিয়ে যেতে পারে না। কেননা, তার কর্মমূল বস্তু। আর বস্তু রূহের জন্য কেবল উসিলামাত্র। কিন্তু ইসলামের স্তর ঔদ্দেশ্যিতা থেকে নিচে নামতে পারে না। কেননা, তার কর্মমূল হল রূহ। আর এই রূহটাই বস্তুর জন্য আসল লক্ষ্য।

এই আলোচনা থেকে আলহামদুলিল্লাহ পুরোমতই সাইন্স এবং ইসলামের মধ্যবর্তী সম্পর্কও সুস্পষ্ট হয়েছে এবং খোলাসা হয়েছে যে, এদের মধ্যে 'উপলক্ষ্য ও লক্ষ্যে'র সম্পর্ক– যা আলোচনার বিষয়বস্তুর দ্বিতীয় মাকসাদ ছিল। যার সারসংক্ষেপ এই যে, সাইন্সের অবদান যতক্ষণ পর্যন্ত ধর্মের জন্য উসিলা হিসেবে ব্যবহৃত হবে– চাই তা উন্নতির যেকোন সীমা পর্যন্তই যাক কেন, তার ফলাফল কল্যাণকর হবে এবং যখন সে ধর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজেই ঔদ্দেশ্যিতার শান গ্রহণ করবে, অর্থাৎ রূহানিয়াত বাদ দিয়ে শুধু বস্তুসর্বস্ব উদ্দেশ্যের স্থান দখল করবে– চাই তা একেবারে নিম্ন পর্যায়ের হোক, তখনই ফলাফল ভয়ংকর এবং লাঞ্ছনাকর হয়ে দেখা দিবে।

সাইন্স ও ইসলামের প্রকৃতিসমূহ কী চায়

এ থেকে আপনি বুঝে নিবেন যে, আপনার উন্নতির লক্ষ্য কী হওয়া বাঞ্ছনীয়। যার স্লোগানে আজকে দুনিয়ার মহাশূন্য গমগম করছে– তার ফায়সালাও সেই

সুস্থ বিবেক করতে পারে, যে এগুলোর মধ্যে একটিকে উসিলা, আরেকটিকে উদ্দেশ্য সাব্যস্ত করেছে। কেননা, উন্নতি কি অবলম্বনের হয়, নাকি উদ্দেশ্যের? আর উন্নতির দৌড় কি রাস্তার জন্য, নাকি মূল গন্তব্যের জন্য?

কাজেই সাইন্স যদি উসিলা হয়ে থাকে এবং বিবেক ও বর্ণনার সাক্ষ্য অনুসারে তা বটেই– যেমনটি সাব্যস্ত হয়ে গেল। তাই সে আবার বিবেকের সাক্ষ্যমতেই কখনও শর্তহীনভাবে উন্নতির লক্ষ্যমাত্রা সাব্যস্ত হতে পারে না। কেননা, সে (উন্নতির) রাস্তামাত্র; মূল গন্তব্য নয়। আর যদি ইসলাম মূল লক্ষ্য হয়ে থাকে এবং তা অবশ্যই– যেমনটি যুক্তি ও বর্ণনা দ্বারা সাব্যস্ত হয়ে গেছে। তাহলে তাকেই অর্জন ও উন্নতির লক্ষ্যমাত্রা বানানো যেতে পারে। কেননা, সে (উন্নতির) রাস্তামাত্র নয়; মৌলিক উদ্দেশ্য। যেখানে পৌঁছবার জন্যই চেষ্টা-প্রচেষ্টা ছিল। এজন্য কুরআনে করীম উন্নতিকে রোধ করেনি; বরং মানুষকে দুনিয়াতে পাঠানো হয়েছেই উন্নতি করার জন্য। হ্যাঁ, অবলম্বনের মধ্যে উন্নতি করাকে সময়ের অপচয় বলেছে এবং মূল লক্ষ্যে, যার নাম কল্যাণ ও মঙ্গল রাখা হয়েছে, তাতে উন্নতি করাকে শুধু বৈধই বলেনি; বরং জরুরি এবং আবশ্যক সাব্যস্ত করেছে। এক জায়গার ইরশাদে রব্বানী–

وَلِكُلٍّ وِّجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيْهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ.

> প্রত্যেক কওমের একটি মকসুদ ও কেবলা আছে– যার দিকে সে ফিরে থাকে। সে যা-ই হোক, তোমরা কল্যাণের কাজে একজন আরেকজন থেকে অগ্রগামী হও। *[সূরা বাকারা : ২ : ২৪৮]*

সমস্ত কল্যাণ ও মঙ্গলের মাকসাদে হাকিকী আখেরাতের নেয়ামতসমূহের কথা উল্লেখ করে অন্যত্র আল্লাহ তায়ালা বলেন–

وَفِيْ ذٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُوْنَ.

> লোভীদের এমন নেয়ামতের জন্যই লোভ করা উচিত। *[মুতাফফিফিন ৮৩:২৬]*

যাক, এক জায়গায় পরস্পরে প্রতিযোগিতা করার, আরেক জায়গায় পরস্পরে লোভ করার শিরোনামে মুসলমানদেরকে উন্নতির উৎসাহ দেওয়া হয়েছে এবং আদেশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এই উন্নতি ওই ময়দানেরই, প্রাকৃতিকভাবে যা হওয়া উচিত– অর্থাৎ মাকসাদের উন্নতি। কেননা, অবলম্বনের ক্ষেত্রে উন্নতি কোন উন্নতি নয়; বরং বোকামি। এই নীতিগত সত্য সামনে রেখে এখন আপনারা জরীপ করুন যে, আপনারা বিষয়টিকে কিভাবে উল্টিয়ে দিয়েছেন।

উদ্দেশ্যকে উসিলা এবং উসিলাকে উদ্দেশ্য, বাদশাহকে গোলাম এবং গোলামকে বাদশাহ বানিয়ে দিয়েছেন। ইসলামকে কেবল তাবেদার এবং প্রথাগত ও নামসর্বস্ব করে ফেলেছেন। সাথে সাথে তার অশুভ পরিণতিকেও সামনে রাখুন, এমতাবস্থায় বস্তুজগতের এই কপট গোলাম আপনাকে বঞ্চনা ও লাঞ্ছনার গর্তে নিয়ে ফেলে দিবে। যেমনটি সে আজ পর্যন্ত বিভিন্ন কওমকে ফেলে এসেছে। আল্লাহর নাযীরে মুবীন (নবী) সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই নিরেট আড়ম্বরতা ও বস্তুজগতের চাকচিক্য- যার নাম শরীয়তের পরিভাষায় জিনত ও জহরত, তার উপর খুব সাবধান করে ইরশাদ করেছেন-

وَاللّٰهِ مَا اَخْشٰى عَلَيْكُمُ الْفَقْرَ وَلٰكِنْ مِمَّا اَخْشٰى عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِىْ زَهْرَةَ الدُّنْيَا تَفْتَحُ عَلَيْكُمْ فَتُهْلِكُكُمْ كَمَا اَهْلَكَتْهُمْ.

খোদার কসম, আমার পরে তোমাদের উপর দারিদ্র্য নিপতিত হওয়ার কোন ভয় আমার নেই। ভয় আছে এই বিষয়ে যে, আমার পরে তোমাদের জন্য দুনিয়ার চাকচিক্য খুলে যাবে এবং তা তোমাদের এমনভাবে ধ্বংস করে দিবে, যেভাবে তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছিল।

নিরেট বস্তুবাদিতার ক্ষতিসমূহ

হ্যাঁ, বস্তুজগতের এই ধ্বংসযজ্ঞ প্রথমে শিক্ষাদীক্ষার ময়দানে আসন গেড়ে বসে- যার ফলে এতেকাদসমূহ বিকৃত হয়। তারপর আমলের ময়দানে ছড়িয়ে পড়ে- যার ফলে আমলের হিম্মত খতম হয়ে যায়। শিক্ষার ময়দানে এভাবে যে, স্বয়ং বস্তুজগৎ নির্বোধ। মানে আগুন পানি মাটি বাতাসের মধ্য থেকে কোনটির মধ্যেই আকল ও হুঁশ নেই। তা না হলে মানুষের হাতে এরকম অসহায় অনুগত হয়ে থাকত না। এজন্য এই আঁধার খেলনাগুলোর সাথে রাতদিন খেলা করা। স্পষ্ট কথা যে, আঁধারের চেয়ে আগে বাড়তে পারে না। তা ছাড়া এই বস্তুশ্রেণী যেহেতু ইন্দ্রিয়ানুভব্য বিষয়ের আওতাভুক্ত এজন্য এগুলোর সাথে মনোযোগ নিবদ্ধকারী ইনসান সর্বোচ্চ অনুভবের গভীর পর্যন্ত যেতে পারবে- যার সম্পর্ক পঞ্চইন্দ্রিয় তথা চোখ নাক কান ইত্যাদির সাথে। কাজেই একজন চোখ-কানের মানুষ চোখ-কানের গোচরীসীমার মধ্যেই আবদ্ধ থাকে। উলুমে ক্বালব, উলুমে আরওয়াহ এবং উলুমে হাকায়েক পর্যন্ত তার পৌঁছনো হয় না। আর স্পষ্ট বিষয় যে, যে ইলমের পথ সম্বন্ধে মানুষ অনবগত এবং অনবগতি সত্ত্বেও যদি সে

ওইপথে চলতে শুরু করে, তাহলে তার গন্তব্যে পৌঁছবার সম্বল কিছু ধারণা-কল্পনা এবং কিছু শক-সন্দেহ ছাড়া উলুম ও মাআরিফ কিভাবে হতে পারে?

এজন্যই বাস্তবিক মানুষকে রূহানী ময়দানে বিভিন্ন শক-সন্দেহ ঘিরে রাখে– যা মূলত বস্তুজগতের মধ্যে মগ্ন ও ডুবে থাকার এক সাধারণ ফল। এর চিকিৎসা এ ছাড়া আর কিছু নেই যে, নানাবিধ ইলম ও ইদরাকের মূল লক্ষ্য রূহানিয়াতের দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে; ক্বালবের মধ্যে ইলমের চেরাগ জ্বালাতে হবে– যাতে শক-সন্দেহ ও ওয়াসওয়াসার আঁধার দূরীভূত হয়।

ইউনিভার্সিটির ছাত্রদের জন্য উপদেশ

কিন্তু আমাকে মাফ করতে হবে। যদি আমি বিনয়ের সাথে আরয করি যে, আজ মুসলমানদের এবং আপনারা কিছু মনে না নিলে (বলব,) আপনাদের মত নতুন ধারণার ব্যক্তিদের এরকম ইলমি ও ইরফানী রশ্মি মোটেই ভাগ্যে জুটছে না– যা শক-সন্দেহের আফিম এবং ওয়াসওয়াসা ও কুমন্ত্রণার দুষ্ট আহ্বায়ক হিসেবে কাজ করছে। বরং ক্বলবের মধ্যে সন্দেহ ও কুমন্ত্রণা এবং পেরেশানী কলজে পাকড়াও করে প্রকৃত সত্য থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। আর যখন নাকি ঈমানের সেই পরিচ্ছন্ন আলো, যা মূর্খতার আঁধার এবং আঁধার থেকে জন্ম নেওয়া শক-সন্দেহ দূর করে এবং মুশাহাদায়ে হক-এর সেই জ্যোতি বিচ্ছুরণ– যা প্রতিটি সওয়ালের জওয়াব হতে পারে, তা হৃদয়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠিতই নয়, তখন শুধু ইলমি উপস্থাপনা দ্বারা আপনি ক্বলবসমূহকে কতক্ষণ অনুপ্রাণিত করতে পারবেন?

এসব ইলমি চমকপ্রদ তথ্য, যা আপনারা আলোচনার মাধ্যমে শুনতে চাচ্ছেন। এটা সময়ের চাহিদা বটে। তবে (এটা কাজ দিত) আসল ইলমের পুঁজি যদি হাতে থাকত। এখানে ঈমানের কল্যাণই তো গোচরীভূত হচ্ছে না; তাহলে ইসলাম ও আমলের প্রশ্ন আসবে কোত্থেকে?

বস্তুজগতের অনিষ্ট দূর করার উপায়

এজন্য আমাদের পরামর্শ হচ্ছে এই যে– না, শুধু আমার পরামর্শ নয়; বরং ইসলামের প্রকৃতির দাবীই হচ্ছে এই যে, আমার প্রিয় ভাই! উপরের টিপটপ এবং মলমপট্টি ছেড়ে এই ফাসেদ বস্তুবাদিতা পরিষ্কার করে ফেলুন– যা বস্তুবিজ্ঞানের উপর অপ্রয়োজনীয় মনোযোগ এবং অনর্থকতা সৃষ্টি করেছে এবং

ফিলোসফির জ্ঞানমত অন্ধকার তার গোড়ায় পানি সিঞ্চন করেছে। এমতাবস্থায় ওগুলোর জন্য ফরয হচ্ছে যে, ওগুলো দেহের পরিবর্তে রূহকে উৎসাহিত হওয়ার উপযুক্ত বানাবে। কেননা, রূহই মানুষের ইলমের উৎস। যার প্রথম ধাপ হচ্ছে এই যে, প্রবৃত্তির কামনা ও বস্তুগত চাহিদার বেশুমার মাকসাদ থেকে একটু একপেশে হয়ে সেই বদান্যতা ও পূর্ণতার উৎস হক (তায়ালা)-এর সত্তার দিকে প্রত্যাবর্তন করা– যা থেকে ইলম ও মারেফাতের রশ্মি লাভ হয় এবং শক-সন্দেহ ও ওয়াসওয়াসার দুনিয়া সংকীর্ণ হয়।

তাওহীদ সুদৃঢ় করুন

অন্য কথায় বলা যায়– বহুবিধ উদ্দেশ্য বা রাস্তা ছেড়ে তাওহীদের উপর দৃঢ়তা অবলম্বন করা দরকার, যা ইসলামের প্রাণ এবং আসল বস্তু। তার চেষ্টা এ ছাড়া আর কী হতে পারে যে, কালেমায়ে তাওহীদ বারবার সকাল-সন্ধ্যা পাঠ করা দরকার। যাতে জপনার আসর দিলের উপর পড়ে এবং তাওহীদ সুদৃঢ় হয়। ইরশাদে নববী–

جَدِّدُوْا اِيْمَانَكُمْ بِقَوْلِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ.

আবার এই لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ-এর ভিতরে শুধু মহাসত্তার তাওহীদের চিন্তা করবেন না; বরং (মহাসত্তার) সিফাতসমূহের তাওহীদের ধ্যানও এই কালেমার মধ্যে করবেন। অর্থাৎ আল্লাহর একশত নাম বা সিফাতের তাওহীদও এই কালেমা থেকেই হাসিল করবেন। যেন প্রভুত্বের স্বীকৃতি-অস্বীকৃতি এই পন্থায় হাসিল হয়। অনুরূপভাবে রহমানিয়াত নাফেয়িয়াত দাররিয়াত[৭]- ইত্যাদির স্বীকৃতি-অস্বীকৃতিও একইভাবে হাসিল করা হয়– لَآ رَحْمٰنَ اِلَّا اللّٰهُ، لَآ مَانِعَ اِلَّا اللّٰهُ، لَآ نَافِعَ اِلَّا اللّٰهُ، لَآ مَلِكَ اِلَّا اللّٰهُ ইত্যাদি। স্পষ্ট বিষয় যে, যখন দিলের মধ্যে এগুলো বসে যাবে যে, মালিকও এক তিনিই; উপকারীও এক তিনিই; ক্ষতিসাধনকারীও তিনিই; বড়ত্ব ও মহত্ত্বের অধিকারী তিনিই; এবং শান ও মর্যাদার অধিকারী এক তিনিই। তাহলে এর কুদরতি ফল এই দাঁড়াবে যে, দিল থেকে সমস্ত সৃষ্টির আজমত দূর হয়ে এক জাতে ওয়াহিদের আজমত থেকে যাবে। আর স্বচ্ছ ও একমুখী হৃদয়ের শক্তি এখানেই। একজন গোলাম একই সময়ে দু'জন মনিবকে

---

[৭] رحمن، نافع، ضار থেকে গঠিত বিশেষ্য। দয়া, উপকার ও ক্ষতি করার ক্ষমতা বুঝাচ্ছে।

সন্তুষ্ট রাখতে পারে না; সে সবসময় চিন্তিত সন্দিহান ও দু'মনা দশায় লিপ্ত থাকবে। যার ফলে হৃদয়ের ভিতরে দুর্বলতা সৃষ্টি হবে। কিন্তু যে এই বিশ্বাসের উপর আছে যে, আমার মনিব একজন। আবার তিনিও এমন যে সবকিছুর মালিক, কব্জাকারী এবং নিয়ন্ত্রক। তাহলে সে সন্দিহান থাকার পরিবর্তে দৃঢ় এবং নিশ্চিন্ত থাকবে। আর একীন ও নিশ্চিন্ততাই হল দিলের শক্তির ভিত্তি। এতে তার কল্পনাশক্তি জড়ো হয়ে একটি কেন্দ্রে গিয়ে জমা হয়। অতঃপর তা থেকে অনুপম চিন্তা ও বিস্ময়কর জ্ঞান-বিজ্ঞানের জন্ম হয় এবং মানুষের অন্তর্দৃষ্টি ও মারেফতের মধ্যে যোগ হতে থাকে। বিশ্বাসের এই শক্তির অধীনেই হযরত সাহাবা ও সালাফে (সালেহীনে)-এর সেসব বিস্ময়কর কীর্তি সংঘটিত হয়েছে– যেগুলো আজ পর্যন্ত সভ্য দুনিয়াকে অস্থিরতায় নিপতিত করে রেখেছে।

তাঁদের উন্নতি এবং বেগবান কীর্তিসমূহ টাকা-পয়সা ও ধনদৌলতের সঞ্চয়ের জোরে ছিল না; বরং ধনদৌলত তাঁদের কীর্তিকর্মে সৃষ্টি হত এবং ধ্বংস হত। এজন্য সবার আগে নিজের তাওহীদী বিশ্বাস দুরস্ত করুন। কেননা, এটাই সমস্ত কল্যাণ ও কামালিয়াতের বুনিয়াদ।

ইয়াদে হক ও তার প্রাথমিক সহজ নিয়ম

হ্যাঁ, তারপর এই তাওহীদী চেতনাকে পোক্তা ও সুদৃঢ় করার জন্য হৃদয়ের স্থিরতার প্রয়োজন আছে। অন্যথায় ওয়াসওয়াসা ও আশঙ্কা এবং নানাবিধ দুশ্চিন্তা এই স্বচ্ছ হাকিকতের উপর অটল থাকতে দিবে না। এজন্য কুরআনে করীম হৃদয়ের স্থিরতা অর্জনের কার্যকর পন্থা উল্লেখ করেছে যে–

اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ.

মনে রেখো, আল্লাহকে স্মরণ করেই হৃদয়সমূহ স্বস্তি বোধ করে। *[সূরা আর-রদ : ১৩ : ২৮]*

এ থেকে উদ্দেশ্য জিকরে ক্বলবী। কিন্তু ক্বলবের জিকির দৃঢ়তা লাভ করে না যতক্ষণ পর্যন্ত যবান দিয়ে তা বারবার আওড়ানো না হয়। কাজেই ছাত্র তার সবক দিলের মধ্যে হেফাযত করার জন্য যবান দিয়েই তা বার বার দোহরায় এবং আওড়ায়। এজন্য যবানকে আগে যাকের বানাতে হবে– যাতে ক্বলব যাকের হয়ে যায়। তাহলে এই ঈমান ও তাওহীদ দিলের মধ্যে তার শিকড় ছাড়বে এবং ক্বলব তার উপর সন্তুষ্ট ও স্থির হবে।

এজন্য শরীয়ত জিকরে হকের বিভিন্ন তরিকা বাতলিয়ে দিয়েছে। কিন্তু

আফসোস যে, সেগুলোর ব্যবহার তো দূরে থাক, সেগুলোর ইলম পর্যন্ত মুসলমান এবং সেই স্তরেরও নেই– যাদেরকে শিক্ষিত বলা হয়।

শরীয়ত সর্বপ্রথম ফরযসমূহকে ধার্য করেছে– যেগুলো আল্লাহর জিকিরের সর্বোত্তম প্রকাশক্ষেত্র এবং ছোট বড় প্রত্যেকের জন্য আবশ্যক। এজন্য ইলম ও সালাত ইত্যাদির ফরযের পাবন্দী করুন। তারপর বিশেষ বিশেষ সময়ের দোয়াগুলো (রুটিনে) রাখুন– যাতে চলতে ফিরতেও আল্লাহর তাসবিহ ও তাহলিল মানুষের যবানে জারি থাকে। এজন্য এ ধরনের জিকিরসমূহ আমল করার ফিকির করুন। এ ছাড়া কথোপকথনের বিভিন্ন স্থানে ইসলামী যবান এমনসব পরিভাষা রেখেছে যে, সেগুলোর মধ্যে অনিচ্ছায়ও আল্লাহর জিকির মুখে জারি থাকে–

بِسْمِ اللهِ، اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ، جَزَاكَ اللهُ، اِنَّا لِلّٰهِ، مَا شَاءَ اللهُ،

اِنْ شَاءَ اللهُ، اَسْتَغْفِرُ اللهَ، لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ، سُبْحَانَ اللهِ

ইত্যাদি আপনার যবানের রাতদিনের পরিভাষা। এখন যদি আপনি ব্যবহার করেন এবং অন্যদের যবানের সাথে প্রীতি সৃষ্টি না করেন, তাহলে আপনার জীবনের এমন কোন কাজ নেই যেখানে কথার সম্পর্ক আছে, অথচ সংশ্লিষ্ট কথার মধ্যে আল্লাহর নাম পরিভাষার অন্তর্ভুক্ত নয়।

কেমন যেন ইসলামী সামাজিকতায় থেকে কথা পরিচালনাকারী অনিচ্ছায়ও সবসময় আল্লাহর নাম নিতে বাধ্য। কিন্তু মুসলমান আজ নিজের দীনী যবান– যার বদৌলতে সে ইচ্ছায় অনিচ্ছায় আল্লাহর নাম নেওয়ার তাওফিক লাভ করত, তা থেকে শুধু বেপরওয়াই নয়; বরং তা মিটিয়ে দেওয়ার ফিকিরে লিপ্ত। অথচ ইসলাম আরব্যতা ও আরব্য পরিভাষা কায়েম রাখার জন্য যথেষ্ট জোর দিয়েছিল, যাতে যবানের আসর তাহযীব, কালচার, তামাদ্দুন এবং জীবনের সাধারণ অবস্থাসমূহের উপর পড়ে। কাজেই ইংরেজী আগ্রাসনের সূচনাতে সমকালীন আলেমগণ এবং বিশেষভাবে দারুল উলুম দেওবন্দের মুরব্বীগণ মুসলমানদের বুঝিয়েছিলেন যে, তারা যেন নিজেদের আরব্যতা ধরে রেখে অন্য যবানের রেওয়াজ ও প্রতিষ্ঠায় এমন আগ্রহ ও প্রেমের সাথে জোর না দেয়। কেননা, তাহলে সেই যবানই তাদের বুনিয়াদ এবং লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হবে। কিন্তু মুসলমানরা সেই বিজ্ঞ লোকগুলোর কথা মানেনি। ফলে আজ তার অশুভ পরিণাম হাড়ে হাড়ে ভোগ করছে। আজ তাদের কৃষ্টিগত চালচরিত্রই মুসলমানদের মত নয়; তাদের আমলী দীনের আসল রঙ মাহফুজ থাকা তো দূরের কথা।

কিন্তু ফিরে আসার জন্য কোন সময় নির্ধারিত নয়। যদি আপনি পুরোপুরি তনুমন দিয়ে আজ আল্লাহর জিকিরের পাবন্দী করতে না পারেন, তাহলে আরব্যতাকেই যবান হিসেবে ধরে রাখার চেষ্টা করুন। আর তার দীনী পরিভাষাগুলো মুখে ব্যবহার করতে থাকুন। যাতে এই বাহানাতেই খোদার নাম মুখে মুখে জারি থাকে। হক (তায়ালা)-এর নামের এই মৌখিক মশ্‌ক– যদি অনিচ্ছায়ও হয়, তবুও ইনশাআল্লাহ এক পর্যায়ে গিয়ে হৃদয়ের মাঝে জিকরুল্লাহ কায়েম করবে।

সৎ লোকদের সোহবত এবং আহলুল্লাহর সম্পর্ক

কিন্তু এই বিষয়গুলোর তাওফিক লাভ করা তাওফিকের উপকরণ সংগ্রহ করা ব্যতীত মুশকিল। আর সর্বাধিক কার্যকর উপকরণ হল সৎ লোকদের সোহবত ও সহচার্য। এজন্যই হক তায়ালা ইরশাদ করেছেন–

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصَّادِقِيْنَ.

হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় করো এবং সৎ লোকদের সহচার্য অবলম্বন করো। *[সূরা তাওবাহ : ৯ : ১১৯]*

কাজেই সোহবতপ্রাপ্ত অশিক্ষিত ব্যক্তি অনেক সময় সোহবতবঞ্চিত আলেমের চেয়ে বহুগুণে বেশি দীনের মাকসাদ বুঝে থাকেন এবং দীনী রঙে রঙীন ও বর্ণিল হয়ে ওঠেন। এজন্য আহলে ইলম ও আহলুল্লাহর কাছে যাওয়া-আসার নিয়ম স্বতন্ত্র উদ্দেশ্য হিসেবে কায়েম রাখুন। একীনের হিমেলিমা এবং হৃদয়ের শীতলতা দলিল অনুসন্ধানের দ্বারা লাভ হয় না। আকবার (এলাহাবাদী) বেশ বলেছেন–

فلسفی کو بحث کے اندر خدا ملتا نہیں

ڈور کو سلجھا رہا ہے پر سرا ملتا نہیں

দার্শনিকের আলোচনার ভিতর দিয়ে খোদাকে পাওয়া যায় না। দার্শনিক সুতার জট খুলছে ঠিকই, কিন্তু আল খুঁজে পাচ্ছে না।

সামনে গিয়ে একীন ও দীন হাসিলের তদবির প্রসঙ্গে বলছেন–

نہ کتابوں سے نہ کالج کے ڈور سے پیدا

دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا

কিতাবাদী বা কলেজের দরজা থেকে দীন পয়দা হয় না; দীন পয়দা হয় বুযুর্গদের সুদৃষ্টির মাধ্যমে।

এজন্য আমি বিনয়ের সাথে আরয করব– আমার প্রিয় ভাইয়েরা, আহ্লুল্লাহ এবং আহলে দীন থেকে আলাদা থাকবেন না; বরং তাঁদের সাথে সম্পর্ক সৃষ্টির পদ্ধতি বের করবেন। যাতে তাঁদের দীন ও একীনের দৌলত (আপনাদের) লাভ হয় এবং শক-শন্দেহ অথবা দ্বিধা-সঙ্কোচের ভ্রান্ত বীজ খতম হয়ে যায়। অন্যথায় শুধু আলোচনা এবং তা-ও এমনসব সামগ্রিক বিষয়াদির আলোচনা– যা নিরেট ইলমি রহস্যকেন্দ্রিক, তা দিয়ে আত্মিক পরিশুদ্ধতার পথ সুগম হয় না। এ হল ওই সময়ের কাজ, যখন একীনের তৃপ্তি দিয়ে হৃদয়-মন ভরে উঠেছে। আমলের শক্তি ও সৎ লোকদের সোহবতের দ্বারাই দীনের রঙ হৃদয়-মনের উপর বসে। কাজেই আপনাদের কর্তব্য এই হওয়া চাই যে, বস্তুজগতের ভিড়ের মধ্যে রূহানিয়াতকে যেন একেবারে ভুলে না যান।

আলোচনার সার-সংক্ষেপ

যা হোক, এই আলোচনা থেকে ইসলামের হাকিকত এবং তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যও স্পষ্ট হয়েছে যে, সে মানুষকে রূহানী ময়দানে তাড়না করে তাকে স্থায়ী মর্যাদা ও সম্মান এবং স্থিরতা ও সুখের ঠিকানা পর্যন্ত পৌঁছে দেয় যে, স্থায়ী মর্যাদা ও সম্মান রূহানিয়াতের মধ্যে। আর সাথে সাথে সাইন্সের হাকিকত এবং তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যও সামনে এসে গেছে যে, তা মানুষকে বস্তুবাদিতার ময়দানে ছেড়ে দিয়ে শেষ পরিণামে তাকে লাঞ্ছনা ও বঞ্চনার দিকে ঠেলে দেয়। কেননা, নিরেট বস্তুজগতের পরিণতি ধ্বংস ও লাঞ্ছনা ছাড়া কিছু নয়। আর শেষতক একজন বিজ্ঞানী না পারে তার বস্তুগত ফায়দা ধরে রাখতে এবং না তার রূহানী ফায়দা নসীব হয়। তা ছাড়া সাইন্স ও ইসলামের পারস্পরিক সম্পর্কও স্পষ্ট হয়েছে যে, উভয়ের মাঝে উপলক্ষ্য ও লক্ষ্যের সম্পর্ক। যার সার কথা এই যে, যতক্ষণ পর্যন্ত সাইন্সের কার্যকলাপ ধর্মের জন্য খাদেম এবং অর্জনের মাধ্যম না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তার পরিণাম শুভ হবে না। আর এর সাথে সাথে ফলস্বরূপ এই মাকসাদও খোলাসা হয়েছে যে, ইসলাম যেহেতু মকসুদ এবং সাইন্স তার মাধ্যম, কাজেই ইসলামের মকসুদ হওয়ার দাবি এই যে, উন্নতির ময়দান ইসলামকে বানাতে হবে; সাইন্সকে নয়। কেননা, উন্নতি সবসময় মাকসাদসমূহের ভিতর করা হয়; মাধ্যম এবং উসিলার ভিতর নয়।

অর্থাৎ সাইন্সের কর্মকাণ্ড সে পর্যন্তই অবলম্বন করা যাবে, যে পর্যন্ত ইসলাম তার প্রয়োজন অনুভব করবে।

শিরোনামের হাদীসের সাথে আলোচনার সম্পর্ক

এই সেই উদ্দেশ্যত্রয়, শিরোনামার হাদীসের বৃত্তে অবস্থান করে আলোচনার শুরুতে যার ব্যাখ্যা করার ওয়াদা করেছিলাম। আলহামদুলিল্লাহ! উদ্দেশ্যগুলোর এক পর্যায়ের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ হয়ে গেছে। এখন আমি চাচ্ছি যে, উদ্দেশ্যরাজির এই লম্বা-চওড়া আলোচনা গুছিয়ে এনে এবং শিরোনামার হাদীসের সাথে সামঞ্জস্য বিধান করে এ কথা স্পষ্ট করব যে, আলোচনার এই সমস্ত বিশ্লেষণ– যেগুলো পেশ করা হল, তা সবই এই হাদীসের কিছু ব্যাপক ও পরিপূর্ণ বাক্যের বিশ্লেষণ এবং তার ব্যাখ্যাবলি থেকে উৎকলিত। কাজেই মনোযোগ দিয়ে শুনুন, এই হাদীসের শুরুতে ফিরিশতাদের প্রশ্নের উপর *আনাসিরে আরবায়ার* আলোচনা করা হয়েছে– যা বস্তুজগৎ এবং তার ত্রিমাত্রিক উৎপাদন (জড়, উদ্ভিদ, জীব)-এর মূল, যেগুলো থেকে এই দুনিয়া সৃষ্টি করা হয়েছে।

আবার এই আনাসিরের আলোচনা এমন চূড়ান্ত কাঠামোতে করা হয়েছে যে, সেগুলোর পারস্পরিক কাঠিন্য ও দুর্বলতার স্তরের উপরও সন্তুষ্ট হওয়ার মত আলোকপাত করা হয়েছে। যেমন- উদাহরণস্বরূপ এগুলোর মধ্যে মাটি সবচে' দুর্বল। তারচে' শক্তিশালী লোহা– যা কিনা মাটিরই অংশবিশেষ। তারচে' শক্তিশালী আগুন। তারচে' শক্তিশালী পানি এবং তারচে' শক্তিশালী বাতাস। এই আলোচনা قَالَ: نَعَمْ. اَلرِّيْحُ পর্যন্ত চলেছে।

তারপর এই আনাসিরের আলোচনা থেকে পার্শ্ব পরিবর্তন করে এগুলো থেকে গঠিত মাওয়ালিদের দিকে নজর দিতে দিতে মাওয়ালিদের সর্বোত্তম অংশ মানুষের দিকে লক্ষ করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, এসবগুলো থেকে ইনসান সবচে' শক্ত এবং শক্তিশালী। যার আলোচনা قَالَ: نَعَمْ. اِبْنُ آدَمَ বাক্য দিয়ে করা হয়েছে। যেমনটি আমি মনুষ্য কার্যাবলি দেখিয়ে স্পষ্ট করে দিয়েছি যে, মানুষই এমন এক শ্রেণী, যার ইশারায় সমগ্র বস্তুজগৎ এবং সারা *মাওয়ালিদ* নেচে বেড়াচ্ছে।

এরপর এই বস্তুজগৎ থেকে হাদীসের লক্ষ্য রূহানিয়াতের দিকে ফিরেছে। এবং বলা হয়েছে বনী আদম মুক্তভাবে শক্ত ও শক্তিশালী নয়; বরং একটি শর্তসাপেক্ষে। তা হল তাকে রূহানী হতে হবে এবং বস্তুগত থাকলে চলবে না। অর্থাৎ বস্তুবাদিতা বর্জন করবে– যার আলোচনা تَصَدَّقَ صَدَقَةً এর মধ্যে করা

হয়েছে। কেননা, আল্লাহ ভিন্ন বাকিসব বা বস্তুজগৎ বর্জন করার নামই সদকা।

তারপর রূহানিয়াত থেকে ফিরে রূহেরও ঊর্ধ্বতন স্তর নিরেট শূন্যতা এবং নফসের দুর্বিপাক থেকে পবিত্রতা ও চরিত্রের স্থূলতা থেকে পরিচ্ছন্নতা অতঃপর আখলাকের সূক্ষ্মতার সৌন্দর্য বর্ধনের দিকে হাদীসের মোড় ঘুরানো হয়েছে। বলা হয়েছে, ইনসানের শুধু সদকা দেওয়া বা বস্তুজগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়াই কোন বিষয় নয়, যতক্ষণ তাতে নিষ্ঠা এবং লৌকিকতা বর্জন না পাওয়া যাবে, আর এর নামই তো ইখফায়ে সদকা[৮]। যার আলোচনা يُخْفِيْهَا -এর মধ্যে করা হয়েছে। অর্থাৎ সাধারণ সদকাদাতার চেয়ে সেই মুখলিস সদকাদাতা শক্ত ও শক্তিশালী, যার সদকার মধ্যে রিয়া ও লৌকিকতার দখল থাকে না। যেন এই সদকা বা বস্তুবাদিতা বর্জন কেবল আল্লাহর জন্য এবং এই সদকাদাতা বস্তুবাদী হওয়ার পরিবর্তে রূহানী হয়ে সদকা দিচ্ছে।

তারপর বলা হয়েছে মাখলুক থেকে গোপন করে সদকাদানও শক্তি ও বলের জন্য যথেষ্ট নয়, যতক্ষণ সে নিজ থেকেও তা গোপন না করবে। অর্থাৎ তাতে নিজস্ববোধ এবং আশ্চর্যবোধ ও তৃপ্তি অনুভব না করতে হবে এবং নিজে তাকে কোনকিছু বিবেচনা করতে পারবে না। কেমন যেন সদকাদাতা নফসানী হওয়ার পরিবর্তে রব্বানী হয়ে সদকা করবে। তাহলে সে সমস্ত আনাসিরে আরবায়া, সমস্ত মাওয়ালিদ, সমস্ত ইনসান, সমস্ত সদকাদাতা ব্যক্তি, তারপর সমস্ত মুখলিস এবং বে-রিয়া সদকাদাতার চেয়েও শক্ত ও শক্তিশালী হবে। এই পর্যায়ের দিকে يُخْفِيْهَا مِنْ شِمَالِهِ -র মধ্যে ইশারা করা হয়েছে।

অর্থাৎ এমন পর্যায়ের গুপ্ত সদকা হওয়া চাই যে, বাম হাতও যেন খবর না পায় যে ডান হাত কী দান করল এবং কিভাবে দান করল? আর স্পষ্ট বিষয় যে, নির্ভীকতা এবং বর্জনের এমন পরিপূর্ণ শান, যাতে মানুষ শুধু দুনিয়াকে নয় বরং নিজের নফসকে পর্যন্ত পরিত্যাগ করে, তা যদি দুনিয়া এবং নিজের নফসকে দেখানোর জন্য না হয়, স্পষ্ট যে তাহলে তা আল্লাহকে বাদ দিয়ে আর কাকে দেখানোর জন্য হতে পারে? আর যখন খোদার জন্যই হবে, তখন এই পরিপূর্ণ লিল্লাহিয়াত বা অন্য কথায় সদকার সম্পর্ক খোদার দিকে হওয়া দুর্বল কাঠামোর সদকাদাতা মানুষটিকে সেই অসাধারণ শক্তি সৃষ্টি করে দিবে যে, সে সমস্ত বস্তুজগৎ এবং আনাসির ও মাওয়ালিদকে বশ করে ফেলবে। তাহলে পুরোপুরি

---

৮. সদকা লুকানো।

স্পষ্ট হয়ে যায় যে, প্রকৃতপক্ষে অনন্য শক্তিধর এবং অনন্য ক্ষমতাবান কেবল আল্লাহরই সত্তা। আর এও স্পষ্ট হয়ে যায় যে, তাঁর দিকেই দৌড়ানো এবং তাঁর সাথেই সম্পর্ক সৃষ্টির মধ্যে সমস্ত শক্তি ও ক্ষমতা নিহিত।

অন্যদিকে হাদীসের বর্ণনা বিন্যাসের ভিতর দিয়েই এ কথা সাব্যস্ত হয়েছে যে, শক্তি ও বল সূক্ষ্মতা অনুসারে হয়। তাই এ কথাও হাদীসের ইঙ্গিতেই বেরিয়ে এসেছে যে, যে খোদা তাকত শক্তি ও বলের আধার, তিনিই অসীম সূক্ষ্মতার ভাণ্ডার। কাজেই তাঁর সীমাহীন সূক্ষ্মতার অবস্থা এমনই যে, দৃষ্টিসমূহ তাকে নাগালের ভিতরে পায় না।

لَاتُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْاَبْصَارَ، وَهُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ.

কোন দৃষ্টি তাঁর নাগাল পায় না; সব দৃষ্টিই তাঁর নাগালের মধ্যে।

কাজেই কেমন যেন হাদীস থেকে এই মূলনীতি বের হল যে, শক্তিধর এবং শক্তিশালী শুধু আল্লাহ তায়ালার সত্তা। অতঃপর যে তাঁর সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি করবে, সে সম্পর্ক অনুপাতে শক্তিশালী হবে। আর তাঁর সাথে সম্পর্ক সৃষ্টির পদ্ধতি হল বস্তুজগৎ থেকে সরে গিয়ে রূহানিয়াতের দিকে আসা। তার উপায় হল সদকা। কাজেই মুখলিস সদকাদাতা হয়ে নফসের তৃপ্তিবোধ এবং অন্যকে দেখানো ছাড়া সদকা যে দেয়, সে তাঁর সাথে পরিপূর্ণ সম্পর্ক সৃষ্টি করে ফেলে। এজন্য সে পূর্ণ সূক্ষ্মতার অধিকারী এবং সবচে' বেশি শক্তিশালী হয়ে ওঠে।

হাদীসের আলোচনার সূক্ষ্ম ফলাফল

যা হোক, হাদীসের এই সুশৃংখল উপস্থাপনা– যেমন, প্রত্যেক স্থূল আগে বয়ান করেছে এবং প্রত্যেক সূক্ষ্মকে তার পরে এবং প্রত্যেক পূর্ববর্তীকে আগে শক্তিশালী ও শক্তিধর বলেছে– এ থেকে সাব্যস্ত হয়ে গেছে যে, শক্তি ও বলের মাপকাঠিই হল এই সূক্ষ্মতাগুণ। আর এর প্রাকৃতিক তারতীব এ-ই হতে পারত যে, মাটির চেয়ে সূক্ষ্ম লোহা, লোহার চেয়ে সূক্ষ্ম আগুন, আগুনের চেয়ে সূক্ষ্ম পানি, পানির চেয়ে সূক্ষ্ম হাওয়া, হাওয়ার চেয়ে সূক্ষ্ম মানুষ, সাধারণ মানুষের চেয়ে সূক্ষ্ম দুনিয়া বর্জনকারী এবং সাধারণ দুনিয়া বর্জনকারীদের চেয়ে সূক্ষ্ম ওই মুখলিস যাহেদ বে-রিয়া দুনিয়া বর্জনকারী মানুষটি– যার হৃদয় দুনিয়ার ব্যস্ততা থেকে পবিত্র, বস্তুজগতের মহব্বত থেকে উর্ধ্বে, বস্তুগত স্থূলতা থেকে ঘৃণাকারী এবং রূহানী সূক্ষ্মতায় টইটম্বুর। কেমন যেন ওই রূহানী ও রব্বানী মানুষটিই

পরিপূর্ণ সূক্ষ্মতার অধিকারী, যিনি দেহরাজ্যের প্রতিপালনে নিমগ্ন নন; বরং রূহের পূর্ণতায় ব্যস্ত। এবং বস্তুগত কর্মকাণ্ডের পরিবর্তে রূহানী আ'মাল তার প্রতীক বনে গেছে।

রূহের সূক্ষ্মতা দীনদার হওয়ার মধ্যে নিহিত

আর এ কথা সবাই জানে যে, রব্বানী হওয়ার তরিকা এবং রূহানী প্রতীক অবলম্বনের ঢং শিখানো ধর্মের কাজ; সাইন্সের নয়। এজন্য এ কথাটি অন্য লফ্জে এভাবে বলতে পারেন যে, অধিক সূক্ষ্ম এবং অধিক শক্তিধর মানুষ তিনিই হতে পারেন, যিনি দীনদার এবং যার চালচরিত্র কেবল দীনই দীন হয়ে গেছে। কাজেই হাদীসের যেখান থেকে তাকত ও শক্তির মাপকাঠি বেরুল সূক্ষ্মতা, সেখান থেকে সূক্ষ্মতা অর্জনের মাধ্যমটাও জানা গেল। তা হল দীন– যা রূহানিয়াতকে সুদৃঢ় করে সূক্ষ্মতা সৃষ্টি করে। আর এভাবেই রূহ বাদশাহ সাব্যস্ত হয়– যা তার প্রকৃত পদমর্যাদা। নফস সেই রাজ্যের চাকর সাব্যস্ত হয়– যে তাকওয়ার উসিলায় ঘরদোরের আবর্জনা পরিষ্কার করে; চুরি-ডাকাতির দিকে ফিরতে পারে না। বিবেক রাজ্যের উজির সাব্যস্ত হয়, যে উপকারী নানাবিধ পরামর্শ দেয়। আল্লাহর ওহী তার অলঙ্ঘনীয় বিধান হিসেবে স্থির হয়, যা পথ প্রদর্শন করে। আর এভাবে রূহের রাজত্বে রূহানিয়াতের ইনসাফ চৌরঙ্গা দেহজগতের উপর ছড়াতে থাকে। চোর-ডাকাতরা বন্দী হয়ে পড়ে, যাদের কারণে নিরাপত্তাহীনতা ছড়াচ্ছিল। অতঃপর এমন নিরাপদ ও সুদৃঢ় রাজ্য– যার প্রজা সচেতন, মন্ত্রী জ্ঞানী, বিধান আলোক-উজ্জ্বল এবং ন্যায় ও ইনসাফের কারণে পুরা ব্যবস্থাপনা সুশৃংখল, তার উপর হামলা করার না তো বহিঃশক্তির সাহস হবে যে, এই শৃংখলার মধ্যে প্রবেশ করে ফেতনা-ফাসাদ লাগাবে; না ভিতরগত চোর-বাটপারদের সাহস হবে যে, বিশৃংখলা সৃষ্টি করবে। বাইরের শত্রু, অর্থাৎ শয়তান প্রসঙ্গে কুরআন করীম বলছে–

إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ

নিশ্চয়ই তার (শয়তানের) কর্তৃত্ব সেসব লোকদের উপর চলে না, যারা ঈমান রাখে এবং নিজেদের রবের উপর ভরসা রাখে। *[সূরা নাহল : ১৬ : ৯৯]*

আর ভিতরগত শত্রু, অর্থাৎ নফসে আম্মারার ব্যাপারে (কুরআন) বলেছে যে, সে অবাধ্যতা ছেড়ে নিজেই আইনের অনুগত হয়ে যায় এবং তার উপরই রাজি ও সন্তুষ্ট হয়ে যায়।

ইরশাদে রব্বানী–

يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ! ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً.

হে সুস্থির নফস, তুমি তোমার রবের দিকে প্রত্যাবর্তন করো– এমতাবস্থায় যে, তুমি তার উপর খুশি এবং তিনিও তোমার উপর খুশি। *[সূরা ফাজর : ৮৯ : ২৮]*

ইসলামের ভিত্তিমূল

এখন এই সমস্ত বিষয়ের সার এই বেরিয়ে আসে যে, এই গোটা দুনিয়া দুই ভাগে বিভক্ত– বস্তুজগৎ ও রূহানিয়াত বা সাইন্স ও ইসলাম। ইসলাম এবং রূহানিয়াতের ভিত্তি হাদীসের ভাষ্যানুসারে দু'টি মূলনীতির উপর– এক. মা সিওয়াল্লাহ[৯] পরিত্যাগ করা, যাকে যাকাত বলে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। আরেক. ইখলাস, যাকে ইখফা বলে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। প্রথম মূলনীতির সার কথা হচ্ছে এই যে, হোক দুনিয়া বা নিজের নফস এবং নফসের চাহিদা– সবকিছুর সেই ভালবাসা ক্বলব থেকে বের করে দিতে হবে, যা আল্লাহর ভালবাসার ক্ষেত্রে বিঘ্ন সৃষ্টি করে। এবং দ্বিতীয় মূলনীতির সার কথা হচ্ছে এই যে, ওই মা-সিওয়ার মধ্যে সেই এক মাহবুবে হাকিকীকে রাজি করবার প্রেরণা কাজ করবে, যিনি ভূ-মণ্ডল ও নভোমণ্ডলের মাহফিল-স্রষ্টা। এই প্রসঙ্গে না আছে আত্মদর্শন, না আত্মপ্রদর্শন; না আত্মাহংকার, না আত্মপীড়ন।

বিজ্ঞানের মূল বুনিয়াদ কী

এর বিপরীত হল বিজ্ঞানের বুনিয়াদ, যা ইসলামের উল্টো। (সাইন্সের মূলনীতি) সরাসরি এ দু'টো মূলনীতির বিপরীত প্রমাণিত হয়। গাইরুল্লাহর পরিত্যাগের বিপরীত গাইরুল্লাহর প্রেম। আখলাকের বিপরীত নিফাক[১০]। গাইরুল্লাহর প্রেমের অর্থ প্রত্যেক গাইরুল্লাহ এবং প্রত্যেক বাতিলের মহব্বত থাকা; তা না হলে খোদা এবং হকের মহব্বত না থাকা। যেহেতু গাইরুল্লাহর প্রেমের ধারায় নিজের নফস সবার আগে, এজন্য সর্বপ্রথম এবং সবচে' বেশি মহব্বত নিজের

---

৯. আল্লাহ ছাড়া বাকি সবকিছুকে মা সিওয়াল্লাহ বলে।
১০. মুনাফিকি বা কপটতা।

নফসের সাথে থাকা। আর নফসের যেহেতু সমস্ত বস্তুগত স্বাদের সাথে মহব্বত আছে, সেহেতু নফসের মধ্যস্থতায় সব বস্তুগত মজার সাথে মহব্বত থাকা– যার নাম দুনিয়া। কেমন যেন গাইরুল্লাহর প্রেমের সারকথা দুনিয়ার মহব্বত ও নফসের ভালবাসা প্রমাণিত হয়।

দ্বিতীয় মূলনীতি অর্থাৎ নিফাকের সার হচ্ছে, জাহেল নফস হাকিকত উপলব্ধি না করে তাকে প্রদত্ত উপভোগ্য বস্তুগুলো, যেগুলোর সুরত পরিপাটি; কিন্তু পরিণতি নোংরা, সেগুলোকে নিজের চূড়ান্ত উদ্দেশ্য বলে প্রকাশ করতে চায়।

কিন্তু যখন প্রকৃতপক্ষেই উপভোগ্য বস্তুগুলো কোন উন্নতি ও পরিণামের ভাল কিছু না রাখার কারণে বিজ্ঞজনদের দৃষ্টিতে মূল্যবান হয়ে ওঠে না এবং তাঁরা এরকম নিকৃষ্ট বন্ধুকে তিরস্কারযোগ্যই মনে করেন, এজন্য কমিনা এই নফস তার কুমতলবগুলোর উপর নীতি ও সভ্যতার পর্দা ফেলে সেগুলো যুক্তিযুক্ত দেখানোর চেষ্টা করে। আর এই কিসিমের সমস্ত নফসানী আকর্ষণ, যেগুলো থেকে সুস্থ বিবেক দূরত্ব অবলম্বন করে, সেগুলোকে পূর্ণতার লেবাস পরিয়ে সামনে পেশ করে– যাতে তার কুমতলবগুলোকে সাধারণ দৃষ্টিসমূহের কাছে কিছুটা গ্রহণযোগ্য বানাতে পারে। যেমন– সাধারণ খেলাধুলা ও বাজারী নাচ-গানকে সূক্ষ্ম শিল্প-সংস্কৃতির শিরোনামে পেশ করে। রীতিমত বিলাসী ও চরিত্রহীন লোকগুলোকে সাংবিধানিক রঙের আড়ালে কৃষ্টি-কালচারের শিরোনাম প্রদান করে। ত্রাস ও রাজ্যলিপ্সাকে নজরকাড়া শব্দে পেশ করে উন্নয়নের নাম প্রদান করে। যুদ্ধাস্ত্রের অপ্রতিরোধ্য খুনাখুনি এবং মানবতা বিনাশকে হক ও সততা এবং নিরাপত্তার যুদ্ধ নাম দিয়ে স্মরণ করে।

সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের উপকরণ বৃদ্ধিকে সামাজিক কল্যাণ ও উন্নতি বলে ব্যাখ্যা করে। নিজের নফস বা নফসের চাহিদারই পূজা করে; কিন্তু শব্দের মারপ্যাচে তাকেই হকপূজা বলে দেখাতে থাকে। নিজের আবেগ অনুভূতির আনুগত্য ও অনুসরণ করা হয়; কিন্তু সত্যের আনুগত্যের নাম প্রচার করে। মোট কথা, এই বস্তুগত নফস ভাল ভাল শিরোনাম থেকে ফায়দা হাসিল করে নিজের রিপুগুলোকে ঢাকে এবং সেগুলোকে সুন্দর লেবাসে প্রকাশ করে মূল্যবান বানানোর চেষ্টা করে; অথচ বাস্তব তার উল্টো।

প্রকাশ্য কথা যে, নিফাকের হাকিকত এ ছাড়া আর কী হবে যে, ভিতরটা এক রকম; আর দেখানো হবে আরেক রকম। ভিতরটা থাকবে নোংরা এবং বাহিরটা পরিপাটি করা হবে এবং দর্শকের দৃষ্টিকে ধোঁকা ও ফেরেব দেওয়া হবে।

বস্তুকৃষ্টির এসব আকর্ষণ এবং গম দেখিয়ে যব বিক্রিকে কুরআনে করীম *যীনত* শব্দ দিয়ে উপস্থাপন করেছে– যার হাকিকত এ-ই যে, ভিতরে কিছুই থাকবে না;

কিন্তু টিপটপ ও বাহ্যিক পরিপাটিতার কারণে তার মধ্যে চিত্তাকর্ষণ ক্ষমতা যথেষ্ট পরিমাণে ভরা থাকবে।

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَ الْبَنِيْنَ وَ الْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ الْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَ الْاَنْعَامِ وَ الْحَرْثِ، ذٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا، وَ اللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الْمَاٰبِ.

মানুষের কাছে আকর্ষণীয় মনে হয় মনোহর বস্তুসমূহের মহব্বত। স্ত্রী আছে; আছে ছেলেমেয়েও। স্তূপ করা সোনা-রূপা আছে রাশি রাশি; আছে নম্বর লাগানো ঘোড়া ও অন্যান্য জীবজন্তু এবং খেতখামার। এগুলো সবই দুনিয়ার জীবনের ব্যবহার্য সম্পদ। কিন্তু পরিণামের ভাল তো আল্লাহর কাছেই। *[সূরা আলে ইমরান : ৩ : ১৪]*

আয়াতের মধ্যে রিপুপূজা, সম্পদের লিপ্সাকে গর্ব-অহংকারের বিষয়– মানে সম্পদের প্রাচুর্য ও প্রতিপত্তির অহমিকাকে দুনিয়ার যীনত সাব্যস্ত করে বলা হয়েছে যে, এই সমস্ত জিনিস– নারী, বাড়ি, জমিদারি ইত্যাদি কেবলই ঠুনকো প্রাপ্তি এবং অস্থায়ী আনন্দ। অন্যথায় ওগুলোর ভিতরগত অবস্থা চলমান ছায়ার মত এবং ওগুলোর সাথে জড়িয়ে যাওয়া হল নোংরা ও তেঁতো। যদিও তার উপর অনেক সুন্দর পর্দা এবং চিত্তাকর্ষক শিরনামার লেবাস পরানো থাক না কেন? তার সার ও-ই দেখা যায়, যাকে পারিভাষিক লেবাসে *নিফাক* বলে। এখন যদি আপনি চিন্তা করেন, তাহলে সাইন্সের এই মূলনীতি দু'টি– 'গাইরুল্লাহর প্রেম' ও 'নিফাক'-এর হাকিকত বাতিল প্রমাণিত হবে। নিফাক বাতিল হওয়া তো এজন্যই স্পষ্ট যে, বাতিলের অর্থই তো হচ্ছে দেখতে অনেক কিছু; বাস্তবে কিছুই না। উপরে চকচকা; কিন্তু ভিতরে অন্ধকার। আর নিফাকেরও অবস্থা এমনই। অর্থাৎ ভিতরে কিচ্ছু না; বাইরেই যা কিছু। কাজেই *নিফাক* বাতিল হওয়ার বিষয়টি স্পষ্ট।

অন্যদিকে 'গাইরুল্লাহ'ও বাতিলেরই অনুবাদ। কেননা, প্রতিটা গাইরুল্লাহর অস্তিত্ব আল্লাহর অস্তিত্বের সাথে প্রতিষ্ঠিত; সে নিজ থেকে প্রতিষ্ঠিত নয় এবং নিজ থেকে অস্তিত্ববানও নয়। এজন্য গাইরুল্লাহর সত্তার ভিতর কোন অস্তিত্ব বা কোন কৃতিত্ব নেই; বরং তার মাধ্যমে শুধু হক তায়ালার বর্তমানতা এবং হক তায়ালার কৃতিত্ব প্রকাশ পায়। আর গাইরুল্লাহ– চাই মানব-নফস হোক বা *আনাসিরে আরবায়ার* অন্যকোন উৎপাদন হোক অথবা সৃষ্টির অন্য কোন অংশ হোক, যখন নাকি তার নিজস্ব কোন বর্তমানতাই প্রমাণিত হয় না, কাজেই সে

বাহ্যিকভাবে বর্তমান হলেও তার কোন অস্তিত্ব নেই। এজন্য আল্লাহ ছাড়া সবকিছু সত্তাগতভাবে বাতিলই প্রমাণিত হয়।

اَلَا كُلُّ شَيْئٍ مَا خَلَا اللهِ بَاطِلُ.

আর যেহেতু সাইন্সের বুনিয়াদ এই দু'টি বাতিলের উপর– এক. প্রভু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গাইরুল্লাহর উপর, যা কিনা জাগতিক বাতিল। আরেক. নিফাকের উপর, যা কিনা নফসী বাতিল। কাজেই পুরো সাইন্সের সার বাতিল হওয়া এবং বাতিলপ্রীতি ছাড়া আর কিছুই নয়– যার উপর বিজ্ঞানীদের এমন গৌরব ও হট্টগোল যে, তাতে দুনিয়া এবং আসমানের মহাশূন্য গর্জন করছে।

হ্যাঁ, এর বিপরীতে যদি গাইরুল্লাহকে পরিত্যাগ করে আল্লাহকে অবলম্বন করা হয়, তাহলে ঠিক এবং নিফাক ছেড়ে ইখলাস অবলম্বন করা হয়, তাহলেও ঠিক। আর আল্লাহর সাথে এমন নিষ্ঠাপূর্ণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার নামই ইসলাম। কাজেই এমন হকের উপর ইসলামের বুনিয়াদ প্রমাণিত হল, যার মধ্যে কোন বাতিলের চিহ্ন নেই। এজন্য এ কথা বলা অতিশয়োক্তি নয় যে, সাইন্স হল একটি ভিত্তিহীন হট্টগোল এবং বাতিলের নাম; আর ইসলাম হল একটি প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন বাস্তবতা ও সত্যের নাম, যার বুনিয়াদ সুদৃঢ় এবং স্থায়ী। বাতিলের কালিমা ভিত্তিহীন এবং হকের কালিমা আপন ভিত্তির উপর সুদৃঢ় ও প্রতিষ্ঠিত।

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ اَصْلُهَا ثَابِتٌ وَّ فَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِيْ اُكُلَهَا كُلَّ حِيْنٍ بِاِذْنِ رَبِّهَا، وَيَضْرِبُ اللهُ الْاَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ. وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيْثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيْثَةِ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْاَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ.

আপনি কি জানেন না যে, আল্লাহ তায়ালা কালিমায়ে তাইয়েবার কেমন উপমা বয়ান করেছেন? তা হল একটি পবিত্র বৃক্ষসদৃশ, যার শিকড় খুব গভীরে এবং তার শাখাপ্রশাখা মহাশূন্যে ছড়ানো। সে আল্লাহর হুকুমে প্রতি মৌসুমেই তার ফলদান করে। আর আল্লাহ তায়ালা তো মানুষের জন্য উপমাসমূহ এজন্য বয়ান করেন, যাতে তারা ভাল করে বুঝে নেয়। আর অশিষ্ট কালিমার উপমা এমন, যেমন একটি অশিষ্ট গাছ, যাকে জমিনের উপর থেকেই তুলে ফেলা যায়; তার কোন স্থায়ীত্বও নেই। *[সূরা ইবরাহীম : ১৪ : ২৪-২৬]*

একটি ভুল ধারণার নিরসন

কিন্তু এই আলোচনা থেকে এই ভুল ধারণা সৃষ্টি হওয়া উচিত নয় যে, আমি খোদ বিজ্ঞান এবং তার অগ্রযাত্রাকেই রোধ করছি বা সাইন্সের তালিমের উপর হারাম হওয়ার ফতোয়া আরোপ করছি অথবা (বলছি যে,) এ নিয়ে ব্যস্ত হওয়া একেবারেই অনর্থক। বরং উদ্দেশ্য সেটাই, যা বিভিন্ন শিরোনামে আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে এসে পড়েছে যে, একে কেবলায়ে মাকসুদ এবং কাবায়ে মাতলুব বানাতে বারণ করছি। এই সমস্ত চেষ্টা-প্রচেষ্টা, যা আজ সাইন্স প্রসঙ্গে করা হচ্ছে, যদি কোন হাকিকী উদ্দেশ্যে করা হয়, তাহলে তা শুধু বৈধই নয়; বরং তা কাম্যও বটে। কিন্তু সে উদ্দেশ্য দুনিয়া হতে পারবে না, কেননা দুনিয়া হল খোদ উসিলা। আবার জাগতিক আরাম-আয়েশও নয়, কেননা তা-ও উসিলা। বরং একজন মুসলমানের জন্য আখেরাত এবং তার ধর্মীয় চেতনাই মূল লক্ষ্য হতে পারে। কেননা তা-ই আসল মকসুদ এবং সেজন্যই মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে।

সুতরাং ধর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সাইন্স অশিষ্ট কালিমামাত্র, যার কোনই স্থায়ীত্ব নেই। আর ধর্মের সাথে যুক্ত হয়ে একজন খাদেমের ভূমিকায় এবং লক্ষ্য অর্জনের মাধ্যমহিসেবে অবশ্যই উপকারী ও কার্যকর হতে পারবে এবং কালেমায়ে তাইয়েবার আঁচলতলে আসতে পারবে। যার শিকড় হবে মজবুত এবং শাখা-প্রশাখা কথা বলতে থাকবে আসমানের সাথে।

কিন্তু আমি যতদূর লক্ষ করছি, আজকাল বৈজ্ঞানিক চেষ্টা-প্রচেষ্টা মৌলিক উদ্দেশ্য হিসেবে পরিলক্ষিত হচ্ছে। মানুষ শুধু এর জন্যই এর উপর ঝুঁকে পড়ছে এবং একে গ্রহণ করা না করার মাপকাঠি ধর্মকে বানানো হয়নি। শুধু কথাই নয়; বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রে একে ধর্মের বিরুদ্ধেও ব্যবহার করা হয়েছে, আর বলা হয়েছে– সাইন্স ধর্মের ভিত্তিমূল টলিয়ে দিয়েছে। কেমন যেন সাইন্স এমনই লক্ষ্য যে, ধর্ম তার উসিলা হওয়ারও যোগ্যতা রাখে না; স্থিতিশীল হওয়া তো দূরের কথা।

অনেকটাই সম্ভব যে, দুনিয়ার পুরানো ধর্মগুলোর ব্যাপারে সাইন্স এমন কোন গবেষণাই পেশ করেছে। কিন্তু আমি আপনাদেরকে দৃঢ়তা প্রদান করে বলতে পারি যে, দুনিয়ার যে ধর্মটার প্রতিটি পর্বের সাথে সাইন্স সঙ্গ দিয়ে চলতে পারে সেটি হল কেবলই প্রাকৃতিক ধর্ম; অর্থাৎ ইসলাম ধর্ম।

যদি এর বিস্তারিত তথ্য দেখতে হয়, তাহলে আমি এ বিষয়ে একটি পুস্তিকা লিখেছি 'তালিমাতে ইসলাম আওর মসীহী আক্বওয়াম'– যেটি দিল্লির নদওয়াতুল

মুসান্নিফীন প্রকাশ করেছে। তার মধ্যে স্পষ্ট প্রমাণাদির মাধ্যমে দেখিয়েছি যে, সাইন্সের সমস্ত আবিষ্কার মূলত ইসলামের পরক্ষ জাগতিক লক্ষ্য। আর এ যুগে ইসলামকে বুঝানো বা বুঝানোর কাছাকাছি নেওয়ার জন্যই অতিপ্রাকৃতিকভাবে সাইন্সের সমৃদ্ধি বাস্তবতায় এসেছে। কাজেই যে ব্যক্তি সাইন্সকে উপলক্ষ্য বানিয়ে ব্যবহার করবে, সে ইসলামের শক্তি যোগাবে। আর যে ব্যক্তি তাকে স্বয়ংসম্পূর্ণ উদ্দেশ্য বানিয়ে ব্যবহার করবে, সে নিজেকে দুর্বল ও ক্ষতিগ্রস্ত করবে। কিন্তু তাতে ইসলামের কিছু যাবে আসবে না।

ইউনিভার্সিটির ছাত্রদের শিক্ষা নেওয়ার ক্ষেত্র

যা হোক, যেহেতু নিরেট সাইন্স অর্থাৎ ধর্মের মধ্যস্থতা ছাড়া কালিমায়ে খবীসা, যার কোন ভিত্তি নেই এবং ইসলাম হল কালিমায়ে তাইয়েবা, যার শিকড় মজবুত ও সুদৃঢ়। তাই ইসলামের কৃতিসন্তানদের জন্য এখান থেকে উপদেশ ও নসিহত সৃষ্টি হয় যে, তাঁরা যেন নিজেদের মূল্যবান সময়কে নিরেট সাইন্সের কর্মকাণ্ডে এমনভাবে ব্যয় না করে, যাতে তা মৌলিক উদ্দেশ্য সাব্যস্ত হয়ে পড়ে এবং তার অস্থায়ী আনন্দ আসল হয়ে পড়ে। কেননা, পরিণতিতে এ হবে লজ্জার কারণ। সেই সাথে তাঁরা যেন ওইসব কওমের বাহ্যিক চাকচিক্য ও টিপটপে মোহিত না হয়ে পড়ে, যারা আগুন, পানি, বাতাস ও মাটির খেলাঘরে কিছু চমক লাগানো বস্তু বানিয়ে দুনিয়ার খেলাধুলায় সংযোগ ঘটিয়েছে। কেননা, ওগুলোর চাকচিক্যের আয়ু খুব সামান্য এবং সবসময় সামান্যই থাকবে।

এই বৈজ্ঞানিক কৃষ্টি ও ডামাডোলের ধোঁকা এক ধরনের ক্ষণিক রূপালি আনন্দ এবং এই কৃষ্টির মধ্যে ডুবে থাকা কওমগুলোব জীবন খুব সীমিত ও হিসেব করা। সেই সময় খুব তাড়াতাড়িই এসে পড়বে, যখন চাকচিক্যময় কৃষ্টি নিজের তামাদ্দুনের সাথে গোল বাঁধাবে এবং নিজের কৃষ্টিশীল লোকগুলোকে ভিতরগত সংঘর্ষ ও টক্করে খতম করে দেবে।

لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِي الْبِلَادِ، مَتَاعٌ قَلِيْلٌ، ثُمَّ مَأْوٰهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ.

তোমাকে যেন ওই কাফেরদের শহরে শহরে চলাচল ধোঁকার মধ্যে না ফেলে। কয়েক দিনের আনন্দমাত্র। তারপর ওদের ঠিকানা হবে জাহান্নাম; আর তা কতই নিকৃষ্ট বিশ্রামাগার।
[সূরা আলে ইমরান : ৩:১৯৬-১৯৭]

দেখতে আনাসিরে আরবায়াও খুব নজরকাড়া। আগুন অত্যন্ত চকচকে আড়ম্বরপূর্ণ দূর-দূরান্তে তেজস্ক্রিয়া পৌঁছাতে সক্ষম। পানি রূপোর মত স্বচ্ছ আর্দ্রতা ছড়াতে কার্যক্ষম। বাতাস বাহ্যিকভাবে তার সূক্ষ্মতাগুণের কারণে অত্যন্ত ক্ষীণদেহী এবং নিজ থেকে সর্বত্র বিরাজমান ও বর্তমান। ভূপৃষ্ঠ সামগ্রিক দৃষ্টিতে অত্যন্ত জাঁকজমক ও আড়ম্বরপূর্ণ এবং দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অনুভূত হয়। কিন্তু স্বভাবগত চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য অনুসারে এই চারটি আনাসিরই মুহতাজ পশ্চাৎপদ এবং সীমাহীন নিকৃষ্ট সাব্যস্ত হয়েছে এবং এগুলোর চাকচিক্য এগুলোর স্বভাবগত পিছুটান দূর করতে পারে না। যেমনটি বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে।

ঠিক অনুরূপভাবে বুঝে নিন যে, যেই কওম বা সোসাইটি অথবা ব্যক্তির উপর ওই বস্তুগত চরিত্রের প্রভাব পড়ে এবং সে রাতদিন বস্তুজগতের মধ্যে পরিপূর্ণ রূপে লেগে থাকে, তাহলে ওই কওম বা সোসাইটি বাহ্যিকভাবে আগুনের মত চাকচিক্য, পানির মত গোরা রঙ, বাতাসের মত দ্রুতগতি ও বিস্তৃতি এবং জমিনের মত ঠুনকো সম্মানের অধিকারী বলে মনে হয়। কিন্তু নিজেদের ওইসব বস্তুগত বৈশিষ্ট্যের কারণে, যেগুলো তার মধ্যে বস্তুগত ব্যস্ততা অবলম্বনের ফলে সংক্রমিত হয়েছে– পরিণতির অপমান ও লজ্জা থেকে তাকে কোন প্রকারেই বাঁচাতে পারে না, যা আখেরাতের আগে দুনিয়াতেই তার সামনে এসে থাকবে। কেননা, যেই বস্তুর কপালে দুর্ভাগ্যবশত কোন ইজ্জত লেখা হয়নি, তার বানানো শক্তিশালী ইমারতগুলো যত বেশি উপর দিকে উঠবে, তত দ্রুত ধ্বংস হয়ে যাবে।

উপসংহার ও উপদেশের সারসংক্ষেপ

অতএব, হে দীনী বন্ধুরা, আজকের লোক দেখানো কালচার্ড কওমগুলোর বাহ্যিক চাকচিক্যের দিকে যেয়ো না। তাদের ধ্বংসপূর্ণ পরিণতি অচিরেই আসছে। এমনটি যেন না হয় যে, খোদা না করুন– তাদের অনুসরণ অনুকরণ করার কারণে তোমরাও সেই পরিণামের আওতায় পড়ে যাও। ওই কওমগুলোর শক্তি তোমাদের দুর্বলতার মধ্যে নিহিত; তাদের কোন জহরতের মধ্যে নয়। রূহানীরা ময়দান ছেড়ে দিয়েছে, তাই বস্তুবাদীরা এসে দখল করেছে। অন্যথায় যখন পূর্বসুরীদের রূহানিয়াতের আধিক্য ছিল এবং রূহানী জাতীয়তা প্রতিষ্ঠিত ছিল, তখনকার দুনিয়া জানে যে, তাঁরা বস্তুগত প্রভাবকে কিভাবে নীচু করেছেন এবং বস্তুগত উত্থানের কী অবস্থা করেছিলেন। আজকেও যদি আপনারা নিজেদের হাকিকত উপলব্ধি করে হাকিকতপ্রিয় হয়ে যান, তাহলে সেই বিগত প্রতাপ ফিরে আসতে পারে। অন্যথায় এই আকার আকৃতির প্রদর্শনী বেশি দিন

স্থায়ী হতে পারবে না।

যা হোক, হাদীসের এক পর্যায়ের ব্যাখ্যা হয়ে গেল। সাইন্স এবং ইসলামের সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি অর্থাৎ উভয়ের প্রকৃতি, উভয়ের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, উভয়ের মধ্যে লক্ষ্য ও উপলক্ষ্য নির্ণয়, উভয়ের স্বভাবগত চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য, উভয়ের পরিণাম এবং উভয়ের চাহিদা নিজের সাধ্যমত এই হাদীস থেকে বের করে আপনাদের সামনে পেশ করেছি এবং আপনারা যে বিষয়ের আলোচনা আমার দায়িত্বে অর্পণ করেছিলেন, এক পর্যায়ে তার অঙ্গীকার পুরা করেছি। এজন্য তাওফিক ও (দীনের উপর) স্থায়ীত্বের দোয়া কামনা করে এই বয়ান শেষ করছি।

وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ اَوَّلًا وَّاٰخِرًا.

৭ আগস্ট ১৯৩৮ ইং,
৮ জুমাদাস সানী ১৩৫৭ হি. (রবিবার)

ষষ্ঠ খণ্ড সমাপ্ত

টেলিগ্রাম চ্যানেল লিংক

https://t.me/islaMic_fdf